মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নুতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

–Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 150.00

(*NSOU*-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata - 700064 & Printed at Gita Printers, 51A, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009.

SBG - 3 MODULES : 11 - 14

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

SBG - 3

MODULES : 11 - 14

SUBSIDIARY BENGALI

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মু— বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন যে পাঠ৻ম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ব্য—গতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা ৷ির করাই যু—যু—। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে সেইসঙ্গে যু— হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণের লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্য৻মে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপ৷াপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যকেন্দ্রে নিযু— শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরি— জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্র*-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ ঃ এপ্রিল, 2011

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক বাংলা **স্নাতক পাঠৰম (সাবসিডিয়ারি)**

পাঠৰম ঃ পর্যায় ঃ SBG ঃ 03 ঃ 37-48

	রচনা	**সম্পাদনা**
		বাংলা স্নাতক বিষয় সমিতির পক্ষে ঃ
পর্যায় ১১	☐ অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়	ড. দিলীপকুমার নন্দী
পর্যায় ১২	☐ অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত	ড. শ—নাথ ঝা
পর্যায় ১৩		ড. নীহারকান্তি মণ্ডল
একক ৪২, ৪৩ এবং ৪৪	☐ অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক	ড. বাণীমঞ্জরী দাস
একক ৪৫ ও ৪৬	☐ ড. সুচরিতা ব্যানার্জি	ড. মননকুমার মণ্ডল
		আব্দুল কাফি
পর্যায় ১৪	☐ ড. দিলীপকুমার নন্দী	

পরিমার্জন, বিন্যাস ও সম্পাদনা ঃ ড. মননকুমার মণ্ডল
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
স্কুল অব হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেস

ঘোষণা

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মু— বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সৌম্যেন্দ্র সেন
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মু— বিশ্ববিদ্যালয়

SBG—3

(স্নাতক পাঠৰম — সাবসিডিয়ারি — বাংলা)

পর্যায়
১১ (উপন্যাস)

একক ৩৭ ❑ কপালকুণ্ডলা ঃ উপন্যাস পাঠ 7-55

পর্যায়
১২ (ছোটগল্প)

একক ৩৮ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ‘স্ত্রীর পত্র’ 56-76

একক ৩৯ ❑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পুঁইমাচা 77-96

একক ৪০ ❑ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারিণী মাঝি 97-117

একক ৪১ ❑ সুবোধ ঘোষ ঃ সুন্দরম্ 118-139

পর্যায়
১৩ (প্রবন্ধ)

একক ৪২ ❑ বিবিধ প্রবন্ধ ঃ গীতিকাব্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 140-154

একক ৪৩ ❑ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ শূদ্র জাগরণ 155-166

একক ৪৪ ❑ নিয়মের রাজত্ব — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 167-174

একক ৪৫ ❑ হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা ঃ চড়ক —কালীপ্রসন্ন সিংহ 175-189

একক ৪৬ ❑ পঞ্চতন্ত্র ঃ বই কেনা— সৈয়দ মুজতবা আলী 190-196

পর্যায়
১৪ (নাটক)

একক ৪৭ ❑ গণনাট্য আন্দোলনের ভূমিকা ঃ
নবান্ন (মূলনাটক) — বিজন ভট্টাচার্য্য 197-297

একক ৪৮ ❑ নবান্ন নাটকের আলোচনা 298-361

একক ৩৭ ❑ কপালকুণ্ডলা ঃ উপন্যাস পাঠ

গঠন

৩৭.১ উদ্দেশ্য

৩৭.২ প্রস্তাবনা

৩৭.৩ 'কপালকুণ্ডলা'-র কাহিনীর উৎস সন্ধানে

৩৭.৩.১ কাহিনী সংক্ষেপ

৩৭.৩.২ 'কপালকুণ্ডলা' উপসংহার

৩৭.৩.৩ কাহিনী-বিশ্লেষণ

৩৭.৪ উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

৩৭.৪.১ উপকাহিনীর অন্যান্য উপযোগিতা

৩৭.৪.২ 'কপালকুণ্ডলা'র উপকাহিনী

৩৭.৪.৩ সার-সংক্ষেপ

৩৭.৫ 'কপালকুণ্ডলা'র বৃত্তগঠন

৩৭.৬ 'কপালকুণ্ডলা'র অতিপ্রাকৃত উপাদান

৩৭.৭ কাহিনীতে বাস্তবতা সৃষ্টির চেষ্টা

৩৭.৭.১ বাস্তবতা ঃ সময়ের উল্লেখ

৩৭.৭.২ বাস্তবতা ঃ ঐতিহাসিক কাহিনী

৩৭.৭.৩ বাস্তবতা ঃ শীর্ষ উদ্ধৃতি

৩৭.৮ সার-সংক্ষেপ

৩৭.৯ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি

৩৭.৯.১ চরিত্র সৃষ্টি ঃ নবকুমার

৩৭.৯.২ চরিত্র সৃষ্টি ঃ কপালকুণ্ডলা

৩৭.৯.৩ চরিত্র সৃষ্টি ঃ মতিবিবি

৩৭.৯.৪ চরিত্র সৃষ্টি ঃ অপ্রধান চরিত্রসমূহ

৩৭.১০ সার-সংক্ষেপ

৩৭.১১ 'কপালকুণ্ডলা'র শ্রেণীবিচার

৩৭.১১.১ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি কাব্য

৩৭.১১.২ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি উপন্যাস

৩৭.১১.৩ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি রোমান্স

৩৭.১১.৪ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি কাব্যিক রোমান্স

৩৭.১২ সারাংশ

৩৭.১৩ অনুশীলনী
৩৭.১৩.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর অনুশীলনী
৩৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জী
৩৭.১৫ উত্তরমালা
৩৭.১৫.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর উত্তরমালা

৩৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- 'কপালকুণ্ডলা' আখ্যানভাগ কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, এই কাহিনীর কতখানি বাস্তব ঘটনা, কতটা লেখকের নিজস্ব কল্পনা সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
- কাহিনীর উপস্থাপনায় বিভিন্ন ঘটনা এবং চরিত্রাবলীর প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা জানতে পারবেন।
- কাহিনীর সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত নির্মাণ রীতি এবং অতিপ্রাকৃত ও বাস্তব উপাদানের অনুপাতিক বিন্যাসে কিভাবে একে আকর্ষনীয় করে তোলা হয়েছে তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- কাহিনীতে প্রধান পাত্রপাত্রী এবং অপ্রধান চরিত্রাবলী কী ভূমিকা পালন করেছে, তা বুঝতে পারবেন।
- উপন্যাসের শ্রেণীভেদ অনুযায়ী 'কপালকুণ্ডলা'র বৈশিষ্ট্য বিচার করতে পারবেন।

৩৭.২ প্রস্তাবনা

একটি উপন্যাসকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে গেলে আলোচনার আওতায় আনা প্রয়োজন মূলতঃ তিনটি বিষয়—এর কাহিনী অংশ, এর চরিত্রনির্মাণ এবং লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশরীতি। উপন্যাসের গল্পটি পরিবেশিত হয় নানা ঘটনার কার্যকারণে শৃঙ্খলে বাঁধা থেকে, বিভিন্ন চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ও সংলাপকে অবলম্বন করে, লেখকের বিশিষ্ট চিন্তাভাবনার আলোকে আলোকিত হয়ে। উপন্যাস পাঠের সময় তাই আপনাদের এই তিনটি প্রধান বিষয়ে সচেতনতা আবশ্যক।

'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনী কিছুটা বাস্তব, কিছুটা লেখকের কল্পনা এবং নিজস্ব জিজ্ঞাসাপ্রসূত ঘটনা। এর চরিত্রাবলীও কখনও বাস্তব মানুষের আদলে নির্মিত, (নবকুমার) কখনও অন্য সাহিত্যিক-প্রেরণাসঞ্জাত (কপালকুণ্ডলা), কখনও আবার ইতিহাসসম্ভাব্য (মতিবিবি)। এরা অধিকাংশ সময়েই আমাদের পরিচিত মানবজগতের সঙ্গে সদৃশ, যদি বা এরা কখনও ভিন্ন পথে বিচরণ করে, তবে সেটি লেখকের নিজের দর্শন, মতামত, উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই। আসুন, উপন্যাসটির সামগ্রিক বিশ্লেষণে আমরা এর কাহিনী, চরিত্রায়ণ এবং লেখকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের ব্যাপারটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করি।

৩৭.৩ 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীর উৎস সন্ধানে

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি এমনই একটি সৃষ্টি যে বহু সমালোচকই এর উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করেছেন। সেই সময়ের এবং পরবর্তী কালের অনেক আলোচকই মনে করেন, এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাস যে

অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল তা বোঝা যায় বহুভাষায় এর অনুবাদ দেখে। ইংরেজিতে অনুবাদ তো বেশ কয়েকবার হয়েছে তা ছাড়া ১৮৮৬ সালে অধ্যাপক ক্লেম জার্মান ভাষায় এটি অনুবাদ করেন। ভারতীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, হিন্দি, গুজরাটি, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে। এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে এটি মঞ্চস্থ করেন প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরে অন্য নাট্যকারও এর নাট্যরূপ দিয়েছেন। এর কাহিনীটি তখন এতই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল যে অপর একজন সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাস যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকেই এদের নিয়ে আবার নতুন করে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, নাম 'মৃন্ময়ী'। এ থেকেই বুঝতে পারবেন তখনকার সাহিত্যিকরাও এই উপন্যাস পড়ে কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এই যে সকলে মুগ্ধ হচ্ছেন উপন্যাস পড়ে, সেতো লেখার গুণে বটেই, কিন্তু এর বিষয়টাও এমন অভিনব যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় এমন একটা চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্র পেলেন কোথা থেকে। এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্রের লেখা 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগুঁয়াতে (এখন যা কাঁথি নামে পরিচিত) বদলি হন তখন তাঁর সমুদ্র তীরের বাংলোতে প্রতিদিন গভীর রাতে এক কাপালিকের উদয় হতো। সে থাকতো সমুদ্রতীরের গভীর জঙ্গলে। এই কাপালিককে নিয়ে তিনি যে বেশ চিন্তা ভাবনা করতেন সে কথা বোঝা যায় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে করা একটি প্রশ্ন থেকে—'যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?'

প্রান্তলিপি

এই উপন্যাসের বিষয় এতোই নতুন রকমের মনে হয়েছে যে লণ্ডন থেকে ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে আর. ডাব্লিউ ফ্রেজার কী দারুণ প্রশংসা করেছেন এর, সেটাও আপনাদের জেনে রাখা দরকার। তিনি লিখেছেন—"Outside in 'Mariage de Loti' there is nothing comparable to the 'Kopala Kundala' in the history to western fiction."

এ প্রশ্নের উত্তর দীনবন্ধু মিত্র কিছু দেননি, দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, তিনি বলেছিলেন—'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।' এই মন্তব্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পছন্দ হয়নি, পূর্ণচন্দ্র তাঁর গ্রন্থেই সে কথা বলেছেন। উপন্যাসটি পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন, পূর্ণচন্দ্র ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু সমাধান যেরকমই হোক, সমস্যাটা যে বেশ অভিনব তা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হচ্ছে। খানিকটা এই ধরনের সমস্যা দেখা যায় কালিদাসের সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-য়। সেখানে আশ্রমে প্রতিপালিতা শকুন্তলা কণ্বমুনি আর আশ্রমবালক ছাড়া অন্য কোন পুরুষ চোখে দেখেনি, প্রথম দেখল রাজা দুষ্মন্তকে। শেক্সপীয়রের 'দা টেম্পেস্ট' নাটকে মিরান্ডারও প্রায় এই ভাবেই নির্জন দ্বীপে শৈশব কেটেছে। সমালোচক ফ্রেজার যে উপন্যাসটির নাম করেছেন, সেই উপন্যাসের লেখক পিয়ের লোতিও দেখিয়েছেন এইরকম একটি মেয়েদের দ্বীপে প্রথম পুরুষের আগমন। যাইহোক, সংক্ষেপে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনীটা আপনাদের জানিয়ে রাখি, যাতে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্যার কী সমাধান করলেন।

৩৭.৩.১ কাহিনী-সংক্ষেপ

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটির কলেবর খুব বেশি নয়, গল্পে নাটকীয় উত্থান পতন থাকলেও কাহিনী খুব জটিল নয়। নবকুমার এই কাহিনীর নায়ক। সপ্তগ্রামে তার বাড়ি। মূল ঘটনা আড়াইশো বছর আগেকার কথা, তাই সপ্তগ্রাম তখন জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি। গঙ্গাসাগরের মেলা থেকে ফেরবার সময় দিগ্‌ভ্রান্ত একদল যাত্রীর মধ্যে নবকুমারও ছিল। কোনরকমে একটা চরে নৌকা ভিড়লে রান্নার উদ্যোগ শুরু হল। কাঠ নেই বলে নবকুমার একা গেল কাঠ কাটতে, কিন্তু তার আগেই জোয়ারে নৌকা ভেসে গেল। নবকুমার সেই চড়ে পরিত্যক্ত হল।

সেই চরে থাকতো এক কাপালিক আর একটি যুবতী মেয়ে কপালকুণ্ডলা। আসলে সে ব্রাহ্মণকন্যা, দৈবদুর্ঘটনার অতি শৈশবে সেই চরে নির্বাসিত। কাপালিক নিজের স্বার্থেই তাকে লালন করেছে। কাপালিক বধের জন্য একটি মানুষ পেয়ে খুব খুশি, নবকুমারকে বন্দী করে রাখল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মায়া হল, সে তাকে মুক্ত করে নিয়ে এল ভৈরবী মন্দিরে পুরোহিত অধিকারীর কাছে। কাপালিকের রোষ থেকে কপালকুণ্ডলাকে বাঁচাবার জন্য অধিকারী নবকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে সপ্তগ্রাম পাঠাবার জন্য মেদিনীপুর পর্যন্ত দিয়ে এলেন।

সপ্তগ্রাম যাবার পথেই দেখা হয় নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মবতীর সঙ্গে, কিন্তু নবকুমার তাকে চিনতে পারে না। পাঠানের হাতে পড়ে পদ্মাবতীর পরিবারের সকলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে বলে নবকুমারের সঙ্গে তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। পদ্মাবতী লুৎফা-উন্নিসা নাম নিয়ে মোগল রাজদরবারে সেলিমের খুব প্রিয়পাত্রী হয়েছে। বাইরে, তার নাম মতিবিবি। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়, গা ভর্তি গহনা সে দেয় কপালকুণ্ডলাকে, কপালকুণ্ডলা তা আবার দান করে ভিখারীকে।

অচেনা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলে যে ধরনের সমস্যা হবার কথা, তা হয়না, নবকুমার জীবন্ত ফিরে আসার আনন্দে সব চাপা পড়ে যায়। কিন্তু কিছু দিন পার নবকুমারের বিবাহিতা ভগ্নী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনে বুঝি, কপালকুণ্ডলার কোন পরিবর্তন হয়নি, আগের জীবনই তার কাম্য ছিল।

এরপর কাহিনী কপালকুণ্ডলাকে ত্যাগ করে মতিবিবির আখ্যান বর্ণনা করতে বসে। সেলিম বা জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী রাজা মানসিংহের ভগিনী এবং সেই ভগিনীর প্রধানা সহচরী হিসাবে লুৎফা-উন্নিসা সেলিমকেও তৃপ্তি দান করতো। আকবর মৃত্যুশয্যায় বলে সেলিমই সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু সেলিম যে গোপনে শের আফগানের স্ত্রী মেহের-উন্নিসার প্রতি প্রণয়াসক্তা, সে কথা জানতো মতিবিবি। ফলে খসরুকে সিংহাসনে বসাবার একটা ষড়যন্ত্র করে সে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এরপর মেহের-উন্নিসার কাছে গিয়ে সেলিম সম্বন্ধে তার মন জানতে চেষ্টা করে মতিবিবি। শেষে মেহের ঘোর প্রণয়াসক্ত। সে কথা সেলিমকে সে জানালে সেলিম অবশ্য উপপত্নী হিসাবে তাকে কাছে রাখতে চায়, কিন্তু সে নিজের স্বামীর ওপর অধিকার কায়েম করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে বিতাড়িত করতে সপ্তগ্রামে আসে। এর কাপালিককেও সেখানে পেয়ে গেল। দুজনের উদ্দেশ্য একই।

এক বছরের বিবাহিত জীবন কাটার পর কপালকুণ্ডলার সামান্য পরিবর্তন হলেও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে তার প্রতি অনুরক্ত করার জন্য বন থেকে গভীর রাতে ওষুধ খোঁজার জন্য পাঠায় মৃন্ময়ী বা কপালকুণ্ডলাকে। মতিবিবি ও কাপালিকের পরামর্শ শুনে ফেলে সে, কাপালিককে দেখেও ফেলে এক

ঝলক। স্বপ্নে কপালকুণ্ডলা নিজের নিয়তি দেখতে পায়। ব্রাহ্মণকুমারবেশী মতিবিবি চিঠি দেয় তাকে আবার দেখা করার জন্য। সেই অনুযায়ী সে যায়, কিন্তু সেই চিঠি নবকুমারের হাতে পড়লে সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। গভীর রাতে কপালকুণ্ডলাকে অনুসরণ করতে যাওয়ার কাপালিকের সঙ্গে দেখা হয়। ভগ্নবাহু কাপালিক মৃণ্ময়ীকে ভৈরবীর কাছে বলিদানে নবকুমারের সাহায্য চায় এবং মদ্যপানে তাকে উন্মত্ত করে ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে মৃণ্ময়ীর মিথ্যা দ্বিচারিতার দৃশ্য দেখায়। নবকুমারই মৃণ্ময়ীকে বধ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় পাড় ভেঙে মৃণ্ময়ী জলে পড়ে। নবকুমার তাকে উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপ দেয়। দুজনেই তলিয়ে যায়।

৩৭.৩.২ কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের একেবারে শেষ বাক্যটি এইরকম ছিল—'সেই অনন্তগঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, 'বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?'

এটা কিন্তু উপন্যাসের বর্তমান সংস্করণে আছে। আপনারা সন্ধান করলে দেখতে পাবেন, প্রথম সংস্করণে অর্থাৎ উপন্যাসটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এর পরেও খানিকটা অংশ ছিল। সেই অংশটুকু এইরকম ঃ ''(কাপালিক) লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কুলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্ন আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

তীরে পুণরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্য বিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিঃশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইল। সে বাক্য কেবল 'মৃণ্ময়ী! মৃণ্ময়ী!'

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃণ্ময়ী কোথায়?' নবকুমার উত্তর করিলেন, 'মৃণ্ময়ি-মৃণ্ময়ি-মৃণ্ময়ি!'

এই দুটি উপসংহারের মধ্যে কোন্‌টি আপনাদের মতে সুন্দর এবং যুক্তিসংগত, ভেবে দেখতে পারেন। আমার বিবেচনায়, শাস্তি যদি পেতেই হয়, দুজনেরই পাওয়া উচিত, একা কপালকুণ্ডলার নয়। তাছাড়া অন্যায় তো বেশি করেছে নবকুমারই। কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর উপকার করবার জন্যই বেরিয়েছিল, আগের দিন কাপালিককে দেখা সত্ত্বেও; কথা বলেছিল ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে। অথচ সেই অপরাধে নিজে তাকে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে নবকুমার কাপালিকের নির্দেশ অনুসারে তাকে বলি দিতে গিয়েছিল। বিনা অপরাধে মৃণ্ময়ীর মৃত্যু যদি ঔপন্যাসিক দেখাতে পারেন, তবে অপরাধ করে নবকুমারের বেঁচে যাওয়া পাঠক হিসাবে আমাদের কিছুতেই যুক্তিসংগত হতো না বলে মনে হয়। তাই, মনে হয় আপনারাও একমত হবেন যে, বর্তমান সমাপ্তিটিই উপন্যাসের পক্ষে সঠিক হয়েছে—যা হবার দুজনের একসঙ্গেই হয়েছে, এবং সেটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩৭.৩.৩ কাহিনী-বিশ্লেষণ

আপনারা উপসংহার নিয়ে যেরকম ভাবনাচিন্তা করলেন, সেই ভাবেই একবার ভাবতে পারেন গোটা কাহিনীটা নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের মাথায় যে চিন্তাটা এসেছিল, আমরা তা জানি। সেই চিন্তাটাকে রূপ দেবার জন্যই তিনি 'রসুলপুরের নদীর' বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি এবং অরণ্যসংকুল অঞ্চলে মৃণ্ময়ীর আশৈশব প্রতিপালনের কথা ভেবেছিলেন। কোনসময় নৌকাডুবি হয়ে একটি শিশু সেখানে উপস্থিত হতেই পারে এবং কাপালিক তাকে আশ্রয় দিয়েছে এমন ঘটনাও স্বাভাবিক। মৃণ্ময়ী বা কপালকুণ্ডলা কখনই কোন যুবা-পুরুষের মুখ দেখেনি,

এটা অবশ্য ঠিক নয়—অধিকারীর শিষ্যেরা কখনও কখনও এসেছে। তবে সভ্য সমাজের নিয়মকানুন জানা বা স্বামী ও বিবাহ সম্বন্ধে কোন ধারণা তার অবশ্য থাকার কথা নয়।

নবকুমার সেইরকম একটি জায়গায় নিতান্ত পরিস্থিতি বিপর্যয়েই গিয়ে পড়েছিল এবং যেরকম ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল তাতে নবকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে সভ্য সমাজে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া অধিকারীর আর কিছু করবারও ছিল না বোধ হয়। অর্থাৎ এইরকম একটি লোকালয় ও সভ্য সমাজের সংস্রব বর্জিত মেয়ের বিয়ে দেওয়া হল।

এরপরে যা হতে পারে বলে সঞ্জীবচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন তা যে বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হয়নি, সেটা আমরা পরবর্তী কাহিনী থেকেই বুঝতে পারি। মৃণ্ময়ীকে পেয়ে নবকুমার যে পৃথিবীকে অন্য চোখে দেখতে লাগল, সব কিছুই তার কাছে সুন্দর হয়ে গেল, এ কথা লেখক বলেছেন, কারণ—'প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।'

অথচ কপালকুণ্ডলার তিলমাত্র পরিবর্তন এই প্রণয় ঘটাতে পারেনি। নবকুমারের বোন শ্যামাসুন্দরী তাকে সুন্দর করে চুল বেঁধে দিতে চেয়েছে, অলংকারে ভূষিত করতে চেয়ছে, এমন কী সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে', একথাও বলেছে, তার পরেও কপালকুণ্ডলা বলেছে, 'বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'

আমরা বিবাহের এক বছর পরেও কপালকুণ্ডলাকে দেখেছি। তখনও সংসারের দিকে তার কোন মন নেই, নবকুমারের প্রতি বিশেষ প্রণয় নেই, দাম্পত্য জীবনেও কোন লোভ নেই। কাজেই মনে হয় জীবনের প্রথম ষোল বছর এইভাবে কাপালিকের কাছে লালিত হলে সংসার আর তাকে আকর্ষণ করতে পারবে না, এইরকম একটা চিন্তাই মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল। অন্তত কাহিনী থেকে সেরকমই মনে হয়। চরিত্রের পক্ষে এই ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে কিনা আমরা কিছুটা পরে বিচার করবো। এখন একটা অন্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র যে চিন্তার কথা উপন্যাস লেখার আগে কারো কারো কাছে খুলে বলেছেন সেখানে কিন্তু শুধু মেয়েটির কথাই ছিল, তাকে বিবাহ করে যে সভ্যসমাজে নিয়ে যাবে তার আর একপক্ষ আগে ছিল, কিম্বা তার বিবাহিত বোনকে স্বামী বিশেষ সম্মান বা ভালবাসা দেয় না, এসব কথা ছিল না। এসব যে উপন্যাসে এসেছে, তাই নয়, কপালকুণ্ডলার জীবন এবং পরিণতির সঙ্গে এরা একেবারে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। এটা কেন হল, আপনাদের একটু চিন্তা করে দেখতে হবে।

৩৭.৪ উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

যে কোন উপন্যাস লেখার সময় মূল কাহিনী তো একটা থাকেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অপ্রধান আরো দুটো-একটা গল্প লেখক সুন্দর ভাবে জুড়ে দেন তার সঙ্গে, এমন ভাবে যাতে মূল গল্পের সঙ্গে বেশ মসৃণভাবে মিশে যেতে পারে। কেন তিনি এমন করেন? উপন্যাসটা একটু মোটাসোটা করবার জন্য? পাঠকের কৌতূহল আরো বাড়িয়ে তুলবার জন্য?

এমনিতে প্রশ্ন দুটো যতোই শুনতে কেমন মোটা দাগের হোক না কেন, এ কথাগুলোও কিন্তু মিথ্যে নয়। উপন্যাসটাকে বেশ খানিকটা কলেবর তো দিতেই হবে, নইলে তাকে উপন্যাস বলে মনে হবে কেন! এখন আমাদের আলোচ্য এই ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসের কথাই ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে প্রশ্নটা জেগেছিল, সেই প্রশ্নের রূপায়ণ কিন্তু তিনি প্রথম দুটি খণ্ডেই, অর্থাৎ পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই করে ফেলেছেন— অর্থাৎ লোকালয়বর্জিত স্থানে একটি মেয়ের বেড়ে ওঠা দেখালেন, অবস্থা বিপাকে তাকে বিবাহ করে সভ্যসমাজে নিয়ে আসা দেখালেন, দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করে সে মেয়ের কোন পরিবর্তন হল কিনা তাও তিনি দেখিয়ে ফেললেন। সব কিন্তু ওই পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই, যে উপন্যাসের বর্তমান কলেবর হচ্ছে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ। তাও প্রথম পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে মতিবিবি। কাজেই মতিবিবিকে বাদ দিলে, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মধ্যে তো মতিবিবির কোন প্রসঙ্গই ছিল না, ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাস কেন খণ্ডোপন্যাসের আয়তনও পেত কি না সন্দেহ।

দ্বিতীয় কথাটা ছিল পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলা। তার জন্যেও তো নিশ্চয়ই গৌণ কিছু গল্প মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দেবার দরকার হতেই পারে। ‘কপালকুণ্ডলা’র গল্পটাই যখন সদ্য আমরা জেনেছি তখন তার কথাটাই আর একবার ভাবা যাক। একেবারে প্রথম দিকটা পাঠকের খুবই কৌতূহল ছিল, একটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাও ছিল—কাপালিকের হাতে ধরা পড়ার পর নবকুমার উদ্ধার পায় কি না। যখন কপালকুণ্ডলাই তাকে বাঁচিয়ে দিল, অধিকারী তার সঙ্গে নবকুমারের বিয়ে দিয়ে তাকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন, তখন আমাদের কৌতূহলের বিষয় এইবার কপালকুণ্ডলা বা মৃণ্ময়ী একটি সাধারণ নারীর অনুভূতিগুলি লাভ করবে, নাকি আগেকার মত বন্যস্বভাবেরই থাকবে। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে দেখা গেল নবকুমার কপালকুণ্ডলার জন্য পাগল হলেও কপালকুণ্ডলার মনে নবকুমার বা এই সংসারের জন্য কোনরকম আকর্ষণ তৈরি হয়নি— এমনকী সাধারণ নাগরিক মেয়ের মত চুলবাঁধা বা সাজসজ্জার ব্যাপারেও তাকে রাজি করানো যাচ্ছে না। পাঠকের কৌতূহলকে এবার কী দিয়ে জাগ্রত করবেন বঙ্কিমচন্দ্র। অপ্রধান গল্প তো তাকে খুঁজতেই হবে। এই ধরনের অপ্রধান গল্পগুলিকে উপন্যাস সমালোচনার ভাষায় বলা হয় উপকাহিনী বা sub plot. একটা উপন্যাসে এর দরকার হয় আরো নানা রকম কারণে। সেগুলি এবার জেনে নিন।

৩৭.৪.১ উপকাহিনীর অন্যান্য উপযোগিতা

যেকোন উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকের যে একটা নিজস্ব জীবনদৃষ্টি থাকে, সে বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নিজের বিশিষ্ট মানসিকতার জন্যই এই জীবনদৃষ্টি তৈরি হয়। উপন্যাস যদি এই জীবনদৃষ্টি বা লেখকের নিজস্ব কোন বক্তব্য আমরা খুঁজে না পাই তাহলে উপন্যাসটিকে সার্থক উপন্যাস হিসাবে মেনে নিতে পারবো না। এই যে জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা বা বক্তব্য, সেটা তো ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের মূল কাহিনী দিয়েই প্রকাশ করবেন। কিন্তু এখন মনে হতে পারে যে সেই বক্তব্যকে আরো জোরদার করার জন্য তাঁর মনে হল, আরো দুটো একটা উপকাহিনী হলে বেশ সুবিধে হয়। তখন তিনি এই রকম গৌণ কাহিনীর কথা ভাবেন। ব্যাপারটা আপনারা আরো ভালো বুঝতে পারবেন আর একটু বুঝিয়ে বললে।

প্রথম যে দুটি কারণের কথা বলেছি, উকাহিনী সে জন্য তো দরকার হয় নিশ্চয়ই—উপন্যাসের আয়তন বাড়াবার জন্য উপকাহিনীর খোঁজ করেন লেখক, পাঠকের কৌতূহল বজায় রাখার জন্যও একসঙ্গে দু-তিনটি

ছোটবড় কাহিনী পেয়ে গেলে একবার এটা, একবার ওটা করে পাঠককে অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায়, কিন্তু ওই জীবনদৃষ্টির ব্যাপারটা আরো গুরুত্বপূর্ণ। সেটার ব্যাপারে উপকাহিনীকে দুভাবে কাজে লাগান হয়। প্রথমত ধরুণ যে বিশেষ বক্তব্য ঔপন্যাসিক সেই উপন্যাসে প্রকাশ করতে চান ঠিক সেইরকম বক্তব্য নিয়েই যদি একটি ছোট কাহিনী পাশাপাশি বুনে যান, তাহলে তাঁর বক্তব্য আরো জোরদার হতে পারে। দ্বিতীয় ব্যাপারটাও বেশ আকর্ষণীয়। মূল কাহিনীতে যেরকম জীবনচিত্র আছে ঠিক তার বিপরীত ধরনের একটা জীবনচিত্র যদি তিনি উপকাহিনীতে আঁকেন তাহলে প্রেক্ষিতের একটা বৈপরীত্য থাকে বলেই ঔপন্যাসকির বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কালো কাপড়ের ওপরে যেমন ফুটে ওঠে সাদা সুতোর কাজ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসটা আপনাদের অনেকেরই চেনা, সেই জন্য ওই উপন্যাসকেই দৃষ্টান্ত হিসাবে বেছে নিচ্ছি। উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথ পরম সাধ্বী স্ত্রী সূর্যমুখী থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পেরে কুন্দনন্দিনীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। এর ফল অবশ্য হল বিষময়, কুন্দনন্দিনী বিষপান করে আত্মহত্যা করল, এই হচ্ছে উপন্যাসের মূল কাহিনী। এর সঙ্গে উপকাহিনী আছে দুটি—দেবেন্দ্রনাথ হীরার আখ্যান এবং শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির আখ্যান। প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পারলে তার বিষময় ফলে সংসারে বিপর্যয় দেখা যায়, এই মূল বক্তব্যের সমান্তরাল উপকাহিনী দেবেন্দ্র-হীরার আখ্যান—সেখানেও অসংযমী দেবেন্দ্র দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং হীরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় রকমের যে ব্যাপারটা উপকাহিনীতে হয়ে থাকে, আমরা বলেছি, তার দৃষ্টান্ত শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি বৃত্তান্ত। নগেন্দ্রের অশান্তির সংসার আরো স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য তাঁর বোন কলমমণির দাম্পত্যচিত্র এত মধুর করে এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এমনকী, সংসারে প্রকৃত টান যে তৈরি হয় সন্তানকে দিয়ে এবং সেইখানেই যে নগেন্দ্রের জীবনে একটা মস্ত ফাক রয়ে গিয়েছে তা বোঝান হয়েছে কলমমণির সন্তান সতীশচন্দ্রের অত্যধিক পাকামি দিয়ে।

৩৭.৪.২ ‘কপালকুণ্ডলার’র উপকাহিনী

উপকাহিনী লিখবার প্রথম যে কারণদুটি থকে, ‘কপালকুণ্ডলা’র ক্ষেত্রে সে কারণদুটি যে ছিলই, সে কথা আপনারা আগেই শুনেছেন, কারণ ‘উপকাহিনীর দরকার হয় কেন’ শিরোনামে সে আলোচনা আমরা করেছি। ‘উপন্যাসের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে এখানে প্রাথমিকভাবে কিছুটা কলেবর বৃদ্ধির জন্যই উপকাহিনী লিখবর কথা ভাবতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত নবকুমারের প্রথমা পত্নী মতিবিবিকে নিয়ে আসায় পাঠকের কৌতূহলও যে বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক, সে কথা অস্বীকার করবারও কোন উপায় নেই। এবার আমাদের দেখতে হবে উপকাহিনী সৃষ্টির অন্য দুটি তাৎপর্য এখানে ফুটিয়ে তুলবার কোন চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল কিনা।

প্রথমেই অবশ্য আপনাদের জেনে রাখা ভাল যে, কপালকুণ্ডলায় মতিবিবির গল্পটা প্রধান উপকাহিনী হলেও এখানে ছোটো আর একটি উপকাহিনী কিন্তু ছিল, সেটা শ্যামাসুন্দরীর গল্প। এই গল্পটা যে তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই শোনাবেন, সে কথা নবকুমার পরিবারের পরিচয় দেবার সময়ই বঙ্কিম বলেছেন। জায়গাটা আপনাদের একবার পড়ে শুনিয়ে দিতে পারি ঃ

‘নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা; তাহার

সহিত পাঠকমহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয় শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা; কেননা, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।'

এবার ভাবুন উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব যে জীবনদৃষ্টি ফুটে উঠেছে সেটার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ধারণা, সমাজ-সংসারের বাইরে কোন মেয়ে যদি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বড় হয়ে ওঠে, তাহলে যৌবনকালে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারী করতে চাইলেও দাম্পত্যজীবনে সে সুখী হতে পারবেনা। এই ধারণা তাঁর ছিল বলেই নবকুমারের প্রগাঢ় প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেল—নবকুমারের প্রেম বা দাম্পত্যবন্ধন, কোনটাই তাকে আকর্ষণ করতে পারল না।

উপকাহিনীর কাজ হতে পারে এর অসম্ভব ধারার কোন কাহিনী সৃষ্টি করা। সেটা যে সম্ভব ছিল না, সে কথা আমরা বুঝতে পারি, কারণ এই কাহিনী এতই বিচিত্র ধরণের যে একই গ্রন্থে এরকম আর একটি উপকাহিনী আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতো না নিশ্চয়ই। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র উপকাহিনীর অন্য তাৎপর্যটির কথা মনে রেখেছেন, অর্থাৎ বিপরীত ধরনের কাহিনী শুনিয়ে একটা বৈপরীত্য তৈরি করা, যাতে সেই প্রেক্ষিতে মূল কাহিনী বেশ ফুটে ওঠে। ছোটো এবং বড়ো দুটি উপকাহিনীর কথাই মনে করুন, ব্যাপারটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমে শ্যামাসুন্দরীর গল্পে দেখুন, কুলীন ব্রাহ্মণের বহু স্ত্রীর মধ্যে সে এক জন বলে তার প্রতি স্বামীর ভালবাসা বিশেষ নেই। স্বামীর মন যাতে পাওয়া যায় সেজন্য প্রসাধনকলা, গুণপনার পরিচয় দেওয়া—ইত্যাদি ব্যাপারে সে যথেষ্টই করেছে নিশ্চয়ই, তারপরও যখন স্বামীর মন পাওয়া যায়নি তখন টোটকার সাহায্য নিয়েচে। কপালকুণ্ডলাকে বন থেকে ওষধি লতা খুঁজে আনতে বলেছে। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীর মন পাবার এই তীব্র চেষ্টা, দাম্পত্যজীবনের প্রতি এই ভালবাসা কপালকুণ্ডলার উদাসীনতা এবং সংসারের প্রতি বিরাগকেই আরো স্পষ্ট করে নাকি।

দ্বিতীয় গল্পে দেখুন এই বৈপরীত্য আরো তীব্র। কপালকুণ্ডলা স্বামীর প্রেম পেয়েও তার মূল্য বুঝতে পারছে না, অথচ মতিবিবি জীবনে প্রচুর বৈভব, প্রচুর আভিজাত্য এবং বিলাস পেয়েও স্বামীপ্রেমের জন্য লালায়িত। সেলিমের মোহ ত্যাগ করে সপ্তগ্রামে ফিরে এসেছে সে, কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, কাপালিকের কাজে সাহায্য করেছে। কেন? উত্তর কিন্তু একটাই—নবকুমার তার স্বামী, সেই অধিকার সে আবার প্রতিষ্ঠিত করবে, আবার দাম্পত্যজীবনে সে ফিরে আসবে। মতিবিবির এই তীব্র জীবন পিপাসার প্রেক্ষিত কপালকুণ্ডলার সংসারজীবনে বিতৃষ্ণাকেই আরো স্পষ্ট করেছে। উপকাহিনী দুটি এই জন্যই সার্থক।

৩৭.৪.৩ সার-সংক্ষেপ

কপালকুণ্ডলার কাহিনী সংক্রান্ত যেটুকু এতক্ষণ আলোচনা করা হল সেটা সংক্ষেপে একটু মনে করার চেষ্টা করুন।

প্রথমে কাহিনীর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আপনারা দেখেছেন, মেদিনীপুরে গিয়ে একটি কাপালিককে দেখেই হোক বা যে কারণেই হোক, একটা প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জেগেছিল, কোন মেয়ে যদি জ্ঞান থেকেই সমাজ সংসারের বাইরে থাকে, তারপর যৌবনকালে তাকে কেউ সংসারী করার চেষ্টা করে, সংসারের প্রতি আগ্রহ কি তার জন্মাবে! সকলের সঙ্গে আলোচনায় সন্তুষ্ট না হয়েই বোধ হয় উপন্যাসটি তিনি লেখেন। এর কাহিনীতে আমরা দেখি মৃণ্ময়ী প্রায় আজন্ম কাপালিকের কাছে নির্জন বালিয়াড়িতে বড়ো হয়েছে। পরে

নবকুমারকে বিবাহ কর সংসারী হবার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়েছে।

এই মূল কাহিনী সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আরো দুটি খণ্ডকাহিনী জুড়েছেন, উপন্যাসের আলোচনায় যাদের বলে উপকাহিনী। উপন্যাসে উপকাহিনী দরকার হয় মূলত চারটি কারণে—উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করবার জন্য, পাঠকের কৌতূহলকে ধরে রাখবার জন্য, লেখকের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির অনুরূপ একটি খণ্ডকাহিনী দিয়ে তার তীব্রতা বাড়াবার জন্য অথবা বিপরীত ধরনের উপকাহিনী তৈরি করে মূল কাহিনীর ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার জন্য। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে দুটি উপকাহিনী আছে, নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী মতিবিবির গল্প এবং নবকুমারের বোন শ্যামসুন্দরীর গল্প। এই উপকাহিনী দুটি উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রেখেছে এবং তীব্র সংসারাসক্তি ও দাম্পত্য জীবনের তৃষ্ণায় কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তিকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

৩৭.৫ 'কপালকুণ্ডলা'র বৃত্তগঠন

বৃত্তগঠন কথাটা ইংরেজি Plot-construction কথাটির বাংলা রূপান্তর। উপন্যাসের story বা কাহিনী আর plot বা বৃত্ত ব্যাপার দুটোর মধ্যে একটু তফাত আছে। এই তফাতটা ই. এম. ফরস্টার নামে এক ইংরেজ ঔপন্যাসিক সমালোচক ভারি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন Aspects of the Novel নামে একটি ছোটো বইয়ে। এইরকম একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিয়েই পার্থক্যটা বুঝিয়েছেন, বলেছেন—'রাজা মারা গেলেন, তারপর রাণি মারা গেলেন, এই হল কাহিনী, এবং 'রাজা মারা গেলেন, তারপর দুঃখে রাণিও মারা গেলেন', এই হল বৃত্ত। মানেটা কী হল? গল্পে আছে কেবল এই প্রশ্ন, তারপর কী হল! বৃত্তে আছে একটা কার্যকারণ শৃঙ্খল। ব্যাপারটা আপনাদের আর একটু স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করি।

যেকোন একটা ছোট গল্প বা উপন্যাস লিখতে গেলে তার গল্পটা তো লেখককে মোটামুটি ভাবে আগেই ভেবে নিতে হবে, কিন্তু সেটা ঠিক কীভাবে সাজিয়ে লিখলে পাঠকের কৌতূহল বজায় থাকবে, কার্যকারণ শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে, গোটা কাহিনীটার মধ্যে একটা বাঁধুনি থাকবে—এক কথায় তার বিন্যাসটাকেই বলে বৃত্ত। আপনারা যে আগে উপকাহিনীর কথা জেনেছেন, সেও কিন্তু এই বিন্যাসেরই ব্যাপার। কীভাবে আমি আমার গল্পটাকে বিন্যস্ত করবো, এটা ভাবতে গিয়েই ঠিক করতে হয় এতে একটাই কাহিনী থাকবে; নাকি একের বেশি। একটিই কাহিনী থাকলে সে বৃত্তকে আমরা বলি সরল বৃত্ত। যদি একাধিক উপকাহিনী থাকে, মানে আমাদের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মত, তবে সেই গঠনকে বলি জটিল বৃত্ত। আর যদি বেশ কয়েকটি কাহিনীর মধ্যে কোনটিকেই ঠিক প্রধান মনে না হয়, সবগুলোই প্রথমটা দেখতে আলাদা বলে মনে হয়, তবে সেই গঠনটাকে বলি যৌগিক বৃত্ত, যেমন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'। কপালকুণ্ডলার গঠনটা যে জটিল বৃত্তের, সেটা আমরা এর মধ্যেই জেনে ফেলেছি, কারণ এখানে কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের গল্পটাই প্রধান, মতিবিবি আর শ্যামাসুন্দরীর গল্প এই প্রধান কাহিনীটাকে নিটোল হতে সাহায্য করেছে মাত্র। এবার দেখি, গোটা কাহিনীটার বিন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক কেমনভাবে করেছেন।

আকারে কপালকুণ্ডলা খুব বড় না হলেও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিকে বিন্যস্ত করেছেন চার খণ্ডে। প্রত্যেক খণ্ডে অবশ্য বেশ কিছু করে পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম খণ্ডের নয়টি পরিচ্ছেদে আছে—কাপালিকের আস্তানায় নবকুমারের গিয়ে পড়া, বন্দী হওয়া, কপালকুণ্ডলার সাহায্যে সাময়িক মুক্তি, অধিকারীর পৌরোহিত্যে তাদের বিবাহ এবং মেদিনীপুর পর্যন্ত তাদের নির্বিঘ্নে এগিয়ে দিয়ে আসা। দ্বিতীয় খণ্ডের ছ-টি পরিচ্ছেদে পাই—

সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তন, পথে নবকুমারের প্রথমা পত্নীর সঙ্গে দেখা এবং বিনা বাধায় কপালকুণ্ডলা নবকুমারের স্ত্রী হিসাবে গৃহীত। তৃতীয় খণ্ডের সাতটি পরিচ্ছেদেই পাই—মতিবিবির সংবাদ—আগ্রায় তার প্রতিপত্তির ইতিহাস এবং সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তন। চতুর্থ খণ্ডের ন'টি পরিচ্ছেদে নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ, কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে চূড়ান্তষড়যন্ত্র এবং পরিণতিতে দুজনের মৃত্যুর আশঙ্কা। ঠিক মতো কার্যকারণে শৃঙ্খলে সমস্ত ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে কিনা বুঝতে গেলে অবশ্য আর একটু বিস্তারিত ভাবে গোটা ব্যাপারটা আমাদের জানতে হবে। প্রথম খণ্ডের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে নবকুমারের নির্বাসনের কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। দিগভ্রান্ত যাত্রীনৌকা কোনক্রমে চড়ায় বেঁধে রান্নার উদ্যোগ করলে তা নষ্ট হতে বসেছিল চেলাকাঠের অভাবে। অন্য কেউ রাজি না হওয়ার নবকুমার একাই গিয়েছিল কাঠ কাটতে, ফলে জোয়ার আসবার সময় নবকুমারের প্রতীক্ষা আর কেউ করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য আমাদের একটা উপদেশ দিয়েছিলেন সেটিও আপনাদের মনে রাখতে হবে ঃ

'ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। . . . তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তর না হইব কেন?

একেবারে পরের পরিচ্ছেদেই কাপালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে গল্পের কোন চমক থাকে না, তাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিঃসঙ্গ ও অসহায় নবকুমারের এমন কষ্ট দেখান হয়েছে যাতে যে কোন কারও সন্ধান পেলে সে বেঁচে যায়। চতুর্থ পরিচ্ছেদেই কাপালিকের সন্ধান পেয়েছে এবং তাতে সে আশঙ্কিত না হয়ে খুশিই হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে—পথভোলা পথিককে সে কাপালিকের আশ্রয়ে যেমন পৌঁছে দিয়েছে, তেমনি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নবকুমারকে বলিদানের জন্য কাপালিক বন্ধন করলে বাঁধনও কেটে দিয়েছে সে। সপ্তম পরিচ্ছেদে খুব যুক্তিসংগত ভাবেই কাপালিককে উঁচু বালিয়াড়ি থেকে পড়ে যেতে দেখিয়েছেন লেখক, যাতে কিছুদিনের জন্য সে কর্মক্ষম না থাকে, কারণ অষ্টম পরিচ্ছেদে অধিকারী নবকুমারকে বিবাহের প্রস্তাব দেবেন এবং নবম পরিচ্ছেদে বিবাহের পর তাকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন—গোটা ব্যাপারটাই সময় সাপেক্ষ। যেহেতু দ্বিতীয় খণ্ডে মতিবিবিকে দেখানো হবে, প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদেই তার উল্লেখ করা হয়েছে।

নবকুমারের সঙ্গে মতিবিবির সাক্ষাৎ করানো হবে বলেই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার পালকির সঙ্গে না গিয়ে নবকুমারকে পদব্রজে যাত্রা করানো হয়েছে, মতিবিবি দস্যুর হাতে নিগৃহীতা হয়েছে এবং নবকুমারের সাহায্যে সরাইখানায় পৌঁচেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মতিবিবি তার স্বামীকে চিনেছে, নবকুমার তাকে চেনেনি। সপত্নীকে দেখার প্রলোভন অবশ্যই এবার জাগবে, তাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলাকে দেখেছে মতিবিবি, তাকে গহনা দান করে নিজের বৈভব বোঝাতে চেয়েছে। পরের পরিচ্ছেদেই সেগুলি ভিখারীকে দান করে কপালকুণ্ডলা তার নিজের চরিত্রও বুঝিয়ে দিয়েছে। যুক্তি অনুসারে এরপর থাকা উচিত একটি অজ্ঞাতকুলশীল মেয়েকে নবকুমারের পরিবার কীভাবে গ্রহণ করে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে সেটাই বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন কপালকুণ্ডলার প্রেমে নবকুমার বিহ্বল হলেও কপালকুণ্ডলার কোনরকম পরিবর্তন নেই।

যে কোনো অল্প শক্তিমান লেখক হলে কাহিনী হয় এখানেই শেষ হতো, অথবা কপালকুণ্ডলা যে কিছুতেই সংসারে মন বসাতে পারছেনা, বার বার তার বর্ণনা দিয়ে আমাদের বিরক্ত করা হতো। এই একঘেয়েমি এড়াবার জন্য, অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে সংসারে মন বসাবার জন্য বেশ কিছুটা সময় দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গোটা

দ্বিতীয়খণ্ডই প্রায় অতিবাহিত করেছেন নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী ও আগ্রার সম্রাট পরিবার নিয়ে। প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন সম্রাট সেলিমের অত্যন্ত কাছের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে উড়িষ্যা পালাতে হয়েছিল, যাতে মেদিনীপুরে নবকুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সেই পূর্বসূত্র অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের লড়াই দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। আগ্রার সিংহাসনে মতিবিবির টিকে থাকার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে তৃতীয় পরিচ্ছেদে সে গিয়েছে শের আফগানের বেগম মেহেরউন্নিসার কাছে। নিজের অস্তিত্বরক্ষা প্রায় অসম্ভব, সে বুঝে গিয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে সম্রাট সেলিমের সঙ্গে কথা বলে। সুতরাং পঞ্চম পরিচ্ছেদে অনিবার্য ভাবেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আগ্রা ত্যাগের। এইবার আশাহত, ক্ষমতাচ্যুত, ভাগ্যের লড়াইয়ে পরাজিত মতিবিবির মনে ঝলসে উঠবে প্রতিহিংসার আগুন, এটাই স্বাভাবিক—তার অধিকারে যে হস্তক্ষেপ করেছে, তার স্বামীকে যে পরিত্বে বরণ করেছে, তাকে সরতে হবে সেখান থেকে, অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে মতিবিবির। সুতরাং পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে মতিবিবি ফিরে এসেছে পদ্মবতী হয়ে, গাঁটছড়া বেঁধেছে কাপালিকের সঙ্গে, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে।

নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত, চতুর্থখণ্ডে সেই কাজটিই তিনি করেছেন। কপালকুণ্ডলার চরিত্র অপরিবর্তিত, প্রথম পরিচ্ছেদে শ্যামাসুন্দরীর জন্য গভীর বনে সে ওষধি খুঁজতে গিয়েছে। এ কাজ তাকে দ্বিতীয়বার করতে হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, তখনই কাপালিককে জঙ্গলে সে দেখতে পেয়েছে, ব্রাহ্মণকুমারবেশী পদ্মাবতী এবং কাপালিকের পরামর্শও সে শুনতে পেয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার নিয়তি যেন সে দেখতে পেয়েছে স্বপ্নে, সুতরাং আর একবার সাক্ষাৎ করার জন্য পদ্মবতীর পত্র পেয়ে সে জঙ্গলে যাবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাটকীয়তার চূড়ান্ত পর্যায় পত্র হারানো ও নবকুমারের তা হস্তগত হওয়া। এবার ক্ষিপ্ত নবকুমার পঞ্চম পরিচ্ছেদে কাপালিককে তার বাড়িতে ডেকে আনতেও দ্বিধা বোধ করে না। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এবং মদ্যপান করিয়ে কাপালিক নবকুমারকে এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে যে সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণকুমারবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার অঙ্গুরীয় বিনিময় দেখতে পেয়ে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দ্বিচারিণী ভাবে। অষ্টম পরিচ্ছেদে নবকুমারই কপালকুণ্ডলাকে ধরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়, অদৃষ্টের পরিহাস বোধ হয় একেই বলে। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণকুমারের পরিচয় কপালকুণ্ডলার মুখে শুনে তার ঘোর কাটে। কিন্তু নদীর পাড় ভেঙে কপালকুণ্ডলা জলে পড়ে যায়, উদ্ধার করার জন্য নবকুমারও ঝাঁপ দেয়। কেউই আর উঠতে পারে না।

> **প্রান্তলিপি**
>
> ‘প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, তার সার কথাটি আপনারা জেনে রাখতে পারেন। তিনি বলেছেন ‘যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।’

কাহিনীর এই বিনাস থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন, কী নিপুণভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাগুলি সজ্জিত করেছেন, সর্বত্র একটা যুক্তিশৃঙ্খলা মেনে চলেছেন এবং নিতান্ত প্রয়োজনেই মতিবিবির উপকাহিনী সৃষ্টি করেছেন।

৩৭.৬ ‘কপালকুণ্ডলা’র অতিপ্রাকৃত উপাদান

বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা হয়েছে, এবং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণই যখন বাস্তবতা, তখন বাস্তব উপাদান বা প্রকৃত উপাদানই তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনারা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাস পড়ে থাকেন, তবে একথা নিশ্চয়ই জানেন যে কিছু অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিল যেমন স্বপ্নদর্শন, অলৌকিক ঘটনা, ভাগ্যগণনা প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে অবশ্য মনে করতেন পাঠকের চিত্তবিনোদনের জন্য বা বাইরের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবার জন্যই এসব ঘটনা উপন্যাসে এসে পড়েছে, কিন্তু এটাও ঠিক যে ভবিষ্যৎ এবং পরিণতি নির্দেশের কাজেও এইসব ঘটনা অনেক সময়ই কাজে লেগেছে।

‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে এইরকম দৈব বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটেছে মূলত দুবার—একবার প্রথম অঙ্কের নবম পরিচ্ছেদে, অন্যবার চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। এর কাহিনী আপনারা জানেন, কাজেই ঘটনাদুটির উল্লেখ করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

নবকুমারকে উদ্ধার করে প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে যখন কপালকুণ্ডলা অধিকারীর কাছে এসেছিল তখন অধিকারী তার সঙ্গে নবকুমারের বিবাহ দেবার সংকল্প করে ‘একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।’ বিল্বপত্রটি পড়ে নি বলেই তিনি মনে করেছিলেন—এই সংকল্পে দেবী কালিকার সম্মতি আছে। কিন্তু বিবাহের পর যাত্রাকালে যখন দেবীর কাছে আবার এসেছেন—‘ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।’

এই ঘটনা কপালকুণ্ডলার মনে গভীর রেখাপাত করেছে, এমন হতে পারে, কারণ সংস্কার এবং তামসিক ভক্তি তার মনে অত্যন্ত বেশি থাকারই কথা।

চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা একটি স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নের মধ্যে অতিপ্রাকৃত বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এখানেও যেন তার ভবিষ্যতের একটি নির্দেশ আমরা পাই। কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখেছে—একটি তরীতে বসন্তলীলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হঠাৎ দুর্যোগের কালো মেঘে সব পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রচণ্ড তরঙ্গ উঠল সমুদ্রে। ‘একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ’ এসে তরী বাঁ হাতে তুলে ধরল। ‘ভীমকান্তশ্রীময়ী ব্রাহ্মণবেশধারী’ অন্য একজন তরী ধরে জানতে চাইলেন—তরী ভাসাবেন না নিমগ্ন করবেন। ‘‘কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, ‘নিমগ্ন কর।’’ তরী পাতালে নিমজ্জিত হল।

এই স্বপ্নের অবশ্য একটা সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমরা পাই। কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবন নষ্ট করার জন্যই যে কাপালিক এসেছে, তা কপালকুণ্ডলা দেখেছে। ব্রাহ্মণবেশধারী যে পুরুষ নয়, তা সে শুনেছে, কিন্তু কাপালিকের সঙ্গে তাকে মন্ত্রণা করতে যখন সে দেখেছে তখন তার সর্বনাশের জন্যই জল্পনা-কল্পনা চলেছে, এ কথা চিন্তা করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। স্বপ্নটি হয়তো তার সেই চিন্তারই ফলমাত্র।

৩৭.৭ কাহিনীতে বাস্তবতা সৃষ্টির চেষ্টা

আমাদের এতক্ষণকার আলোচনায় এ কথা নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে, কপালকুণ্ডলায় লেখক এমন

‘একটা পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, ঠিক যেরকম পরিবেশ আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতায় আমরা পাই না। এটা ঠিক আমাদের চেনা মানুষের গল্পও নয়—কাপালিক আর কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ আমরা কেউই প্রায় পাবো না। যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে তাও আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না, কারণ ওইভাবে একটি নির্জন বালিয়াড়িতে নির্বাসিত হবো এবং একটি সুন্দরী যুবতী কাছে এসে বলবে ‘পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?’ এমন অভিজ্ঞতা আমাদের কারোরই হয়তো হবে না।

প্রান্তলিপি

এখানে একবার মনে করে নিতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’-র আরম্ভটা ঃ ‘৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।’

ব্যাপারটা যতই কাল্পনিক হোক, এই কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে তাকে বাস্তব করে তুলতে হবে, অর্থাৎ পাঠকের কাছে তাকে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হবে। সেই ব্যাপারটা করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কী কী চেষ্টা করেছেন,—সেগুলোই আমরা এবার লক্ষ করার চেষ্টা করবো।

৩৭.৭.১ বাস্তবতা ঃ সময়ের উল্লেখ

যে গল্প শোনানো হচ্ছে, সেটা আরম্ভ করবার সময়টা একেবারে নির্দিস্ট করে বললে কী হয়, মনে হয় যেন এটা গল্প নয়,—সত্য ঘটনা। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস শুরু করেছেন এইভাবে ঃ

‘প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।’ অর্থাৎ তখন সালটা যে প্রায় ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ—কারণ এই উপন্যাস লেখা হয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, এটা স্পষ্ট করে বলা হল। তাতে মনে হল, যেন এটা কোন কাল্পনিক কাহিনী নয়। অবশ্য এটা বঙ্কিমচন্দ্রের অতি প্রিয় কৌশল, অন্যান্য উপন্যাসেও এরকম কৌশল আপনি পাবেন।

কিন্তু এই কৌশলের কথা মুখে বলা যত সহজ, সর্বদা স্মরণ রেখে ঠিক সেইমত উপন্যাস লিখে যাওয়া কিন্তু অতো সহজ নয়। যেমন দেখুন, সপ্তদশ শতকের ঘটনাক্রম বললেই মনে রাখতে হবে, ইংরেজ তখনও এদেশে আসেনি। সেটা মাথায় রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ‘পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল।’

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র যখন মতিবিবির প্রসঙ্গে আগ্রার মোগল রাজবংশের কথা উল্লেখ করেছেন, তখনও স্মরণ রেখেছেন, সেটা সম্রাট আকবরের মৃত্যু ও যুবরাজ সেলিমের সিংহাসন লাভের সময়।

তৃতীয় আর একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যায়। সপ্তগ্রামে নবকুমারের বাসভবনের কাছাকাছি এমন অরণ্য থাকতে হবে যেখানে কাপালিক লুগিয়ে থাকতে পারে, যেখানে ওষধির সন্ধানে কপালকুণ্ডলা পরিভ্রমণ করতে পারে। এই কারণেই সমৃদ্ধিশালী নগর হিসাবে পরিচিত সপ্তগ্রামের সে সময় কীরকম অবস্থা ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন একটু বিশেষভাবে ঃ

‘সপ্তগ্রামের এক নির্জন ওপনিবেশিক ভাগে নবকুমারের বাস। . . . নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর

বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

বাস্তবতা রক্ষার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ সতর্কতা এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোধ হয় সৃষ্ট হতে পারবে।

৩৭.৭.২ বাস্তবতা ঃ ঐতিহাসিক কাহিনী

একটি কাল্পনিক কাহিনী পরিবেষণ করতে গিয়ে উপকাহিনীতে অর্থাৎ নবকুমারের প্রথমা পত্নীর গল্প-প্রসঙ্গে ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র কেন আশ্রয় করলেন, এ বিষয়ে নানা কারণ অনুমান করা যায়। কেউ কেউ এরকম বলেন যে—'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পরিবেশে এবং ঐতিহাসিক চরিত্র সমন্বয়ে রচনা করে তিনি বিশেষ সাফল্য ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, সেই জন্যই দ্বিতীয় উপন্যাসে ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি, ইতিহাসের কাহিনী যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন, সেটুকুই বর্ণনা করেছেন।

আমার কিন্তু সে কথা মনে হয় না। এ বিষয়ে আমার মত হল এই যে, বাস্তবতা রক্ষার জন্যই এ কাজ বঙ্কিমচন্দ্রকে করতে হয়েছে। এ মত অবশ্য সম্পূর্ণ ভাবেই আমার। আপনারা উপন্যাসটি ভালভাবে পড়ে দেখে যদি এর সঙ্গে একমত না হন তবে অবশ্যই অন্যভাবে আপনার শিক্ষাসহায়কের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আমি মনে করি যে কাহিনী এই উপন্যাসে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা শুধু কাল্পনিক নয়, এত বিচিত্র ধরনের যে, কোন মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাকে ধরার সম্ভাবনা খুবই কম। এই রকম একটা পুরোপুরি কাল্পনিক কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে বিশ্বাসের একটা ভূমি দরকার, 'ইতিহাস সেই বিশ্বাসের ভূমি বলে আমি মনে করি। রসুলপুরের নদীর চরে কাপালিকের বসবাস বা প্রায় আজন্ম কপালকুণ্ডলাকে মানুষ করবার ব্যাপারটা একেবারে অলীক হতে পারে, কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনলাভ তো অলীক নয়, মানসিংহের ভগিনী যে তাঁর প্রধানা মহিষী ছিলেন, এ খবর তো অসত্য নয়, এবং জাহাঙ্গীর যে শের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসার প্রতি গাঢ় প্রণয়াসক্ত ছিলেন, ইতিহাসই তার নির্ভুল সাক্ষ্য দেয়—অন্যায়ভাবে শের আফগানকে হত্যা পর্যন্ত করাতে হয়েছিল তাঁকে নিজের অভিলাস পূর্ণ করার জন্য। কাজেই এমন একটি শক্ত জমির ওপর নিজের উপন্যাসকে দাঁড় করাবার যে সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্র হাতে পেয়েছেন, সেটাই কাজে লাগিয়েছেন নবকুমারের প্রথমা পত্নীকে লুৎফ-উন্নিসা হিসাবে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাজন করিয়ে। ইতিহাসের এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলেই লুৎফ-উন্নিসার কাহিনীও বিশ্বাসযোগ্য এবং লুৎফ-উন্নিসার সূত্রেই নবকুমারের কাহিনীটি পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।

৩৭.৭.৩ বাস্তবতা ঃ শীর্ষ উদ্ধৃতি

চারখণ্ডে সম্পূর্ণ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে পরিচ্ছেদের সংখ্যা একত্রিশ। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শীর্ষেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছেন। পরিচ্ছেদের ঘটনার সঙ্গে কিছুটা ভাবসাদৃশ্য আছে, বিভিন্ন সাহিত্য থেকে এরকম অংশ খুঁজে খুঁজে এক বা একাধিক পংক্তি পরিচ্ছেদ শুরুর আগে তুলে দিয়েছেন। এতে শুধু যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসবোধ প্রকাশ পেয়েছে, উপন্যাসটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তাই নয়—যে সমস্ত নাটক ও কাব্যকে আমরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি তাদের সঙ্গে ভাবসাদৃশ্যে উপন্যাসটিও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্ধৃতিগুলি আপনাদের কারো কারো কাছে অপরিচিত মনে হতেও পারে। কিন্তু এগুলি না জানা থাকলে

উপন্যাসটির রস পুরোপুরি গ্রহণ করা যাবে না, তাই আমি অতি সংক্ষেপে এদের পরিচয় দেবো।

প্রথম খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ — 'Floating straight obedient to the stream.' বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়রের Comedy of Errors নাটকের একটি পংক্তি। এই নাটক অবলম্বনেই বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন 'ভ্রান্তিবিলাস'। নবকুমারের যাত্রীবাহী নৌকা যেমন এখানে ঘন কুয়াশার মধ্যে পড়ে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, শেক্সপীয়রের নাটকেও তেমনি বণিক Aegion (ইজিয়ন) দিগন্তজোড়া কুয়াশার মধ্যে পড়ে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — 'Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!'- শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক King Lear-এর প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। বড়ো এবং মেজো মেয়েকে সম্রাট লিয়র অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কিন্তু প্রতিদানে অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই পাননি বলে এটি তাঁর খেদোক্তি—অকৃতজ্ঞতাই সবচেয়ে কঠিন হৃদয় শত্রু। কপালকুণ্ডলার এই পরিচ্ছেদে নবকুমারও এইরকম অকৃতজ্ঞতাই পেয়েছিল সহযাত্রীদের কাছে। তাদের আহার হবে না বলে গিয়েছিল কাঠের জোগাড় করতে, তারাই তাকে চরে নির্বাসন দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— '— Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And girmly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes.'

বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের 'ডন জুয়ান' (Don Juan) কাব্যগ্রন্থ থেকে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই কাব্যের নায়ক জাহাজে করে সমুদ্রপথে যখন চলেছিল, তখন রাত্রির গভীর অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এরকম অনুভূতিই তার হয়েছিল, যেন যবনিকা উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে এসেছে নিকষ কালো রাত সমস্ত বিদ্বেষ নিয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ ও দৃষ্টি হতাশ করে দিতে। ডন জুয়ানের সঙ্গে অবশ্য একজন সঙ্গিনী ছিল, কপালকুণ্ডলার এই পরিচ্ছেদে অজানা নির্জন দ্বীপের কালো অন্ধকারে নবকুমার একা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— '—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থের পঞ্চম সর্গে এই পংক্তি দুটি আছে। লঙ্কার উত্তর দরজায় গভীর বনের মধ্যে অবস্থিত চণ্ডীদেবীর মন্দিরে লক্ষ্মণ এসেছিলেন দেবীকে পুজো করতে, উদ্দেশ্য মেঘনাদকে বধ করা। সেই সময়ই দরজায় ভীষণদর্শন মহাদেবকে দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। নবকুমার এই পরিচ্ছেদে কাপালিককে ওইভাবে হঠাৎ দেখতে পেয়েছে বলেই বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্ধৃতির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন বোধ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— '—যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্ব্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্।।'

মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য ‘রঘুবংশম্’-এর যোড়শ সর্গে এই শ্লোকটি আছে। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর শারাবতীতে যখন কুশ রাজত্ব করছেন, গভীর রাতে একদিন অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সাধারণ নারী হিসাবে তাঁর বন্ধ ঘরে তাঁকে দর্শন দিলেন। সেই রাজলক্ষ্মীকেই কথাগুলি কুশ বলেছিলেন—আপনার বিশেষ যোগশক্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ আপনার আকৃতি দুখিনী নারীর মত, আপনাকে হিমক্লান্ত মৃণালিনী বা পদ্মফুলের মত মনে হচ্ছে। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখে হতবাক হয়ে যাবে বলেই এই পরিচ্ছেদে ‘রঘুবংশের’ কুশের বিমূঢ় অবস্থার কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে পড়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— ‘কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ—

শ্রীহর্ষ রচিত ‘রত্নাবলী’ নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে রাজার এই সংলাপের অংশ সংগ্রহ করা হয়েছে। শৃঙ্খলিতা সাগরিকাকে দেখে রাজা এই কথা বলেছেন—এ কী! তুমি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমি দ্রুত এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব। কপালকুণ্ডলাও এই পরিচ্ছেদে নবকুমারের বন্ধনমুক্ত ঘটাবে, সেই জন্যই এই প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃত করেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ— ‘And the great lord of Luna
Fell at that deadly stroke;
As falls on mount Alvernus
A thunder-smitten oak.’

এই অংশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি বোঝা যায়। এটি নেওয়া হয়েছে মেকলের Lays of Ancient Rome গ্রন্থ থেকে। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে লুনার অধিপতি ভূপতিত হওয়ার সঙ্গে মেকলে তুলনা করেছিলেন অ্যালভার্নাস পাহাড়ের একটি বজ্রাহত ওক গাছের লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে। এখানে বালিয়াড়ির শিখর থেকে কাপালিকের পতন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই তুলনার কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ— ‘And that very night—
Shall Romeo bear thee to Mantua.’

এটি শেক্সপীয়রের ‘রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট’ (Romes and Juliet) নাটকের অংশবিশেষ (4th Act, Scene1)। এখানে নায়িকা জুলিয়েটকে লরেন্স সান্ত্বনা দিয়ে বলছে,—ওষুধের প্রভাবে মৃতপ্রায় জুলিয়েটকে কবরস্থ করার জন্য নিয়ে এলে সেই রাত্রেই রোমিও তাকে মান্টুয়ায় নিয়ে যাবে। মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে অধিকারীর আশ্রমে নিয়ে গিয়েছে বলেই এই অংশ লেখকের মনে পড়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ— ‘কণ্ব। অলং বুদিতেন; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।’

মহাকবি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের চতুর্থ অঙ্কে মহর্ষি কণ্ব এই করেছিলেন। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় তাকে অঝোরে কাঁদতে দেখে তিনি বলেছিলেন, আর কেঁদো না, স্থির হও। তোমার পথের দিকে চেয়ে দেখো। নবম পরিচ্ছেদে অধিকারীও প্রায় সেই ভূমিকা গ্রহণ করে কপালকুণ্ডলাকে উপদেশ দিয়েছেন বলে সদৃশ অংশ লেখক উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— '—There—now lean on me:
Place your foot here—

ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের 'ম্যানফ্রেড' (Manfred) নাট্যকাব্যে এই সংলাপটি পাওয়া যায়। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় ম্যানফ্রেডের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হলে একজন শিকারী তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এ কথা বলেছিল—আমার দেহের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে আসুন। এই পরিচ্ছেদে নবকুমারও মতিবিবিকে সেইরকম কথা বলবে বলে লেখক ম্যানফ্রেডের ওই অংশের সঙ্গে নিজের লেখার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— 'কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা'

কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের সংস্কৃত 'উদ্ধবদূত' কাব্যে কবি শ্রীরাধাকে দেখে এই মন্তব্য করেন—স্বভাব চঞ্চলা এই নারীটি কে? 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নবকুমার মতিবিবিকে চিনতে না পেরে কেবল প্রগলভা নারীটির আচরণ দেখে এইরকম কথাই হয়তো মনে করে থাকবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— 'ধর দেরি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গ থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। রতিদেবী এ কথা বলেছেন দেবী পার্বতীকে। রাবণবধের জন্য মহাদেবের অনুগ্রহ দরকার, মহাদেব ধ্যানমগ্ন—সেই ধ্যান ভঙ্গ করতে পারেন একমাত্র পার্বতী, তাই রামচন্দ্রের অনুরোধে রতিদেবী পার্বতীকে মোহিনী সাজে সাজাবার জন্য এ কথা বলেছেন। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবিও কপালকুণ্ডলাকে সাজাবে, কিন্তু তার সঙ্গে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের সাদৃশ্য বোধহয় খুব বেশি নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— '—খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চি।'

এটিও মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এখানেও আমাদের মনে হয় কপালকুণ্ডলার সব গহনা ভিক্ষুককে দেওয়ার সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যের সাদৃশ্য খুব বেশি নেই। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গে সীতা রাবণ কর্তৃক হরণের সময় রামচন্দ্রকে পথের সন্ধান দেবার জন্য অলংকারগুলি ওইভাবে ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— 'শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।।'

কবি কালিদাসের 'মেঘদূতম্' পত্রকাব্যের উত্তরমেঘ অংশের ৪২-সংখ্যক শ্লোকের এটি আরম্ভ। এই শ্লোকে

নির্বাসিত যক্ষের প্রগাঢ় প্রেম স্পষ্ট হয়েছে। এর বাংলা ভাষান্তর প্রায় এইরকম—তোমার সখীদের কাছেও সে কথা অনায়াসে প্রকাশ্যেই বলা যায়, সেরকম অগোপন কথাও একদিন সে তোমার আনন স্পর্শ করার লোভে ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলতো। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই নবকুমারের প্রেমের গাঢ়তা বোঝাতেই এই সদৃশ বর্ণনা খুঁজেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— ‘কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে।।’

কবি কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের পঞ্চম সর্গে এই শ্লোকটি আছে। উমার তপস্বিনী মূর্তি দেখে স্বয়ং মহাদেব ব্রহ্মচারী বেশে তাঁকে ছলনা করতে এসে এই কথা বলেছিলেন—যৌবনেই সমস্ত আভরণ ত্যাগ করে তুমি বৃদ্ধ বয়সের উপযোগী বল্কল ধারণ করেছো কেন! প্রদোষকালে প্রস্ফুট চন্দ্র ও তারকাশোভিত বিভাবরী কি কখনও অরুণের কাছে যেতে পারে, তুমিই বলো! অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে যোগিনী কপালকুণ্ডলা সঙ্গে সাধিকা উমার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

তৃতীয় খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— ‘কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবং।’

শ্রীহর্ষরচিত ‘রত্নাবলী’ নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে একটি শ্লোকের সামান্য অংশ এখানে উদ্ধার করা হয়েছে। কথাটা বলেছেন রাজমন্ত্রী যৌগন্ধাবায়ণ। রাজার মঙ্গলের জন্যই অনেক রকমের কাজ তাঁকে করতে হয়েছে যা রাজার পছন্দ নয়। সেই জন্যই তিনি ভৃত্যের কাজকে বড়ই কষ্টকর বলেছেন। এই পরিচ্ছেদে লুৎফ-উন্নিসাও অনেক রকমের অনভিপ্রেত কাজ করেছে, তবে তা নিজের মঙ্গলের জন্য নয় রাজার মঙ্গলের জন্য, বলা শক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— ‘যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে।।
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফলা হলো, হতে পারে কাল।।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের ‘নবীন তপস্বিনী’ নাটক থেকে এই অংশটি সংগ্রহ করা হয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত এই উক্তিটি করেছেন মন্ত্রী জলধর। স্ত্রীর কাছে একবার অপদস্থ হয়ে আবার তারই সাহায্য প্রার্থনা করবেন সংকল্প করে তাঁর এই উক্তি। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পরও হতোদ্যম না হয়ে সে নতুন করে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করছে বলেই অংশটি প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— ‘শ্যামাদন্যো নহি নহি প্রাণনাথ মমাস্তি।’

কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা ‘উদ্ধবদূত’ কাব্যগ্রন্থ থেকে এই পংক্তি উদ্ধৃত। এই উক্তি শ্রীরাধার—শ্যাম ছাড়া আমার প্রাণনাথ আর কেউ নেই। এই পরিচ্ছেদে সম্ভবত মতিবিবিও বুঝতে পেরেছে, নবকুমারের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন গতি তার নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— ‘পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।’

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বীরাঙ্গানা কাব্য’ থেকে সংগৃহীত। এটি ‘শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী’ পত্রের অন্তর্ভুক্ত। রাজা শান্তনুকে জাহ্নবী বিবাহ করেছিলেন কেবল এই শর্তে যে সন্তানকে তিনি গঙ্গাগর্ভে-বিসর্জন দেবেন, রাজা বাধা দিলেই তিনি স্বর্গে ফিরে যাবেন। যেবার অসহিষ্ণু হয়ে শান্তনু বাধা দেন সেবারই জাহ্নবী সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং রাজাকে এ কথা বলেন। এই পরিচ্ছেদে সেলিমের প্রতি মতিবিবির সম্ভাষণ পড়লেই বোঝা যায়, তার বক্তব্যও এই একই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— ‘জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ ন গলে।।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল।।
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক।।’

এটি কবি বিদ্যাপতির অতি বিখ্যাত এক বৈষ্ণব পদ। পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার পর রাধার বাবসম্মিলনের পদ এবং এখানে আর অংশ নয়, গোটা পদটাই বঙ্কিমচন্দ্র তুলে দিয়েছেন। কৃষ্ণের প্রেমে মুগ্ধ রাধা এখানে প্রেমের অসীম রহস্যময়তার অনুভূতিই প্রকাশ করেছেন। এতদিন লীলায় অংশগ্রহণ করেও এ লীলা কত মুর রাধা বুঝতে পারেননি, লক্ষ লক্ষ যুগ কৃষ্ণের হৃদয়ে হৃদয় যোগ করেও হৃদয় জুড়োয় নি। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মতিবিবি এই প্রথম বুঝতে পারছেন প্রকৃত প্রেমের রহস্য, তাই প্রেমের অসীম রহস্যময় অনুভূতির পদ এখানে সংযোজিত হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— ‘কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।।’

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বীরাঙ্গনা কাব্যে’র লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখা’ পত্রিকার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত। মধুসূদনের অমর লেখনীতে রাক্ষসীও এখানে প্রেমমুগ্ধা নারীতে পরিণত হয়েছে, বলেছে দেহ মনপ্রাণ সবই সে সমর্পণ করবে লক্ষ্মণকে। শিরোনাম হিসাবে এটা অত্যন্ত উপযোগী বলেই আমাদের মনে হয়, কারণ রাক্ষসীর মতই ইন্দ্রিয় লালসাযুক্ত জীবনযাপন করে মতিবিবি এখন মধুর দাম্পত্যপ্রেমে আত্মসমর্পণ করার সংকল্প গ্রহণ করেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ— ‘I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat.’—

বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়রের অমর সৃষ্টি ‘ম্যাকবেথ’ —নাটক থেকে অংশটি গৃহীত। এটি প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। রাজা ডানকানকে মারার ব্যাপারে প্রথমে ছিল তাঁর তীব্র অনিচ্ছা, এ ব্যাপারে সংকল্প যখন স্থির করেন, তখনই এই উক্তি তিনি করেন। নবকুমারের কাছে আত্মসমর্পণ যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন মতিবিবি নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্য কপালকুণ্ডলার সর্বনাশে উদ্যত হয়েছে—এই ব্যাপারটাই এখানে দেখতে পাবো বলে শীর্ষ উদ্ধৃতি সংগত বলেই আমাদের মনে হয়।

চতুর্থ খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— ‘রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।’

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্যে’র অন্তর্গত ‘সারিকা’ নামক একটি কবিতা থেকে এই পংক্তিটি উদ্ধার করা হয়েছে। শ্রীরাধা পিঞ্জরে আবদ্ধ সারিকাকে দেখে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন। তিনি যে সমাজ-সংসারের বাধা অতিক্রম করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পারছেন না, তার সঙ্গে সারিকার শুকের সঙ্গে মিলিত না হতে পারার যন্ত্রণাকে এক করে দেখতে পেয়েছেন বলেই তাঁর মিনতি সারিকাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং তার পরেই তাঁর নিজের বেড়ি ভাঙার জন্য। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সংসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কপালকুণ্ডলাকে সারিকার সমগোত্রীয় মনে করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— ‘—Tender is the night,
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no Light.’

ইংরেজ কবি Keats-এর বিখ্যাত কবিতা Ode to A Nightingale থেকে এই অংশটুকু এখানে তুলে আনা হয়েছে। কোমল রাত্রি, আকাশের সম্রাজ্ঞী চন্দ্রকলা প্রসন্না, তারাপরীর দল ঝাঁক বেঁধে ভিড় করেছে চারপাশে, অথচ কবির কাছেই কোন আলো নেই। এই অংশের সঙ্গে প্রবল সাদৃশ্য আছে কপালকুণ্ডলার নিশাভিসারের। বাসন্তীরাত্রি জ্যোৎস্নায় প্লাবিত, কিন্তু তার জীবনে তো নেমে আসবেই অসুন্দর অন্ধকার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— ‘I had a dream, which was not all a dream’.

লর্ড বায়রনের ‘ডন জুয়ান’ — কাব্যের চতুর্থ সর্গ থেকে পংক্তিটি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই কাব্যের নায়িকা হেইডি একটা স্বপ্ন দেখেছিল, যা শুধু স্বপ্ন নয়, তার জীবনের পূর্বাভাসও বটে। তাই বলা হয়েছে স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়। কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের সঙ্গে এর একটা নিবিড় সাদৃশ্য আছে বলেই পংক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণে এসেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— ‘— I will have grounds
More relative than this.’

উইলিয়াম শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক ‘হ্যামেলেটের (Hamlet) প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে এটি সংগৃহীত। একটি নাটকের অভিনয় করিয়ে হ্যামলেট পিতার হত্যাকারী সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, সেই প্রসঙ্গেই হ্যামলেটের এই উক্তি। কপালকুণ্ডলাও সমস্ত সংশয়ের অবসানের জন্যই ব্রাহ্মণ কুমারের কাছে গোপনে যাওয়া মনস্থ করেছে। এখানেই দুটি ঘটনার সাদৃশ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— ‘Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient list.’

এটিও শেক্সপীয়রের আর একটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি থেকে সংগৃহীত, নাম —‘ওথেলো’ (Othello) এখানে আপাত-ভালমানুষ কিন্তু প্রকৃত শয়তান ইয়াগো ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর সন্দেহকে তীব্রতর করে তুলবার জন্য এরকম করে কথা বলছে। কাপালিকও নবকুমারের মন কপালকুণ্ডলার প্রতি বিষিয়ে দেবার

জন্যই এই পরিচ্ছেদে এই ধরনের আচরণ করবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— ‘তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্।’

মহাকবি কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব কাব্য’-এর তৃতীয় সর্গ থেকে গৃহীত। এটি দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তি। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য মদন যখন নিজের মনস্থির করতে পেরেছে, তখনই ইন্দ্র মদনকে একথা বলেছিলেন—তবে সিদ্ধিলাভের জন্য যাও, দেবকার্য সুসম্পন্ন কর। এখানে কাপালিকও কপালকুণ্ডলাবধকে দেবকার্য হিসাবেই দেখাতে চেয়েছে এবং নিজ অক্ষম বলে এ কাজ করাতে চেয়েছে নবকুমারকে দিয়েই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ— ‘Be at peace; it is your sister that addresses you. Requite Lucretia’s love.’

এই উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহ করেছেন লর্ড লীটনের ‘লুক্রেশিয়া’ (Lucretia) উপন্যাস থেকে। লুক্রেশিয়া যাকে ভালবাসতো, সে ভালবাসতো লুক্রেশিয়ার বোন সুসানকে। সুসান এখানে ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে তার প্রেমিককে অনুরোধ করছে, সে যেন লুক্রেশিয়াকেই ভালবাসে। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার কথাবার্তার মধ্যেও অনুরূপ একটি ব্যাপার ঘটেছে বলে ‘লুক্রেশিয়া’ উপন্যাসের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ— ‘No spectre greets me – no vain shadow this.’

এই পংক্তিটি ইংরেজ-কবি William Wordsworth-এর Laodamia কবিতা থেকে সংগৃহীত। ঈশ্বরের অনুগ্রহে লাওডেমিয়াও তার মৃত স্বামীর ছায়া দেখতে পেয়েছে, কিন্তু মনে হয়েছে তা যেন ছায়া নয়, সজীব। এখানেও ভবানীমূর্তি কপালকুণ্ডলার কাছে ছায়ার মত এলেও তা শুধু ছায়া নয়।

নবম পরিচ্ছেদ— ‘বপুষা করণোজ্‌ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্।।’

মহাকবি কালিদাসের ‘রঘুবংশম্’ কাব্যের অষ্টম সর্গের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকটি এখানে শীর্ষ নির্দেশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গটি ছিল এইরকম—নারদের বীণা থেকে মালা খসে অজপত্নী ইন্দুমতীর ওপর পড়লে রানী মারা যান। তা দেখে রাজা অজও মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এটাই যে স্বাভাবিক, সেটা বোঝাতে গিয়ে শ্লোকে বলা হয়েছে—হৃদয়েশ্বরীর হতচেতন দেহের সঙ্গে তাঁর পতি অজও ভূতলে পতিত হলেন, কারণ জ্বলন্ত দীপশিখা থেকে এক বিন্দু তেল ক্ষরিত হলে জ্বলন্ত শিখারও কিছু অংশ ভূতলে পতিত হয়। বোঝাই যাচ্ছে, কপালকুণ্ডলার জলে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারের জলে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে এর স্পষ্ট সাদৃশ্যই এরকম উল্লেখের কারণ।

৩৭.৮ সার-সংক্ষেপ

এই এককে আমরা আলোচনা করতে চেয়েছি, একটি কাল্পনিক কাহিনীকে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। প্রথমত, তিনি সময়ের উল্লেখ করবার সময় খুব নির্দিষ্ট করে তা নির্দেশ করেছেন যাতে ঘটনাটা ওই বিশেষ সময়েই ঘটেছে বলে আমাদের মনে হয়। অবশ্য

সেই সঙ্গে সেই বিশেষ সময়ে কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে যা সেই সময়ের বৈশিষ্ট্য কী, এটাও মনে রেখেছেন।

দ্বিতীয়ত, মুঘল রাজদরবারের কাহিনী শোনানোর উদ্দেশ্যও ছিল প্রধানত এই বাস্তবতা সৃষ্টি করা। কারণ ইতিহাসের ঘটনার সত্যতা আমরা সকলেই জানি, কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে তাকে নিখুঁত ভাবে জুড়ে দেওয়া মানেই বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার একটা গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের যেমন একটা করে নাম দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার ঘটনা নির্দেশ করতে, যথা 'সাগরসঙ্গমে', 'উপকূলে', 'বিজনে', 'স্তূপশিখরে' প্রভৃতি, তেমনি কাহিনী শুরু করার আগে বিখ্যাত কোনও নাটক, কাব্য, কবিতা বা উপন্যাস থেকে একটি বিশেষ অংশ উদ্ধারও করেছেন। আমরা প্রত্যেকটি অংশের উৎস নির্দেশ করেছি। আসলে এই সব সাহিত্যিক সৃষ্টি এত বাস্তব হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে যে এগুলির উল্লেখ করলেই বর্তমান কাহিনীর বাস্তবতা যেন তাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কাহিনীর বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার জন্য চরিত্রগুলিকেও বাস্তব করে তুলতে হয়। তা বঙ্কিমচন্দ্র করতে পেরেছেন কিনা সেটা আমরা পরের এককে দেখবো।

৩৭.৯ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি

উপন্যাসে লেখক গল্প বলেন, সেই গল্পকে বৃত্তে ভালভাবে বিন্যস্ত করেন, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন—সবই তো আমরা দেখলাম। তাহলে চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে ঔপন্যাসিককে আবার আলাদা করে নজর দিতে হবে কেন, এ প্রশ্ন আপনাদের মাথায় জাগতেই পারে। সেই কথাটাই একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

উপন্যাসে লেখক নিজে অবশ্য মন্তব্য করতে পারেন, ঘটনাবর্ণনাও করতে পারেন কিন্তু এটা তো আরো সত্যি কথা যে, চরিত্রগুলোকে ভালবেসে ফেলেন বলেই পাঠক গল্পটা পড়বার আগ্রহ বোধ করেন। যে মানুষগুলি উপন্যাসে আছে, তারা যখন রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ওঠে তখনই তো গল্পটাকে আমাদের আর বানানো বলে মনেই হয় না, তারা আমাদের খুব আপনজন হয়ে ওঠে, আমরাও আগ্রহভরে তাদের গল্প শুনি। সুতরাং গল্পের মানুষগুলিকে অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্তমাংসের মানুষ করে তুলতে হবে এটাও উপন্যাসের একটা শর্ত। সেই ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলায় কীভাবে করতে পেরেছেন সেটা আমাদের দেখতে হবে।

তবে সেটা শুধুই প্রধান চরিত্রদের দিকে তাকিয়ে করলেই হবে না, খুব অল্প সময়ের জন্য হয়তো একটা চরিত্র দেখা গিয়েছে, সেটির প্রতিও ঔপন্যাসিক দৃষ্টি কেমন, এ থেকে লেখকের সামর্থ্য বোঝা যায়। তাই দুরকম চরিত্রের প্রতিই আমরা নজর রাখবো, অর্থাৎ চরিত্রগুলিকে লেখক কীভাবে প্রাণ দিতে পেরেছেন। প্রথমে প্রধান চরিত্রগুলির কথাই ভেবে দেখা যাক।

১.৯.১ চরিত্র সৃষ্টি ঃ নবকুমার

উপন্যাসের নাম থেকেও বোঝা যায়, কাহিনী থেকেও বোঝা যায়, নারীরাই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ, পুরুষরা নয়। বস্তুত, নবকুমার ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য পুরুষ এই উপন্যাসে আমরা খুঁজেও পাই না। কাপালিক অবশ্য গল্পের পরিণতি ঠিক করার ব্যাপারে অনেকটাই সাহায্য করেছে, যেমন নবকুমারের

দাম্পত্য জীবন গঠনের ব্যাপারে অধিকারীর ভূমিকাও রয়েছে অনেকখানি। কিন্তু গল্পের নায়ক যাদের মনে করা হয়, ঠিক তেমন চরিত্র বলতে আমরা নবকুমারকেই বুঝে থাকি।

নায়কের সাধারণত যেসব গুণ থাকা দরকার, নবকুমারের তার প্রায় সবই আছে। বয়সে যুবক হলেও বিবেচনায় যে সে কারো চেয়ে কম নয়, প্রথম পরিচয়েই সে কতা আমরা বুঝতে পারি। যেমন, ঘোর কুয়াশায় দিগভ্রান্ত হয়ে মাঝি যখন বুঝতেই পারছে না সে কেমন করে এ থেকে উদ্ধার পারে, তখন বৃদ্ধ তাকে তিরস্কার করলে নবকুমার বলেছিল, 'যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে?' এ সংবাদও পরে আমরা জানতে পারি যে সেই বৃদ্ধের বাড়িতে অন্য অভিভাবক কেউ নেই বলে তাঁকে সে এই গঙ্গাসাগর যাত্রায় আসতে নিষেধ করেছিল। পুণ্যের জন্য তীর্থে আসতেই হবে, এ কথাও সে মেনে নেয়নি, বলেছে, 'যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।'

নবকুমার যে কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সেই সঙ্গে কাব্যরসিকও, সে কতা আমরা বুঝতে পারি বিস্তীর্ণ সমুদ্রসঙ্গম থেকে দূরের আবছা তটভূমি দেখে নবকুমারের 'রঘুবংশম্' কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের অন্তর্গত পঞ্চদশ শ্লোক অর্থাৎ 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী ......' ইত্যাদি মনে পড়ে যাওয়ায়। যেরকম দুর্বিপাকে পড়ে যাত্রীরা সকলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, সেই অবস্থাতেও নবকুমার কাব্যরস আস্বাদন এবং সৌন্দর্য উপভোগের মত অবস্থায় আছে, এটা বড় কম কথা নয়।

নবকুমারের সাহসিকতারও প্রশংসা করতে হবে, কারণ যে অবস্থায় সে যে স্থানে বিসর্জিত হয়েছিল— 'গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য নাই, পেয় নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাক্ত; ....প্রাণনাশই নিশ্চিত'—তা সত্ত্বেও সে বালিয়াড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমোতে পেরেছে। নিদ্রাভঙ্গ হবার পর কাপালিকের মুখোমুখি হবার মত সাহসও তার ছিল।

নবকুমারের পরোপকার ব্রতের কথা আমরা প্রথমেই জানতে পেরেছি। অচেনা চর এবং বালিয়াড়ি বলে রান্নার উপযোগী কাঠ কাটতে যেতে কেউই রাজি হয়নি, নবকুমার রাজি হওয়ার পর শুধু একজনকে সঙ্গী হতে বলেছিল, তাতেও কেউ রাজি হয়নি। অগত্যা সে একাই অগ্রসর হয়েছিল।

কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করার মধ্যে একই সঙ্গে নবকুমারের মধ্যে বিবেচনাশক্তি এবং কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশ দেখা যায়। অধিকারী নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহের প্রস্তাব করার পর সারা রাত যে নবকুমারের ঘুম হয়নি, উপন্যাসে তার প্রমাণ আমরা পাই। সকালে নিজের সিদ্ধান্ত সে জানিয়েছে—'আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব।'

অর্থাৎ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, নবকুমারের যে একটি বিবাহ আগে ছিল, সে জন্য সে চিন্তিত নয়, তাঁর চিন্তা অন্য। একটি অজ্ঞাতকুলশীল কন্যাকে এভাবে বিবাহ করে নিয়ে গেলে হয়তো তাকে সমাজচ্যুত হতে হবে, এই ভাবনাই সারা রাত তাকে ঘুমোতে দেয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে সে চিন্তা করে দেখেছেন, যে নারী নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে উদ্ধার করেছে, তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া তার উচিত হবে না, কারণ ফিরে গেলে কপালকুণ্ডলার যে মৃত্যু সুনিশ্চিত, এ কথা অধিকারী তাকে বলেছিলেন।

সৌন্দর্যপিপাসু নবকুমার যে বিবাহের পর কপালকুণ্ডলাকে সুখী করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, তা আমরা

দেখেছি। নিজের পরিবার যখন মৃণ্ময়ীকে সাদরে গ্রহণ করল তখন তার প্রেম আর কোন বাধা মানল না। কিন্তু সমস্ত হৃদয় সমর্পণ করার পরও যদি কপালকুণ্ডলার মনে তিলমাত্র প্রভাব ফেলতে না পারে তবে ধীরে ধীরে অবসাদ তাকে গ্রাস করবে, এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই হয়েছিল। তা না হলে কাপালিকের কথা অতো সহজে সে বিশ্বাস করত না, অথবা যে কপালকুণ্ডলাকে এত করেও সংসার এবং দাম্পত্য জীবনের কোন বোধ ও অনুভূতিই দিতে পারল না, সে কেমন করে দ্বিচারিণী হতে পারে, এ কথাও তার মনে হল না। ফলে সে কপালকুণ্ডলাকেও সুখী করতে পারল না, নিজেও সুখী হল না।

৩৭.৯.২ চরিত্র সৃষ্টি ঃ কপালকুণ্ডলা

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের মানসী-কন্যা, মনের সৃষ্টি—সুতরাং চরিত্রটি একদিকে রহস্যময়তা, অন্যদিকে সজীবতা ফোটাবার গুরু দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল। রহস্যময়তা ফুটিয়ে তুলবার জন্যই দুটি প্রধান উপাদান বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন—প্রথমত সর্বদাই তাকে অন্ধকার রাত্রি বা আলোছায়ার পরিবেশে দেখানো, দ্বিতীয়ত রাশি রাশি কালো চুলের মধ্যে তাকে লুকিয়ে রাখা। কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দেখার দৃশ্যটিই একবার মনে করে দেখুন—'সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। কেশভার—অবেণী সম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার।'

দ্বিতীয়বার যখন নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার দেখা হয় 'তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই' এবং পিঠে কোমলস্পর্শ পেয়ে পেছন ফিরে নবকুমার দেখেছে 'সেই আগুল্‌ফলম্বিত-নিবিড়কেশরাশি-ধারিণী বন্য দেবীমূর্তি।'

তৃতীয়বার মতিবিবির সঙ্গে আলাপের জন্য যখন কপালকুণ্ডলার কাছে আসে তখন 'একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের বাড়িতে কপালকুণ্ডলাকে যখন আমরা প্রথম দেখি শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে, তখনও 'সন্ধ্যাকাল উপস্থিত' এবং কপালকুণ্ডলা 'অবিন্যস্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্ধলুক্কায়িতা।' বস্তুত এই পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার চুল বেঁধে দেবার জন্যই শ্যামাসুন্দরী সাধাসাধি করেছে কপালকুণ্ডলা রাজি হয়নি।

পরবর্তীকালে চতুর্থ খণ্ডে অন্ধকার রাত্রে কপালকুণ্ডলার ওষধি খুঁজেতে যাওয়া, অন্ধকারে ব্রাহ্মণকুমারবেশী মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বিষাদময় পরিণতির কথা আমাদের সকলেরই জানা, কিন্তু লক্ষ্য করবেন পটভূমি সবসময়েই অন্ধকার রাত্রি।

তার অর্থ এই নয় যে চরিত্রটিকে শুধু রহস্যময়ই করে রাখবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেননি। চরিত্রটি যাতে রক্তমাংসের সজীবতা লাভ করে সেজন্য তিনি যে কত সচেতন ছিলেন, একটু ব্যাখ্যা করলেই তা বোঝা যাবে।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পথ দেখিয়েছিল, সেটা তার অন্তরের স্বাভাবিক কোমলতা হতে পারে, কিন্তু কাপালিকের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে অধিকারীর বাড়িতে নিয়ে আসায় করুণাবৃত্তির একেবারে চরম প্রকাশ দেখা যায়। এভাবে নবকুমারের প্রাণ বাঁচালে কাপালিক যে তাকে হত্যা করবে, এ কথা সে জানতো—অধিকারীর কাছে তা প্রকাশও করেছে। তবু যে এ কাজ সে করেছে তাতে বোঝা যায় মানবিক অনুভূতি তার

মধ্যে পুরোপুরি বজায় আছে।

সংসার ও সামাজিক বন্ধন সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ কপালকুণ্ডলা 'বিবাহ' শব্দের অর্থই বুঝতে পারেনি প্রথমে, অধিকারী কালিকা ও শিবের সম্বন্ধ এনে এটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সংসার সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলার অনভিজ্ঞতা যে কত বেশি তা বোঝাবার জন্য তার একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত আপনাদের মনে করার। মতিবিবি প্রচুর স্বর্ণালংকার পরিয়ে দিয়েছিল কপালকুণ্ডলাকে, রাস্তায় ভিখারি সাহায্য চাওয়াতে সমস্ত অলংকারগুলি সে তার হাতে খুলে দিয়েছে। বিহ্বল ভিক্ষুক এদিক-ওদিক চেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেছে, তখন—''কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?''

সপ্ত গ্রামের সংসারে এসে শ্যামাসুন্দরীর অবস্থা দেখেও কপালকুণ্ডলার দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে কিছুই ধারণা জন্মায়নি, নবকুমার প্রবল প্রণয় কত দুর্লভ বস্তু একথা কখনই সে জানতে পারেনি, বরং সে বলেছে 'বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।

এরপর যখন কপালকুণ্ডলার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন সে 'এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিনী।' সাজসজ্জায় তার কিছু পারিপাট্য এসেছে, অলংকারও তার অঙ্গের ভূষণ হয়েছে, কিন্তু মানসিকতার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলেম মনে হয় না, না হলে শ্যামাসুন্দরীকে বলতো না, 'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে বিবাহ করিতাম না।'

অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। সংসার তার ভাল লাগে না, রাত্রে অরণ্যে ভ্রমণ করতে সে আনন্দ পায়, 'গৃহস্থের বউ-ঝি'র এই আচরণ ভাল কিনা সে প্রশ্নই তার মনে আসে না। যে পরোপকার বৃত্তি আমরা প্রথম থেকেই তার মধ্যে দেখেছি, সেই পরোপকার সাধনের জন্যই শ্যামাসুন্দরীর জন্য সে গভীর রাতে বনে ঢুকেছিল ওষধির সন্ধানে। কাপালিককে একবার দেখা সত্ত্বেও ভয়ে সে এ কাজে বিরত হয়নি। কাজেই চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি, এটাই আমাদের বলতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের দাদার পরামর্শ যে পছন্দ হয়নি, উপন্যাসের পরিণতি সে কথা প্রমাণ করে। আসুন চরিত্রটি এবার আমরা একেবারে আমাদের নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে দেখার চেষ্টা করি এবং এর কোন ত্রুটি দেখতে পাই কিনা তা দেখি।

প্রথম কথা, 'কুচরিত্রা', 'অবিশ্বাসিনী' ইত্যাদি পদগুলি কপালকুণ্ডলা বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছে, যেমন—'আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?' কিম্বা 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।' প্রশ্ন হচ্ছে, দাম্পত্য সম্পর্কই যে বোঝে না, সংসারের রীতিনীতি এখনও যার কাছে অস্পষ্ট, সে এসব কথা জানল কী করে এবং এর অর্থই বা তার কাছে পরিষ্কার হয় কেমন করে।

দ্বিতীয় কথা, যেখানে এক বছরেরও বেশি সময় বাস করছে, যাদের সঙ্গে, তাদের প্রতি একটা গভীর ভালবাসার সম্পর্ক এমনিতেই গড়ে ওঠার কথা। মানুষের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, বাড়িতে একটি গৃহপালিত পশু থাকলেও তার বাড়ি সম্বন্ধে মায়া জন্মে যায়—আর কপালকুণ্ডলার মত কোমলহৃদয়া নারী এই সংসারকে ভাল বাসতে পারল না। সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণই তার জন্মাল না। এটা কি বিশ্বাস করা সহজ।

তৃতীয় কতা, কপালকুণ্ডলা লোকালয়বর্জিত স্থানে প্রতিপালিত হলেও সে মেয়ে। যখন মানবিক বৃত্তিগুলি তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে তখন জৈববৃত্তি জাগ্রত হবে না, এটা মনে করা অসম্ভব। কাজেই নবকুমারের উন্মত্ত

ভালবাসার অর্থ সে বুঝতে পারবে না। একটি দম্পতি যেভাবে জীবনযাপন করে সেভাবে তারা জীবন কাটাবে না! জৈব প্রবৃত্তিকে কী করে একটি নারী ঠেকিয়ে রাখতে পারে। তাহলে তার সন্তন সম্ভাবনা কি অনিবার্য ছিল না! আর সন্তান একবার জন্মগ্রহণ করলে একটি নারী কি আগের মত থাকতে পারে!

এই অসংগতির ব্যাখ্যা দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শুধু রেখেছেন নবকুমারের সঙ্গে বালিয়াড়ি ত্যাগের প্রাক্কালে দেবীর পা থেকে বিল্বপত্র স্খলিত হওয়া। অশিক্ষিতা ও কাপালিকলালিতা মেয়ের মনে সংস্কার প্রবল হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা সক্রিয় থাকবে এবং একটি নারীর সহজাত প্রবৃত্তির দ্বার রুদ্ধ করে দেবে, এটা আমাদের স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর অগ্রজ যা বলেছিলেন, সেই পরিণতিই যেন স্বাভাবিক হতো বলে আমাদের মনে হয়—'সন্তানাদি হইলে স্বামী-পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাঁহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।'

প্রান্তলিপি

মতিবিবি চরিত্রটি এমনই প্রাণবন্ত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় যেন এই মেয়েটিকেই আমরা দেখতে পাই। আপনারাও মিলিয়ে দেখতে পারেন, একটু অংশ তুলে দিচ্ছি। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে 'নাম্নী' নামে এক গুচ্ছ কবিতা আছে, তার 'নাগরী' কবিতা থেকে—

'ব্যঙ্গসুনিপুণা,
শ্লেষবাণসন্ধানদারুণা।
অনুগ্রহবর্ষণের মাঝে
বিদ্রুপ বিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে।

....

আপন তপস্যা লয়ে যে-পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে, চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে।'

৩৭.৯.৩ চরিত্র সৃষ্টি ঃ মতিবিবি

কপালকুণ্ডলার মত একটি বিচিত্র নারীকে উপন্যাস লিখবার বাসনা যখন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জন্মায় তখন মতিবিবি চরিত্রের কথা তাঁর মাথাতেই ছিল না। আমাদের মনে হয়, তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে কপালকুণ্ডলা সংসারজীবনে ফিরে এসেও সুখী হবে না। এটাকে নিশ্চিত করার জন্যই নবকুমারের প্রথম স্ত্রী এবং স্বামীকে অধিকার করার ও সপত্নীর প্রতি প্রতিহিংসার জন্য এই চরিত্রের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, যাতে কপালকুণ্ডলার বিষণ্ণ পরিণতি একেবারে সুনিশ্চিত হয়।

বোধহয় এই কারণেই মতিবিবি চরিত্রের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না, তাকে স্বৈরিনী নারী হিসাবে আঁকবার চেষ্টাই তিনি করেছেন, কিন্তু শিল্পী যখন একটি চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টির প্রচুর উপাদান পেয়ে যান তখন তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না। ফলে চরিত্রটি সম্ভবত এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষনীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে। কপালকুণ্ডলা কল্পনার সৃষ্টি, তাকে বাস্তব করার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তার অসংগতি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ দূর করতে পারেন নি। মতিবিবি প্রয়োজনের সৃষ্টি, তাকে স্বৈরিনী ও প্রতিহিংসাপরায়ণা করবার সচেতন অভিপ্রায় সত্ত্বেও শিল্পীর প্রচ্ছন্ন সহানুভূমি তাকে সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

চরিত্রটিকে দেখার আগে তার কথা আমরা শুনি কেবল লেখকের বর্ণনায়। নবকুমারের প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতী বিয়ের পর পিত্রালয়েই থাকত, মাঝে মাঝে আসতো। তেরো বছর বয়সে উড়িষ্যায় সপরিবার পাঠানের হাতে পরে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে নিজের কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও

পদ্মবতী স্বামী-পরিত্যক্তা হয়। পরবর্তী কালে এই নারী যে লুৎফ-উন্নিসা নাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজনে ছদ্মবেশে মতিবিবি নাম গ্রহণ করে থাকে, তার পিতা আগ্রায় এসে আকবরের রাজদরবারে ওমরাহ হয়ে বসেছে, লুৎফ-উন্নিসা আগ্রায় এসে 'পারসিক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ্য ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হয়েছে, এসব সংবাদ আমরা পরে পেয়েছি। জেনেছি, 'ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। ......বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? অর্থাৎ পদ্মাবতী এখন স্বৈরিণী নারী, এমনকি যুবরাজ সেলিমও তার অনুরক্ত।

মতিবিবিকে প্রথম আমরা দেখি ভাঙা পালকিতে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। রাতে নবকুমার কপালকুণ্ডলার সন্ধানে যাবার সময় এর সাক্ষাৎ পেয়েছিল। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, কপালকুণ্ডলা কী না জানতে চাওয়ায় বলেছিল, 'আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।'

তারপরই আমরা দেখেছি শুধু বাগবৈদগ্ধ্যে নয়, আচরণেও মতিবিবি আকর্ষনীয়া। বিপদে পড়ে সে শঙ্কা বিসর্জন দিয়ে নবকুমারের কাঁধে ভর দিয়ে সরাইখানায় এসেছে। সেখানে নবকুমারের সঙ্গে কথোপকথনে তার বুদ্ধিমত্তা, শ্লেষবাণ সন্ধানের ক্ষমতা এবং পরিশীলিত রুচি প্রমাণিত হয়।

কপালকুণ্ডলাকে দেখতে গিয়ে নিজের সমস্ত অলংকার মতিবিবি কেন তাকে দান করেছিল স্পষ্ট করে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করা শক্ত নয়। তার আগের পরিচ্ছেদেই নবকুমারের নাম সে শুনেছে এবং একটি অব্যর্থ ইঙ্গিত দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচ্ছেদ শেষ করেছেন—'প্রদীপ নিবিয়া গেল।' কপালকুণ্ডলাকে দেখতে যাবার সময় অবশ্যই তার মনে হয়েছে, যে জীবনে ফিরে যাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ, সেই জীবনেই এখন সে দর্শক মাত্র। নবকুমারের স্ত্রী হিসেবে নিজেকে সাজাতে পারেনি, এখন নবকুমারের পরিত্যক্তা স্ত্রী হিসাবে তার নবপরিণীতা বধূকে সাজিয়ে আংশিক তৃপ্তি পেতে চেয়েছে।

তিনটি ব্যাপার এ থেকে প্রমাণিত হয়—মতিবিবির হৃদয়ের ঔদার্য এবং ফেলে আসা জীবনের জন্য স্তিমিত বাসনা ও নবকুমারের প্রতি এখনও সুপ্ত প্রেম। এগুলিরই প্রকাশ দেখা যাবে পরবর্তী পর্যায়ে। যে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠেছিল তার জীবনে তাকে ভুলে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টায় সে পরিবর্তিত জীবনের ভোগবিলাসকেই উত্তুঙ্গ শিখরে টেনে তুলতে চেয়েছিল। সে আশা যখন মিলিয়ে গেল, তখন এই জীবনের অপ্রাপ্তি তার মনে প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হল। বিনাদোষে একদিন যে স্ত্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আজ সেই অধিকার ফিরে পাবার জন্য সে ফিরে এল সপ্তগ্রামে। কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ না করলে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তাই কাপালিকের সঙ্গে সন্ধি করতে তার আপত্তি হয়নি। কিন্তু লক্ষ করে দেখবেন, সহানুভূতি তার কপালকুণ্ডলার প্রতিও ছিল, কাপালিকের মত তার জীবনহানি সে চায়নি।

আসলে মানুষের চরিত্র দোষগুণে ভরা। কেবল দোষ বা কেবল গুণ থাকলে তাকে বাস্তব মানুষ বলে মনে করা শক্ত। কপালকুণ্ডলাকে তাই আমরা ততটা আমাদের কাছের মানুষ মনে করতে পারি না, যতটা পারি মতিবিবিকে। মতিবিবির যন্ত্রণা আমরা অনুভব করতে পারি। সে গিয়েছিল পুরীতে জগন্নাথদেব দর্শনে। ধর্মচ্যুত হয়ে তাকে যে মুসলমান হতে হয়েছিল সে দোষ তার নয়, কিন্তু তার ফলভোগ করল সে—নবকুমার তাকে ত্যাগ করল। স্বাভাবিক জীবন থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে, সে মৃগয়া বৃত্তি গ্রহণ করবে, এটা কাম্য না হতে পারে কিন্তু এটাই তো ঘটে থাকে। কিন্তু এই স্বৈরিণীবৃত্তি গ্রহণ করেও যে তার ভেতরের মানুষটা মরে

যায়নি, বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে সে কথা অনেকবার বলেছেন, যেমন—'পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।'

বস্তুত, নবকুমার যদি পদ্মাবতীকে গ্রহণ করতো, তবে কপালকুণ্ডলার বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধনও বোধহয় সে করতে চাইত না। নবকুমার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখনই 'দলিতফণা ফণিনীর' মত সে ঘোষণা করেছে 'তুমি আমারই হইবে।' এরপরই তার কাপালিকের সঙ্গে মন্ত্রণা, ছদ্মবেশ ধারণ এবং যাবতীয় অভিনয়।

বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত চাননি, কিন্তু মতিবিবি যে কপালকুণ্ডলার চেয়েও স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর চরিত্র হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই।

৩৭.৯.৪ চরিত্র সৃষ্টি ঃ অপ্রধান চরিত্রসমূহ

অপ্রধান শুধু নয়, একেবারে নগণ্য চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র যে কতটা সতর্কতা এবং শৈল্পিব মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা আপনাদের মনে পড়বে যদি একেবারে প্রথম পরিচ্ছেদের একটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করি। নৌকা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, বাঁচার আশা নেই শুনে পুরুষরা দুর্গানাম জপ করতে লাগল, মেয়েরা সুর তুলে কাঁদতে লাগল—'একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।'

এই উপন্যাসে কাপালিককে অপ্রধান চরিত্র বলে আপনাদের মনে নাও হতে পারে, কারণ তার জন্যই নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে, আবার তার জন্যই নবকুমারের জীবনে করুণ পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও আমাদের মনে হয় কাপালিক অপ্রধান চরিত্র এই কারণে যে, বিশেষ উদ্দেশ্য পেরিয়ে কোনো সজীবতা সে লাভ করেনি। যে কপালকুণ্ডলাকে প্রায় আজন্ম সে লালনপালন করেছে, তাকে বধ করবার জন্য নিয়ে যাবার সময়ও সে একবারও ইতস্তত করেনি। এইরকম একমুখী তীব্রতা নিয়ে কোনো চরিত্র সজীবতা লাভ করতে পারে না। সপ্তগ্রামে তার আসাটাও অবিশ্বাস্য, অধিকারী তাদের সন্ধান বলে দেবেন, এমন মনে হয় না।

অধিকারী চরিত্রটি আবার অন্য রকমের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। তবু এই চরিত্রে কিছু বৈচিত্র্য আছে এবং সেই কারণেই চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য মনে হয়। প্রথমত তাঁর অন্তরে করুণাবৃত্তি আছে বলেই কপালকুণ্ডলাকে ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করার কথা তিনি বিবেচনা করেছেন। কপালকুণ্ডলার প্রতি যে তাঁর যথার্থ স্নেহ ছিল, তার বোঝা যায় মেদিনীপুর পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দিয়ে আসা এবং কপালকুণ্ডলার সমব্যথী হয়ে অশ্রুবিসর্জনে। অধিকারী যেভাবে নবকুমারকে বিবাহ করার জন্য রাজি করিয়েছেন তাতে তাঁর বাস্তব বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজেকে নিজেই তারিফ করে মনে মনে বলেছেন, 'রাঢ়দেশের ঘটকালী কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি?'

তবু, চরিত্রসৃষ্টিতে কিছু অসংগতি আছে, সেটা আপনাদেরও চোখে পড়তে পারে, যেমন ঘোর জঙ্গল এবং বালিয়াড়ির মধ্যে লোকালয়বর্জিত স্থানে অধিকারী যেখানে থাকেন সেখানে 'এক অত্যুচ্চ দেবালয় চূড়া' এবং 'তন্নিকটে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটি গৃহ' থাকাটা কিছুটা বিস্ময়কর। দ্বিতীয়ত, সেখানে অধিকারীর শিষ্যও দু-একজন এসে থাকে (কপালকুণ্ডলার কথা—'যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে' ইত্যাদি)। তৃতীয়ত সেখানে নাকি হিজলীর বহুলোক পুজো দেয়, অধিকারী বলেছেন—'পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়।'

এত লোক যেখানে পূজা দেয় সেটি নির্জন স্থান হবে কেমন করে।

নারী চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য পেতে পারে শ্যামাসুন্দরী। বোঝাই যায়, কপালকুণ্ডলার উদাসীনতাকে স্পষ্টতর করবার জন্যই এই স্বামীপ্রেমবুভুক্ষু চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। সে সময়ের কৌলীন্য প্রথার অসুন্দর দিকটিও এতে ফুটে উঠেছে। নবকুমারের এই ভগ্নীর বিবাহ এক কুলীনের সঙ্গে হয়েছিল বলেই তার সপত্নীও ছিল অনেক। শ্যামাসুন্দরী ছোটবেলায় শেখা ছড়া জানে, বৌদির কেশসজ্জার উৎসাহ তার আছে, মেয়েদের জীবনের 'পরশ-পাথর' যে পুরুষের প্রেম, সেকথা শ্যামাসুন্দরী জানে, এবং এও জানে যে 'সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে'—এর চেয়ে বড় চাওয়া মেয়েদের আর কিছু হতে পারে না। কেন মেয়েদের এত সাজসজ্জা, এ কথা বোঝাতে গিয়ে শ্যামা-সুন্দরী সুন্দর একটি উপমা দেয়, 'বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ', কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাতেও যখন উদাসীন তখন তার গভীর হৃদয়বেদনা এই উক্তিতে ধরা পড়ে—'ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম তবে ফুটিয়া সুখ হইত।'

আসলে, শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে কাছে রাখবার জন্য, তাঁকে বশ করার জন্য ওষধি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আর কপালকুণ্ডলা নবকুমারের আকুল প্রেম উপেক্ষা করে যোগিনী হয়ে বসে থাকে—এই বৈপরীত্যটি শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রের সাহায্যে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

মেহেরউন্নিসা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে তার উল্লেখই শুধু আছে, চরিত্র হিসাবে তাকে ফুটিয়ে তুলবার অবকাশ পাওয়া যায় নি। তবু এরই মধ্যে কিন্তু চরিত্রের পাঠানোচিত দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন, আবার সেই সঙ্গে সেলিমের প্রতি তার আন্তরিক দুর্বলতাও ঢাকা থাকে নি। মতিবিবি যখন জানায় মেহেরউন্নিসার প্রেমে মুগ্ধ সেলিম তাকে পাবার জন্য সব কিছুই করতে পারেন, তখন মেহেরউন্নিসা বলে, 'বৈধব্যের আশঙ্কা। শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহে।' মতিবিবি যখন চিত্রাঙ্কনে তার দক্ষতার প্রশংসা করে বলে অন্যের এ ক্ষমতা থাকলে মেহেরউন্নিসার অপূর্বরূপ চিত্রপটে অঙ্কিত থাকতো, মেহের বলে, 'কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।' ফের এই মতিবিবিই যখন সংবাদ দেয় আকবরের মৃত্যু হয়েছে, সেলিম এবং সিংহাসনে, মেহের-উন্নিসা চোখের জল সামলাতে পারে না, নিশ্বাস ত্যাগ করে বলে, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?'

এত স্বল্প অবসরে চরিত্র অঙ্কনের এমন দক্ষতা অল্পই দেখা যায়।

৩৭.১০ সার-সংক্ষেপ

এখানে আমরা চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণভাবে মূল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি এবং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র কীরকম দক্ষতা দেখিয়েছেন সেটা বুঝবার চেষ্টা করেছি। প্রথমেই প্রধান চরিত্র এবং অপ্রধান চরিত্রের পার্থক্যটা আমরা বুঝে নিয়েছি এবং অপ্রধান চরিত্র ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারেও লেখকের দৃষ্টি কেন থাকা দরকার, সে কথা বলেছি।

এবার প্রধান চরিত্রের মধ্যে আলোচনা করেছি নবকুমার, কপালকুণ্ডলা এবং মতিবিবির। উপন্যাসটি নারীপ্রধান বলেই আমরা দেখতে পেয়েছি নবকুমার চরিত্রটি বিভিন্ন নায়কোচিত গুণে ভূষিত হলেও, এখানে ঘটনা বলতে যা আছে তাতে নবকুমারের ভূমিকা অল্প। কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি কত যত্নে বঙ্কিমচন্দ্র আঁকবার

চেষ্টা করেছেন সে কথা আলোচনা করা হয়েছে। রহস্যময়তা ও বাস্তগুণের সংমিশ্রণে চরিত্রটি অভিনব হয়ে উঠেছে। কিন্তু আরো বেশি সজীব চরিত্র হয়েছে মতিবিবি, এ ব্যাপারে আমরা অনেকেই বোধহয় একমত হবো।

অপ্রধান চত্রি নির্মাণেও বঙ্কিমচন্দ্র কত দক্ষ ছিলেন তা আমরা দেখিয়েছি এবং এই দক্ষতা কাপালিক, অধিকারী, শ্যামাসুন্দরী এবং মেহের-উন্নিসার চরিত্রসৃষ্টিতে কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে সেটা দেখিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে।

৩৭.১১ কপালকুণ্ডলার শ্রেণীবিচার

একটি উপন্যাসের পরিচয় সম্পূর্ণ জানা না হলে তার শ্রেণীবিচার করা শক্ত। এখন আমরা তার পরিচয় মোটামুটিভাবে সব দিক থেকেই জানি, বলতে পারি। যিনি প্রথম এই উপন্যাস পড়তে যাবেন, একটা ব্যাপারে তাঁর একটু খটকা লাগতে পারে, কারণ 'কপালকুণ্ডলা' নাম হিসাবে কিছুটা বিস্ময়কর, যখন দেখা যাবে এর অন্যতম প্রধান নারীচরিত্রের নামই এই, তখন বিস্ময় আরো বাড়বে, কারণ এরকম নাম সাধারণত কোন স্ত্রীলোকের হয় না।

এ বিষয়ে যাঁরা কিছু চিন্তাভাবনা করেছেন তাঁরা বলেছেন, নামটি সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছেন ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটক থেকে। সেখানেও অঘোরঘন্ট নামে এক কাপালিক আছে এবং তাঁর এক শিষ্যাও আছে কপালকুণ্ডলা নামে। তবে আপনারা যদি সেই নাটক পড়েন, তাহলে দেখবেন, যেখানে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি উপন্যাসের চরিত্রের ঠিক বিপরীত আমাদের কপালকুণ্ডলা কাপালিকের গ্রাস থেকে মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, ভবভূতির কপালকুণ্ডলা কাপালিকের জন্য নরবলির জোগাড় করে।

আসলে, এই উপন্যাসের উৎস সম্বন্ধে আমরা জানি, এটি বঙ্কিমচন্দ্রে একটি পরীক্ষামূলক গ্রন্থ। মনের একটি গভীর চিন্তাকে তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে রূপ দিতে চেয়েছেন। যে মেয়ে প্রায় আজন্ম লোকালয় থেকে দূরে আছে, যৌবনে তার বিবাহ দিলে সে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারবে কিনা, এই ছিল প্রশ্ন। এটা দেখাবার জন্য একটি মেয়েকে নিতান্ত শৈশবে কোন নির্জন জায়গায় নির্বাসিত দেখাতে হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, নির্জন বালিয়াড়িতে কাপালিক এই মেয়েকে লালিত করেছে। কাপালিকের দেওয়া নাম এই ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক কারণ এটি কালীর নামান্তর। অধিকারী নিজেও স্নেহভরে কখনও কখনও তাকে কাপালিনী বলে ডেকেছেন। যাইহোক, একে আমরা কোন জাতীয় সৃষ্টি বলবো সে ব্যাপারে এবার চিন্তা করা যাক।

৩৭.১১.১ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি কাব্য

কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, কপালকুণ্ডলা আসলে একটি গদ্য কাব্য। একথা অবশ্য ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কবিতা রচনার মাধ্যমেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এ কথাও মিথ্যা নয় যে কপালকুণ্ডলার মধ্যে এমন এক গভীর অনুভূতিমূলক চিন্তা আছে, মহৎকাব্যেই সেরকম চিন্তা দেখা যায়। তাছাড়া এমন এক রহস্যময় পরিমণ্ডল বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন—নির্জন সমুদ্রতীর, বালিয়াড়ি, দৈবদুর্বিপাকে নবকুমারের সেখানে নির্বাসন, রহস্যময় কাপালিক, তার চেয়েও রহস্যময়ী নারী কপালকুণ্ডলা এবং তার ব্যাকুল আহ্বান—

সমস্ত মিলে একটা কাব্যিক ব্যঞ্জনাই যে ফুটে ওঠে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

এই গ্রন্থের কাব্যিক লক্ষণ আরো আছে। সমগ্র গ্রন্থে এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র যার কাব্যিক সুষমা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। দু-এক পংক্তি উদ্ধার করলে আপনারাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন—'মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবণ, ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে, না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভুত হয় না।'

গ্রন্থের মধ্যে মধ্যেই এমন কিছু ব্যঞ্জনধর্মী পংক্তি আছে যার সাক্ষাৎ কাব্যেই পাওয়া স্বাভাবিক, যেমন—

ক) ''মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পারি না?'
নবকুমার বলিলেন, 'নবকুমার শর্মা।'
প্রদীপ নিবিয়া গেল।''

খ) 'ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।'

গ) 'লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।'

এত কাব্যিক লক্ষণ সত্ত্বেও বলতে হবে এটি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য কাব্য নয়, কারণ কাব্যের আখ্যান এবং চরিত্রসৃষ্টির কোন দায় থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে এর আখ্যান রচনা করেছেন তাই নয় সেই আখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্য কার্যকারণ শৃঙ্খল সমন্বিত সুবিন্যস্ত বৃত্তে পরিণত করেছেন। চরিত্র শুধু আখ্যানের অবলম্বন হিসাবে আসে নি, তাদের জীবন্ত করার আপ্রাণ চেষ্টাও তিনি করেছেন। সুতরাং কাব্যিক সুষমা এর উপভোগ্যতা অনেক বাড়াতে পারে, কিন্তু শ্রেণী হিসাবে একে গদ্য কাব্য বললে এর প্রতি সুবিচার করা হবে না বলেই আমরা মনে করি।

৩৭.১১.২ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি উপন্যাস

উপন্যাসের যেসব লক্ষণের কথা আমরা জানি, সেগুলি মনে রেখে বিচার করতে গেলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে কপালকুণ্ডলা একটি উপন্যাস। কারণ উপন্যাসের যে লক্ষণগুলি ২ নং এককে আপনারা স্বীকার করে নিয়েছেন সেগুলিই একবার মনে করুন। এর মধ্যে উপন্যাসের দুটি শর্ত, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ছাপাখানার আবিষ্কার আমরা বাদ দিয়ে শুধু লক্ষণগুলি বিচার করছি।

ক) উপন্যাসে আমরা প্রথম পাই মানুষের গল্প, তার সুখদুঃখ আর মানবিক দুর্বলতার গল্প। 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থে দৈবী সংস্কার ও বিশ্বাসের একা পরিমণ্ডল আছে বটে, কিন্তু এ গল্প মানুষের গল্প এবং সুনিশ্চিত ভাবে মানুষেরই গল্প। নবকুমার সৌন্দর্যপ্রেমিক এবং প্রকৃতিপ্রেমিক একটি যুবক, নানারকম ভাগ্যবিপর্যয়ে প্রথমা স্ত্রীকে হারিয়েছিল, আবার জীবনে কৃতজ্ঞতাসূত্রে একটি নারী এসেও ছিল। তাকে নবকুমার হৃদয়ের সংরক্ত প্রেম নিবেদন করেছিল, ভালবাসার একটি সংসার গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই নারী যেহেতু ভিন্ন পরিবেশে মানুষ, লোকালয় ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা অল্প, সুতরাং সংসারজীবন সম্বন্ধে তার উদাসীনতা কাটেনি। নবকুমার সুখী হয়নি, কারণ তার হৃদয়ে প্রেম সে জাগ্রত করতে পারে নি। পাশাপাশি পেয়েছি জীবনতৃষ্ণার প্রতীক স্বরূপ নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে, প্রেম না পেলে নিজের দাম্পতয

অধিকারে যা সে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে ছলে-বলে কৌশলে। কাজেই এই আদ্যন্ত মানবিক বিষয়টি যে অবশ্যই উপন্যাসের উপযোগী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

খ) বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রাণ। উপন্যাস সৃষ্টির আগে রূপকথার গল্প, দেবদেবীর গল্প অনেক প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেসব ছিল অলৌকিক। উপন্যাস মানুষের গল্প বলেই সেখানে বিশ্বাসযোগ্যতার একটা ব্যাপার আছে। সেই কারণেই উপন্যাসে বৃত্ত নির্মাণ করতে হয় যাতে সমগ্র গল্পটা বাঁধা থাকে একটা কার্যকারণ সূত্রে। আমরা দেখেছি, ঠিক সেই নিয়ম মেনেই কপালকুণ্ডলার গোটা গল্পটাই বঙ্কিমচন্দ্র একটা সুচিন্তিত বৃত্তে বা plot-এ রূপায়িত করেছেন। কাজেই সেদিক থেকেই একে উপন্যাস বলে স্বীকার করতে হবে।

গ) উপন্যাসে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের একটি নিজস্ব জীবনদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সেটি যে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ছিল,—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। সেই জন্যই অন্যান্যদের মতকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি, নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী জীবনের যে রূপ প্রতিভাত হওয়া উচিত, চরিত্র যেরকম আচরণ করা উচিত বলে মনে হয়েছে, তাই তিনি দেখিয়েছেন। মানুষ পশু নয় বলেই প্রাথমিক জীবনাচরণের প্রভাব তার জীবনে অলঙ্ঘ্য, দাম্পত্য জীবনের মূল প্রেমে, জৈব তাড়নায় নয় এবং সেই প্রেম জীবনের যোল বছর পর্যন্ত যার মনে জাগবার কোন অবকাশই ছিল না, পরেও পরিণত হবার পর তা জাগতে পারে না—এই ধরনের একটা জীবনবোধই মনে হয় এখানে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এই গ্রন্থকে উপন্যাস আখ্যা না দেবার কোন কারণ নেই।

৩৭.১১.৩ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি রোমান্স

কপালকুণ্ডলাকে উপন্যাস হিসাবে স্বীকার করে নিলেও আমরা দেখবো, এটি একটি বিশেষ ধরনের উপন্যাস, কারণ এখানে যেসব পাত্রপাত্রীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তারা কেউই আমাদের খুব পরিচিত নয়।

উপন্যাসের পাত্রপাত্রী আমাদের পরিচিত কিনা, উপন্যাসের ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে কিনা, এইসব বিচার থেকে উপন্যাসকে যে দুটিভাগে ভাগ করা হয়, সে কথা আমরা জানি। যেখানে আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী ও ঘটনা আহরণ করা হয়, তাকে আমরা বলি 'নভেল' এবং যেখানে পাত্রপাত্রী আমাদের অপরিচিত, ঘটনাধারাও ঠিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না, অথচ মানবিক সুখদুঃখের কাহিনী এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হয়, যাতে আধুনিক পাঠকের তাতে উৎসাহিত হবার কারণ থাকে, সে ধরনের উপন্যাসকে আমরা বলি 'রোমান্স'। কপালকুণ্ডলায় যেহেতু এই দ্বিতীয় ব্যাপারটির ঘটেছে অথচ তীব্র মানবিক আখ্যান আমাদের কাছে গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, একে আমরা 'রোমান্সজাতীয় উপন্যাস' হিসাবেই স্বীকৃতি দিতে পারি।

৩৭.১১.৪ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি কাব্যিক রোমান্স

রোমান্সজাতীয় উপন্যাসেরও দুটি ভাগ আছে, সে কথা আমরা জানি। যে রোমান্সের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় ইতিহাস থেকে, তাকে আমরা বলি 'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং যে রোমান্সের বিষয়বস্তু লেখকের কল্পনাতেই প্রথম দেখা দেয়, তারপর বাস্তব পরিবেশ, বিশ্বাসযোগ্য পাত্র-পাত্রী এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য কাহিনীর দ্বারা সাহিত্যে তার রূপ দেবার চেষ্টা করেন, তাকে বলা হয় 'কাবিযক রোমান্স'।

একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারবো, 'কপালকুণ্ডলা'কে আমরা 'কাব্যিক রোমান্সে'র পর্যায়েই ফেলতে পারি। এখানে অবশ্য ইতিহাসের কিছু অনুষঙ্গ আছে, সম্রাট আকবরের মৃত্যু এবং যুবরাজ সেলিমের রাজত্বভার গ্রহণের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক পর্বকেও গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তা সবই এসেছে একটি উপকাহিনীর চরিত্র মতিবিবির মাধ্যমে। কাজেই এর দ্বারা ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য কিচুটা সৃষ্টি হয়েছে বটে, সমগ্র কাহিনীটির বাস্তবতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল পরিকল্পনা যে 'কাব্যিক রোমান্সে'র সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ।

'কাব্যিক রোমান্সে'র জন্ম যেভাবে হয়, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উৎস সন্ধানে গেলে দেখা যাবে,—এর সৃষ্টিও সেইভাবেই হয়েছে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নয়, জীবন বিষয়ে একটি জটিল জিজ্ঞাসা আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে উদিত হয়েছিল। সেই জিজ্ঞাসার কতা আমরা বার বার বলেছি, সুতরাং এখানে আর তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই বোধ হয়। মনের এই প্রশ্নটির সাহিত্যিক মীমাংসা খুঁজবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাল্যকালে খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত' এবং 'সমুদ্রতীরে ত্যক্ত' একটি নারীর কথা কল্পনা করতে হয়েছিল, তন্ত্রসাধক কাপালিকের দ্বারা লালন এবং কপালকুণ্ডলা নামকরণ করাতে হয়েছিল, নবকুমারকে দৈব দুর্বিপাকে সেখানে নিয়ে যেতে হয়েছিল, ঘটনাক্রমে নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসাযী করতে হয়েছিল এবং লোকালয়ে বসবাসের ব্যবস্থাও করতে হয়েছিল। তারপর দেখাতে হয়েছিল মূলত তার সংসার ও দাম্পত্যজীবনে অনীহা এবং সপত্নী পদ্মাবতীর প্রতিহিংসা সাধনের প্রচেষ্টার কীভাবে তার জীবনে করুণ পরিণতি নেমে এল। কাজেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দিক থেকে একে অবশ্যই বলতে হবে কাব্যিক রোমান্স।

তবে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে প্রক্রিয়ার মিল থাকলেই তাকে যথার্থ 'রোমান্স' আমরা আখ্যা দিতে পারি না, কাহিনী বাস্তব করে তুলবার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা ও নিষ্টা লেখকের থাকা প্রয়োজন। তাও যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, সে বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং কপালকুণ্ডলার শ্রেণী সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সংশয় থাকতে পারে না।

৩৭.১১.৫ সার-সংক্ষেপ

উপন্যাসের আলোচনা সব দিক থেকে করা হলে, বলা সম্ভব এটি কী জাতীয় উপন্যাস বা আদৌ উপন্যাস কিনা। 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থটির আলোচনা মোটামুটি ভাবে শেষ হয়েছে, সুতরাং এইবার আমরা এই আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

'কপালকুণ্ডলা'কে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন 'গদ্যকাব্য' কারণ এর মধ্যে লেখকের এক গাঢ় অনুভূতির প্রকাশ আমরা দেখি, সর্বব্যপ্ত একটা রহস্যময় পরিমণ্ডলী দেখি এবং পাত্র-পাত্রীদের আচরণও কেমন রহস্যময় মনে হয়। এ ছাড়া এই গ্রন্থ রচনায় এমন কাব্যিক ভাষার ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, মাঝে মাঝে এমন ব্যঞ্জনাময় উক্তি করেছেন যে একে কাব্য বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, এটি কাব্য নয়, এতে একটি আখ্যান আছে, সুবিন্যস্ত বৃত্ত আছে এবং সমর্থ চরিত্রসৃষ্টি আছে। কোন কাব্যেরই এগুলি থাকে না। সুতরাং একে 'কাব্য' বলা বোধহয় ঠিক হবে না।

'কপালকুণ্ডলা'কে উপন্যাসই বলতে হবে, তবে 'নভেলজাতীয় উপন্যাস' নয়, 'রোমান্স ধরনের উপন্যাস'। 'রোমান্স'ও দুরকমের হতে পারে—'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং 'কাব্যিক রোমান্স'। এদের যেসব লক্ষণ আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি, তা মনে রাখলে একে 'কাব্যিক রোমান্স' বলাই সংগত হবে।

৩৭.১২ সারাংশ

'কপালকুণ্ডলা'-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ। তাঁর সমকালের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তিনিই প্রথম উপন্যাসে প্রাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন—একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে ব্যপৃত থেকেও সাহিত্যের সৃজনশীলতায় তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই বিচরণ করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র পর ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় 'কপালকুণ্ডলা'।

উপন্যাস আধুনিক কালের ফসল, যখন মানুষ দেবকেন্দ্রিক মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে মানবজগৎ সম্পর্কে সচেতন ও উৎসাহী হয়ে উঠছে। তাই সব উপন্যাসই মানুষের গল্প, মানবিক অনুভূতির গল্প। কখনও সে সুদূর ইতিহাসচারী বা কল্পনাপ্রসূত মানুষের রোমান্সধর্মী চরিতকথা, কখনও বা সে বাস্তব, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত মানবজীবনের প্রতিলিপি, নভেল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা বাংলা উপন্যাসের ভাণ্ডার—এই দুই শ্রেণীর রচনাতেই পূর্ণ হয়ে উঠছিল, যার মধ্যে অন্যতম সফল অবদান—বঙ্কিমচন্দ্রের।

'কপালকুণ্ডলা'র মূলকানিহী নবকুমার-কপালকুণ্ডলা কেন্দ্রিক হলেও তাতে দুটি উপকাহিনী সংযোজিত হয়েছে—মতিবিবির গল্প ও শ্যামাসুন্দরীর গল্প। এই দুটি কাহিনী উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে, গল্পের পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রেখেছে এবং এই দুই চরিত্রের তীব্র সংসারাসক্তি ও দাম্পত্যজীবনের তৃষ্ণার বিপরীতে কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তিকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

এই উপন্যাসের কাহিনীকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সময় নির্ধারণের দিকে লেখক সচেতন দৃষ্টি দিয়েছেন। স্পষ্ট সময় নির্দেশ বা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য মূলকাহিনীকে সম্ভাব্যতার জায়গায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনার সত্যতা নিখুঁতভাবে জুড়ে দেবারফলে সমগ্র কাহিনী পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে অতি সহজেই।

সমগ্র উপন্যাসটি নারীপ্রধান। নবকুমার বিভিন্ন নায়কোচিত গুণে ভূষিত হলেও ঘটনাবলীতে তার ভূমিকা গৌণ। রহস্যময়তা ও বাস্তবগুণের সংমিশ্রণে কপালকুণ্ডলা লেখকের এক অভিনব সৃষ্টি। তবে পাশাপাশি মতিবিবির চরিত্রটি বরং অধিকতর সজীব, মনোগ্রাহী। বিভিন্ন অপ্রধান চরিত্রের নির্মাণেও লেখকের যত্ন ও দক্ষতা আমাদের চোখে বিশেষভাবে ধরা পড়ে।

'কপালকুণ্ডলা'-র রহস্যময় পরিমণ্ডলী, কাব্যিক ভাষারীতি, ব্যঞ্জনাময় উক্ত এবং প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশময়তা অনেকের কাছেই একে 'গদ্যকাব্য'-এর পরিচয়ে উপনীত করেছে। কিন্তু যেহেতু এতে একটি আখ্যান আছে, সুবিন্যস্ত বৃত্ত এবং সমর্থ চরিত্রসৃষ্টি আছে যা কোনো কাব্যে থাকে না, সেই হেতু একে 'কাব্য' বলা ঠিক নয়। এটি উপন্যাসই, তবে এর বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ অনুযায়ী একে 'কাব্যিক রোমান্স' বলাই সংগত।

৩৭.১৩ অনুশীলনী

অনুশীলনী ৫২

১) এ কথা কি ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র একাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ.—পরীক্ষায় পাশ করেন?

২) বঙ্কিমচন্দ্র মোট কটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন?

৩) যে মন্তব্যটি সঠিক সেটি চিহ্নিত করুন—

ক) বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাসই রচনা করেছেন।

খ) বঙ্কিমচন্দ্র শুধু প্রবন্ধই রচনা করেছেন

গ) বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে কিছু রচনা করেন নি।

ঘ) উপন্যাস এবং প্রবন্ধ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কিছু ইংরেজি রচনাও আছে।

৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের —— উপন্যাস নয়, —— উপন্যাস।

অনুশীলনী ৫৩

১) মধ্যযুগের আখ্যানের সঙ্গে উপন্যাসের আখ্যানের কোনও পার্থক্য আছে কি? থাকলে সেটা কী?

২) উপন্যাস সৃষ্টির জন্য এমন দুটি শর্তের কথা বলুন যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

৩) উপন্যাসের প্রধান লক্ষণগুলি কী বলুন।

৪) মন্তব্যগুলির সত্যাসত্য বিচার করুন এবং অসত্য হলে তার কারণ বুঝিয়ে দিন।

ক) নভেলে থাকে আমাদের চেনা মানুষের গল্প।

খ) ইতিহাস থেকে কাহিনী সংগ্রহ করলেই তা ঐতিহাসিক রোমান্স হয়ে যায়।

গ) কাল্পনিক ধারণা নিয়ে যুক্তিসংগত ভাবে আখ্যান রচনা করলেই তা কাব্যিক রোমান্স হতে পারে।

ঘ) রোমান্স মানেই কল্পনার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেওয়া।

৫) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে কোন্‌গুলি নভেল এবং কোন্‌গুলি ঐতিহাসিক রোমান্স তার শ্রেণীবিভাগ করুন।

৬) বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা নভেল রচনার চেষ্টা হয়েছিল কি? হলে সেরকম গ্রন্থগুলির নাম করুন।

৭) বঙ্কিমচন্দ্রের আগে ঐতিহাসিক রোমান্স রচিত হয়েছিল কি? হলে কার লেখা, কী গ্রন্থ? তাকে উপন্যাস বলা যায় কি?

৮) প্রকৃত নাম, ছদ্মনাম এবং গ্রন্থনাম ভুলভাবে সাজানো আছে, আপনি সঠিকভাবে সাজিয়ে দিন—

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	গ্রন্থনাম
ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ	টেকচাঁদ ঠাকুর	নববাবুবিলাস
খ) প্যারীচাঁদ মিত্র	প্রমথনাথ শর্মা	আলালের ঘরের দুলাল
গ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	হুতোম প্যাঁচা	হুতোম প্যাঁচার নকসা

অনুশীলনী ৫৪.৩

১) কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার উৎসাহ বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে পান?

২) উপকাহিনী কাকে বলে? উপন্যাসে উপকাহিনীর দরকার হয় কেন?

৩) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে উপকাহিনী আছে কি? কী জন্য লেখক সেগুলি সৃষ্টি করেছেন?

৪) সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) কপালকুণ্ডলার আর একটি নাম— বনবালা / কপালিকা / মৃণ্ময়ী।

খ) নবকুমারের প্রথম স্ত্রী নাম— পদ্মাবতী / মতিবিবি / লুৎফ-উন্নিসা / সবগুলিই / কোনটিই নয়।

গ) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের শেষে মৃত্যু হল— কাপালিকের / মতিবিবির / কপালকুণ্ডলার / নবকুমারের / কপালকুণ্ডলার ও নবকুমারের / ঠিক জানা যায় না।

ঘ) কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে রক্ষা করেছিল— কপালকুণ্ডলা / অধিকারী / দুজনেই।

অনুশীলনী ৫৪.৫

১) কাহিনী এবং বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য কী?

২) সাধারণভাবে বৃত্ত কত রকমের ও কী কী?

৩) বাক্যগুলির একটি 'হ্যাঁ' বা 'না' বসান—

ক) কপালকুণ্ডলার শুধু কাহিনী আছে, বৃত্ত নেই—

খ) কপালকুণ্ডলায় কোনো স্বপ্নদৃশ্য নেই—

গ) উপকাহিনীর আলোচনা বৃত্তগঠনের মধ্যেই পড়ে—

অনুশীলনী ৫৪.৭

১) কপালকুণ্ডলা-র কাহিনীতে বাস্তবতা সৃষ্টির কী দরকার ছিল, তার দুটি কারণ উল্লেখ করুন।

২) ক) যুবরাজ সেলিমের পিতা কে? খ) সেলিমের প্রধান মহিষী কে ছিলেন? গ) শেষ আফগানের স্ত্রীর নাম কি? ঘ) তাঁকে সেলিম গ্রহণ করেছিলেন কি না উপন্যাসে তার উল্লেখ না থাকার কারণ কি?

৩) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করুন—

ক) মোট কতগুলি শীর্ষ উদ্ধৃতি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আছে?

খ) নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের কোন্ কোন্ নাটক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

গ) সংস্কৃত কোন্ কোন্ কবির কী কী নাটক ও কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন?

ঘ) বাংলা কোনও কাব্য ও নাটক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কোনও উদ্ধৃতি দিয়েছেন কি?

ঙ) ইংরেজ কবিদের মধ্যে কাদের কবিতার উল্লেখ এই উপন্যাসে আছে?

৪) বাঁদিকে কিছু গ্রন্থের নাম আছে, ডানদিকে সাহিত্যিকদের নাম। গ্রন্থের পাশে সঠিক গ্রন্থকারের যে ক্রম উল্লেখ আছে, সেটি বসান।

প্রকৃত নাম	গ্রন্থনাম
কমেডি অব এররস ( )	ক) লর্ড বায়রন
মেঘনাদবধ কাব্য ( )	ক) কালিদাস
নবীন তপস্বিনী ( )	গ) কবীন্দ্র ভট্টাচার্য
লুক্রেশিয়া ( )	ঘ) শেকস্‌পীয়র
উদ্ধব দূত ( )	ঙ) মধুসূদন দত্ত
লাওডামিয়া ( )	চ) জন কীটস
লেইজ অব এনশেন্ট রোম ( )	ছ) লর্ড লীটন
ওড টু এ নাইটিংগেল ( )	জ) ওয়র্ডসওয়র্থ
ডন জুয়ান ( )	ঝ) মেকলে
মেঘদূতম্ ( )	ঞ) দীনবন্ধু মিত্র

অনুশীলনী ৫৪.৯

১) চরিত্রসৃষ্টি বলতে আপনি কী বোঝেন?

২) কপালকুণ্ডলার পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে কাকে প্রধান মনে করেন, বুঝিয়ে দিন।

৩) কপালকুণ্ডলার নারীচরিত্রদের মধ্যে আপনি কাকে প্রধান্য দেবেন বুঝিয়ে বলুন।

৪) উক্তিগুলি সত্য হলে পাশ টিক চিহ্ন (√) দিন, ভুল হলে ক্রশ চিহ্ন (×) দিন—

ক) কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করে আনার সময় নবকুমারের মাতা জীবিত ছিলেন—

খ) শ্যামাসুন্দরী নবকুমারের একমাত্র ভগিনী—

গ) কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করতে নবকুমারের মা প্রথমে রাজি হয়নি—

ঘ) মতিবিবি আগ্রায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন—

ঙ) বালিয়াড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কাপালিকের দুটি হাতই ভেঙে গিয়েছিল—

চ) অধিকারীর ভবানীমন্দিরে কেউ কখনও পূজা দেয় নি—

অনুশীলনী ৫৪.১১

১) ‘কপালকুণ্ডলা’ নামটি কি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই কল্পনা? উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্রের নাম এমন অদ্ভুত কেন?

২) গ্রন্থের শ্রেণীবিচার বলতে কী বোঝায়? ‘কপালকুণ্ডলা’র শ্রেণীবিচার করার জন্য আমরা কীভাবে অগ্রসর হবো?

৫৪.১৩.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর অনুশীলনী

১) ‘কপালকুণ্ডলা’কে উপন্যাস না বলে অনেকে কাব্য বলতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানান।

২) এক সমালোচকের মতে ‘কপালকুণ্ডলা ঠিক উপন্যাস নয়; ইহার কতকটা কাব্য, কতকটা নাট্য।’ আপনি এই মত সমর্থন করেন কি?

৩) ‘কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে’র শ্রেণীবিচার করুন।

৪) উপন্যাসে উপকাহিনীর প্রয়োজন হয় কেন? কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উপকাহিনী কী? এর কোন প্রয়োজন ছিল বলে আপনার মনে হয় কি?

৫) ’কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সংস্কারের কোন পরিচয় আছে বলে মনে করেন কি? উপন্যাসের মত আধুনিক সাহিত্যে এর কি কোন দরকার ছিল?

৬) কপালকুণ্ডলাকে প্রায় সর্বদাই অন্ধকারে দেখানো হয়েছে, দিনের উজ্জ্বল আলোয় তাকে আমরা বিশেষ দেখতে পাইনা। এর কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আপনার মনে হয় কি?

৭) কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার উৎস কী? এ বিষয়ে যা জানা যায় তার পরিচয় দিন।

৮) কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা ভেবেছেন এবং পরিণতি যেরকম দেখিয়েছেন, তা কি আপনার স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে এর স্বাভাবিক পরিণতি কী হতে পারতো বলে আপনি মনে করেন?

৯) গ্রন্থের নাম যখন ‘কপালকুণ্ডলা’ তখন কপালকুণ্ডলাকেই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র নায়িকা করতে চেয়েছেন, কিন্তু অনেকেই মনে করেন মতিবিবিই অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

১০) ‘কপালকুণ্ডলার’ কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের পরিচয় দিন। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সতর্ক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

১১) ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে ইতিহাস থাকলেও একে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ বলা সংগত নয় কেন, বুঝিয়ে দিন।

৩৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

২) শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

৩) প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত ঃ উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম

৪) মোহিতলাল মজুমদার ঃ বঙ্কিম-বরণ

৫) বঙ্কিমচন্দ্র ঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৩৭.১৫ উত্তরমালা

উত্তর — ৫২

১) না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্নাতক পরীক্ষা বা বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আরো একজন পাশ করেন—যদুনাথ বসু।

২) এগারোটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আর তিনটি ছোট উপন্যাস বা খণ্ডোপন্যাস। অবশ্য ইংরেজি উপন্যাস 'Rajmohan's Wife'-এর কথা ধরলে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হবে বারোটি।

৩) (ঘ)

৪) [কপালকুণ্ডলা উপন্যাস সম্বন্ধে আপনি এখনও পর্যন্ত তেমন কিছুই জানেন না, কেবল কোন্‌টি প্রথম বা দ্বিতীয় সেটুকুই জানেন। তাই শূন্যস্থান পূরণও সেইভাবেই করবেন—]

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস নয়, দ্বিতীয় উপন্যাস।

[এক্ষেত্রে আপনাকে Rajmohan's Wife-এর কথা মনে রাখতে হবে না, কারণ বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় তাকে ধরা হয় না।]

উত্তর — ৫৩

১) মধ্যযুগেও আখ্যান বা গল্প ছিল, কিন্তু তা ছিল প্রধানত দেবদেবীর কাহিনী, উপন্যাসে আমরা পাই মানুষের গল্প, তার সুখদুঃখ আর মানবিক দুর্বলতার গল্প। মানুষের গল্প বলেই উপন্যাসে অলৌকিক বা অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা বিশেস থাকে না, মধ্যযুগে দেবদেবীর গল্প শোনার হতো বলে অবিশ্বাস্য মাহাত্ম্য কথাও থাকতো অনেক বেশি, নইলে তাঁদের অসাধারণ ক্ষমতার বিশ্বাস জন্মায় না সাধারণ মানুষের।

২) উপন্যাস সৃষ্টির দুটি মৌলিক শর্ত হল, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার।

৩) উপন্যাসের প্রধান লক্ষণগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সারাংশেও তার উল্লেখ আছে। আপনারা বিশদভাবেই আলোচনা করতে পারেন এই প্রশ্নে কত মানাঙ্ক দেওয়া আছে তার ওপর নির্ভর করে। সাংরাশের মূল সূত্রগুলি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি—

ক) উপন্যাসের কাহিনী হবে মানুষের ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন।

খ) গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ওপর উপন্যাস সৃষ্টি নির্ভরশীল।

গ) বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ।

ঘ) ছাপাখানার আবিষ্কার উপন্যাস সৃষ্টির এক প্রধান শর্ত।

৬) উপন্যাসে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার।

৪) ক) সত্য

খ) অসত্য। ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা সেই কাহিনীতে যথেষ্ট মানবিক আবেদন বা মানুষের ভালো লাগার মত উপাদান না থাকলে তা ঐতিহাসিক রোমান্স হয় না।

গ) সত্য।

ঘ) অসত্য। কারণ, রোমান্স তো উপন্যাসেরই একটি প্রকারভেদ এবং উপন্যাসের প্রধান গুণ— বাস্তবতা; কাজেই কল্পনার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলে তাকে কখনই আমরা 'উপন্যাস' বলতে পারবো না, আর যাকে 'উপন্যাস' বলা চলে না তাকে 'রোমান্স' বলার কোন কারণ নেই।

৫) এই শ্রেণীবিভাগ আমরা করেই দিয়েছি, আপনি ৫৩.৪.২ অংশটি দেখে নিয়ে অনায়াসে উত্তর করার চেষ্টা করতে পারেন। আপনার নিজের যদি অন্যরকম কোন সিদ্ধান্ত হয়, আপনি তাও জানাতে পারেন।

৬) হ্যাঁ, হয়েছিল। প্রথম গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৮২৩ সালে, নাম 'নববাবু-বিলাস'। দ্বিতীয় নভেল লেখার চেষ্টা হয়েছিল ১৮৫৮ সালে, গ্রন্থের নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'। তৃতীয় গ্রন্থটি রচিত হয় ১৮৫২ সালে, নাম 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ'। হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নামে আরো একটি গ্রন্থ রচিত হয়, সেটির প্রকাশকাল ১৮৬২ সাল।

৭) হ্যাঁ, 'ঐতিহাসিক রোমান্স' লেখার চেষ্টা করা হয়েছিল। লিখেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থের নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। পূর্ণাঙ্গ রোমান্স হলে তাকে হয়তো 'উপন্যাস' বলা চলতো, কিন্তু গ্রন্থটি আসলে দুটি ক্ষুদ্র কাহিনীর সংকলন। তাই একে 'উপন্যাস' না বলাই বাঞ্ছনীয়।

৮) সঠিক সাজানো এইরকম হবে ঃ

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	গ্রন্থনাম
ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা	হুতোম প্যাঁচার নক্সা
খ) প্যারীচাঁদ মিত্র	টেকচাঁদ ঠাকুর	আলালের ঘরের দুলাল
গ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রমথনাথ শর্মা	নববাবু বিলাস

উত্তর — ৫৪.৩

১) কর্মজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগুঁয়ায় বদলি হয়েছিলেন, এক কাপালিকের দেখা পেতেন মাঝরাতে। এঁকে দেখেই সম্ভবত মাথায় একটা প্রশ্ন এসেছিল, কোন নারী যদি লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত অবস্থায় বড় হয়, তবে যৌবনে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারী করতে চাইলে তার স্বভাবের পরিবর্তন হবে কিনা। এর উত্তর সন্ধানের জন্যই যে উপন্যাসটি লেখা, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে সেই কথাই বলা হয়েছে।

২) এই প্রশ্নের উত্তর আপনারাই দিতে পারবেন। এই এককের ৫৪.৪ এবং ৫৪.৪.১ অংশদুটিকে সংক্ষেপে লিখলেই এর উত্তর হয়ে যাবে।

৩) এর উত্তরও নিজে লেখার চেষ্টা করুন। ৫৪.৪.২ অংশে এর উত্তর সাজানোই আছে।

৪) ক) মৃণ্ময়ী।

খ) সবগুলিই।

গ) ঠিক জানা যায় না।

[ভেসে যাওয়ার কথা আছে, মৃত্যুর কথা নেই]

ঘ) দুজনেই

[এটা একটা শক্ত প্রশ্ন, কারণ যে-কোন উত্তরই ঠিক, তবে শেষেরটা যে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তর, আপনারা একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবেন]

উত্তর — ৫৪.৫

১) কাহিনী বলতে বোঝায় উপন্যাসের আখ্যান বা গল্পটা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'story' এবং বৃত্ত বলতে বোঝায় সেই গল্পের বিন্যাস, যাকে ইংরেজিতে বলি আমরা 'প্লট'। কাহিনীর মধ্যে কেবল পাঠকের কৌতূহলবৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয়, অর্থাৎ তারপর কী হল, তারপর? এইভাবে কাহিনী এগিয়ে যায়। বৃত্তে থাকতে হবে সেই সঙ্গে কার্যকারণের শৃঙ্খলা—এইজন্যে এটা হল, এই জন্যে ওটা হল, এইরকম। এক কথায় বলা যেতে পারে, বৃত্ত একটা সুশৃঙ্খল কাহিনী।

২) সাধারণভাবে বৃত্ত হয় তিন রকমের। এদের নাম হল 'সরল বৃত্ত', যাতে একটাই গল্প থাকে; 'জটিল বৃত্ত', যাতে একটি মূল কাহিনী আর এক বা একাধিক উপকাহিনী; 'যৌগিক বৃত্ত',—যেখানে বেশ কয়েকটা আপাত স্বাধীন কাহিনী যারা তাৎপর্যে কিন্তু একটা অভিন্ন সংবেদন তৈরি করে।

৩) ক) না

খ) না

গ) হ্যাঁ।

উত্তর — ৫৪.৭

১) প্রথমত এটি যখন বঙ্কিমচন্দ্র রচিত একটি উপন্যাস তখন বাস্তবতা সৃষ্টি তো করতেই হবে, নইলে তাকে উপন্যাস হিসাবে আমরা মেনে নেব কেন।

দ্বিতীয়ত, কাহিনীটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলেই পাঠকের কাছে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার দরকার ছিল।

২) ক) সম্রাট আকবর।

খ) মানসিংহের ভগিনী। নাম উল্লেখ করা হয় নি।

গ) মেহের-উন্নিসা।

ঘ) ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেলিম তাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু উপন্যাসে তার উল্লেখ নেই এই জন্য যে, উপন্যাসের সময়কালের মধ্যে তা পড়ে না

৩) ক) মোট একত্রিশটি।

খ) Comedy of Errors; King Lear; Romeo and Juliet; Macbeth; Hamlet; Othello

গ) কালিদাস — রঘুবংশম্‌; অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌; মেঘদূতম্‌; কুমারসম্ভব;

শ্রীহর্ষ — রত্নাবলী।

কবীন্দ্র ভট্টাচার্য — উদ্ধবদূত।

ঘ) মধুসূদন দত্ত — মেঘনাদবধ কাব্য; বীরাঙ্গনা কাব্য; ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

দীনবন্ধু মিত্র — নবীন তপস্বিনী

বিদ্যাপতি — বৈষ্ণব পদ।

ঙ) Lord Byron — Don Juan; Manfred।

John keats — Ode to a Nightingale।

William Wordsworth — Laodamia।

উত্তর — ৫৪.৯

১) উপন্যাসের কাহিনী কিছু পাত্র-পাত্রীর সাহায্যেই বর্ণনা করা হয়। এই সব পাত্র-পাত্রীকেই সাধারণভাবে বলা হয় চরিত্র। তবে সৃষ্টির গুণে এই কাল্পনিক পাত্র-পাত্রী যদি রক্তমাংসের মানুষের মত সজীব না হয়ে ওঠে, তবে তাদের চরিত্র বলা যাবে না। প্রত্যেকটি মানুষের যেমন এক-একটি বৈশিষ্ট্য থাকে, চরিত্রেরও তাই থাকা উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের হাতে হবে দোষেগুণে ভরা মানুষ। এই ভাবেই চরিত্র আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য না হলে কাহিনীটিও অবাস্তব মনে হবে, আর কাহিনী অবাস্তব হলে তাকে আমরা উপন্যাসই বলতে পারবো না। কাজেই উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টির একটা বিরাট গুরুত্ব যেমন আছে, তেমনি কাল্পনিক পাত্র-পাত্রী যাতে 'চরিত্র' হয়ে ওঠে, সেটা দেখাও সাহিত্যিকের প্রধান দায়িত্ব।

২) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র বলতে একটিই আছে, নবকুমার। উল্লেখ করা যায় এমন চরিত্র আছে আর দুটি—কাপালিক ও অধিকারী। এই দুটি চরিত্রই সম্পূর্ণ একমুখী, কাপালিকের সব কিছুই খারাপ এবং অধিকারীর সব কিছুই ভালো। সেইজন্য তাদের খুব বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র বলে মনেই হয় না। নবকুমারের চরিত্রে গুণ অনেক বেশি থাকলেও দোষও আছে কিছু। তা না হলে কপালকুণ্ডলাকে সে অবিশ্বাসিনী ভাবতে পারতো না, কাপালিকের আজ্ঞা পালন করে কপালকুণ্ডলাকে বধের জন্য নিয়ে যেতে পারতো না — অন্তত এ কথা তার মনে পড়তো, এই কপালকুণ্ডলাই কাপালিকের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে নতুন জীবন দান করেছিলেন। দোষেগুণে ভরা এই চরিত্রটিই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র

হতে পেরেছে।

৩) এটা বলা একটু শক্ত, কোন সন্দেহ নেই। কারণ উপন্যাসের নাম 'কপালকুণ্ডলা'। এই চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা, একে সাহিত্যে রূপ দেবার জন্যই তিনি উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন। পক্ষান্তরে মতিবিবিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, কপালকুণ্ডলা যাতে কোন মতেই সুখী হতে না পারে, সে ব্যাপারে নিশ্চত হবার জন্য নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী হিসাবে তার পরিকল্পনা করেছেন। কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমচন্দ্র রহস্যময়ী করে তুলেছেন, যেন একটা অলৌকিক পরিমণ্ডল তাকে ঘিরে আছে, তার উদাসী মূর্তির যেন সবটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মতিবিবি স্বৈরিণী নারী—ক্ষমতা করায়ত্ত করা এবং লুব্ধ পুরুষের বিলাসসঙ্গিনী হবার জন্যই তাকে যেন বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। অথচ এই নারীই আমাদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আসলে মতিবিবির মধ্যে দোষের ভাগ বেশি, কিন্তু সে এক চিরন্তন নারী, এইজন্য তাকে বেশি ভালো লাগে। কপালকুণ্ডলার মধ্যে যেন এক অনির্বচনীয় মহত্ত্ব আছে, কিন্তু সে আমাদের হৃদয়ের অতো কাছে আসতে পারে না।

৪) ক) √

খ) ×

গ) ×

ঘ) ×

ঙ) √

চ) ×

উত্তর — ৫৪.১১

১) নামকরণ যখন বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন তখন কপালকুণ্ডলা নামটিও তিনি নিজেই ভেবে থাকতে পারেন। কিন্তু নামকরণ একটি অদ্ভুত ধরনের বলেই এ প্রশ্ন উঠেছে যে এরকম নাম তিনি আগে কখনও শুনেছেন কিনা। এ বিষয়ে বলা যায়, ভবভূতির লেখা সংস্কৃত নাটক 'মালতীমাধবে' একটি কাপালিক ছিল, তার প্রধান শিষ্যার নাম ছিল কপালকুণ্ডলা। কিন্তু সে চরিত্রটি ছিল নির্দয় এবং হিংস্র। কাজেই, নামটি যদিওবা বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করে থাকেন ভবভূতির নাটক থেকে, চরিত্রটি তিনি নির্মাণ করেছেন নিজের মত করেই।

২) সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ আছে — কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি। একটি গ্রন্থকে ঠিক কী ধরনের বা প্রকারের সাহিত্য বলা যায়, সেটা নির্ণয় করাকেই বলে তার শ্রেণীবিচার। কারণ অনেক সময় আকৃতির দিক থেকে একরকম মনে হলেও তার প্রকৃতি হয়তো দেখা যায় অন্যরকম। সেক্ষেত্রে প্রকৃতিগত বিচারটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

কপালকুণ্ডলা দৃশ্যত একটি উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র সেভাবেই এটি রচনা করেছেন কিন্তু অনেকেই এর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক রকম কথা বলেছেন। কেউ একে বিশুদ্ধ 'কাব্য' বলতে চেয়েছেন, কেউ বলেছেন 'নাটক', কেউ আবার এমন কথাও বলেছেন যে এটা বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিচিত্র সৃষ্টি। আর ডাব্লিউ ফ্রেজার সাহেব মন্তব্য করেছিলেন 'লতির বিয়ে', ছাড়া এমন একখানা বই নাকি পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যেও কোথাও খুঁজে

পাওয়া যাবে না। আমরা এই সমস্যার সমাধানে কীভাবে অগ্রসর হবো সেটা এই ৫৪.১১ এককে বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা আছে, আপনারা সেই আলোচনা পড়ে নিজের বুদ্ধিবিচার প্রয়োগ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। মনে রাখবেন, সাহিত্যের প্রশ্নে একেবারে আমিই চূড়ান্ত সত্য কথা বলছি, এভাবে কেউ বলতে পারে না। সুতরাং আপনার নিজের চিন্তাভাবনার সুযোগ নিশ্চয়ই আছে, তবে তা করতে হবে আপনি যেসব আলোচনা পড়েছেন, তাকেই অবলম্বন করে। কারণ আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার জন্যই আলোচনাগুলি বিভিন্ন দিক থেকে করা হয়েছে।

৫৪.১৫.১ সামগ্রিক আলোচনা নির্ভর উত্তরমালা

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে একটা কথা আপনাদের জানানো দরকার। সেটি হল, যে প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে তার প্রত্যেকটিই যাতে আপনি নিজে আলোচনা করতে পারেন, সেই ভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এটা বলে দেওয়াই যথেষ্ট হতো যে, এই প্রশ্নের জন্য এই এককটি দেখে নিন এবং তারপর আপনার বুদ্ধি বিবেচনামতে ঠিক মত গ্রহণ করুণ, কিন্তু বর্জন করুন, কিছু আপনি নিজে ভেবে-চিন্তে নিন। কারণ আমাদের আলোচনা একক বিভাগ করে পৃথক বিষয় নিয়েই হয়েছে। বিষয় অনুযায়ী এককের বিভাগ এইরকম ঃ

৫২	লেখক, তাঁর সৃষ্টি এবং প্রতিভার বৈশিষ্ট্য
৫৩	উপন্যাসের বিভিন্ন লক্ষণ এবং তার শ্রেণীবিভাগ।
৫৩	উপন্যাসের পথিকৃৎ কে এবং তাঁর সমসাময়িক রচনা।
৫৪.৩ ও ৫৪.৪	‘কপালকুণ্ডলা’র কাহিনী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য।
৫৪.৫ ও ৫৪.৬	‘কপালকুণ্ডলা’র বিষয়বিন্যাস বা বৃত্তগঠনের আলোচনা।
৫৪.৭	‘কপালকুণ্ডলায়’ বাস্তবতা সৃষ্টির বিভিন্ন উপায়।
৫৪.৯	‘কপালকুণ্ডলায়’ চরিত্রসমূহ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য।
৫৪.১১	‘কপালকুণ্ডলায়’ শ্রেণীনির্ণয়।

তবুও আপনাদের সম্পূর্ণ একার প্রচেষ্টায় উত্তর লেখার অসুবিধাও কিছু আছে। প্রধান অসুবিধা হল এই যে, উত্তরগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে লিখতে হবে—৫০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে। কিন্তু আমাদের আলোচনা তুলনায় কিছুটা বিস্তৃত। সেই আলোচনা দেখে কী করে সংক্ষেপ করবেন তা বোঝাবার জন্য কিছু উত্তর এখানে লিখে দেওয়া হবে। তবে তা সত্ত্বেও সেই উত্তর হুবহু না লিখে আপনি নিজে কিছু ভাবুন, আলোচনা-অংশ দেখুন, তার কিছু পরিবর্তন করুন—এটাই বাঞ্ছনীয়। আপনাদের সুবিধার জন্য যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হল, সেগুলি অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন।

এবার উত্তরমালা।

১) এই প্রশ্নের উত্তর আপনি অনায়াসে ৫৪.১১ অংশ থেকে করতে পারবেন। শুধু মনে রাখবেন, এই মূল কথাগুলি আপনাকে লিখতে হবে—

ক) কাব্যের গভীর অনুভূতি বর্তমান।

খ) উপন্যাসের মত স্পষ্ট নয়, রহস্যময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি।

গ) ভাষা একেবারেই কাব্যময়।

ঘ) কিছু উক্তিতে কাব্যিক ব্যঞ্জনা আছে।

ঙ) কিন্তু আখ্যান চরিত্রবিত্রণ ও বিশেষ করে বৃত্তনির্মাণের বৈশিষ্ট্যে বোঝা যায় এটি কাব্য নয়।

২) এই প্রশ্নের উত্তর ১ নং প্রশ্নের উত্তরের মতই হবে, শুধু নাট্য লক্ষণ বলতে কী বোঝায়, এবং সেটা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আছে কিনা আপনাদের বলতে হবে। তাই সেই লক্ষণ দু-এক কথায় জেনে নিতে পারেন ঃ

প্রকৃতির দিক থেকে দ্বন্দ্বময়তা এবং বাহ্যিক দিক থেকে চমকিত ঘটনা সংস্থাপন নাটকের বৈশিষ্ট্য। কপালকুণ্ডলায় দ্বন্দ্বময়তা আমরা খুব বেশি দেখতে পাইনা, কারণ কপালকুণ্ডলার চরিত্রে বিশেষ দ্বন্দ্ব নেই। মতিবিবির যদি আগ্রার রাজসিংহাসন দখলের ক্ষমতা থাকতো তাহলে তার ফিরে আসা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারতো, কিন্তু সে সম্ভাবনাও কিছু ছিল না। নবকুমার বিক্ষুব্ধ চরিত্র—একেবারে শেষের দিকে কিছুটা দ্বন্দ্বময় বলা যায়। আসলে চমকপূর্ণ ঘটনা এখানে অনেক ঘটেছে যাদের 'নাটকীয়' ঘটনা বলতে পারি, যেমন —সমুদ্রতীরে কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎ, দস্যুহস্তে নিগৃহীতা মতিবিবির সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ, কপালকুণ্ডলার পত্র হারানো এবং তা নবকুমারের হাতে পড়া, ব্রাহ্মণ-বেশী মতিবিবির অঙ্গুরীয় দান দেখে নবকুমারের কপালকুণ্ডলাকে ভুল বোঝা ইত্যাদি।

৩) [লক্ষ করে দেখুন, এখানে কপালকুণ্ডলা যে উপন্যাস, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি, কী জাতীয় উপন্যাস, সে কথাই জানতে চাওয়া হয়েছে।] উত্তর এই ভাবে লিখতে পারেন?

উপন্যাসের প্রধানত দুটি বিভাগ—'নভেল' এবং 'রোমান্স'। 'নভেল' আমরা পাই আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ এবং পরিচিত পাত্রপাত্রী, 'রোমান্সে' বাস্তবতা বজায় রেখে, আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে যে জগৎ সেখানকার মানবিক কাহিনী শোনানো হয়। 'রোমান্সের' কাহিনী ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলে তাকে বলে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং লেখকের কল্পনার যদি সেটি আগেই এসে থাকে তবে তাকে বলে 'কাব্যিক রোমান্স'।

'কপালকুণ্ডলা'র সমগ্র কাহিনী আমাদের স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে এদের আমরা পেতে পারি না, সুতরাং এটি যে 'রোমান্স' এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাসের আশ্রয় এ উপন্যাসে নেওয়া হলেও মূল কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নেই বলে একে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' বলা যায় না। বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যায়, এই উপন্যাসের সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতে আগেই দেখা দিয়েছিল —যৌবনকাল পর্যন্ত লোকালয়বর্জিত স্থানে বাস করে, পরে দাম্পতয জীবনে বাস করলে কোন নারীর স্বাভাবিক সংসারাসক্তি, প্রেম ইত্যাদি অনুভূতি জাগবে কিনা। এই চিন্তারই বাস্তব গ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ঔপন্যাসিক রূপান্তর বলা যায় এই উপন্যাসকে। কাজেই এটি যে একটি 'কাব্যিক রোমান্স' এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।

৪) বুঝতেই পারছেন এর উত্তর পাওয়া যাবে ৫৪.৪ নং এককে কারণ এটি কাহিনী সংক্রান্ত প্রশ্ন। এই এককের ৫৪.৪.১ ও ৫৪.৪.২ অংশ দেখে উত্তরটি সংক্ষেপে লিখতে পারেন অথবা ৫৪.৪.২ অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি সরাসরি লিখে দিতে পারেন।

৫) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সংস্কারের পরিচয় কিছু কিছু আমরা পাই। সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়, কারণ কাপালিক ও তার পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলার কাহিনীতে এরকম রহস্যময় আবেষ্টনী একটা থাকতেই পারে। সেগুলির পরিচয় দিই আগে।

অলৌকিক যে অংশটি আছে সেটি রয়েছে চতুর্থ খন্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে। মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে বাড়ি ফেরার পথে কপালকুণ্ডলা ভৈরবী-কালীর দর্শন পেয়েছে এবং তাঁর নির্দেশ শুনতে পেয়েছে। এটি যে প্রত্যক্ষ, সেটা দেখাবার জন্য Wordsworth-এর একটি কাব্যপংক্তি দিয়ে পরিচ্ছেদের শুরু — 'No spectre greets me — no vain shadow this,' কপালকুণ্ডলা দেখেছে 'আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্তি। গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতশ্রুতি হইতেছে, কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে — বাম করে নরকপাল — অঙ্গে রুধিরধারা ললাটে বিষমোজ্জ্বলাজ্বালা বিভাসিত লোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত।' কপালকুণ্ডলা চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি স্বপ্ন দেখেছে, তাকেও অতিপ্রাকৃত বলা যেতে পারে, কারণ সেখানে কপালকুণ্ডলার পরিণতিই যেন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে তরীতে কপালকুণ্ডলা ইতোপূর্বে বসন্তলীলা করেছে, সেই তরী সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবার জনয এসেছে কাপালিক, ব্রাহ্মণ বেশধারী একজন তাকে আটকেছে, তরী রাখবে না ডুবিয়ে দেবে প্রশ্ন করায় তরী নিজেই তা ডুবিয়ে দিতে বলেছে এবং তরী পাতালে প্রবেশ করেছে।

সংস্কারের যে ব্যাপারটি আছে সেটি, বিবাহের পর যাত্রাকালে ভবানীর চরণ থেকে বিল্বপত্র খসে পড়া। এটি কপালকুণ্ডলাকে পরবর্তী জীবনে সর্বদা আশঙ্কিত রেখেছে।

উপন্যাস আধুনিক সাহিত্য হলেও কপালকুণ্ডলা একটু ান্য ধরনের উপন্যাস। এখানে কিছু রহস্যময়তাকে আমরা ছাড়পত্র দিতে পারি। দ্বিতীয়ত এই ধরনের অলৌকিক বা অতি প্রাকৃত যে মনের ভুল হতে পারে, তারও ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। ভৈরবী-মূর্তি দর্শনের আগে এ কথা বলেছেন মানুষের মন চঞ্চল হলে 'অনৈসর্গিক পদার্থও প্রতীক্ষীভূত' বলে বোধ হতে পারে। স্বপ্নদর্শন যে কপালকুণ্ডলার অবচেতন মনেরই প্রতিফলন এ আমরা বুঝি। আর সংশয় উপস্থিত হলে সংস্কার তো মানুষকে আচ্ছন্ন করেই। কাজেই কপালকুণ্ডলায় অতিপ্রাকৃত উপাদান বলে যেগুলিকে মনে হয় তাদের প্রত্যেককেই জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বলে অনায়াসেই মেনে নেওয়া যায়।

৬) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা যুক্ত করে রেখেছেন অন্ধকার এবং কপালকুণ্ডলার কেশভার — অবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত। যখন প্রথম তাকে নবকুমার দেখে, তখনও তাই এবং একেবারে শেষ পরিচ্ছেদ, যেখানে কপালকুণ্ডলাকে বধ করতে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানেও তাই 'চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিল্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল।' এছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অন্ধকারই কপালকুণ্ডলার সঠিক প্রেক্ষিত হয়েছে, শ্যামাসুন্দরী ওষধিচয়নের ক্ষেত্রেও বলেছে, 'ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলো চুলে তুলিতে হয়।'

চরিত্রটিতে এভাবে অন্ধকারে রাখার গূঢ় তাৎপর্য আছে বলেই আমরা মনে করি। কপালকুণ্ডলা কেবল যে বঙ্কিমচন্দ্রে কাল্পনিক সৃষ্টি তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় 'অর্ধেক কল্পনা তুমি, অর্ধেক মাধবী।' কপালকুণ্ডলা লেখকের একটি অর্ধস্ফুট তত্ত্ব পত্র — সম্ভবত লেখকের কাছেও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। সেইজন্য একটি রহসের মায়াজালে চরিত্রটিকে বরাবর তিনি রেখে দিতে চেয়েছিলেন। দিনের উজ্জ্বল আলোয় এনে ফেললে সে রহস্যজাল উন্মুক্ত হয়ে যায় বলেই প্রকাশ্য দিবালোকে চরিত্রটিকে তিনি কখনও আনেননি।

৭) প্রশ্ন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটি কপালকুণ্ডলার কাহিনী সংক্রান্ত প্রশ্ন। আপনারা জানেন এটা আমরা আলোচনা করেছি ৫৪ নং এককে। সুতরাং সেখানেই এর উত্তর আছে। আপনরা ৫৪.৩ শীর্ষাঙ্কের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদটি একটু সংক্ষেপে ১০০ শব্দের মধ্যে লেখার চেষ্টা করলেই এর উত্তর হয়ে যাবে।

৮) [এই প্রশ্নের উত্তর আপনি সমস্ত আলোচনা পড়ে ঠিক যেরকম আপনার মনে হয়, সেইভাবেই দিতে চেষ্টা করবেন। আমার মতামত আমি উত্তরের মত লিখছি, এটি যুক্তিসংগত বিবেচনা করলে আপনি এটাও ব্যবহার করতে পারেন।]

যে নারীর লোকালয়ের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক না রেখে বড় হয়েছে, যৌবনে বিবাহ হলে সংসার ও দাম্পত্য জীবনকে সে ভালবাসতে ও গ্রহণ করতে পারবে কিনা এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা। এ বিষয়ে অনেক মতামত পেলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যা সংগত মনে করেছেন সেই মত অনুযায়ীই উপন্যাসে চরিত্রটির পরিণতি দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃতির মধ্যে বড় হওয়া মেয়ে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সুখী হয়নি, দাম্পত্য জীবন কাকে বলে সে বোধও তার হয়নি। এমনিতে সংসার সম্পর্কে উদাসীন সে ছিলই, তার ওপর মতিবিবির কথা জানতে পেরে সংসারে থাকার ইচ্ছা তার একেবারেই লোপ পেয়ে যায় এবং পরে নাটকীয় পরিস্থিতিতে নবকুমার তাকে বধ করতে নিয়ে যাবার সময় দুর্ঘটনায় দুজনেই সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

এই পরিরতি স্বাভাবিক মনে করা শক্ত, কারণ মতিবিবি এসে আবির্ভূত হলে পরিস্থিতি কী রকম দাঁড়াতো সেটা পরের কথা, কিন্তু এক বছরের বেশি সময় নবকুমারের বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে সপ্তগ্রামে কাটাবার পরও সংসারে কোনরকম আসক্তি না জন্মানো খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। দাম্পত্য জীবন এবং যৌন জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন, তবে তাদের কোন সন্তান সম্ভাবনা ঘটেনি, এটাও আমরা দেখেছি। কপালকুণ্ডলা লোকালয়ে না থেকেও নারীসুলভ করণাবৃত্তি যখন অর্জন করেছে তখন জৈব আকর্ষণ তার কেন গড়ে উঠবেনা বোঝা শক্ত। তাই সংসার তার উৎসাহ জন্মানোটাই স্বাভাবিক ছিল, এরপর মতিবিবির প্রসঙ্গে কোন নাটকীয় সিদ্ধান্তে লেখক নিলে সম্ভবত তা আমাদের আপত্তির কারণ হতো না।

৯) গ্রন্থের নাম 'কপালকুণ্ডলা' বলেই তাকে নায়িকা হিসাবে মেনে নিতে পারলে খুব ভাল হতো। বিশেষ করে মতিবিবি যখন কোনমতেই আদর্শনারী নয়, এমন একটি স্বৈরিণী নারীকে নায়িকার সম্মান দিলে অনেকেরই তা ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষনীয়া নারী চরিত্র মতিবিবিই।

কপালকুণ্ডলার নাটকীয় আবির্ভাব, তার বন্য সৌন্দর্য, তার রহস্যময় চরিত্র আমাদের বিহ্বল করে সত্য,

কিন্তু তাকে যেন আমরা ঠিক আমাদের ঘরের মেয়ে করে নিতে পারিনা — ঠিক যেমন পারেনি নবকুমার, পারে নি শ্যামাসুন্দরী। মতিবিবিকে ঘরের মেয়ে বা আপনজন ভাবা সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু তাকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। আগ্রায় যে জীবনযাত্রায় সে জড়িয়ে পড়েছিল সেটা অনভিপ্রেত হতে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। পাঠানের হাতে লুণ্ঠিতা হয়ে যে মেয়ে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয় তাকে নবকুমার গ্রহণ করে নি সামাজিক বিধিনিষেধের জন্যই, কিন্তু আধুনিক পাঠক হিসাবে একথা আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করি যে তাতে মতিবিবির নিজের দোষ কিছু ছিল না। এরপর ক্ষমতালোভী, বিবেকবর্জিত পিতার হাতে পড়ে যা হতে হয়েছে তাকে, তাতেও নিজের কোন হাত ছিল না তার। আগ্রার ক্ষমতার লড়াইয়ে টিকতে না পেরে এবং অবশ্যই সুপ্ত দাম্পত্যপ্রেম মনে জাগ্রত হওয়ায় যে স্ত্রীলোক সপ্তগ্রামে ফিরে এসেছে, তার আচরণকে আমরা নিন্দা করতে পারি, কিন্তু তার অধিকারবোধকে অস্বীকার করতে পারিনা।

তাই জীবনে অভাবিত সুযোগ পেয়ে গিয়েও যে তার অধিকারকে কোনদিন বুঝতেই শিখল না, তার বদলে ভাগ্যবিড়ম্বিত এক নারীর অধিকার ফিরে পাবার সংগ্রামকে — হোক না তা অসুন্দর উপায়ে, আমাদের মনে মনে সমর্থন না করে কোন উপায়ই থাকে না। মতিবিবি অবশ্যই উজ্জ্বলতর চরিত্র।

১০) চরিত্র আমরা আলোচনা করেছি ৩৭.৯ নং এককে। তাই সেখানে ৩৭.৯.৪ শীর্ষক আলোচনা সংক্ষেপে লিখতে পারেন। আমরা বৃদ্ধের চরিত্র আলোচনা করিনি, পেষমনও না; আপনি সে বিষয়েও আপনার মতামত সংযোজিত করতে পারেন।

১১) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাস তো আছেই, মুঘল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ই সেখানে ধরা পড়েছে। তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি কারণে একে ঐতিহাসিক উপন্যাস' আমরা বলতে পারবো না। কারণগুলি উল্লেখ করলেই আমরা এরকম সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছি তা বোঝা যাবে।

ক) সমগ্র উপন্যাসটি পড়লে এবং এই উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কেন উৎসাহিত হয়েছিলেন তা জানা থাকলে, আমরা বুঝতে পারি, মতিবিবির আগ্রার জীবনবৃত্তান্ত নয়, নির্জন সমুদ্রতীরে কাপালিকের লালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলাই এই উপন্যাস রচনার প্রাথমিক কারণ এবং প্রধান আকর্ষণের বস্তু। সেই হিসাবে একে কাব্যিক রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত করাই অধিকতর সংগত।

খ) ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস থেকেই চরিত্র সংগৃহীত হয়, কিছু কাল্পনিক চরিত্রও থাকতে পারে। এই উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের যোগাযোগ যেটুকু সেখানে মতিবিবি বা নবকুমার কেউই ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। ঐতিহাসিক যেসব চরিত্র অতি স্বল্পকালের জন্য উপন্যাসে এসেছে তাদের চরিত্র নির্মাণে কোন উৎসাহ লেখকের ছিল না।

গ) ঐতিহাসিক উপন্যাসে একটা ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করতে হয়, এখানে যে পটভূমির প্রতি লেখকের উৎসাহ বেশি তাকে ভৌগোলিক বলা যায়, ঐতিহাসিক নয়।

ঘ) সমগ্র উপন্যাসের এক-চতুর্থাংশ মাত্র, অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ড ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত, মতিবিবিকে আশ্রয় করেই ইতিহাস এই উপন্যাসে কিছুটা স্থান পেয়েছে — সেই চরিত্রটিও উপকাহিনীর অন্তর্গত। সুতরাং ইতিহাসের প্রেক্ষিত এই উপন্যাসে থাকলেও একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা কখনই সংগত নয়।

একক ৩৮ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'স্ত্রীর পত্র'

গঠন

৩৮.১ উদ্দেশ্য
৩৮.২ প্রস্তাবনা
৩৮.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও ছোটগল্প
৩৮.৪ মূলপাঠ ঃ স্ত্রীর পত্র
৩৮.৫ সারাংশ
৩৮.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ
৩৮.৭ অনুশীলনী
৩৮.৮ উত্তর সংকেত
৩৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৮.১ উদ্দেশ্য

প্রথম একক পাঠ করে আপনি গল্প ও ছোটগল্পের উদ্ভব-বিকাশ সম্পর্কে জেনেছেন। সেই সঙ্গে জেনেছেন ছোটগল্পের সাধারণ লক্ষণগুলি। বর্তমান এককটিতে আপনি 'রবীন্দ্র' গল্প সাহিত্যের একটি স্মরণীয় রচনার সঙ্গে পরিচিত হবেন। এই গল্পটির মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভাবনীয় ব্যক্তিত্বের, জীবন-ভাবনার এক অনন্য পরিচয় পাবেন। সাম্প্রতিক নারীবাদী আন্দোলনের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক বাংলার সমাজে নারীর লাঞ্ছনার অবমাননার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র অবলম্বনে তিনি নারীর নারীত্ব, তাঁর মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্র ছোটগল্পের সংসারে এরকম আরও কয়েকটি গল্প আছে, যার নায়িকারা বুদ্ধি, যুক্তি, চিন্তা ও চৈতন্যে সমকালকে অতিক্রম করে কালাতীত মূল্যবোধকে তুলে ধরেছে।

এককের মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে আপনি যে জ্ঞান আহরণ করবেন, তার সাহায্যে আপনার—

- রবীন্দ্রনাথের একটি অসামান্য গল্পের সঙ্গে পরিচয় হবে।
- গল্পটির মাধ্যমে রবীন্দ্র-গল্প সাহিত্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করবেন।
- উপলব্ধি করতে পারবেন রবীন্দ্রনাথের যুগাতিশায়ী মনন ও মনীষার পরিচয়।
- চিঠির আকারে লেখা এই রচনাটির মাধ্যমে আপনার পরিচয় হবে গল্প-রচনার এক নতুন আঙ্গিকের সঙ্গে।

৩৮.২ প্রস্তাবনা

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মনন, বিষয় ভাবনা, উপস্থাপনা ও ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে নতুন বার্তা বয়ে এনেছিল। এ পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি পূর্ববর্তী 'হিতবাদী', 'সাধনা', ভারতী' যুগ থেকে অনেকাংশেই স্বতন্ত্র। এ সময়ের গল্পে জীবন ও সমাজের নানা সমস্যার সচেতন বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। নারীর সামাজিক ভূমিকা নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনা রবীন্দ্র মননকে আশ্রয় করেছে। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত অনেক গল্পে তাই দেখা যায় ব্যক্তি হিসেবে পুরুষ থেকে নারীর ব্যক্তিত্বই তাঁর গল্পে অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। পুরুষ চরিত্র এখানে অবহেলিত না হলেও, নারী এ পর্বে অনেকটা দীপ্তিময়ী উজ্জ্বল এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রসঙ্গতঃ 'হৈমন্তী', 'পয়লা নম্বর' স্মরণীয়। এসব গল্পে নারী যে শুধুই স্ত্রী নয়, তাঁরও একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা আছে — তা তুলে ধরা হয়েছে।

'স্ত্রীর পত্র' পত্রাকারে লেখা 'ছোটগল্প'। বাংলা সাহিত্যে এই বিশেষ ধরনের আঙ্গিকের ব্যবহার প্রথম দেখা যায় মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। ঐ কাব্যটি ওভিদের 'হেরোইদায়' কাব্য অনুসরণে রচিত। বীরাঙ্গনা-য় নায়িকারা দীপ্তিময়ী, তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ জানিয়েছেন। 'সবুজ পত্রে' 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রকাশ ১৯১৪। অর্থাৎ ১৩২১ বঙ্গব্দের শ্রাবণ সংখ্যায়। মূলগল্প পাঠের সময় বর্তমান আলোচনা গল্পের প্রতিপাদ্য বুঝতে সহায়ক হবে।

৩৮.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর কাব্য রচনার আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা যায় ১৮৭৫ — চতুর্দশ বর্ষীয় বালক হিন্দুমেলায় স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। ১৮৭৭-এও আর একটি কবিতা পড়েছিলেন। এরপর নগরবাসী রবীন্দ্রনাথ মনের সহজ অনুভবের একান্ততা থেকে জোরাসাঁকোর সীমাবদ্ধ জীবন থেকে যখনই বেরিয়েছেন, অনুভব করেছেন, পল্লীপ্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে একাত্মতা — ক্রমে দেশের সুবৃহৎ জনজীবনের বেদনাও তাঁর নিভৃত অন্তরে প্রবেশ লাভ করেছিল। কিন্তু তখনও কবির গ্রাম-বাংলার সঙ্গে গভীর নৈকট্য স্থাপিত হয়নি। অন্তরের এই প্রাণ-পৈতি থেকে গ্রাম-জীবন। সম্পর্কে আবাল্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এই সত্যকে স্বীকার করলেই রবীন্দ্র-গল্প সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন সূত্রকে অনুধাবন করা যাবে। তাঁর ছোটগল্পে বস্তুত বাঙালি-জীবন মুখীনতাই প্রকাশ পেয়েছে। 'ঘাটের কথা' (কার্ত্তিক, ১২৯১), রাজপথের কথা (১৩০০) ঠিক গল্প নয়। গল্পাভাস গল্পচিত্র বিশেষ। শেষোক্তটির কাহিনীর স্বপ্লতায় দার্শনিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলত ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি।

১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী' পত্রিকায় পরপর ছটি ছোটগল্প লেখেন। এখান থেকেই তাঁর যথার্থত ছোটগল্প লেখা শুরু। এ সময় কবি শিলাইদা, পতিসর, নাটোর নানা জাগয়াগ নদীপথে ঘুরছেন — জমিদারী দেখার কাজে। পদ্মা-বাস পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুললেন। বাংলার গ্রাম যেন বস্তুঘন জীবনভূমিতে নেমে এলো বাংলা কথা সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বাদ্‌শা, রাজা, জমিদার প্রভৃতি সামন্ত প্রভুরা আধা গ্রাম-শহর ছেড়ে অন্তর্হিত হলেন গ্রাম-বাংলা ও তার জনজীবন স্থান করে নিল। বাংলা গল্পের পট পরিবর্তন হোল।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পর্ব চিহ্নিত করা যায়। প্রথম পর্বের লেখাগুলি মূলত 'হিতবাদী' পত্রিকাকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে। পরের পর্বটি 'সাধনা' পত্রিকাকেন্দ্রিক। তৃতীয় পর্যায়টিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সবুজপত্র'-এর যুগ; এবং শেষপর্বটি তাঁর জীবনের সায়াহ্নকালে আত্মপ্রকাশ করে, সমালোচক মহলে যার নাম 'তিনসঙ্গী' পর্ব। এর বাইরে 'নবজীবন', 'ভারতী', 'বালক' প্রভৃতি পত্রিকাতেও কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম তিনটি পর্বেকে অবলম্বন করে 'গল্পগুচ্ছ' তিনখণ্ড প্রকাশিত হয় পরবর্তীকালে। চতুর্থ পর্বের লেখাগুলির সঙ্গে 'লিপিকা', 'গল্পসল্প' এবং 'সে' গ্রন্থের কাহিনীগুলিও একত্রে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১৮৭৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' প্রকাশিত হয়। শেষ লেখাগুলি ১৯৪০ সালের 'গল্পসল্প' বইতে প্রাপ্য। 'হিতবাদী' পর্বে তিনি মূলত গ্রামজীবনকে অবলম্বন করেই লেখেন। 'সাধনা' পর্বে, তাঁর লেখায় তার সঙ্গে নগরজীবন প্রতিভাত হতে থাকে। 'সবুজপত্র'-এর আমলে মনোবিশ্লেষণমূলক গল্প প্রচুরায়তভাবে রচিত হয়। এবং এই ধারাটিই পুনর্বিকশিত হয়ে শেষপর্বে।

সাধারণ মানুষের জীবন তাঁর গল্পে ব্যাপকভাবে স্থান অধিকার করেছে। জবিদারী প্রথা, পণপ্রথা, নারী-পুরুষের পারস্পরিক উপলব্ধির বহু বিচিত্রতা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক টাপাপোড়েন, মনের অন্তর্বিলীন গহেনে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠা নানা কূটেষণা আপাত-অলৌকিকতা ইত্যাদি তাঁর লেখা গল্পগুলিতে ব্যাপক স্থান অধিকার করেছে। তাঁর ছোটগল্পের শিল্পনির্মিতি এবং বিষয় গভীরতার জন্য, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের সঙ্গে তাঁকে নির্দ্বিধায় একাসনস্থিত করা যেতে পারে।

৩৮.৪ মূলপাঠ ঃ স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু,

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি — মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখাবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাছে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে-সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহমনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে; তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজো বউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, "মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?" চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধ নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স

বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাক্‌রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্‌কি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না — সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলাদেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না — তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু, সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়ে-মানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল — আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল — তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে-কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন, তাহলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে, সে-কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখান তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের

আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্‌না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ, উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে — তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বুড়ো হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য সমস্ত এনে দিত; তখন মেজবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর, অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্‌টো পিঠ; সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্‌টো — অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে, এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উটে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়; আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত, আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তারপর থেকে ফাটল শুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পর আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো — দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া সে কতবড়ো অপমান। দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল, তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তারপরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটারকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না — রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সলক দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয় — তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, "মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে-স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিয়ে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেঝেটার জন্যেই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে-কোণে একটা

অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্যে আঁস্তাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জোর নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম, তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে। তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জোর হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না — মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে-কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি — এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, ‘‘দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।’’ যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম, সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তরদিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে — সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক একবার তার উপর রাগ হত, সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি, এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎখুঁৎ-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল, এ-কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামার লোকের বাড়িতল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়ে চর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত — তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও-মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এইসকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলেন যে, আমার হাতখরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল, তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে অথর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, 'বাঁচলুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।"

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, "বিন্দু, তুই ভয় করিস নে — শুনেছি, তোর বর ভালো।"

বিন্দু বললে, "বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক, এ-কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে — কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে-কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, ‘‘দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।’’

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম, কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে, ‘‘দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।’’

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, ‘‘জানিস তো, বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।’’

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই — বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

অআমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা বলে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই — সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয়, তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন — আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, ‘‘দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?’’

আমি বললুম, ‘‘না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করবে না।’’

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল, তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

‘সত্যি বলছিস, বিন্দি?’’

‘‘এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না — কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।’’

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুস দয়া করে না। বলে, ‘ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।’

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালার ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে-রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, “এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্‌, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।”

তোমার বললে, “বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।”

আমি বললুম, “ও কখনো মিথ্যা বলে নি।”

তোমরা বললে, “কেমন করে জানলে।”

আমি বললুম, “আমি নিশ্চয় জানি।

তোমরা ভয় দেখালে, “বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।”

আমি বললুম, “ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ-কথা কি আদালত শুনবে না।”

তোমরা বললে, “তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।”

আমি বললুম, “আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।”

তোমরা বললে, “উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।”

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে — কিন্তু কসাইয়ের হাত থেকে যে গোরুপ্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, “তা দিক্‌ থানায় খবর!”

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলেছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, "ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।"

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি, সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছে, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেলে কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না, কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই তো যত রকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার যে এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, "বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।"

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, "আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ"।

আমি বললুম, "সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম — কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্তি।"

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, "বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?"

আমি বললুম, "বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে, এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর 'পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে — কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম, বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, "বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে, তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, "আমিও যাব।"

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারের সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, "যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।"

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, "ভয় নেই, দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব — ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুখ দমে গেল। আমি বললুম, "কী শরৎ? সুবিধা হল না বুঝি?"

সে বললে, "না।"

আমি বললুম, "রাজি করতে পারলি নে?"

সে বললে, "আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।"

যাক্, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, "মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।"

তোমরা বললে, "এ সমস্ত নাটক করা।" তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীর পুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে। যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি — মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনের মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হবে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না। মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বই তো না! বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা

অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হয় তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে — আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্ — সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক না, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই আন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার — কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত — আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল — কোথায় রে রাজমিস্ত্রীর গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দুঃখ কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলেন। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই অভবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি — ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল — তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু — তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন —

মৃণাল

শ্রাবণ ১৩২১

৩৮.৫ সারাংশ

স্ত্রীর পত্র' গল্পের উপস্থাপনায় সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির বাড়ীর মেজ বৌ মৃণাল পিস্ শাশুড়ীর সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র গিয়ে তাঁর স্বামীকে চিঠি লিখছে।

বিয়ের পনেরো বছর পর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সে জগত এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ জানতে পেরেছে - এ সংবাদ স্বামীকে জানিয়েছে।

মৃণাল দুর্গম পাড়া গাঁয়ের মেয়ে। বৌ — মেজবৌ হয়ে এসেছে কলকাতার ইট কাঠের চার দেওয়ালের অন্দরমহলে। এ বাড়ীর বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার, অসতর্ক বিধাতা মেজেবৌকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি বুদ্ধি দিয়েছেন শুধু নয়, সেই সঙ্গে তাঁর ছিল কবিতা লেখার ক্ষমতা।

কোলকাতার বনেদি বাড়ীর আভিজাত্য — বাড়ীর সদরের বাগান, ঘরের সাজসজ্জা — আসবাবের অভাব নেই; কিন্তু অন্দরটি ছিল তার উল্‌টো — সেখানে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। আলো জ্বলে মিট্‌মিট্ করে। হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে। উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না, দেওয়াল, মেঝের কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। এখানে মেয়ে-মানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে নিয়ম।

এ বাড়ীর আতুড়ঘরে মেজবৌয়ের মেয়েটি জন্ম নিয়ে মারা গেল। মায়েরও ডাক এসেছিল। ছোট একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে সন্ধ্যা তারার মত ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল — মা হবার দুঃখটুকু পেলেও মা হবার মুক্তিটুকু পেলে না। মেজ বৌ থেকে মা হয়ে সংসারে থেকেও বিশ্বসংসারের হয়ে উঠতে পারলে না।

মেজবৌ সংসারের নিত্য কর্মে আবার জড়িয়ে পড়ে। বড় জায়ের বোন বিন্দু সংকটে পড়ে দিদির কাছে আশ্রয় নেয়। বাড়ীর লোকেরা ভাবলে এ আবার কোন আপদ। মেজবৌ সমস্ত মন, সমবেদনা নিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বড়বৌ বিন্দুকে সাংসারিক কাজে নিযুক্ত করে খাওয়া পড়ার যৎসামান্য ব্যবস্থা করলেন। বড়জা'র সংকট ও বিন্দুর দুরবস্থা দেখে মেজবৌর মন ব্যথিত হয়ে ওঠে — সে শুধু দুঃখ নয়, লজ্জাবোধ করে — বিন্দুকে নিজের ঘরে টেনে নেয়। বিন্দু ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গেল। স্নেহস্পর্শে বুঝল তার আশ্রয়কে। বিন্দুর ভয় ভাঙল। সে মেজবৌকে এমন গভীরভাবে ভালবাসলে যেন পাগল হয়ে উঠল। প্রকৃতিতে বসন্তের ছোঁয়া যখন লাগল, বিন্দুর অনাদৃত চিত্তও যে আগাগোড়া রঙিন হয়ে উঠল; মেজবৌও তখন হৃদয়ে অনুভব করলে, জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে — সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে। এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে

মেজবৌ তার নিজের স্বরূপকে দেখেছে — আবিষ্কার করেছে জীবনের মুক্ত রূপ।

বিন্দুকে নিয়ে প্রতিকূলতার সীমা ছিল না। কিন্তু সব বাধা অস্বীকার করে বিন্দুর আনুকূল্য করায়, তাঁর হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

অবশেষে, বিন্দুর বয়স বেড়ে যাওয়ার বিব্রত হয়ে তাকে বিদায় করবার উপায় তৈরী হোল। বিন্দুর বর ঠিক হোল। বিয়ের পর জানা গেল সে পাগল। বিন্দুর শাশুড়িও পাগল। বিন্দু পালিয়ে এসে, গোপনে এ বাড়ীতে আশ্রয় নিলে। পরে এ বাড়ীর সংকট এড়াতে সে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়। সেখানে, শেষে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

বিন্দুর এমনই পোড়া কপাল সে বেঁচে থেকেও রূপ-গুণের জন্য কোন যশ পায় নি। মরে গিয়েও লোকেদের চটিয়ে দিলে। মেজবৌ মৃণাল বলেছে, সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে খাওয়া পরায় অস্বচ্ছলতা ছিল না, কারও বিরুদ্ধে সেরকম কোন নালিশ না থাকলেও এটা বোঝা গেছে এ বাড়ীতে মেয়েদের কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। কিন্তু বিন্দু তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে সে কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, সে তার হতভাগ্য মানব জন্মের চেয়ে বড়ো। বিন্দুর এই মৃত্যুতে মৃণাল নতুনতর সত্যকে আবিষ্কার করেছে, অভ্যাসের অন্ধকার এতদিন তাকে ঢেকে রেখেছিল, বিন্দু তার মৃত্যু দিয়ে সেই আবরণ আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়েছে — মেজবৌ মরেছে, মৃণালের সামনে আজ নীল সমুদ্র, মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। তাঁর শেষ কথা — আমি বাঁচব, আমি বাঁচলুম। মীরাবাঈকে বাঁচবার জন্য মরতে হয়নি।

৩৮.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) লিখেছিলেন 'সবুজপত্র'-এর ১৩২১ সনের শ্রাবণ সংখ্যায়। এটি চলিতভাষায় লেখা তাঁর প্রথম গল্প। এদিক থেকে বিচার করলেও, এই গল্পের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। শুধু বিষয়বস্তুই নয়, প্রকাশ মাধ্যমের ব্যাপারেও এর অভিনবত্ব লক্ষণীয়। চলতি ভাষায় লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠির আয়তনে রচিত এই গল্পের মাধ্যমে নারীর আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার যে ঘোষণা সোচ্চার হয়েছে, তাকে আমাদের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একান্তভাবে উল্লেখনীয় বলেই মানতে হবে। যেদেশে নারীত্বের আদর্শ হিসেবে সর্বদাই শেখানো হয়েছে যে, স্ত্রী হবে স্বামীর "ছায়া ইব অনুগতা" সেখানে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির আর সকলের অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া এবং নিজের সেই উপলব্ধিকে বাঙ্‌ময় করে তোলার এমন নজির গত শতাব্দীর প্রথমদিকের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল নেহাৎই অকল্পনীয়। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের সূত্রে নারীর স্বপ্রতিষ্ঠ হবার, স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করার অনাগত কালকেই যেন পূর্বঘোষিত করতে চেয়েছেন।

অবশ্য সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রতিবাদিনী নারী এই গল্পের নায়িকা মৃণালই একা নয়। তার মতোই 'মানভঞ্জন'-এর গিরিবালা কিংবা 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা উপেক্ষা, অপমান ও অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে স্বামীকে ত্যাগ করেছে। এদের তিনজনের মধ্যে যে ভাবগত মিলটা আছে, তা হল এরা প্রত্যেকেই স্বামীগৃহের রক্ষণশীল, পুরোনোপন্থী আর্থ-সামাজিক মূলবোধকে বর্জনীয় বলে উপলব্ধি করেছে এবং তার চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে নিজের পায়ের তলার জমি নিজেই খুঁজে নেবার অভীপ্সায়।

এই ধরনের আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী আরও যেসব নারীকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং কথাসাহিত্যে আমরা দেখি (যেমন ঃ 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের চিত্রাঙ্গদা, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী; 'গোরা'-র

ললিতা; 'চতুরঙ্গ'-এর দামিনী, 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী; কাহিনী-কাব্য 'নিষ্কৃতি'-র মঞ্জুলিকা এবং 'অমৃত'-র অমিয়া) তাদের সঙ্গে মৃণাল এবং অনিলা-গিরিবালার পার্থক্য আছে। তারা আত্মস্বাতন্ত্র্যের দীপ্র ঘোষণায় মুখর ঠিকই কিন্তু এই তিনজনের মতন সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মেল-শ্যভিনিজ্‌মকে ধিক্কার দিয়ে বিদ্রোহ করেনি। মৃণালের বিদ্রোহ আবার এই তিনজনের মধ্যে তীব্রতর — কেননা, সে তার চিঠির মাধ্যমে শ্বশুরবাড়ির সমস্ত পরিবারটাকেই যেন ন্যায়-নীতির কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

মৃণাল যেভাবে তার স্বামীকে সম্বোধন করে চিঠি শেষ করেছে (''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল'') তার সঙ্গে তার প্রারম্ভিক সম্বোধনটির (''শ্রীচরণকমলেষু'') তুলনা করলেই বোঝা যায় যে, এই কাহিনীর মধ্যে কীভাবে তার জীবনাদর্শটি বাঙ্ময় ও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। তার যে-চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এই গল্পের মুখ্য উপজীব্য, সেটি তো এদেশের পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোদের প্রেক্ষিতে নারীর মর্যাদাবোধ ও ন্যায়সঙ্গত পারিবারিক-সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ আত্মসমীক্ষা। সমাজ বাস্তবতার এই গভীর উপলব্ধির স্তরটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে একটি প্রত্যক্ষ-বহিরঙ্গের কাহিনী, যা গড়ে উঠেছে বিন্দুর জীবনের করুণ ট্র্যাজেডির অনুষঙ্গে।

ধনীগৃহে আশ্রিতা আত্মীয়কন্যার প্রতি সমগ্র পরিবারের উপেক্ষা এবং হৃদয়হীনতার কাহিনী অবশ্য সেযুগের বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল ছিল না। কিন্তু বিন্দুর জীবনে বিবাহ নামক 'দুর্ঘটনাটি' সাংসারিক সীমানাকে অতিক্রম করে একটা সামাজিক ভ্রষ্টতার বিধানকেই স্পষ্টচিহ্নে সূচিত করে তুলেছে। আর তার উপলক্ষেই মৃণাল বিদ্রোহ করেছে নিজের শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। বস্তুত, তার ঐ বিদ্রোহ আসলে চিরাভ্যস্ত সামাজিক-বিধিবিধানের অপহ্নবী চরিত্রের বিরুদ্ধেই — এমন বললেও ভুল হবে না।

বিন্দুর বিয়ে এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলীর সূত্রে যে-অমানবিক হৃদয়হীনতার উদ্‌ঘাটন ঘটেছে এই গল্পে, তা আমাদের সমাজে খুবই পরিচিত, সুলভ; হয়ত আজও। বিন্দুর ট্র্যাজেডিকে হয়ত আমরা ব্যক্তিগত বেদনার কাহিনী হিসেবেই গণ্য করতাম, যদি-না মৃণালের জবানিতে সেটার অন্তর্বীক্ষণ করতে বাধ্য হতাম আমরা, এই গল্পের পাঠকরা, যদি না তার 'চোখে' আমরা সমস্ত ঘটনাগুলিকে প্রত্যক্ষ করতাম; যদি এই ব্যক্তিগত চিঠিকে ন্যায়নীতির এজলাসে দাঁড়ানো আসামীরূপে ভ্রান্ত সামাজিক-মূল্যবোধের উদ্দেশে তর্জনী তোলা একটি অভিযোগপত্র বলে না অনুভব করতাম আমরা।

।।২।।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে উদ্দিষ্ট স্বামীট নামহীন; সেটা আমাদের তৎকালীন দেশাচার হিসেবে খুবই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এর একটি প্রতীকী তাৎপর্যও আছে। মৃণালের এই 'নামহীন' স্বামীটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিরাচরিত সমাজব্যবস্থার নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা 'স্বামী-সাধারণের' প্রতিনিধি। তাই গল্পের শুরুতে মৃণালের সম্বোধনে সে, একা (তাই, ''শ্রীচরণকমলেষু''); কিন্তু কাহিনীর শেষে সে, গোটা পরিবারের (হয়ত সমগ্র সমাজবিধানের বাহকদেরই) প্রতিনিধি। আর সেই কারণেই সম্বোধনটা রূপান্তরিত হয়েছে বহুবচনে (''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন'')। এই বহুবাচনিক উক্তিটি তাই সমগ্র পুরুষ-শাসিত সমাজবিধিবাহকদের উদ্দেশেই যে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না আদৌ।

'শ্রীচরণকমলেষুর' আশ্রয় থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে নিয়ে মৃণাল নিজের স্বাধীন সত্তাকে উন্মুক্ত করতে

প্রয়াসী হয়েছে। পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনে শ্বশুরবাড়ির সদর দরজার ওপারে সে পা বাড়ায়নি; তাই স্বামীকে চিঠি লেখারও কোনও উপলক্ষ তার ঘটেনি (বা, জোটেনি)। কিন্তু সেই অতিপরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার মাঝেই যে-সুপ্রবল এক অপরিচয় লুকিয়েছিল, তাই প্রমাণিত হয়েছে মৃণালের এই চিঠিতে। শ্বশুরবাড়ির ঐ দম-আটকানো পরিবেশেও (যাকে রবীন্দ্রনাথেরই 'মুক্তি' কবিতার একটি পংক্তি উদ্ধৃতির সূত্রে বলতে পারি ''রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা'') তার স্বকীয় অস্তিত্বের বোধটাকে নির্মূল করে তুলতে পারেনি। ঘরকন্নার বাইরে মৃণালের সঙ্গোপন আত্মিক মুক্তি কবিতা লেখায়। সেখানে কোনও পারিবারিক বা সামাজিক অনুশাসনের প্রাকারই তার একান্ত-নিজের অস্তিত্ববোধটাকে বন্দী করে রাখতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু তার এই কবিতা লেখার কথাটা পনেরো বছরের মধ্যে কেউই — এমনকী তার স্বামীও জানতে পারেনি। মৃণালের সৃষ্টির আবেগের অংশ নিতে পারেনি সে। সেই অপরিচয়ের ব্যবধানটুকু দেড় দশক ধরে উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে দুজনের মধ্যে — সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যুও তাদের সেই বিচ্ছিন্নতাকে একই অনুভবের অংশীদার করতে পারেনি। মৃণাল যে শিশুটির মা হয়ে 'মাতৃত্বের যন্ত্রণাটুকু' পেয়েছিল, কিন্তু 'মাতৃত্বের মুক্তিটুকু' পায়নি — সেই 'মেয়েসন্তান'-টির মৃত্যুরও কারণ ছিল তাদের পারিবারিক-সংস্কারাচ্ছন্নতাই। আঁতুড়ঘরের অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক থেকে বার হয়ে শোবার ঘরের সুস্থ পরিবেশে সে ঢুকতে পায়নি। মৃণালের নিজেরও তখন মুমূর্ষু অবস্থা ঃ ''আগলা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে'', যম ঠিক মতো টান মারলে সেদিন 'শিকড়সুদ্ধ' সেও উপড়ে যেতো। এই 'আলগা ঘাসের চাপড়া' চিত্রকল্পটি তো আসলে মৃণালের নিজেরই প্রতীক ঃ তাই তার 'বিচারবুদ্ধি' (যম নয়!) যখন তাকে টান মেরেছে, সে-ও ঐ ভাবেই সংসারের জমিনের থেকে হয়ে গেছে শিকড়সমেত উন্মুলিত। বিন্দুর প্রতি ঐ ২৭নং মাখন বড়ালের গলির অন্য সমস্ত বাসিন্দাদের হৃদয়হীনতা সেই বিচারবুদ্ধির পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। বিন্দুর আত্মহননে তা চূড়ান্ত হয়ে গেল।

বিন্দু যখন ২৭নং বাড়িতে আশ্রয়ভিখারী হয়ে এসেছে, তখন সারা পরিবারের (মায়, তার আপন দিদিরও!) বিরক্তি, গঞ্জনার বিপরীতে একমাত্র মৃণালই তাকে স্নেহ এবং মমতা দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছে। অসুস্থ সেই কিশোরী মেয়েটিকে নিয়ে সেই আঁতুড়ঘরেরই (যেখানে তার সদ্যোজাত কন্যাটি মারা যায়) এককোণে আশ্রয় নেওয়াটা তার বুভুক্ষু মাতৃসত্তারই এক অলক্ষ্য আত্মপ্রকাশ। তার মরে যাওয়া ঐ মেয়েটিকেই সে যেন ঐ ঘুপচি আঁতুড়ঘরের অন্ধকারে ফিরে পেল বালিকা বিন্দুর মধ্যে। এবং ঠিক এই কারণেই বিন্দুর প্রতি অবিচারগুলো মৃণালের মনের গভীরে বিম্বিত হয়েছে তার নিজের মৃতা মেয়েটির প্রতি অবিচার হিসেবেই — যে জন্মের কদিন পরেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল তার 'আপনজন'দের (!) অবিমৃষ্যকারী সংস্কারাচ্ছন্নতার পরিণামে (ইংরেজ ডাক্তারের তিরস্কারের কথাটা এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য অবশ্যই)। তাই পরবর্তীকালে বিন্দুর মর্মান্তিক মৃত্যু (প্রকৃতপক্ষে যার জন্যে দায়ী মৃণালের শ্বশুড়বাড়ির লোকজনই) নতুন করে তার নিজের কন্যাবিয়োগের স্মৃতিকেই নতুন করে জাগিয়ে তুলল; এবং সেটাই মৃণালের এতবড় গুরুতর সিদ্ধান্ত নেবার পথটাকে খুলে দিল একবারে। গায়ে আগুণ ধরিয়ে বিন্দুর আত্মহননকে মৃণাল পারিবারিক-সামাজিক অনুশাসনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ হিসেবে গণ্য করেনি; তার কাছে সেটা প্রতীত হয়েছিল সমস্ত নির্যাতিতা নারীর হয়ে এক প্রজ্জ্বলন্ত প্রতিবাদের প্রবল প্রতীক হিসেবেই, সেই প্রতিবাদের অনল-আলোকে মৃণাল নিজের মনেরও সকলটুকুকে পুরোপুরি দেখতে পেয়েছিল, আর পরিণামে তার নিজের প্রতিবাদের মশালও সে যেন ঐ 'আগুনেই' জ্বালিয়ে নিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মৃণাল, স্বামীকে ছেড়ে আসার এই দলিলে মীরাবাইয়ের কথা উল্লেখ করেছে। মহারাণী মীরার সঙ্গে মেবার রাজপরিবারের দ্বন্দ্বটাও ছিল আদর্শগত, যদিও তা একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক। মৃণাল নিজে কবিতা লিখত; তাই সে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কথাটাও স্মরণ করতে পারত হয়ত। বা জাহ্নবী কর্তৃক শান্তনুকে পরিত্যাগ করে যাবার কথাটা তার মতো মেয়ের জানা থাকাই স্বাভাবিক। তবে মৃণালের এইভাবে স্বামীকে ছেড়ে যাবার অন্তরালে কোনও আধ্যাত্মিক, কিংবা পৌরাণিক প্ররোচনা নেই। চিরকাল এদেশে 'পতিদেবতারাই' স্ত্রীদেব পরিত্যাগ করে এসেছেন — এখানে ঘটল তার ঠিক বিপরীত ব্যাপারটাই। এক্ষেত্রে অবশ্য মৃণালই প্রথমা নয়; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' — এর ভ্রমর তার পূর্বসূরিকা। কিন্তু মৃণালই সর্বপ্রথম স্বামীকে উপলক্ষ করে সমগ্র সমাজবিধানটাকেই আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছে। ভ্রমরের মতো স্বামীর ব্যভিজারের জন্য নয়, গোটা পরিবারের এবং সমাজের অনাচারের শরিক হবার কারণেই মৃণাল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। খাওয়া-পরার অস্বচ্ছল দুঃখ তার ছিল না স্বামীর সংসারে, ছিল না স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার কোনও অপ্রতুলতা। তার স্বামীর নৈতিক চরিত্রও ছিল অকলঙ্ক। তবু মৃণাল স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তার নারীত্ব, তার মাতৃত্ব, তার মনুষ্যত্ব এবং আত্মস্বতন্ত্র সম্মানের বোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে তাকে প্রণোদিত করেছে এতবড় কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে। ২৭ নং মদন বড়ালের গলির পাঁচিলবন্দী পনেরো বছরের জীবন থেকে বেরিয়ে পড়ে সে ঠাঁই নিয়েছিল মহাসমুদ্রের উন্মুক্ত উপকূলে — পুরীধামে। এটিও একভাবে প্রতীকী ব্যঞ্জনাবহ বৈ কি! মীরাবাই, কি ভ্রমর, বা গিরিবালা, কিংবা জাহ্নবী, অথবা অনিলার স্বামী-সংসার ত্যাগের সঙ্গে এই জন্যে মৃণালের সব ছেড়ে চলে যাওয়াটা মেলে না। এমন কী, এই গল্পের সমসাময়িক 'বোষ্টমী' গল্পের নায়িকাও স্বামী ছেড়ে চাওয়ার সঙ্গে এর গরমিল! বোষ্টমী স্বামীকে ছেড়ে চলে যায় স্বামীর অনুমতি নিয়েই — বৃহত্তর এক হৃদয়াবেগের আকুতিতে আকূল হয়েই। মৃণালের বেলায় তো তা হয়নি!

॥ ৩ ॥

হেনরিক ইবসেনের 'এ ডল'স হাউজ'-এর নোরার সঙ্গেও মৃণালের তুলনা করার একটা রেওয়াজ আমাদের দেশের সমালোচক মহলে রয়েছে। নোরার প্রতিবাদ সোচ্চার হয়েছিল, সে তার স্বামীর খেলার পুতুল হয়ে থাকতে চায়নি বলে। সেও যে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি নারী, একজন মানুষ - একথা তার স্বামী উপলব্ধি না করে, তাকে আদরে-আহ্লাদে, পোশাকে-গয়নায়, উচ্ছ্বাসে-উৎসাহে নিজের একটি জীবন্ত খেলনা হিসেবে দেখতেই ব্যতিব্যস্ত ছিল! এর বিরুদ্ধেই নোরার প্রতিবাদ এবং শেষ দৃশ্যে সজোরে সদর দরজা বন্ধ করে স্বামীর ঘর থেকে চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ঘটনাটা তারই দ্যোতনাবাহী। নোরার ঐ আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা - নারীর মানবিক মুক্তির এক ধরনের অভিপ্রকাশ; আর মৃণালের এই বিদায়, আর একভাবে, আর এক পরিপ্রেক্ষিতে সেই নারীরই মুক্তি ঘোষণার প্রয়াস।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি যতই সামাজিক তাৎপর্যময় হোক না কেন, তার কয়েকটি দুর্বলতার কথাও কিন্তু উল্লেখ না করে আলোচনা শেষ করা যায় না। এই গল্প, 'একটি' নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দলিল হিসেবে যতখানি দামী, ততখানি শিল্পঋদ্ধ নয়। মৃণালের চরিত্রও যতটা দীপ্র এবং বলিষ্ঠ, ততটা সূক্ষ্ম জটিল অনুভবে উদ্বেল হয়নি। তার মগ্নচৈতন্যের গভীরে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে-পরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের যে টানাপোড়েন প্রত্যাশিত ছিল, তা কোনও প্রতিভাস এতে ব্যঞ্জিত হয় নি, কোনও সময়েই না। বিন্দুকে উপলক্ষ করে তার যে নিজস্ব আবেগ ক্রিয়াশীল ছিল — সেটাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে মিশে গেছে। নিজের রূপ এবং বুদ্ধি এবং কবিত্ব — এই সব নিয়ে একটা অনুচ্চারিত অহম্‌বোধও তার সঙ্গে জড়িয়ে

ছিল। বৃহত্তর সামাজিক জটিলতার দিকে তার চিঠির মাধ্যমে পাঠকের দৃস্টি পড়ে ঠিকই, কিন্তু মূলত সেটা ২৭নং মদন বড়ালের গলির বাসিন্দা একটি পরিবারের সেজ বউয়ের 'পার্সনাল টেস্টামেন্ট' হিসেবেই স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে।

এই একক প্রতিবাদ অনাগত সামাজিক বিপ্লবের পূর্বপ্রতিভা হিসেবে কতখানি গণ্য হয়েছে বা হতে পারে, সেই নিয়ে বিতর্ক অবশ্যই থাকবে। কিন্তু সবটুকু মিলিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন ভাবনার মুক্তি ঘটালেন যে আমাদের কথা কথাসাহিত্যে, সে কথা অনস্বীকার্য।

৩৮.৭ অনুশীলনী

ক) বিস্তৃত আলোচনামূলক ঃ

১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিকে নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের ঘোষণাপত্র বলা যায় কি-না বিশ্লেষণ কর।

২) 'স্ত্রীর পত্র' অবলম্বনে ১৯শ শতকের শেষভাগে / ২০শ শতকের গোড়ায় কলকাতার বনেদী গৃহস্থ পরিবারগুলির একটি লেখচিত্র রচনা কর।

৩) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের চিঠির শেষে মৃণালের যে উক্তি, ''আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।''— এর তাৎপর্য কী বিশ্লেষণ করে দেখাও।

খ) সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ঃ

১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে চিঠির শুরুতে মৃণাল স্বামীর উদ্দেশে লিখেছে, ''শ্রীচরণকমলেষু'' এবং সব শেষে লিখেছে, ''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন'' — এই পার্থক্যের কারণ কোথায় নিহিত?

২) 'আডল'স হাউজ'-এর নোরার সঙ্গে এবং মেবারের মহারাণী মীরাবাঈয়ের সঙ্গে মৃণালের পার্থক্য কোথায়?

৩) 'মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।'' — এটা কার উক্তি? এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি?

৪) ইংরেজ ডাক্তার কেন এসেছিলেন বিন্দুদের বাড়িতে? তিনি কী করেছিলেন? কেন?

৫) ''তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে।'' — একথা নিহিতার্থ কী?

৬) স্বামী-সংসার ছেড়ে মৃণাল শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কেন?

৭) ''ঘাসের চাপড়া'' কথাটি 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে কোন্ তাৎপর্য বহন করে?

গ) সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ঃ

১) বিন্দুর সঙ্গে মৃণালের পারিবারিক এবং মানসিক সম্পর্ক দুটি কী কী?

২) ‘‘ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা’’ মৃণালের গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকার করতে লাগলেন কেন?

৩) মৃণালের শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা কী?

৪) শরৎ কে? সে কী খবর এনেছিল?

৫) মৃণাল শরতের কাছে ‘‘লোক দিয়ে’’ কী পাঠিয়ে দিত?

৬) বিন্দু শ্বশুরবাড়ি থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল?

৭) বিন্দুর পাগল স্বামী তাকে কে বলে ভাবত?

৮) শরৎ কোন্ পরীক্ষায় ফেল করেছিল? কেন?

৯) মৃণালের বিয়ের আগে পাত্রী দেখতে ক-জন গিয়েছিল?

১০) মৃণাল বসন্তের আগমনী-সংকেত কীভাবে পেত?

৩৮.৮ উত্তর সংকেত

বিস্তৃত আলোচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১) প্রাথমিক আলোচনার প্রথম অংশটি লক্ষ্য করুন। এরপর মূলপত্রের উত্তর করুন।

২) গল্পে বর্ণিত মৃণালের বাড়ীর পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট পারিবারিক চিত্র সংক্ষেপে লিখুন।

৩) মৃণাল স্বামী গৃহের রক্ষণশীল, পুরনোপন্থী, আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা পীড়িত বোধ করেছে। তার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। উক্তিটির মধ্যে তা-ই ব্যঞ্জিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে যথাযথ উত্তর করতে সচেষ্ট হোন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনার চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম-দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর করুন।

২) প্রাথমিক আলোচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

৩) উক্তিটি বিন্দুর দিদির। মেজবৌ মৃণালের বড়জা-র। মৃণাল বিন্দুকে স্নেহাশ্রয় দেওয়ায় বড়বৌ বলে মনে খুশী হলেন এবং বাড়ীর অন্যান্যদের অনুযোগ থেকে বেঁচে গেলেন। তিনি তাঁর ছোট বোন বিন্দুকে ভালবাসলেও নিজে সেই স্নেহ দেখাতে পারতেন না। মেজ-বৌ সস্নেহে তাকে গ্রহণ করায় তাঁর মনটা হাল্কা হয়েছিল। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করার শক্তি তার ছিল না বলে, উদ্ধৃত মন্তব্য করেছিলেন। বাইরে তাই এমন একটি পরিমণ্ডল তৈরী করতে লাগলেন যে এজন্য তিনি দায়ী নন।

৪) বিন্দুর মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। বিন্দুর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হলে ইংরেজ ডাক্তার ডাকা হয়। তিনি অন্দর দেখে আশ্চর্য হলেও আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিলেন। কেননা সেখানে

আলো জ্বলে মিটমিট করে। হাওয়ায় চোরের মত ঢোকে, উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না। দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কারও যেন লজ্জা বা দুঃখবোধ ছিল না।

৫) মেজবৌ মৃণালের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে উত্তর দিন।

৬) বিন্দুর মৃত্যুর পর মেজবৌ মৃণালের মনে নতুন ভাবোদয় হয়। ২৭ নম্বর বাড়ীর মধ্যেকার চারিদিকে প্রাচীর তোলা নিরানন্দের অন্দর মহলের তুচ্ছ ইট কাঠের আড়ালে টিকে থাকার চেয়ে বাড়ীর চৌকাঠ পেরিয়ে মেজবৌ-এর খোলস ছিন্ন করে বিশ্বজগতের ছয় ঋতুর সুধাপাত্রে ভরা আনন্দলো যাত্রার উদ্দেশ্যে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

৭) মূলপাঠ পড়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

সুনির্দিষ্ট উল্লেখন মূলক প্রশ্ন ঃ

আলোচনা নিষ্প্রয়োজন / মূলপাঠ পড়লেই সঠিক উত্তরের সন্ধান পাবেন / উত্তর লিখুন।

৩৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — *গল্পগুচ্ছ* (৩য় খণ্ড)

২) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*

৩) প্রমথনাথ বিশী — *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*

৪) শিশির কুমার দাস — *বাংলা ছোটগল্প* (১৮৭৩ - ১৯২৩)

৫) ক্ষেত্র গুপ্ত — *রবীন্দ্রগল্প ঃ* অন্য রবীন্দ্রনাথ

৬) তপোব্রত ঘোষ — *রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ*

৭) ভূদেব চৌধুরী — *বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার।*

একক ৩৯ ❑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ পুঁইমাচা

গঠন

৩৯.১ উদ্দেশ্য
৩৯.২ প্রস্তাবনা
৩৯.৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা
৩৯.৪ মূলপাঠ ঃ পুঁইমাচা
৩৯.৫ সারাংশ
৩৯.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ
৩৯.৭ অনুশীলনী
৩৯.৮ উত্তরমালা
৩৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৯.১ উদ্দেশ্য

'পুঁইমাচা' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বেই প্রকাশিত হয় — ১৩৩১ বঙ্গাব্দে। এ সময়েই 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভা (১৩৩০)। কল্লোলের উত্তাল, উচ্চ কণ্ঠ যোদ্ধবেশ বাংলা সাহিত্যের জগতকে যখন হতচকিত করে দিয়েছে, সেই সময় বিভূতিভূষণ মনে হয়, অনেকটা সচেতনভাবেই নীরব প্রতিবাদী ভঙ্গীতে তাঁর নিজের কথা বলতে শুরু করেছেন। কল্লোলের লেখকরা যখন স্বাতন্ত্র্যবিলাসী হতে ব্যাকুল, উৎসুক, বিদ্রোহের নামে প্রতিক্রিয়া প্রকাশে কিছুটা উদ্ধত, বিভূতিভূষণ তখন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের বর্মে নিজেকে ঢেকে রেখে নীরবে পল্লীবাসী, সহায় সম্বলহীন মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের জীবনকথা বলে চলেছেন। পুঁইমাচার ক্ষেন্তি, সহায়হরি চাটুজ্জে, অন্নপূর্ণা চরিত্রকে বাংলার গ্রাম থেকে আলাদা করে দেখা যায় না।

এ এই গ্রামবাংলাকে আশ্রয় করেই বারবার এসেছে বাংলার প্রকৃতি — পল্লীগ্রামের নানা গাছপাল, পাখ-পাখালি, তাঁর নানা পালা-পার্বন। এমনকি লোকচার ও লোক সংস্কার। তিনি গ্রামজীবনের 'সাগা' (Saga) রচনা করেছেন। শহুরে মধ্যবিত্তের পেছনে ফেলে আসা সেই গ্রামের চরিত্রচিত্রশালায় 'নস্টালজিয়া' অনুভব করেছেন। ফলে তিনি বাঙালি পাঠকের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছেন।

পুঁইমাচা গল্পটি পাঠ করে আপনিও তাই ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করবেন —

১) গল্পের নায়িকা ক্ষেন্তির লাগান পুঁই গাছ-এর মাচা গল্পের শেষ পরিণতিকে নূতন মাত্রা এনে দিয়েছে।

২) গ্রাম বাংলা ও তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ ও পরিবার জীবনের লেখক একটি জীবন্ত ছবি এ গল্পে এঁকেছেন।

৩) গল্পের পরিবেশ বর্ণনায় প্রকৃতির এমন একটি শান্ত, সরল, সহজ-সুন্দর লাবণ্যময় রূপ তুলে ধরা হয়েছে, যা গল্পের রসকেন্দ্রটি ব্যঞ্জনায় লেখকের প্রকৃতি-ভাবনাকেই প্রকাশ করেছে।

৪) গল্পের শেষ পরিণতি থেকে প্রকৃতি-প্রেমিক লেখকের রোমান্টিক করিপ্রাণতার পরিচয় পাবেন।

৫) পুঁইমাচার রচনারীতি ও ভাষা বৈশিষ্ট্য তার নায়িকা ক্ষেন্তির মত নিরলঙ্কার। আর স্বভাবে সহজ ও সরল অথচ অনুভব-সংবেদনাময় ও গভীর। এ ভাষা বিষাদঘন মুহূর্ত রচনার পক্ষে যথেষ্ট বলবান — এ উপলব্ধিও ঘটবে।

৩৯.২ প্রস্তাবনা

'পুঁইমাচা' গল্পটি প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস রচনার সূত্রপাত বৈশাখ, ১৩৩২। এদিক থেকে 'পুঁইমাচা' ও 'পথের পাঁচালী' সমসাময়িক কালের রচনা। এই দুটি রচনাতেই গ্রাম বাংলার দুঃখ দুর্দশা, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পারিবারিক জীবনের কথা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। যে জীবনকাহিনী এতে তুলে ধরা হয়েছে, তা যেমন অনাড়ম্বর, শান্ত, তেমনি তার ভাষ্যও অনলঙ্কৃত ও জীবনানুগ — যেন সহজ জীবনের সহজতর ভাষ্য রচনা বিশেষ। গল্প ও উপন্যাসের জীবনচর্যা ও জীবন ভাবনার এই সাদৃশ্য — গ্রাম-প্রকৃতি-মানুষ, তাঁদের চলাফেরা, সংসার প্রতিপালন, সন্তান স্নেহ সবকিছুতেই যেন অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এদিকটার প্রতি লক্ষ্য করে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন পুঁইমাচা গল্পটিতে পথের পাঁচালীর বীজ আছে। অপর এক সৃষ্টিশীল লেখক-সমালোচকের বিশ্বাস কোন সৃস্টির পূর্বে লেখকের মনের গভীরে প্রত্যক্ষে বা অগোচরে একটি ছক তৈরী হতে থাকে, তারই প্রতিফলন সমকালীন গল্পে-উপন্যাসে অনেক সময় প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে ওঠে। পুঁইমাচা ও পথের পাঁচালীতে এমনটি ঘটে থাকবে। পল্লীর শান্ত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে দারিদ্র্যদীর্ণ পরিবার জীবন — ক্ষেন্তী, সহায়হরি চাটুজ্যে ও অন্নপূর্ণা যথাস্থানে দুর্গা, হরিহর ও সর্বজয়ার পূর্বগ। দুটি রচনার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য থাকলেও উপস্থাপনার স্বাতন্ত্র্যের কারণে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। পুঁইমাচায় পাওয়া যায় প্রকৃতির পটভূমিতে উপস্থাপিত মানুষের জীবনমৃত্যুর রহস্যঘন কতকগুলি খণ্ডচিত্র। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে যেন অনেকটা নিরাসক্ত ও নির্মম।

এই গল্পটি পাঠক মনোযোগ দিয়ে পড়লে লক্ষ্য করবেন আকস্মিক কোন ঘটনার চমকে এটি শেষ হয়নি। এটি চরিত্রপ্রধান গল্পও নয়। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটিকে লেখকের কবিপ্রাণতা ও প্রকৃতিপ্রেমের চরম উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। পৌষ-পার্বণের দিন পিঠে গড়ার শেষে জ্যোৎস্নার আলোয় উঠানের সেই জায়গায় দুই মেয়ে ও মায়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল যেখানে ''লোভী মেয়েটির ..... নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে .... বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে .... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।'' প্রতীক হিসেবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে লেখক এখানে তাঁর প্রকৃতি দর্শনকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গল্পের প্রাণকেন্দ্রে ক্ষেন্তি আর তাঁর পুঁই মাচার সঙ্গে প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে। এখানেই গল্পের 'স্নিগ্ধ' সৌন্দর্য। পুঁইমাচা গল্পটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে আপনি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন।

৩৯.৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম বুধবার, ২৯ শে ভাদ্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দে (ইং ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) মাতুলালয় — কাঁচড়াপাড়া-হালিশহরের নিকটবর্তী মুরারীপুর গ্রামে। মৃত্যু ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। তাঁর

বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি নিবাস বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা বনগ্রাম সংলগ্ন ব্যারাকপুর গ্রাম। মায়ের নাম মৃণালিনী দেবী। মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতা ও পৌরোহিত্য বৃত্তিতে সংসার প্রতিপালন করতেন। বিভূতিভূষণের শৈশব-কৈশোর অত্যন্ত দারিদ্র্য, অভাব-অনটনে অতিবাহিত হয়। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বনগ্রাম হাইস্কুল থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১৬-তে কলকাতার রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. এবং ১৯১৮-তে ডিস্টিংশন সহ বি. এ. পাশ করেন। এম.এ ও আইন পড়বার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু সংসারের চাপে পড়া অসমাপ্ত রেখে প্রথম জাঙ্গীপাড়া স্কুলে, পরে হরিনাভী স্কুলে (সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা) শিক্ষকতা করেন (১৯২০-১৯২২)। হরিনাভী ছেড়ে তিনি অল্প কিছুদিনের জন্য কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষিণী সভার প্রচারকের কাজ করেন। খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে গৃহ শিক্ষক, খেলাৎ ঘোষের আপ্ত-সহায়ক, তাঁর এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে ভাগলপুর সার্কেলের কাজে চলে যান। অতঃপর তিনি খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করলেও, জীবনের শেষ পর্বে নিজগ্রামে ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী গোপাল নগর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। অবসর জীবনের অধিকাংশ সময় ঘাটশিলায় তিনি থাকতেন।

শৈশব থেকেই তিনি পল্লীপ্রকৃতির রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ ছিলেন। হরিনাভিতে থাকাকালে গল্প লেখায় প্রবল আগ্রহ জন্মে। ১৯২২-এ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে ভাগলপুর বাসকালে তিনি 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসটি লেখেন। সেটি প্রথম বিচিত্রায় ধারাবাহিকভাবে বের হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ (১৩৩৬) ঘটে। পল্লীপ্রকৃতি, সেখানকার মানুষ ও সমাজজীবন তাঁর এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। তার অপর উপন্যাস আরণ্যক (১৩৪৫) ও ইছামতী (১৩৫৬) উল্লেখযোগ্য। 'আরণ্যক' বিহারের আরণ্যক প্রতিবেশে দরিদ্র আদিবাসী জনসমাজের সহজ সুন্দর অনাবিল জীবন প্রধান প্রতিপাদ্য। অতি পরিচিত পল্লীজীবন থেকে অনেক দূরের এই জগতটিকে তিনি শান্ত, নির্লিপ্তভাবে অন্যতম ভিন্নতর রূপকে তার এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন অলঙ্কার বর্জিত আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় ভাষায়।

বাইরের পৃথিবী যখন — বিশ শতকের তৃতীয় দশকে — ভরে উঠেছে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রেরণায় বিহুল নূতনতর সমাজ গড়বার চেতনায়। তরুণতর শিল্পীরা এসময় জীবনকে কখনও দেখছেন মার্ক্সীয় সাম্যবাদের দৃষ্টিতে; কখনও বা ফ্রয়েডীয় যৌন-সমস্যার প্রেক্ষিতে। তাঁদের জীবন দৃষ্টিতে কখনও প্রবল প্রখর বাস্তবতা, কখনও বা আশাহত আশাবাদীর স্বপ্নভঙ্গের বেদন। এ সময়ের সাহিত্য বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে কোন ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। ফলে, জীবন দৃষ্টিতে সমগ্রতা ধরা পরেনি। পক্ষান্তরে, বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাস যুগ ও সমাজ সম্পর্কে অনেকটা নির্লিপ্ত, উদাসীন, শান্ত, সহজ, কোমল ও মধুর। তাঁর গ্রাম, জনপদ, আকাশ, অরণ্য-পাহাড় স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এভাবেই তিনি প্রকৃতির অন্তর্লোকে প্রবেশ শুধু নয়, অবগাহন করে জীবন ও জগতের মহান সত্যকে অনুভব করতে চেয়েছেন। দেশ-কালের খণ্ডিত রূপের মধ্যে — অখণ্ডজীবন সত্য খোঁজেন নি। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যা কিছু শাশ্বত তাকে পেতে হলে খুজতে হবে সুন্দর পরিপূর্ণ আনন্দ ভরা সৌম্য জীবনে। সাধারণভাবে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' ও 'ইছামতী' এই উপন্যাস চতুষ্টয়কে নির্ভর করেই তাঁর পরিচিতি ব্যাপ্ত হলেও, ছোটগল্প রচনাতেও বিভূতিভূষণের দক্ষতা বড় কম নয়। গ্রামের মানুষ এবং প্রকৃতি, সেখানেও তাঁর লেখার মুখ্য উপাদান। দরিদ্র গ্রামবাংলার স্বল্পবিত্ত ভদ্রগৃহস্থই তাঁর লেখার মূল কুশীলব। আর বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি — তাঁর জন্মস্থান বিশেষত, তাঁকে এমনভাবেই আবৃত্ত করে রেখেছিল যে, সামাজিক এবং পারিবারিক কাহিনী গড়ে তোলবার সময়েও তার প্রকৃতিতন্ময় ভাবটা সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকত। আর সে জন্যই কিন্তু জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যময় ভাবনাটা তাঁর গল্প-

উপন্যাসের মানুষদের সচেতন রেখেছে, কিন্তু বেদনার বা ক্রোধের, হাহাকার অথবা বিস্ফোরণ কোনো সময়ে ঘটেনি তাদের মধ্যে। এই বিষয়ে প্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধভাবে হয়ত তার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কিছুটাও তুলনা করা যায়।

'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল', 'যাত্রাবদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নর দল', 'বেণীগির ফুলবাড়ি', 'নবাগত', 'তালনবমী', 'উপল খণ্ড', 'বিধু মাষ্টার', 'ক্ষণভঙ্গুর', 'অসাধারণ', 'মুখোশ ও মুখশ্রী', 'আচার্য কৃপালনী কলোনি', ' কুশল পাহাড়ী', 'অনুসন্ধান', 'ছায়াছবি', 'সুলোচনা', 'প্রেমের গল্প', 'অলৌকিক' এবং 'বাক্সবদল' — মোট এই কটি তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ। এছাড়া 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'বাছাই গল্প' — ইত্যাদি নামেও গল্প সংকলন আছে।

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে 'পুঁইমাচা' গল্পটি পড়তে হবে।

৩৯.৪ মূলপাঠ ঃ পুঁইমাচা

সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন — একটা বড় বাটি কি ঘটী যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তেলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন — কি হয়েছে, বসে রইলে যে? দাও না একটা ঘটী? আঃ, ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণ তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন — তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রী অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল — ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন — কেন .... কি আবার .... কি ....

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বাপেক্ষাও শান্ত সুরে বলিলেন — দেখ, রঙ্গ কোরো না বলিছ — ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জান না, কি খোঁজ রাখ না? অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধ'রে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক'রে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — কেন? কি গুজব?

— গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগ্‌দী দুলে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না। — সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ সুরেই পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলেন — একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্ব্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হলো না — ও নাকি উচ্ছুগগু করা

মেয়ে —গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ বলবে না — যাও ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগদী-বাড়ী উঠে ব'সে দিন কাটাও।

সহায়হতির তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন — এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর! — ওঃ!

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন — কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশি কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা, না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমার একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি? — আর সত্যিই তো, এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল। হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন — হলো যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?... পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন — না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন — কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন — এ সব কি রে! ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এ যে.....

চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে আর-দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে, হলদে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই-গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল, মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে। ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পাকা পুঁই-পাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো কৃষ্ণ ও অগোছালো — বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টো ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেপটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল — চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম দিতে চায় না, বলে — তোমার বাবার কাছে আর-দিনকার দরুণ দু'টো পয়সা বাকি আছে, আমি বললাম — দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে — আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায় কাকা দিয়ে বললে, নিয়ে যা — কেমন মোটা মোটা ....

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অতযন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন — নিয়ে যা! আহা, কি অমর্ত্তই তোমাকে তারা দিয়েছে। পাকা পুঁইডাঁটা, কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত ... নিয়ে যা, আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন — ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হলে না। যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে ....ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া ক'রে বেড়াতে। বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না? .... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন; আর একজন বেড়াচ্ছেন — কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ ..... ফেল্ বলছি ওসব ..... ফেল্।

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আগলা করিয়া দিল, পুঁই শাখের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন — যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো ..... ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো ....

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল। .... সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন — তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে ... তুমি আবার .... বরং .....

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাইল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন — না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না — মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের! একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে ক'রে! যা, যা .... তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয় ....

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাদের জিনিস হোক, পুঁই শাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না — নিঃশব্দে খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল- গত অরন্ধনের পূর্ব্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল — মা, অর্দ্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের ....

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী দোরের আশেপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন — বাকিগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাখের তরকারী রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু-এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন — কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীমায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন — সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে....স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না, স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে — অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেয়, তবে রক্ষে। তারা কি স্বভাব? রাম বল, ছ-সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয়! পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন — তা সমাজের সে-সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চ'লে যাচ্ছে। বেশি দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের ....

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন —এই শ্রাবণে তেরোয় ....

— আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলের তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে। আশীর্ব্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকি, এই তো? ....সমাজে ব'সে এ-সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল....পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে পাত্তর মেলে না? গরীব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে। জজ মেজেষ্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্‌ — রাজার হাল! দুই ভায়ের অভাব কি?....

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্য্যন্ত বাকি — শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হোক পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েক মাস পূর্ব্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকারবধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবী লেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল — বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল....

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন — যা শীগ্‌গির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি। কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল — তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল — ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁধ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সব কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন — মুখুয্যে বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল — খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে খুড়ীমাকে গিয়ে বল্‌, মা ছোঁবে না তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে বাড়ী ও-পাড়ায় — যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতা-পাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজঝোলা হলদে পাখী আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইলে বলিলঢ— খুড়ীমা, খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটা। — পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া আওয়াজ হইতেছিল। ... কে যেন কি খুঁড়িতেছে ... দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা খানিক দূর যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন — এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল — এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তির স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন — ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে — কর্ত্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং ....

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন — বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন — আমি। না...আমি কখন্? .... কক্ষনো না, এই তো আমি...। সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন — চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না। আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি...দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ...তখন আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ....তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা করতে ইচ্ছে হয় কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হির হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন, কিন্তু স্ত্রী চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশি কথাও যোগাইল না, বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।....

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া, বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলু দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন — ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা.....

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল — সে ইতস্তত করিতে করিতে মার নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন — এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস, না?

ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে

পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন — কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এসেনছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মায়ে মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল — হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন — পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাটের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছে মেটে আলু চুরি করতে। সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, যার মধ্যে দিন দুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে? যদি গোসাঁইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা ব'লে পরের জিনেসে হাত? এ মেয়ে আমি কি করব মা?

দু-তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল — মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙ্গা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্ত্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থিবন্ধ হইয়া ফাঁকি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন উর্দ্ধমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন — দূর পাগলী, এখন পুঁই ডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে ম'রে যাবে?

ক্ষেন্তি বলিল — কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন — দেখ, হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। .... একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুয্যে বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন — হ্যাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত?

— আচ্চা দিচ্ছি বাবা - কই শীত, তেমন তো....

— হ্যাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে — অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে?

— সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?...

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিত রূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জ্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিফু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন জামাটি তাহার

গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি রাখিতেন না। জামার বর্ত্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না — ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন —একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর নীচে একটা কলার পাত পাড়িয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্ত্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল — মা, ঐ একটু....

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজমেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া মার সামনে পাতিয়া বলিল — মা, আময় একটু ...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন — দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্য একটু রাখি। ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজমেয়ে পুঁটি বলিল — জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল — এ-বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও-বেলা তো পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি এইসব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল — হ্যাঁ মা, ক্ষীর নৈলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদী বলছিল, ক্ষীরের পূর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়েই করে, সে তো কেমন লাগে।

অন্নপূর্ণা বেগুণের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল — খেঁদীর ওই সব কথা। খেঁদীর মা তো ভারী পিঠে করে কিনা! ক্ষীরের পূর দিয়ে ঘিরে ভাজলেই কি আর পিঠে হলো? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ....আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়।

বেপরোয়া ভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল — মা, নারকেলের কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন — নে, কিন্তু এখানে ব'সে খাস নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থারা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন — ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি, গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল-দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণা এ প্রস্তাব যে মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল — মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে পুঁটি খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্টি খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো-উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন — ক্ষেন্তি, আর নিবি? ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তবাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল — বেশ খেতে হয়েছে মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়া নাও, ওতেই কিন্তু.....। সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তী, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন — ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজ কর্ম্মে বকো, মারে, গলা দাও, টু শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ী, সিলেট চুন ও ইটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে — এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘটনা কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাচ্ছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন — চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।.... তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময়ে ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল — মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো... বাবাকে পাঠিয়ে দিও .... দু'টো মাস তো....

ও-পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন — তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক — তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমি সুরে বলিল — না, যাবে না বৈ কি!... দেখো তো কেমন না যান্।....

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু হু করিত .... তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে — মা, বলব একটা কথা? ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি ....

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন —ও তুমি ধ'রে রাখ, ও রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন — নাঃ, সব তো আর ... তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। ... তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছ'টি টান দিয়া কাসিতে কাসিতে বলিলেন — বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপারে কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

— একেবারে চামার.....

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পূজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কম হবে না ভেবে দেখলাম কিনা? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে.... ছোট লোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খায়... আরও কত কি। পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?...

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে মিনিট কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন — তারপর?

আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে। শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনেশুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিনে মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে। পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন — বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে — আজই না হয় আমি....। প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

— তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হলো। এমন চামার — বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল — তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে....

— দেখতে পাওনি?

— নাঃ! এমনি চামার — গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ...যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল।.... চার কি ঠিক করলে? .... পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না।....

তারপর কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্ব্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাক্‌লি পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে — আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন' পুঁটি বলিল — আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

— ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এক্ষুনি ধরে উঠবে....

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন — স'রে এসে বোস মা, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল .... খোলা আগুণে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন... দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।.....

পুঁটি বলিল — মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কানাচে যাঁড়া ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন — একা যাস নে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে যাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।....

পুঁটি ও রাধী খিড়কী দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠেখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জ্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কী-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।....

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন — দিলি?

পুঁটি বলিল — হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চালা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম...

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ... রাতও তখন খুব বেশি।.... জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে ... দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল — দিদি বড় ভালোবাসত.....

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপন-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল.... সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে ... বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সম ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

৩৯.৫ সারাংশ

'পুঁইমাচা' অত্যন্ত সাদামাটাভাবে লেখা একটি গল্প — যা বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব স্টাইল বা শৈলী। এই কাহিনীর বিষয়বস্তু খুব ব্যাপক কিছু নয়। দরিদ্র গ্রাম্য গৃহস্থ পরিবারের খাদ্যলোভী এক কিশোরীর জীবনের কয়েকটি টুকরো টুকরো ছবি আর বিয়ের পরে তার অকাল বিয়োগের করুণ স্মৃতিচারণা — এই হল গল্পের বিষয়বস্তু। গরিব গৃহস্থ সহায়হরি চাটুয্যে এবং অন্নপূর্ণার তিন মেয়ের মধ্যে ক্ষেন্তিই বড়। সারাদিন এথা-ওথা ঘুরে বেড়ায়, খাবারদাবার কী পাওয়া যায় তারই খোঁজে। পনেরো বছর বয়স হলেও (সেকালীন বাঙালি গ্রাম্য সমাজের প্রথাকে বজায় না রেখে) এখনও তার বিয়ে হয়নি। সম্বন্ধ হয়ে, আশীর্বাদ হবার পর একটা বিয়ে ভেঙে গেছে পাত্রের চরিত্রদোষের খবর আসায়। এ নিয়ে গাঁয়ে ঘোঁট পাকায় কর্মহীন, ছিদ্রান্বেষী মাতব্বরেরা। পিতা এবং কন্যা এতে নির্বিকার থাকলেও মায়ের দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

গল্পের শুরু হয়েছে, সহায়হরি প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে গাছকাটা-খেজুর রস সংগ্রহের জন্য উৎসাহ সহকারে যাবার উদ্যোগ করার জন্য স্ত্রীর কাছে ভর্ৎসিত হবার পটভূমিকায়। ঠিক সেই সময়েই ক্ষেন্তির আবির্ভাব আরেক প্রতিবেশী বাগানের জঞ্জাল হিসেবে ফেলে দেওয়া একরাশ পাকা পুঁইডাটা এবং ধার করে চেয়ে আনা একমুঠো কুচো চিংড়ি নিয়ে, সঙ্গে ছোট চোনা পুঁটি। ক্রুদ্ধা মায়ের তিরস্কারে দুই কন্যা খিড়কির পুকুরের ধারে পুঁইডাটার বোঝা ফেলে দিয়ে এলে, সমস্যাটা তখনকার মতো মিটল।

অন্নপূর্ণা মেয়েকে যতই তিরস্কার করুন, হাজার হোক মাতৃহৃদয় — দুপুরবেলায় সবার অগোচরে 'পাঁদাড়ে-ফেলা' ঐ পুঁইশাকেরই খানিকটা আবার উদ্ধার করে এনে, রান্না করে যথা সময়ে স্বামী-কন্যার পাতে সেই চচ্চড়ি পরিবেশন করলে ক্ষেন্তির মুখে হাসি ফুটে ওঠে।... এইভাবেই দুঃখের ভাত সুখ করে খেয়ে দিন কাটে চাটুয্যে পরিবারের। কখনো বাবাতে-মেয়েতে লুকিয়ে অন্যের পোড়ো বাগানের জংলা জমির তলা থেকে বিশসেরী মেটে আলু তুলে এনে অন্নপূর্ণার কাছে ভর্ৎসিত হয়। কখনো বা, পৌষ-পার্বনের দিনে, দুঃখের সংসারে হাসি ফোটে পিঠে, পাটিসাপ্টা তৈরি হলে। এরই মধ্যে ভাঙা পাঁচিলের ধারে ফেলে দেওয়া সেই পুঁইশাকের ডাঁটা থেকে একটি শীর্ণ পুঁইচারা জন্মালে তিন মেয়ের আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

পরের বৈশাখে ক্ষেন্তির পাত্র জোটে। তার বর বছর চল্লিশ বয়সের দোজবরে হলেও পাত্র হিসেবে পাঁচজনের বিচারে ভাল বলেই গণ্য হয়, ''ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি'' করেছে সে। কিন্তু বরপণের আড়াইশো টাকা বকেয়া পড়ে থাকায় ক্ষেন্তির সমাদর মেলেনি শ্বশুরবাড়িতে, বাপের বাড়িতেও তার আসা হয়নি আর। সহায়হরি মেয়েকে দেখতে গিয়ে কুটুমবাড়িতে অসম্মানিতও হন তাঁর দারিদ্র্যের কারণে।

বছরখানেকের মধ্যেই বসন্তরোগে ক্ষেন্তির জীবনাবসান ঘটল। নির্মম শ্বশুরকুলের লোকেরা তার দূর সম্পর্কের এক পিসির বাড়িতে রোগাক্রান্ত অসহায় মেয়েটাকে ফেলে রেখে যায়, সহায়হরিকে কোনও খবর-টবর না দিয়েই। গায়ের সোনা গয়নাগুলোও খুলে রেখে দেয় ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

আবার ঘুরে আসে পৌষপার্বণের তিথি। বড় মেয়ের বিয়োগব্যথা বুকে জমিয়ে রেখেই অন্নপূর্ণা এবারও পিঠে গড়তে বসেন দুই মেয়েকে নিয়ে। তিনজনেরই মন হু-হু করে ক্ষেন্তির কথা ভেবে। তারপর উঠোনের এক কোণে নজর গিয়ে পড়ে, যেখানে ক্ষেন্তির হাতে পোঁতা সেই পুঁইচারাটি এতদিনে মাচা জুড়ে বেড়ে উঠেছে... ''বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশিরে'' পরিপুষ্ট হয়ে, মাচা থেকে ঝুলে পড়ে কচি সবুজ পুঁই ডগাগুলি দুলছে, ''সুপুষ্ট, নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর' হয়ে। সেটি শুধু ক্ষেন্তির স্মৃতির সংকেতবাহী নয়, যেন তারই প্রতিরূপা হয়ে উদ্‌ভাসিত হয়েছে।

৩৯.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

'পুঁইমাচা' গল্পের ক্ষেন্তির মধ্যে অনেক সমালোচকই 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দুর্গার প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছেন। এখালে বলা ভাল যে, 'পথের পাঁচালী' প্রথমে যখন লেখা হয়, তখন দুর্গার চরিত্র সেখানে ছিল না। আকস্মিকভাবে দুর্গার মতন একটি কিশোরী মেয়েকে প্রত্যক্ষ করে, বিভূতিভূষণ তাকেই দুর্গার প্রত্নপ্রতিমা (বা আর্কিটাইপ; কোনও সৃস্টির প্রথম কাঠামো) হিসেবে গ্রহণ করে চরিত্রটিকে গড়ে তোলেন। ঠিক একই রকমের অভাবী গৃহস্থ পরিবারের ছন্নছাড়া, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো ধরনের মেয়ে, খাদ্যে আসক্তি অপরিমিত; স্বভাবটি নম্র; মায়ের স্নেহ, শাসনকে মান্য করে এবং অল্প বয়সেই জীবনাবসান ঘটে ক্ষেন্তি এবং দুর্গা উভয়েরই। প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে দুর্গার মতোই ক্ষেন্তিও ওতঃপ্রোতভাবেই যেন জড়িয়ে থাকে। ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'পুঁইমাচা' প্রকাশিত হয়; এর কিছু দিন আগে থেকে 'পথের পাঁচালী' লেখা শুরু করেন বিভূতিভূষণ। পরবর্তী সময়ে দুর্গর চরিত্রটি 'পথের পাঁচালী'তে সন্নিবিষ্ট করার আগে, 'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে তার একটা পূর্ব-প্রতিভাস ক্ষেন্তির চরিত্রে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, এমন সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে না।

গ্রামের মানুষ এবং তাঁদের নিত্যদিনের শোক সুখ, অভাব-আনন্দ, হীনতা - মহত্ত্ব — বিভূতিভূষণের লেখার এই হল অন্যতম প্রধান উপজীব্য। 'পুঁইমাচা'-ও এই সীমানারই অন্তর্বর্তী। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি নিবিড় — নৈকট্যও তাঁর উপন্যাস এবং গল্পের আরেকটি বিশিষ্ট উপকরণ। 'পুঁইমাচা'-য় সেটিও প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু 'পুঁইমাচা' গল্পের একটা অনন্যতা রয়েছে — যা ঐ প্রকৃতি তন্ময়তার মধ্যেও ভিন্নতর এক মাত্রাবিন্যাস করেছে। গল্পের শেষে যে বর্ণনা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ ঐ পুঁইমাচাটির — সেটি এখানে স্মরণযোগ্য ঃ ''সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে...বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।'' এরই পাশাপাশি গ্রাম্য সমাজের ছবিটাও নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে 'পুঁইমাচা' গল্পে। ক্ষেন্তির বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থান্বেষী এবং কুচক্রী 'গাঁওবুড়ো'-দের নির্খুতভাবেই তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ। অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্নতা, অশিক্ষা এবং কূপমণ্ডুকতা — এই তিনে মিলে প্রায় 'ত্র্যহস্পর্শ' যোগ ঘটেছে সেখানে। ক্ষেন্তির বিয়ের আশীর্বাদ হবার পরেও পাত্রের দুশ্চরিত্রতার খবর পেয়ে সহায়হরি যে, আর এগোলেন না ঐ সম্বন্ধের সূত্রে — এতে কিন্তু আবার তার ব্যক্তিত্বেরও একটা হদিশ মেলে, মূল্যবোধেরও। এর ফলে গ্রাম্য মোড়লদের বৈঠকে তাঁকে তিরস্কৃতও হতে হয়, যদিও তার পিছনে ছিল কালীময় মজুমদার প্রমুখের ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থহানি হবার কারণজাত আক্রোশই (ঐ লম্পট পাত্রটির বাবার কাছে তিনি ঋণ করে রেখেছিলেন, ক্ষেন্তির সঙ্গে সে-হেন অপাত্রের বিয়ের ব্যবস্থা করে, তিনি কিছুটা সুবিধে পেতেই সচেষ্ট ছিলেন, এই আর কি!) আবার এই গ্রাম্য সমাজেই দীনদরিদ্র গয়া বুড়ির মতো নারীকেও দেখা যায়, যিনি কোনও দিন দাম শোধ হবে না জেনেও ছেলেমানুষ ক্ষেন্তিকে এক মুঠো কুচো চিংড়ি দেন তার তরিবৎ করে পুঁইশাক খাওয়ার সাধ মেটাতে। পাড়াপড়শির মধ্যে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব বিবাদ যাইই থাক — একজনের সুখে-দুঃখে আরেকজন পাশে এসে দাঁড়ায়ও সর্বদা। এই সমাজকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন বলেই বিভূতিভূষণ এমনভাবে তার চিত্রায়ণ করতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু এই গল্পেই নয়, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মেই।

প্রধান চরিত্র তিনটির মধ্যে সহায়হরি এবং অন্নাপূর্ণার মানসিক প্রবণতার কিছুটা পরিচয় উপরের আলোচনা থেকে পাওয়া গেছে। সহায়হরি দরিদ্র, কিন্তু আত্মসম্মানহীন নন। লুকিয়ে পরের বাগান থেকে মেটে আলু চুরি করতে কিংবা স্বচ্ছল প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে খেজুর রস চেয়ে আনতে যেমন তিনি কুণ্ঠাহীন, ঠিক তেমনই আবার পিতৃস্নেহে এবং চরিত্রগত মূল্যবোধের জন্য তিনি শ্রদ্ধার্হ। ক্ষেন্তির প্রথম সম্বন্ধটি ভেঙে দেবার ক্ষেত্রে তাঁর এই দুটি প্রবণতাই একত্রে মিলে গিয়ে ঐ সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যেও মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিতে ক্ষমতা জুগিয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গত তিরস্কারের সামনে আমতা-আমতা করলেও, সমাজপতিদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার মতো মনোবল তাঁর ছিল। আবার দারিদ্র্যের কারণে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অপমানিত হলেও কোনও প্রতিবাদের ভাষা তাঁর মুখে জোগায় না। জামাইবাড়ির লোকেদের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতায় আদরিণী কন্যার মৃত্যু ঘটলে তিনি মর্মান্তিক বেদনা পান ঠিকই, কিন্তু তার অল্পদিন পরেই আবার বন্ধুর সঙ্গে মাছ ধরতে যাবার তোড়জোড়ও করতে দেখা যায় সহায়হরিকে। আসলে এই মানুষটি নানা ধরনের বৈপরীত্যের সমাহারে তৈরি। তাই এঁকে পছন্দ বা অপছন্দ কিছুই করা যায় না। আবার পার্শ্বচরিত্র হিসেবে গণ্য করে উপেক্ষা করাও তাঁকে অসম্ভব। নীতিবোধ কখনো দুর্বল; কখনো প্রবল; কোনো সময়ে ব্যক্তিত্বহীনতায় গ্রস্ত, কখনো বা ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বলপ্রভ; কখনো দুঃখে-আনন্দে সচকিত — কখনো নিরাসক্ত, নির্বেদনে স্বস্থ। ফলত, এইসব বহুমাত্রিক বৈপরীত্য তাঁর চরিত্রটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

অন্নপূর্ণা চরিত্রটি পক্ষান্তরে একমাত্রিক। শুধু ক্ষেন্তিই দুর্গার পূর্বপ্রতিমা (বা, আর্কিটাইপ) নয়, অন্নপূর্ণাকেও সর্বজয়ার প্রতিকল্প বলে স্বচ্ছন্দেই মনে করা যায়। দরিদ্রের সংসারে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে পাঁচটি প্রাণীর উদরান্নের জোগাড় করা যে কী দুঃসাধ্য দায়িত্ব তা হয়ত তিনিই জানেন। দারিদ্র্যের কারণে সঞ্জাত স্বামী-কন্যার ঐ খাদ্যলোলুপ স্বভাবের প্রতি তিনি বিরক্ত। অথচ মাতৃস্নেহের স্বাভাবিক অনুভবও তাঁর চরিত্রের মধ্যে সুনিবিড়। পরের বাগানের 'ফেলে দেওয়া জঞ্জাল' কুড়িয়ে আনার জন্য কিংবা মেটে আলু চুরি করার জন্য তিনি যেমন ক্রুদ্ধ হন, তেমনই আবার রাগ করে ফেলে দেওয়া পুঁই ডাঁটারই চচ্চড়ি রেঁধে লোভাতুর কন্যার পাতে তুলে দিয়ে তিনি তৃপ্তি পান। মেয়ের স্বভাবের মধ্যে ঐ খাদ্যলোলুপতাটুকু ছাড়া আর কোনো বিচ্যুতিই যে নেই, তা আর তাঁর চেয়ে বেশি কে বোঝে ''ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজে-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও টুঁ শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথাটি কখনো কেউ শোনেনি''। ঠিক এই কারণেই শঙ্কিতবক্ষে তিনি মেয়ে শ্বশুরঘর করতে পাঠাবার সময়ে ভেবেছেন ''ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?''

পরের বছরের পৌষ-পার্বনের দিনে সন্ধ্যার পরে ছোট দুই কন্যাকে নিয়ে পিঠে গড়তে বসে তাই তাঁর চিন্তার মধ্যে সর্বব্যাপ্ত হয়ে ওঠে মৃতা জ্যেষ্ঠা দুহিতার বেদনাময় স্মৃতি। তার নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটির মাচাভরা বিস্তৃতি দেখে যেন সেই তৃণগুল্মের সতেজ, সবুজ ভাবটুকুর মধ্যেই প্রয়াতা কন্যার কৈশোর-লাবণ্যকে অনুভব করেন অন্নপূর্ণা। সেই খাদ্যলোলুপ, শান্ত স্বভাবের, ভীরু, অগোছালো কন্যাটির বিয়োগের পরেও যেন তিনি তাকে, তার স্মৃতিমেদুর অলক্ষ্য অস্তিত্বকে খুঁজে পান সেখানে। বাস্তবে-কল্পনায় এভাবে মেশামিশি হবে তাঁর স্নেহকরুণ মাতৃহৃদয় উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

ক্ষেন্তির চরিত্রটি অবশ্যই অভিনব নয়। বারংবার দুর্গার কথা তার প্রসঙ্গে মনে পড়বেই। তার খাদ্যলোভ স্বভাবগত ঠিকই, কিন্তু মূল উৎসটা দারিদ্র্যই। ঠিক একই কথা 'পথের পাঁচালী'-র মধ্যে অনেকবারই বলেছেন বিভূতিভূষণ — এখানেও সেটি নানান্ ব্যঞ্জনায় তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাই ক্ষেন্তির এই দোষটি তাকে সামান্য মেটে আলুর মতো তুচ্ছ বস্তু চুরি করতেও প্ররোচনা দিয়েছে। (অবশ্য সেই অপকর্মে সে ছিল তার বাবার

সহকারিনী মাত্র!) ক্ষেন্তির শান্ত, অগোছালো, লাজুক এবং ভীরু স্বভাবটির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তার ট্র্যাজেডির রন্ধ্রপথ। বরপণ ইত্যাদি সব সামাজিক অনাচার, অপহ্নব সেই ট্র্যাজেডির উৎস হলেও, নিজের স্নিগ্ধ স্বভাবটির জন্যই সে প্রতিবাদ করতে শেখেনি এবং শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, অবিচারের শিকার হয়েছে তার ফলে। খাদ্যলোলুপতা ক্ষেন্তির জীবনের একমাত্র ত্রুটি, কিন্তু সেটাও বিভূতিভূষণের লেখার গুণে ক্ষমার যোগ্য হয়ে উঠেছে। ফলে, সরল এবং শান্ত এই গ্রাম্য কিশোরীটিও বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার মতোই পণপ্রথার শিকার হয়ে উঠেছে।

'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য সেভাবে কিছু অবশ্য নেই। দারিদ্র্য এবং সামাজিক ও পারিবারিক অবিচার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অজস্র গল্প রচিত হয়েছে। এই গল্পের উল্লেখযোগ্যতা অন্যত্র। প্রকৃতি ও মানুষে নিবিড় একটি সম্পর্ক বিভূতিভূষণের লেখায় বহু-বহুবারই দেখতে পেয়েছি আমরা। কিন্তু কাহিনীর পরিণামে সতেজ, লাবণ্যময় পুঁই মাচাটির বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে কিশোরী ক্ষেন্তির স্মৃতিময় রূপটি মিশে একাকার হয়ে গিয়ে যে বিচিত্র রসানুভূতির সঞ্জনন ঘটেছে, তা কিন্তু বাস্তবিকই তুলনাবিরল। এই অন্যস্বতন্ত্র অনুভবের কারণেই এই গল্প এত সাধারণভাবে শুরু এবং বিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও, পরিণামে এমন শিল্পঋদ্ধি অর্জন করেছে। 'পুঁইমাচা' নামটির অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যও সেখানেই নিহিত।

৩৯.৭ অনুশীলনী

□ বিস্তৃত আলোচনামূলক □

১) 'পুঁইমাচা' গল্পটি নামকরণ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখান।

২) ক্ষেন্তি এবং অন্নপূর্ণা, যথাক্রমে দুর্গা এবং সর্বজয়ার পূর্বপ্রতিমা কি-না আলোচনা করুন।

৩) ''মানুষ এবং প্রকৃতি বিভূতিভূষণের লেখায় খুব ঘনিষ্ঠ এক তন্ময়-সম্পর্কে নিবিড় হয়ে থাকে; কিন্তু 'পুঁইমাচা' গল্পে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যেমন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।'' — এই মন্তব্যের যাথার্থ্য আলোচনা করুন।

৪) বাংলার পল্লীসমাজের কুচক্রী পটভূমি একদিকে, অন্যদিকে সহজ সরল প্রতিবেশী বৎসল প্রেক্ষিত — এ-দুটিই এ-গল্পে কেমন করে সহাবস্থান করেছে আলোচনা করুন।

৫) ''ক্ষেন্তি এবং অন্নপূর্ণা বিভূতিভূষণের লেখায় টাইপ-চরিত্র হলেও, সহায়হরি কিন্তু তা নন।'' — একথা কতদূর মান্য আলোচনা করুন।

৬) এই কাহিনী ট্র্যাজেডি হলেও — এর মধ্যে একটি সমাহিতভাব অনুভূত হয় কী ভাবে, আলোচনা করুন।

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) ক্ষেন্তির প্রথমবারে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল কী কারণে?

২) ফেলে দেবার পরেও অন্নপূর্ণা পুঁইডাটা তুলে এনে চচ্চড়ি রেঁধেছিলেন কেন?

৩) মেটে আলু তুলে আনা নিয়ে সহায়হরি এবং অন্নপূর্ণার মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল?

৪) পৌষ-সংক্রান্তির সন্ধ্যায় চাটুয্যেবাড়িতে পাটিসাপটা তৈরি করা নিয়ে যে কথাবার্তা হয়, তার তাৎপর্য কী?

৫) অন্নপূর্ণ কেন চিন্তিত হয়েছিলেন ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে?

৬) পুঁইমাচাটি অন্নপূর্ণা এবং তাঁর ছোট দুই মেয়ের কাছে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল?

◻ সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ◻

১) সহায়হরি কার কাছে থেকে রস আনতে যেতে চাইছিলেন?

২) ক্ষেন্তিকে পুঁই ডাঁটা কে দিয়েছিলেন?

৩) চিংড়ি মাছ ক্ষেন্তি কার কাছ থেকে পেয়েছিল?

৪) কার ‘‘বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়’’?

৫) কোন্ গাঁয়ের কার ছেলের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিয়ের সম্বন্ধ হয়েও ভেঙে গিয়েছিল?

৬) মুখুজ্জে বাড়ির ছোট খুকীর নাম কী?

৭) মেটে আলু কোথায় পোঁতা ছিল?

৮) চৌকিদারের নাম কী?

৯) ক্ষেন্তির জামা কত টাকায় কেনা হয়েছিল?

১০) ক্ষেন্তির বর কিসের ব্যবসা করতেন?

১১) সহায়হরি ‘‘বিখ্যাত’ পূর্বপুরুষের নাম কী?

১২) ক্ষেন্তির বরপণ কত বাকি ছিল?

১৩) সহায়হরি কার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবার উদ্যোগ করছিলেন?

১৪) ক্ষেন্তির মৃত্যু কোথায় হয়েছিল?

১৫) ‘ষাঁড়া ষষ্ঠী’ কোথায় অধিষ্ঠান করেন?

১৬) পুঁটি ও রাধী কোথায় পিঠে ছুঁড়ে দিয়েছিল?

১৭) ষাঁড়া ষষ্ঠীর উদ্দেশে পিঠে ফেলার সময় কে পালিয়ে গিয়েছিল?

১৮) পৌসপার্বণের রাত্রে কোন্ পাখি ডাকছিল?

৩৯.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্পের শেষ অনুচ্ছেদ অনুসরণে উত্তর করুন।

২) প্রাসঙ্গিক আলোচনা ইত্যাদির (৬৩.৬) প্রথম অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

৩) প্রস্তাবনা এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার শেষাংশ বার বার পড়ে উত্তর তৈরী করুন।

৪) গল্পটি ভাল করে পড়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণের সাহায্যে উত্তর দিন।

৫) ট্রাজেডির সংজ্ঞা ও ভাব-রস বিশ্লেষণ করে আলোচ্য গল্পের রসপরিণতি প্রাসঙ্গিক আলোচনা অবলম্বনে বুঝিয়ে দিয়ে উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) ক্ষেন্তির বিয়ের প্রথম সম্বন্ধ হয়েছিল, শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলের সঙ্গে। ক্ষেন্তির বাবা টের পান পাত্রটি স্বগ্রামে কি একটা করবার ফলে জনৈক কুম্ভকার বধুর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহারে শয্যাগত ছিল। এরকর পাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত ছিলেন না বলে সহায়হরি সম্বন্ধ ভেঙে দেন।

২) ক্ষেন্তির আনা পুঁই-ডাটা ফেলে দেবার পর অন্নপূর্ণার রাঁধতে রাঁধতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি মনে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এও মনে পড়ে যে অরন্ধনের পূর্বদিন পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করে বলেছিল। ''মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অৰ্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের।'' তিনি নিজেই স্নেহের টানে উঠান ও খিড়কী থেকে ডাঁটা কুড়িয়ে এনে কুঁচো চিংড়ি দিয়ে চুপি চুপি তরকারী রেঁধেছিলেন।

৩) সহায়হরি পনেরো-ষোল সের ভারী মেটে আলু ঘাড়ে করে নিয়ে এসে, স্ত্রীকে দেখে কৈফিয়ত হিসেবে বলে, ময়শা চৌকিদার তাঁকে দিয়েছে। অন্নপূর্ণা বরোজপোতার বন থেকে চুরি করে আনার অভিযোগ করেন। সহায়হরি অস্বীকার করতে সচেষ্ট দেখে, তিনি অনুযোগ করে বলেন যে তার ইহকাল-পরকাল তো গেছেই, চুরি-ডাকাতি করতে ইচ্ছে হয় করুন। কিন্তু মেয়েকে সঙ্গে নেওয়া কেন।

৪) পৌষ-সংক্রান্তির দিন পাটি-সাপটা তৈরী করার যে বর্ণনা আছে, তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করুন।

৫) ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় অন্নপূর্ণা অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং অধিকমাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাবার সময় তার বুক উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিকমত বুঝবে।

৬) পৌষ সংক্রান্তির জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে অন্নপূর্ণা ও তাঁর দুই মেয়ের যখন পিঠে গড়া প্রায় শেষ -দুই বোনের খাওয়ার জন্য যখন কলার পাতা ছিড়ছে। পুঁটি অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ বলে ওঠে — ''দিদি বড় ভাল বাসত।'' এরপর তিনজনই কেমন যেন আচ্চৰন হয়ে পড়ে। লোভী মেয়েটির স্মৃতি তাদের আচ্ছন্ন করে নজর পড়ে ক্ষেন্তির হাতে সাধের পুঁই গাছটি — মাচাটি জুড়ে রয়েছে গাছটি — সে যেন পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়িয়ে রয়েছে। সে বেড়ে উঠেছে — বর্ষার জল আর কার্তিক মাসের শিশিরে। তার কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে ধরেনি। মাচার বাইরে দুলছে, সুপুষ্ট নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ ভাল করে পরে একটি বাক্য উত্তর করুন।

৩৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্য — *শ্রেষ্ঠ গল্প*

২) ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী — *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*

৩) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*

৪) ড. ভূদের চৌধুরী — *বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার*

৫) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *বাংলা গল্প বিচিত্রা*

৬) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*

একক ৪০ ❑ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারিণী মাঝি

গঠন

৪০.১ উদ্দেশ্য

৪০.২ প্রস্তাবনা

৪০.৩ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৪০.৪ মূলপাঠ ঃ তারিণী মাঝি

৪০.৫ সারাংশ

৪০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৪০.৭ অনুশীলনী

৪০.৮ উত্তরমালা

৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪০.১ উদ্দেশ্য

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকালীন কথা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি গল্প ও উপনযাস দুটি ধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'কল্লোল' পত্রিকায় ছোট গল্প লিখেই তাঁর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে তিনি বাংলা উপন্যাসে গ্রাম বাংলাকে নিয়ে রচিত এপিকধর্মী উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। তথাপি রাঢ়ের গ্রামীণ প্রতিবেশে রচিত তাঁর ছোটগল্পগুলি শিল্প সৌন্দর্যের বিচারে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি রূপে গণ্য।

'তারিণী মাঝি' এমনই একটি গল্প। প্রসঙ্গে ও প্রকরণে তারাশংকরের এই গল্পটিকে অনেকটা আদিম মহাকাব্যধর্মী বলা যায়। এখানে তারিণী চরিত্রে যে আদিম জৈব-প্রবৃত্তির (elemental passion) পরিচয় পাওয়া যায়, তা মানুষের মৌলিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সহজাত উপাদান। এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। অমোঘ নিয়তির অনিবার্য পরিণামের মত একে এড়িয়ে যাবার শক্তিও নেই। প্রেম আর আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি প্রেমনির্ভরতাকেও পরাভূত করে। এ গলেপর এটিই ট্রাজেডি।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পটি পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন —

১) 'তারিণী মাজি' চরিত্র প্রধান গল্প।

২) গল্পটি বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদী তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত।

৩) ময়ুরাক্ষী নদী এই গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র তারিণী মাঝি ও তার স্ত্রী সুখীর সঙ্গে সমান গুরুব পেয়েছে। ময়ূরাক্ষীর জীবন্ত, দুর্দান্ত স্বভাবের বর্ণনা তাকে এখানে অনেকটা সজীব ও স্বতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৪) এই গল্পে দেখান হয়েছে প্রেম ও প্রাণশক্তির মূলগত ভেদ আছে।

৫) গল্পটির আপনি লক্ষ্য করবেন মানুষের প্রেম ও প্রাণশক্তির দ্বন্দ্বে, প্রাণের দাবীই প্রধান। মানুষের আদিম অসংস্কৃত জৈব প্রবৃত্তিই একান্তভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এই বাঁচার তাগিদে অপরকে পাশবিকভাবে হত্যা করলেও সে পরাঙ্মুখ হয় না।

৬) গল্পটিতে আপনি বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদী-তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের বিশেষ ভাষা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাবেন। লেখকের ভাষা গঠনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, গল্পের ভাষার নিরাসক্ত, নির্মম ও অমোঘ রূপের মধ্যে। ভাষা একান্তভাবেই চরিত্রানুসারী।

৪০.২ প্রস্তাবনা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সার্থক গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায়। 'তারিণী মাঝি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প — প্রকাশ ১৩৩৫-এর পূজা সংখ্যা 'আনন্দবাজার'-এ। রচনাটি তারাশংকরের জীবন ভাবনা ও শিল্প কর্মের উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি বস্তুতঃ জীবনের স্বভাবধর্মকে বুঝতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাঢ়ের পরিচিত প্রতিবেশে লালিত নিরক্ষর, অমার্জিত, আদিম জৈব কামনা-বাসনা ভরপুর মানব মানবীকে আশ্রয় করেছেন। তাই তাঁর কাহিনীবৃত্ত নিটোল, বাহুল্য বর্জিত, পরিমিত ও সংযত; চরিত্রগুলি রাঢ়ের শুষ্ক রাঙামাটির মত অনেক সময় আদি অসংস্কৃত, জৈবপ্রকৃতির অনুসারী —ভালমন্দের বিচার রহিত। গল্পকার তারাশংকরের এটি নিজস্ব ক্ষেত্র। বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে অভিনব ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে জৈবিক তাড়না ও মানবিক বোধ এই দুয়ের দ্বন্দ্বে যে বিশাল জল সমাজকে তারাশংকর প্রত্যক্ষ করেছিলেন — তারই জীবন্ত প্রতিমূর্তি 'তারিণী মাঝি'।

গল্পটি পাঠ করার পর প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাহায্যে আপনি গল্পের প্রকৃত মর্মবস্তু যথাযথ অনুধাবন করতে পারবেন।

৪০.৩ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩.৭.১৮৯৮ — ১৪.৯.১৯৭১) জন্মেছিলেন বীরভূমের লাভপুরে গ্রামের একটি মধ্যবর্গীয় ভূস্বামী পরিবারে। তাঁর পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, আয় ছিল সামান্যই। তিনি ছিলেন এই শ্রেণীর এক অন্তিম প্রতিনিধি।

গ্রামীণ পরিবেশে তারাশংকর তাঁর শৈশব-কৈশোরের পাঠ সাঙ্গ করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেওয়ায় ১৯২১-এর তিনি অন্তরীণ হন। াবার ১৯৩০-এ সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ায় কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে বেরিয়ে জীবিকার প্রয়োজনে কিছুদিন কয়লার ব্যবসা, পরে কানপুরে চাকরী নিয়ে যান। এ সব কাজে মন বসেনি। পরিশেষে সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে দেশসেবার ব্রত নেন। আমৃত্যু সাহিত্যই ছিল তাঁর অবলম্বন। দক্ষিণ পূর্ব বীরভূমের আঞ্চলিক প্রতিবেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠা জীবন ছিল তাঁর সিদ্ধকাম সৃষ্টির প্রেরণা। তাই গ্রাম বাংলার বিশেষত রাঢ়ভূমির মানুষ এবং প্রকৃতি তাঁর লেখায় ব্যাপকভাবে স্থান অধিকার করে রেখেছে। সমাজ

ও পরিবার —এই দুটি প্রেক্ষিতেই তাঁর কাহিনীগুচ্ছের উপকরণ; কিন্তু মানুষের মনের অন্তর্গূঢ় আলোছায়াময় অসংখ্য স্তরকেও তিনি অন্বেষণ করে কাহিনীর ভাবরূপকে গড়ে তুলেছেন। নিজের সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেও সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি পৌঁছনোর সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার — দুই পরিচয়েই তিনি প্রথিতযশা। তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর। উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'কবি', 'অভিযান', 'রাইকমল', 'রাধা', 'বিচারক', 'অরণ্যবহ্নি'—ইত্যাদির। আর তাঁর ছোটগল্পের মোট সংখ্যা ১৯০টি। এগুলির মধ্যে সুপরিচিত ও বহু-আলোচিত অনেক কটিই; যেমন ঃ 'রসকলি', 'মালা-চন্দন', 'জলসাঘর', 'বন্দিনী কমলা', 'রায়বাড়ি', 'নারী ও নাগিনী', 'বেদেনী', 'ডাইনী', 'অগ্রদানী', 'তারিণী মাঝি', 'না', 'জটায়ু', 'কালাপাহাড়', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার',—ইত্যাদি। মোট ৩৫টি গ্রন্থে এগুলি বিধৃত আছে। 'রসকলি', 'জলসাঘর', 'শিলাসন', 'পৌষলক্ষ্মী', 'হারানো সুর', 'দীপার প্রেম' ইত্যাদি এদের মধ্যে উল্লেখ্য।

তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে এক-অর্থে চলমান ইতিহাসের ছবি যেমন বিম্বিত হয়েছে, তেমনই আবার মানুষের মনের বহুবিচিত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণও তার মধ্যে রূপান্বিত হয়েছে। ফলত, জীবনের প্রেক্ষাপট এবং অন্তর্লোক— দুইই তাঁর লেখার মধ্যে বিপুল প্রতীতি নিয়ে উপস্থিত আছে। এই বিশাল ব্যপ্তির জন্যই তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে অত্যন্ত উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে।

তারাশঙ্কর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিও দেওয়া হয়। তিনি বিধানসভার সদস্য, লোকসভার মনোনীত সদস্যও ছিলেন।

৪০.৪ মূলপাঠ ঃ তারিণী মাঝি

তারিণী মাঝির অভ্যাস মাথা হেঁট করিয়া চলা। অস্বাভাবিক দীর্ঘ তারিণী ঘরের দরজায়, গাছের ডালে, সাধারণ চালাঘরে বহুবার মাথায় বহু ঘা খাইয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু নদীতে যখন সে খেয়া দেয়, তখন সে খাড়া সোজা। তালগাছের ডোঙার উপর দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ লগির খোঁচা মারিয়া যাত্রী-বোঝাই ডোঙাকে ওপার হইতে এপারে লইয়া আসিয়া সে থামে।

আষাঢ় মাস। অম্বুবাচী উপলক্ষে ফেরত যাত্রীর ভিড়ে ময়ূরাক্ষীর গণুটিয়ার ঘাটে যেন হাট বসিয়া গিয়াছিল। পথশ্রমকাতর যাত্রীদলের সকলেই আগে পার হইয়া যাইতে চায়।

তারিণী তামাক খাইতে খাইতে হাঁক মারিয়া উঠিল, আর লয় গো ঠাকরুণরা, আর লয়। গঙ্গাচান করে পুণ্যির বোঝায় ভারী হয়ে আইছ সব।

একজন বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, আর একটি নোক বাবা, এই ছেলেটি। ওদিক হইতে একজন ডাকিয়া উঠিল, ওলো ও সাবি, উঠে আয় লো, উঠে আয়। দোশমনের হাড়ের দাঁত মেলে আর হাসতে হবে না।

সাবি ওরফে সাবিত্রী তরুণী, সে তাহাদের পাশের গ্রামের কয়টি তরুণীর সহিত রহস্যালাপের কৌতুকে হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে বলিল, তোরা যা, আসছে খেপে আমরা সব একসঙ্গে যাব।

তারিণী বলিয়া উঠিল, না বাপু, তুমি এই খেপেই চাপ। তোমরা সব একসঙ্গে চাপলে ডোঙা ডুববেই। মুখরা সাবি বলিয়া উঠিল, ডোবে তো তোর ওই বুড়িদের খেপেই ডুববে মাঝি। কেউ দশ বার, কেউ বিশ বার গঙ্গাচান করেছে ওরা। আমাদের সবে এই একবার।

তারিণী জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে মা, একবারেই যে আপনারা গাঙের ঢেউ মাথায় করে আইছেন সব। যাত্রীর দল কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাঝি লগি হাতে ডোঙার মাথায় লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার সহকারী কালাচাঁদ পারের পয়সা সংগ্রহ করিতেছিল। সে হাঁকিয়া বলিল, পারের কড়ি ফাঁকি দাও নাই তো কেউ, দেখ, এখনও দেখ। — বলিয়া সে ডোঙাখানা ঠেলিয়া দিয়া ডোঙায় উঠিয়া পড়িল। লগির খোঁচা মারিয়া তারিণী বলিল, হরি হরি বল সব — হরিবোল। যাত্রীদল সমস্বরে হরিবোল দিয়া উঠিল — হরিবোল। দুই তীরের বনভূমিতে সে কলরোল প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল। নিম্নে খরস্রোতা ময়ূরাক্ষী নিম্নস্বরে ক্রুর হাস্য করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তারিণী এবার হাসিয়া বলিল, আমার নাম করলেও পার, আমিই তো পার করছি।

এক বৃদ্ধা বলিল, তা তো বটেই বাবা। তারিণী নইলে কে তরাবে বল?

একটা ঝাঁকি দিয়া লগিটা টানিয়া তুলিয়া তারিণী বিরক্তভরে বলিয়া উঠিল, এই শালা কেলে — এঁটে ধর্ দাঁড়, হ্যাঁ — সেঙাত, আমার ভাত খায় না গো! টান দেখছিস্ না?

সত্য কথা, ময়ূরাক্ষীর এই খরস্রোতই বিশেষত্ব। বারো মাসের মধ্যে সাত-আট মাস ময়ূরাক্ষী মরুভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধু-ধু করে। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্কারী। দুই পার্শ্বে চার-পাঁচ মাইল গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতে পরিব্যপ্ত করিয়া বিপুল স্রোতে সে তখন ছুটিয়া চলে। আবার কখনও কখনও আসে 'হড়পা' বান, ছয়-সাত হাত উচ্চ জলস্রোত সম্মুখের বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষে ধুইয়া-মুছিয়া দিয়া সমস্ত দেশটাকে প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু সে সচরাচর হয় না। বিশ বৎসর পূর্বে একবার হইয়াছিল।

মাথার উপর রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। একজন পুরুষ যাত্রী ছাতা খুলিয়া বসিল।

তারিণী বলিল, পাল খাটিও না ঠাকুর, পাল খাটিও না। তুমিই উড়ে যাবা।

লোকটা ছাতা বন্ধ করিয়া দিল। সহসা নদীর উপরের দিকে একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল — আর্ত কলরব।

ডোঙার যাত্রী সব সচকিত হইয়া পড়িল। তারিণী ধীরভাবে লগি চালাইয়া বলিল, এই, সব হুঁশ করে! তোমাদের কিছু হয় নাই। ডোঙা ডুবেছে ওলকুড়োর ঘাটে। এই বুড়ি মা, কাঁপছ কেনে, ধর ধর ঠাকুর, বুড়িকে ধর। ভয় কি? এই দেখ আমরা আর-ঘাটে এসে গেইছি।

নদীও শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

তারিণী বলিল, কেলে!

কী?

নদীবক্ষের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তারিণী বলিল, লগি ধর্ দেখি।

কালাচাঁদ উঠিয়া পড়িল। তাহার হাতে লগি দিতে দিতে তারিণী বলিল, হুই — দেখ — হুই — হুই ডুবিল। বলিতে বলিতে সে খরস্রোতা নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ডোঙার উপর কয়েকটি বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল, ও বাবা তারিণী, আমাদের কি হবে বাবা।

কালাচাঁদ বলিয়া উঠিল, এই বুড়িয়া পেছু ডাকে দেখ দেখি। মরবি মরবি, তোরা মরবি।

পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতের মধ্যে শ্বেতবর্ণের কি একটা মধ্যে মধ্যে ডুবিতেছিল, আবার কিছুদূর গিয়া ভাসিয়া

উঠিতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই তারিণী ক্ষিপ্তগতিতে স্রোতের মুখে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিল। সে চলার মধ্যে যেন কত স্বচ্ছন্দ গতি। বস্তুটার নিকটেই সে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটা ডুবিল। সঙ্গে সঙ্গে তারিণীও ডুবিল। দেখিতে দেখিতে সে কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিল। এক হাতে তাহার ঘন কালো রঙের কি রহিয়াছে। তারপর সে ঈষৎ বাঁকিয়া স্রোতের মুখেই সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিল।

দুই তীরের জনতা, আশঙ্কাবিমিশ্র ঔৎসুক্যের সহিত একাগ্রদৃষ্টিতে তারিণীকে লক্ষ্য করিতেছিল। এক তীরের জনতা দেখিতে দেখিতে উচ্চরোলে চীৎকার করিয়া উঠিল, হরিবোল।

অন্য তীরের জনতা চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, উঠেছে? উঠেছে?

কালাচাঁদ তখন ডোঙা লইয়া ছুটিয়াছিল।

তারিণীর ভাগ্য ভাল। জলমগ্ন ব্যক্তিটি স্থানীয় বর্ধিষ্ণু ঘরেরই একটি বধূ। ওলকুড়ার ঘাটে ডোঙা ডুবে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনারতা বধূটি ডোঙার কিনারায় ভর দিয়া সরিয়া বসিতে গিয়া এই বিপদ ঘটাইয়া বসিয়াছিল। অবগুণ্ঠনের জন্যই হাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সে টলিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিল। মেয়েটি খানিকটা জল খাইয়াছিল কিন্তু তেমন বেশি কিছু নয় — অল্প শুশ্রূষাতেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

নিতান্ত কচি মেয়ে — তের চৌদ্দ বৎসরের বেশি বয়স নয়; দেখিতে বেশ সুশ্রী, দেহে অলঙ্কারও কয়খানা রহিয়াছে — কানে মাকড়ি, নাকে টানাদেওয়া নথ, হাতে রুলি; গলায় হার। সে তখনও হাঁপাইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটির স্বামী ও শ্বশুর আসিয়া পৌঁছিলেন।

তারিণী প্রণাম করিয়া বলিল, 'পেনাম ঘোষমশাই।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

তারিণী কহিল, আর সান কেড়ো না মা, দম লাও দম লাও। সেই যে বলে — লাজে মা কুঁকড়ি, বেপদের ধুকুড়ি।

ঘোষমহাশয় বলিলেন, কী চাই তো তারিণী, বল?

তারিণী মাথা চুলকাইয়া সারা হইল, কী তাহার চাই, সে ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে বলিল, এক হাঁড়ি মদের দাম — আট আনা।

জনতার মধ্য হইতে সেই সাবি মেয়েটি বলিয়া উঠিল, অ মরণ আমার! দামী কিছু চেয়ে নে রে বাপু।

তারিণী যেন এতক্ষণ খেয়াল হইল, সে হেঁটমাথাতেই সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, ফাঁদি লত একখানা ঘোষ-মশাই।

জনতার মধ্যে হইতে সাবিই আবার বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ বাবা তারিণী, বউমা বুঝি খুব নাক নেড়ে কথা কয়?

প্রফুল্লচিত্তে জনতার হাস্যধ্বনিতে খেয়াঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল।

বধূটি ঘোমটা খুলে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার গৌরবর্ণ কচি হাতখানি বাহির হইয়া আসিল — রাঙা করতলের উপরে সোনার নথখানি রৌদ্রাভায় ঝকঝক করিতেছে।

ঘোষমহাশয় বলিলেন, দশহরার সময় পার্বণী রইল তোর কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী? আর এই নে পাঁচ টাকা।

তারিণী কৃতজ্ঞতায় নত হইয়া প্রণাম করিল, আজ্ঞে হুজুর চাদরের বদলে যদি শাড়ি —

হাসিয়া ঘোষমহাশয় বলিলেন, তাই হবে রে, তাই হবে।

সাবি বলিল, তোর বউকে একবার দেখতাম তারিণী।

তারিণী বলিল, নেহাত কালো কুচ্ছিত মা।

তারিণী সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিল আকণ্ঠ মদ গিলিয়া। এখানে পা ফেলিতে পা পড়িতেচিল ওখানে। সে বিরক্ত হইয়া কালাচাঁদকে বলিল, রাস্তায় এত নেলা কে কাটলে রে কেলে? শুধুই নেলা — শুধুই — অ্যা —অ্যাই — একটো —

কালাচাঁদও নেশায় বিভোর, সে শুধু বলিল, হুঁ।

তারিণী বলিল, জলাম্পয় — সব জলাম্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চলে যাই। শালা খাল নাই, নেলা নাই, সমান স — ব সমান।

টলিতে টলিতেই সে শূন্যের বায়ুমণ্ডলে হাত ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া সাঁতারের অভিনয় করিয়া চলিয়াছিল।

গ্রামের প্রান্তেই বাড়ি। বাড়ির দরজায় একটা আলো জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সুখী — তারিণীর স্ত্রী।

তারিণী গান ধরিয়া দিল, লো — তুন হয়েছে দেশে ফাঁদি লতে আমদানি —

সুখী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, খুব হয়েছে, এখন এস। ভাত কটা জুড়িয়ে কড়কড়ে হিম হয়ে গেল।

হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কোমরের কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে তারিণী বলিল, আগে তোকে লত পরাতে হবে। লত কই — কই কোথা গেল শালার লত?

সুখী বলিল, কোন্ দিন ওই করতে গিয়ে আমার মাথা খাবে তুমি। এবার আমি গলায় দড়ি দোব কিন্তু।

তারিণী ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেনে, কি করলাম আমি।

সুখী দৃষ্টিতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, এই পাথার বান, আর তুমি —

তারিণীর অট্টহাসিতে বর্ষার রাত্রির সজল অন্ধকার ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হাসি থামাইয়া সে সুখীর দিকে চাহিয়া বলিল, মায়ের বুকে ভয় থাকে? বল তু বল্ বলে যা বলছি। পেটের ভাত ওই ময়ূরাক্ষীর দৌলতে। জবাব দে কথার — অ্যাই।

সুখী তাহার সহিত আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভাত বাড়িতে চলিয়া গেল।

তারিণী ডাকিল, সুখী, অ্যাই সুখী, অ্যাই!

সুখী কোন উত্তর দিল না। তারিণী টলিতে টলিতে উঠিয়া ঘরের দিকে চলিলৈ। পিছন হইতে ভাত বাড়িতে ব্যস্ত সুখীকে ধরিয়া বলিল, চল, এখুনি তোকে যেতে হবে।

সুখী বলিল, ছাড়, কাপড় ছাড়।

তারিণী বলিল, আলবত যেতে হবে। হাজার বার — তিনশো বার।

সুখী কাপড়টা টানিয়া বলিল, কাপড় ছাড়— যাব, চল। তারিনী খুশি হইয়া কাপড় ছাড়িয়া দিল। সুখী ভাতের থালাটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তারিণী বলিতেছিল, চল্ তোকে পিঠে নিয়ে ঝাপ দোব গনুটের ঘাটে, উঠব পাঁচথুপীর ঘাটে।

সুখী বলিল, তাই যাব, ভাত খেয়ে লাও দেকিন।

বাহির হইয়া আসিতে গিয়া দরজার চৌকাঠে কপালে আঘাত খাইয়া তারিণীর আস্ফালনটা একটু কমিয়া আসিল।

ভাত খাইতে খাইতে সে আবার আরম্ভ করিল, তুলি নাই সেবার এক জোড়া গোরু? পনের টাকা — পাঁচ টাকা কম এক কুড়ি, শালা মদন গোপ ঠকিয়ে নিলে? তোর হাতের শাঁখা-বাঁধা কী করে হল? বল্ কে— তোর কোন্ নানা দিলে?

সুখী ঘরের মধ্যে আমানি ছাঁকিতেছিল, ঠাণ্ডা জিনিস নেশার পক্ষে ভাল। তারিণী বলিল, শালা মদনা — লিলি ঠকিয়ে — লে। সুখীর শাঁখাবাঁধা তো হয়েছে, ব্যস্ আমাকে দিস আর না দিস! পড়ে শালা একদিন ময়ূরাক্ষীর বাণে — শালাকে গোটা কতক চোবল দিয়ে তবে তুলি।

সম্মুখে আমানির বাটি ধরিয়া দিয়া সুখী তারিণীর কাপড়ের খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল, বাহির হইল নথখানি আর তিনটি টাকা।

সুখী প্রশ্ন করিল, আর দু টাকা কই?

তারিণী বলিল, কেলে, ওই কেলে, দিয়ে দিলাম কেলেকে— যা লিয়ে যা।

সুখী এ কথায় বাদ-প্রতিবাদ করিল না, সে তাহার অভাস নয়। তারিণী আবার বকিতে শুরু করিল, সেবার সেই তোর যখন অসুখ হল, ডাক পার হয় না, পুলিস সাহেব ঘাটে বসে ভাপাইছে হুঁ হুঁ বাবা — সেই বকশিশে তোর কানের ফুল। যা তু যা, এখুনি ডাক্ লদীর পার থেকে, এই, উঠে আয় হারামজাদা লদী। উঠে আসবে, যা যা।

সুখী বলিল, দাঁড়াও আয়নাটা লিয়ে আসি, লতটা পরি; তারিণী খুশি হইয়া নীরব হইল। সুখী আয়না সম্মুখে রাখিয়া নথ পরিতে বসিল। সে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ভাত খাওয়া তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতেই আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখি দেখি।

সুখীর মুখে পুলকের আবেগ ফুটিয়া উঠিল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল।

তারিণী সাবি-ঠাকরুণকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সুখী তন্বী, সুখী, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।

তারিণী মত্ত অবস্থাতে বলিলেও মিথ্যা বলে নাই। ওই ময়ূরাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। দশহারার দিন ময়ূরাক্ষীর পূজাও সে করিয়া থাকে। এবার তেরো শো বিয়াল্লিশ সালে দশহারার দিন তারিণী নিয়মমত পূজা-অর্চ্চনা করিতেছিল। তাহার পরনে নূতন কাপড়, সুখীর পরনেও নূতন শাড়ি — ঘোষ মহাশয়ের দেওয়া পার্বণী। জলহীন ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছিল। তখনও পর্যন্ত বৃষ্টি নামে নাই। ভোগপুরের কেষ্ট দাস নদীর ঘাটে নামিয়া একবার দাঁড়াইল। সমস্ত দেখিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, ভাল করে পূজো কর্ তারিণী, জল-টল হোক, বান-টান আসুক, বান না এলে চাষ হবে কি করে?

ময়ূরাক্ষীর পলিতে দেশে সোনা ফলে।

তারিণী হাসিয়া বলিল, তাই বল বাপু। লোকে বলে কি জান দাস, বলে, শালা বানের লেগে পূজো দেয়। এই মায়ের কিপাতেই এ মুলুকের লক্ষ্মী। ধর্ ধর্ কেলে, ওরে, পাঁঠা পালাল ধর্।

বলির পাঁঠাটা নদীগর্ভে উত্তপ্ত বালুকার উপর আর থাকিতে চাহিতেছিল না।

পূজা অর্চনা সুশৃঙ্খলেই হইয়া গেল। তারিণী মদ খাইয়া নদীর ঘাটে বসিয়া কালাচাঁদকে বলিতেছিল, হড়হড় — কলকল — বান, লে কেনে তু দশদিন বাদ।

কালাচাঁদ বলিল, এবার মাইরি তু কিন্তুক ভাষা জিনিস ধরতে পাবি না। এবার কিন্তুক আমি ধরব, হ্যাঁ।

তারিণী মত্ত হাসি হাসিয়া বলিল, বড় ঘুরণ-চাকে তিলেটি বুটবুটি, বুক— বুক— বুক, বাস্ — কালাচাঁদ ফরসা।

কালাচাঁদ অপমানে আগুন হইয়া উঠিল, কি বললি শালা?

তারিণী খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুখী মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সব মিটাইয়া দিল। সে বলিল, ছোট বানের সময় — হুই পাকুরগাছ পর্যন্ত বানে দেওর ধরবে, আর পাকুরগাছ ছাড়লেই তুমি।

কালাচাঁদ সুখীর পায়ের ধুলো লইয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল, বউ লইলেই বলে কে?

পরদিন হইতে ডোঙা মেরামত আরম্ভ হইল, দুইজনে হাতুড়ি নেয়ান লইয়া সকাল হইতে সন্ধ্য পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ডোঙাখানাকে প্রায় নুতন করিয়া ফেলিল।

কিন্তু সে ডোঙায় আবার ফাল ধরিল রৌদ্রের টানে। সমস্ত আষাঢ়ের মধ্যে বান হইল না। বান দূরের কথা, নদীর বালি ঢাকিয়া জলও হইল না। বৃষ্টি অতি সামান্য — দুই চারি পশলা। সমস্ত দেশটার মধ্যে একটা মৃদু কাতর ক্রন্দন যেন সাড়া দিয়া উঠিল। প্রত্যাসন্ন বিপদের জন্য দেশ যেন মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল। কিংবা হয়তো বহুদূরের যে হাহাকার আসিতেছে, বায়ুস্তরবাহিত তাহারই অগ্রধ্বনি এ। তারিণীর দিন আর চলে না। সরকারী কর্মচারীদের বাইসিক্‌ল ঘাড়ে করিয়া নদী পার করিয়া দুই-চারিটা পয়সা মেলে, তাহাতেই সে মদ খায়। সরকারী কর্মচারীদের এ সময়ে আসা-যাওয়ার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে — তাঁহারা আসেন দেশে সত্যই অভাব আছে কি না, তাহারই তদন্তে। আরও কিছু মেলে — সে তাঁহাদের ফেলিয়া-দেওয়া সিগারেটের কুটি।

শ্রাবণের প্রথমেই প্রথম বন্যা আসিল। তারিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বন্যার প্রথম দিন বিপুল আনন্দে সে তালগাছের মত উঁচু পাহাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীর বুকে পড়িয়া বন্যার জল আরও উচ্ছল ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কিন্তু তিন দিনের দিন নদীতে আবার হাঁটু-জল হইয়া গেল। গাছে বাঁধা ডোঙাটা তরঙ্গাঘাতে মৃদু দোল খাইতেছিল। তাহারই উপর তারিণী ও কালাচাঁদ বসিয়া ছিল — যদি কেহ ভদ্র যাত্রী আসে তাহারই প্রতিক্ষায়, সে হাঁটিয়া পার হইবে না। এ অবস্থায় তাহারা দুইজন মিলিয়া ডোঙাটা ঠেলিয়া লইয়া যায়।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। তারিণী বলিল, ই কি হল বল্ দেখি কেলে?

চিন্তাকুলভাবে কালাচাঁদ বলিল, তাই তো।

তারিণী আবার বলিল, এমন তো কখনও দেখি নাই।

সেই পূর্বের মতই কালাচাঁদ উত্তর দিল, তাই তো।

আকাশের দিকে চাহিয়া তারিণী বলিল, আকাশ দেখ কেনে — ফরস লী-ল পচি দিকেও তো ডাকে না।

কালাচাঁদ এবার উত্তর দিল, তাই তো।

ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া তারিণী বলিল, তাই তো! 'তাই তো' বলতেই যেন আমি ওকে বলছি। তাই তো! তাই তো! তাই তো!

কালাচাঁদ একান্ত অপ্রতিভেত মত তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কালাচাঁদের সে দৃস্টি তারিণী সহ্য করিতে পারিল না, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। কিছুক্ষণ পর অকস্মাৎ যেন সচেতনের মত নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া সে বলিয়া উঠিল, বাতাস ঘুরেছে লয় কেলে, পচি বইছে, না? বলিতে বলিতে সে লাফ দিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া শুষ্ক বালি একমুঠো ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বায়ুপ্রবাহ অতি ক্ষীণ, পশ্চিমের কি না ঠিক বুঝা গেল না। তবুও সে বলিল, হুঁ পচি থেকে ঠেলা বইছে — একটুকুন। আয় কেলে, মদ খাব, আয়। দু আনা পয়সা আছে আজ। বার করে লিয়েছি আজ সুখীর খুঁট খুলে।

সস্নেহ নিমন্ত্রণে কালাচাঁদ খুশি হইয়া উঠিয়াছিল। সে তারিণীর সঙ্গ ধরিয়া বলিল, তোমার বউয়ের হাতে টাকা আছে দাদা। বাড়ি গেলে তোমার ভাত ঠিক পাবেই। মলাম আমরাই।

তারিণী বলল, সুখী বড় ভাল রে কেলে, বড় ভাল। উ না থাকলে আমার।

'হাড়ির ললাট ডোমের দুগগতি' হয় ভাই। সেবার সেই ভাইয়ের বিয়েতে—

বাধা দিয়ে কালাচাঁদ বলিল, দাঁড়াও দাদা, একটা তাল পড়ে রইছে, কুড়িয়ে লি।

সে ছুটিয়া পাশের মাঠে নামিয়া পড়িল।

একদল লোক গ্রামের ধারে গাছতলায় বসিয়াছিল, তারিণী প্রশ্ন করিল, কোথা যাবা যে তোমরা, বাড়ি কোথা?

একজন উত্তর দিল, বীরচন্দ্রপুর বাড়ি ভাই আমাদের, খাটতে যাব আমরা বদ্ধমান।

কালাচাঁদ প্রশ্ন করিল, বদ্ধমানে কি জল হইছে নাকি?

জল হয় নাই, ক্যানেল আছে কিনা

দেখিতে দেখিতে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। দুর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়া ছিল, মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। গৃহস্থ আপনার ভাণ্ডার বন্ধ করিল; জনমজুরের মধ্যে উপবাস শুরু হইল। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সকালে উঠিয়া তারিণী ঘাটে আসিয়া দেখিল কালাচাঁদ আসে নাই। প্রহর গড়াইয়া গেল, কালাচাঁদ তবুও আসিল না। তারিণী উঠিয়া কালাচাঁদের বাড়ি গিয়া ডাকিল, কেলে।

কেহ উত্তর দিল না। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরদ্বার শূন্য খাঁ খাঁ করিতেছে, কেহ কোথাও নাই। পাশের বাড়িতে গিয়া দেখিল, সে বাড়িও শূন্য। শুধু সে বাড়িই নয়, কালাচাঁদের পাড়াটাই জনশূন্য। পাশের চাষাপাড়ায় গিয়া শুনিল, কালাচাঁদের পাড়ার সকলেই কাল রাত্রে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

হারু মোড়ল বলিল, বললাম আমি তারিণী, যাস না সব, যাস না। তা শুনলে না, বলে, বড়নোকের গাঁয়ে ভিখ করব।

তারিণী বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল; সে ওই জনশূন্য পল্লীটার দিকে চাহিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হারু আবার বলিল, দেশে বড়নোক কি আছে? সব তলা-ফাঁক। তাদের আবার বড় বেপদ। পেটে না খেলেও মুখে কবুল দিতে পারে না। এই তো কি বলে — গাঁয়ের নাম, ওই যে — পলাশডাঙ্গা, পলাশডাঙ্গার ভদ্দরনোক একজন, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। শুধু অভাবে মরেছে।

তারিণী শিহরিয়া উঠিল।

পরদিন ঘাটে এক বীভৎস কাণ্ড! মাঠের পাশেই এক বৃদ্ধার মৃতদেহে পড়িয়া ছিল। কতকটা তার শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইয়াছে। তারিণী চিনিল, একটি মুচি পরিবারের বৃদ্ধ মাতা এ হতভাগিনী। গত অপরাহ্নে চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধার মৃত্যু-কামনা বারবার তাহারা করিতেছিল। বৃদ্ধার জন্যই ঘাটের পাশে গত রাত্রে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল। রাত্রে ঘুমন্তবৃদ্ধাকে ফেলিয়া তাহারা পালাইয়াছে।

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। বরাবর বাড়ি আসিয়া সুখীকে বলিল, লে সুখী, খান চারেক কাপড় আর গয়না কটা পেট-আঁচলে বেঁধে লে। আর ই গাঁয়ে থাকব না, শহর দিকে যাব। দিন খাটুনি তো মিলবে।

জিনিসপত্র বাঁধিবার সময় তারিণী দেখিল, হাতের শাঁখা ছাড়া কোন গহনাই সুখীর নাই। তারিণী চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, আর?

সুখী ম্লান হাসিয়া বলিল, এতদিন চলল কিসে বল?

তারিণী গ্রাম ছাড়িল।

দিন তিনেক পথ চলিবার পর সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের প্রান্তে তাহারা রাত্রির জন্য বিশ্রাম লইয়াছিল। গোটা দুই পাকা তাল লইয়া দুইজনে রাত্রির আহার সারিয়া লইতেছিল। তারিণী চট করিয়া উঠিয়া খোলা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল। থাকিতে থাকিতে বলিল, দেখি সুখ, গামছাখানা। গামছাখানা লইয়া হাতে ঝুলাইয়া সেটাকে সে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল। ভোরবেলায় সুখীর ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিল, তারিণী ঠায় জাগিয়া বসিয়া আছে। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ঘুমোও নাই তুমি?

হাসিয়া তারিণী বলিল, না ঘুম এল না।

সুখী তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিল, ব্যামো-স্যামো হলে কী করব বল দেখি আমি? ই মানুষের বাইরে বেরুনো কেনে বাপ, ছি-ছি-ছি!

বাসা ভেসে যাবে। ইদিকে বাতাস কেমন বইছে, দেখেছিস? ঝাড়া পশ্চিম থেকে।

আকাশের দিকে চাহিয়া সুখী বলিল, আকাশ তো ফটফটে— চকচক করছে।

তারিণী চাহিয়া ছিল অন্য দিকে, সে বলিল, মেঘ আসতে কতক্ষণ? ওই দেখ্, কাকে কুটো তুলছে — বাসার ভামা-ফুটো সারবে। আজ এইখানেই থাক্ সুখী, আর যাব না; দেখি মেঘের গতিক।

খেয়া-মাঝির পর্যবেক্ষণ ভুল হয় নাই। অপরাহ্নের দিকে আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, পশ্চিমের বাতাস ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিল।

তারিণী বলিল, ওঠ্ সুখী, ফিরব।

সুখী বলিল, এই অবেলায়?

তারিণী বলিল, ভয় কি তোর, আমি সঙ্গে রইছি। লে, মাখালি তু মাথায় দে। টিপটিপ জল ভারি খারাপ।

সুখী বলিল, আর তুমি, তোমার শরীর বুঝি পাথরের?

তারিণী হাসিয়া বলিল, ওরে, ই আমার জলের শরীর, রোদে টান ধরে জল পেলেই ফোলে। চল্‌, দে, পুঁটুলি আমাকে দে।

ধীরে ধীরে বাদল বাড়িতেছিল। উতলা বাতাসের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ রিমিঝিমি বৃষ্টি হইয়া যায়, তারপর থাকে। কিছুক্ষণ পর আবার বাতাস প্রবল হয় সঙ্গে সঙ্গে নামে বৃষ্টি।

যে পথ গিয়াছিল তাহারা তিন দিনে, ফিরিবার সময় সেই পথ অতিক্রম করিল দুই দিনে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়াই তারিণী বলিল, দাঁড়া লদীর ঘাট দেখে আসি। ফিরিয়া আসিয়া পুলকিত চিত্তে তারিণী বলিল, লদী কানায় কানায়, সুখী।

প্রভাবে উঠিয়াই তারিণী ঘাটে যাইবার জন্য সাজিল। আকাশ তখন দুরন্ত দুর্যোগে আচ্ছন্ন, ঝড়ের মত বাতাস সঙ্গে সঙ্গে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি।

দ্বিপ্রহের তারিণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কামার বাড়ি চললাম আমি।

সুখী ব্যস্তভাবে বলিল, খেয়ে যাও কিছু।

চিন্তিত মুখে ব্যস্ত তারিণী বলিল, না, ডোঙার একটা বড় গজাল খুলে গেইছে। সে না হ'লে — উহুঁ, অল্প বান হ'ল না হয় হ'ত, লদী একেবারে পাথার হয়ে উঠেছে, দেখলে আয়।

সুখীকে না দেখাইয়া ছাড়িল না। পালদের পুকুরের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সুখী দেখিল, ময়ূরাক্ষীর পরিপূর্ণ রূপ। বিস্তৃতি যেন পারাপারহীন। রাঙা জলের মাথায় রাশি রাশি পুঞ্জিত ফেনা ভাসা ফুলের মত দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, ডাক শুনছিল — সোঁ-সোঁ? বান আরও বাড়বে। তু বাড়ি যা, আমি চললাম। লইলে কাল আর ডাক পার করতে পারব না।

সুখী অসন্তুষ্ট চিত্তে বলিল, এই জল ঝড়—

তারিণী সে কতা কানেই তুলিল না। দুরন্ত দুর্যোগের মধ্যেই সে বাহির হইয়া গেল।

যখন সে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে সে আসিতেছিল। কি একটা 'ডুগডুগ' শব্দ শোনা যায় না? হাঁ ডুগডুগিই বটে। এ শব্দের অর্থ তো সে জানে আসন্ন বিপদ। নদীর ধারে গ্রামে গ্রামে এই সুরে ডুগডুগি যখন বাজে, তখনই বন্যার ভয় আসন্ন বুঝিতে হয়।

তারিণীর গ্রামের ও-পারে ময়ূরাক্ষী, এ-পাশে ছোট একটা কাঁতার অর্থাৎ ছোট্ট শাখা নদী। একটা বাঁশের পুল দিয়া গ্রামে প্রবেশের পথ। তারিণী সড়ক পথ ধরিয়া আসিয়াও বাঁশের পুল খুঁজিয়া পাইল না। তবে পথ ভুল হইল নাকি? অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ পর ঠাহর করিল, যে পুলের মুখ এখন অন্তত এক শত বিঘা জমির পরে। ঠিক বন্যার জলের ধারেই সে দাঁড়াইয়া ছিল, আঙুলের ডগায় ছিল জলের সীমা। দেখতে দেখতে গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবিয়া গেল। সে কান পাতিয়া রহিল, কিন্তু বাতাস ও জলের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না, আর একটা গর্জনের মত গোঁ-গোঁ শব্দ। দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ তাহার পোকায় ছাইয়া গেল। লাফ দিয়া মাটির পোকা পালাইয়া যাইতে চাহিতেছে।

তারিণী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

ক্ষিপ্রগতিতে মাঠের জল অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যেও বন্যা প্রবেশ করিয়াছে। এক কোমর জলে পথঘাট ঘরদ্বার সব ভরিয়া গিয়াছে। পথের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের নরনারী আর্ত চীৎকার করিয়া এ উহাকে ডাকিতেছে। গরু ছাগল ভেড়া কুকুর সে কি ভয়ার্ত চীৎকার। কিন্তু

সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ; লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চিৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহসেথর ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে।

গভীর অন্ধকারে পথও বেশ চেনা যায় না

জলের মধ্যে কি একটা বস্তুর উপর তারিণীর পা পড়িল, জীব বলিয়াই বোধ হয়। হেঁট হইয়া তারিণী সেটাকে তুলিয়া দেখিল, ছাগলের ছানা একটা, শেষ হইয়া গিয়াছে। সেটাকে ফেলিয়া দিয়া কোনরূপে সে বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাকিল, সুখী — সুখী!

ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল — অপরিমেয় আশ্বস্ত কণ্ঠস্বরে সুখী সাড়া দিলে, এই যে, ঘরে আমি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তারিণী দেখিল, ঘরের উঠানে এক কোমর জল। দাওয়ার উপর এক হাঁটু জলে চালের বাঁশ ধরিয়া সুখী দাঁড়াইয়া আছে।

তারিণী তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল, বেরিয়ে আয়, এখন কি ঘরে থাকে, ঘর চাপা প'ড়ে মরবি যে।

সুখী বলিল, তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। কোথা খুঁজে বেড়াবে বল দেখি?

পথে নামিয়া তারিণী দাঁড়াইল, বলিল, কি করি বল দেখি সুখী?

সুখী বলিল, এইখানেই দাঁড়াও। সবার যা দশা হবে, আমাদেরও তাই হবে।

তারিণী বলিল, বান যদি আরও বাড়ে সুখী? গোঁ-গোঁ ডাক শুনছিস না?

সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে গো? আর বান বাড়লে দেশের কি থাকবে? ছিষ্টি কি আর লষ্ট করবে ভগবান?

তারিণী এ আশ্বাস গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

একটা হুড়মুড় শব্দের সঙ্গে বন্যার জল ছটকাইয়া দুলিয়া উঠিল। তারিণী বলিল, আমাদেরই ঘর পড়ল সুখী। চল, আর লয়, জল কোমরের ওপর উঠিল, তোর তো এক ছাতি হয়েছে তা হ'লে।

অন্ধকারে কোথায় বা কাহার কণ্ঠস্বর বোঝা গেল না, কিন্তু নারীকণ্ঠের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল, ওগো খোকা প'ড়ে গেইছে বুক থেকে। খোকা রে!

তারিণী বলিল, এইখানেই থাকবি, সুখী, ডাকলে সাড়া দিস।

সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। শুধু তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল, কে? কোথা? কার ছেলে প'ড়ে গেল, সাড়া দাও ওই!

ওদিক হইতে সাড়া আসিল, এই যি।

তারিণী আবার হাঁকিল, ওই!

কিছুক্ষণ ধরিয়া কণ্ঠস্বরে সঙ্কেতের আদান-প্রদান চলিয়া সে শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পরই তারিণী ডাকিল, সুখী।

সুখী সাড়া দিল, অ্যাঁ?

শব্দ লক্ষ্য করিয়া তারিণী আসিয়া, বলিল, আমার কোমর ধর্‌ সুখী গতিক ভাল নয়।

সুখী আর প্রতিবাদ করিল না। তারিণীর কোমরের কাপড় ধরিয়া বলিল, কা'র ছেলে বটে? পেলে?

তারিণী বলিল, পেয়েছি, ভূপতে ভল্লার ছেলে।

সন্তর্পণে জল ভাঙিয়া তাহারা চলিয়াছিল। জল ক্রমশ যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, আমার পিঠে চাপ সুখী। কিন্তু এ কোন্ দিকে এলাম সুখী, ই — ই —

কথা শেষ হইবার পূর্বেই অথই জলে দুইজনে ডুবিয়া গেল। পরক্ষণেই কিন্তু তারিণী ভাসিয়া উঠিয়া বলিল, নদীতেই বা পড়লাম সুখী। পিঠ ছেড়ে আমার কোমরের কাপড় ধ'রে ভেসে থাক।

স্রোতের টানে তখন তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে। গাঢ় গভীর অন্ধকার, কানের পাশ দিয়া বাতাস চলিয়াছে — হু-হু শব্দে, তাঁহারই সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ময়ূরাক্ষীর বানের হুড়মুড় শব্দ। চোখে মুখে বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া বিঁধিতেছিল তীরের মত। কুটার মত তাহারা চলিয়াছে — কতক্ষণ, তাহার অনুমান হয় না, মনে হয়, কতদিন কত মাস তাহার হিসাব নাই — নিকাশ নাই। শরীরও ক্রমশ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতছিল। মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষীর তরঙ্গ শ্বাসরোধ করিয়া দেয়। কিন্তু সুখীর হাতের মুঠি কেমন হইয়া আসে যে! সে যে ক্রমশ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। তারিণী ডাকিল, সুখী — সুখী?

উন্মত্তার মত সুখী উত্তর দিল, অ্যাঁ?

ভয় কি তোর, আমি —

পর মুহূর্তে তারিণী অনুভব করিল, অতল, জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছে। ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারা। সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবিতে হইবে। সে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কি, সুখী যে নাগপাশের মত জড়ায়ি ধরিতেছে? সে ডাকিল, সুখী — সুখী!

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছে। সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস — বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ। হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াচিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ — বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।

৪০.৫ সারাংশ

'তারিণী মাঝি' গল্পের গল্পাংশ সামান্য। গল্পের নায়ক তারিণী অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহী। তার স্ত্রী সুখী। তারা নিঃসন্তান। তারিণী ময়ূরাক্ষী নদী সংলগ্ন গুনটিয়ার ঘাটে খেয়া পারাপার করে। তার এই কাজে একমাত্র সঙ্গী কালাচাঁদ। ডোঙায় লোকপারাপার করা শুধু তার জীবিকা নয়, এটি তার যেন নেশা। কিন্তু বর্ষার দিনের উত্তাল, ভয়াল ময়ূরাক্ষীর বুকে বেশী যাত্রী এক সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে অনেক। ময়ূরাক্ষী ভয়াল ভয়ঙ্কর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপরেই তারিণীর মাঝি-জীবনের ভাগ্য নির্ভর করে।

নদী হিসেবে ময়ূরাক্ষীর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। রাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য নদীর মত সে আট মাস থাকে মরুভূমির মত শুক্‌নো। কিন্তু বর্ষা এলেই সে হয় 'রাক্ষসীর মত ভয়ংকরী।' তখন যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে অসম্ভব প্লাবনে দুকূল অতিক্রম করে চতুস্পার্শ্বের গ্রাম, বাড়ী, ধনসম্পদ, লোকজন ভাসিয়ে দিতে পারে। জীবন হানি ঘটাতে পারে অসংখ্য মানুষের। গল্পের উপসংহারে দেখব এই ময়ূরাক্ষী আর তারিণী বুঝিবা একই জীবন বৈশিষ্ট্যে আত্মীয়। ময়ূরাক্ষী নদী জীবিকার সূত্রে তারিণীর জীবন ধারণে সাহায্য করে। তারিণীর আছে সুখীর মত স্ত্রী — নামেও স্বভাবে যে যথার্থই সুখজ। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় একটুকুও খাদ নেই। সমস্ত রকম ছোট-বড়, সুখ-দুঃখ বিপদের দিনে তারা পরস্পরের প্রেমে, আকর্ষণে একান্তভাবে আপন হয়ে থাকে। ময়ূরাক্ষীর বুকে কারও বিপদ ঘটলে, জলে ডুবে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটলে, তারিণী নির্দ্বিধায় তাঁকে বাঁচায়। কেউ খুশী হয়ে যা দেন, তাতেই সে খুশী। টাকা, পয়সা, অলংকার, খাদ্যবস্তু, কাপড়-চোপড় উপহার পেলে সে সব দিয়ে খুশী করে স্ত্রী সুখীকে। এভাবে সে নিজের সুখের জীবন ভরিয়ে রাখে।

কিন্তু ময়ূরাক্ষীর জীবন সব সময় সমান তালে চলে না। এক সময় দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে তারিণীর পেশা বন্ধ হয়ে যায়। তারিণীর কষ্টের শেষ থাকে না। খাদ্যের অভাবের সঙ্গে আশপাশের গ্রাম মড়ক লাগে। গ্রাম ছেড়ে সব পালাতে থাকে। শেষে তারিণী আর সুখীও গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ময়ূরাক্ষীর মাঝি, তারিণী। সে হাওয়ার গতিক বোঝে। বুঝতে পারে বর্ষা আসন্ন। সুখীকে নিয়ে যে ঘরে ফেরার স্বপ্ন দেখে। সত্যিই যখন আবার বর্ষার মেঘ এলো ও তা থেকে ঘনবর্ষণ হোল, তারা বাড়ী ফেরাই স্থির করল এবং পরিশেষে ফিরে আসে। ক্রমশ আকাশের অবিরাম বর্ষণ আর নদীর জল দুকূল ছাপিয়ে প্লাবিত করে। বাড়ী ঘরদোর গরু বাছুর মানুষ বন্যায় বিধ্বস্ত ও ডুবে যায়। তারিণী আর সুখীও তাদের ভাঙা ঘর-বাড়ি ছেড়ে নদীর বুকে প্রতিকূল অবস্থায় ভাসতে থাকে। শেষে উভয়েই অবধারিত জীবন-সংশয়ের কালে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। সুখী তাকে আঁকড়ে থাকে। তারিণী এই সংকটে, বাঁচবার একান্ত আকাঙ্ক্ষায়, নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাকে জড়িয়ে থাকা, তাঁর একান্ত ভালবাসার, একমাত্র আপনজন — স্ত্রী সুখীর বজ্রমুষ্ঠি থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাঁর গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে, নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। আলো আর মাটির আশ্রয়ে তারিণী বুক ভরে শ্বাস নেয়। গল্প এখানেই শেষ হয়েছে।

৪০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পের একটি কাহিনী আছে, কিন্তু তার গল্পাংশ কম। গল্পটি গড়ে উঠেছে দুটি চরিত্রকে আশ্রয় করে — তারিণী আর সুখী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি চরিত্র ময়ূরাক্ষী নদী। ময়ূরাক্ষী লেখকের বর্ণনার গুণে ও তাঁর প্রকৃতি দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিল্পীর প্রয়াসে নদীটিও একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। গল্পের কাহিনীবৃত্ত ছোট। উপস্থাপনা সংযত। গল্প পূর্বাপর শিল্পের শাসনে নির্মেদ ও সংহত। গল্পের শুরু তারিণীর কথায় — সহজ স্বাভাবিক যাত্রী পারাপারের ঘটনা দিয়ে। শেষ হয়েছে অস্বাভাবিক পরিবেশে, তারিণীর নিতান্ত আত্মরক্ষার চিত্র রচনায়। কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গল্পাংশে রক্তমাংস জুগিয়েছে।

॥ ২ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে মাঝে মাঝেই দেখা গেছে যে, মানুষের অন্তরের মধ্যে সুপ্ত

হয়ে থাকা কোনো একটা আদিম প্রবৃত্তি সহসাই কালসর্পের মতো ফণা তুলে কাহিনীর ট্রাজিক পরিণামকে সূচিত করে। 'তারিণী মাজি' এই জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে। অনেক সময়ই অবশ্য তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রধান কোনো চরিত্রের মধ্যে ঐ ধরনের জৈবিক বৃত্তির সন্ধান পূর্বাপরই মেলে; সেই সব ক্ষেত্রে নিয়তির চূড়ান্ত আঘাতটি কাহিনীর পরিশেষে বজ্রের মতো আছড়ে পড়লেও, তার প্রস্তুতিটা অনেক আগে থেকেই অনুভব করা যায়, হয়ত বা নিজেরও অগোচর-অবচেতনের মধ্যে। এই ধরনের কাহিনী হল 'অগ্রদানী', কিংবা 'আখড়াইয়ের দীঘি', অথবা 'বেদেনী'। আর 'তারিণী মাঝি'-র সঙ্গে পংক্তিভুক্ত হতে পারে 'দেবতার ব্যাধি'-র মতো গল্প।

'তারিণী মাঝি' গল্পের বিষয়-উপকরণের সঙ্গে বীরভূমের নিসর্গপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এটা অবশ্য তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের মধ্যেই দেখি। কিন্তু 'তারিণী মাঝি' গল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি একটু ভিন্নতর মাত্রিক। গণুঘাটের খেয়ানৌকোর মাঝি তারিণী এবং তার স্ত্রী সুখীর মতোই প্রবল বন্যায় হিংস্র হয়ে ওঠা ময়ূরাক্ষী নদীও এই কাহিনীর অন্যতম একটি প্রধান চরিত্র। বস্তুতপক্ষে, তারিণী, সুখী এবং ময়ূরাক্ষী — এই তিনটি চরিত্রই বলা যেতে পারে সমান গুরুত্বপূণল। মানুষের মনের অবচেতনে তলিয়ে থাকা যে-সব প্রবণতা আকস্মিকভাবে জেগে ওঠে পারিপার্শ্বিকের অপ্রতিরোধ্য প্ররোচনায়, তাদেরই একটি — আত্মরক্ষার সহজাত বৃত্তি — এই কাহিনীর ট্র্যাজেডির মূল উপলক্ষ। ঐ পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের প্ররোচনা এখানে এসেছে ময়ূরাক্ষীর বিধ্বংসী বানের মূর্তিতে, কাহিনীর ভিলেন হয়ে।

গণুঘাটের খেয়ামাঝি তারিণী; তার সহকারী হল কালাচাঁদ। ময়ূরাক্ষীর বুকে এপার-ওপার করে তারা নৌকা বোঝাই যাত্রী নিয়ে। তাদের দেওয়া 'পারের কড়িতে'-ই তারিণীর গ্রাসাচ্ছাদন। এর ওপরে কখনো - কখনো জোটে ডুবন্ত মানুসজন, গরুমহিষকে বাঁচানোর বকশিস্ ঃ টাকা, কাপড়, কখনো টুকিটাকি গয়নাগাঁটিও। পুত্রবধূকে জলে ডোবা থেকে রক্ষা করার পুরস্কার স্বরূপ কোনো বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ হয়ত দেন টাকা; বরাত থাকে পরবর্তী দশহরার সময় ধুতি-চাদরের। সলজ্জভাবে তারিণী চাদরের বদলে হয়ত চেয়ে নেয় বক্ষয়ের জন্য নতুন শাড়ি। তারিণীর হাতে হয়ত জলে-পড়ে যাওয়া কিশোরী বধূটি তুলে দেয় নিজের নাকেরই সোনার নথটুকুই। একখানা 'ফাঁদি লত্''-ও ঘোষ মশায়ের কাছে চেয়েছিল তারিণী তার সুখীর জন্যে।

এইসব ছোটখাট ঘটনাগুলিই তারিণী-সুখীর দাম্পত্য সুখের নির্দেশিকা। সন্তানহীনতার বেদনা আছে তাদের, কিন্তু সেটা গ্রাস করে ফেলেনি তাদেরকে। মদ খায়, কালাচাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে, আবার সুখীর শাসন মেনে খুশিও থাকে তারিণী। এইভাবেই দিন কাটে তাদের।

রাঢ়বাংলার প্রবল খরায় কোনও একবার দেশজুড়ে হাহাকার পড়ে। ময়ূরাক্ষীর বুকে চড়া পড়ে মাইলের পর মাইল। খেতখামারে ফসল নেই। গরিবগুর্বোর ঘরে খাবার নেই। গ্রামের পর গ্রাম জনহীন হয়ে পড়ছে — স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে মানুষ চলছে শহর অভিমুখে, কাজের সন্ধানে। একদিন নিরুপায় হয়ে তারিণীও বেরিয়ে পড়ে সুখীর হাত ধরে ঃ ''দিন-খাটুনি তো মিলবে।''

কিন্তু ক-দিনের মধ্যেই নদীতে প্রবল বান আসার সঙ্কেত পায় ময়ূরাক্ষীর 'সন্তান' অভিজ্ঞ খেয়ার মাঝি তারিণী। তিনদিনের পেরিয়ে-আসা পর নবোদ্যমে ফিরে আসে সে বউকে নিয়ে। আসন্ন বর্ষায় টইটম্বুর হয়ে নদী আবার তাকে ফিরিয়ে দেবে জীবিকা, মনের নিশ্চিন্ততা, জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসল একসময়ে বিস্তীর্ণ লালমাটির দেশ।

অবশেষে বানও এক সময়ে এল — তার "বিস্তৃতি যেন পারাপারহীন।" নদীর বুকে ডুগডুগি বেজে উঠে আসন্ন বিপদের ইশারা দিলে গেল। গ্রামের মধ্যেও বান ঢোকে— ভাসতে থাকে বাড়ির চালা, গরুর-বাছুর, মানুষ। বন্যার প্রবল শব্দ, ঝড়বাদলের প্রবল ঝাপ্‌টা আর মানুষ ও পশুর ভয়ার্ত চেঁচামেচিতে যেন বিশ্বজগৎ ভরে যায়।

মায়ের বুক থেকে খসে-পড়া ভূপতি ভল্লার সন্তানকে এর মধ্যেই উদ্ধার করে তারিণী। কিন্তু জল ক্রমশই বাড়তে থাকে; সুখীকে পিঠে নিয়ে সাঁতার দিতে শুরু করে সে — জীবনের সহজাত আত্মরক্ষার আকুতিতে। কিন্তু অথই জলের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য কমে আসে বহু বচরের ময়ূরাক্ষী — অভিজ্ঞ তারিণী মাঝিরও। তারিণী 'অনুভব করিল, অতল জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছে। ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারা। সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবিতে হইবে। ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছে। সুখী — তারিণীর প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছিল যে সুখী তার নিরুপায়, অসহায় হাতদুটোর নাগপাশের মতো বলে মনে হচ্ছে জীবনের বৃহত্তম বন্যার মধ্যে বিপন্ন হওয়া তারিণী মাঝির। একটা সময়ে, প্রাণাধিকা সুখীর ঐ ভয়ার্ত বন্ধনই তার কাছে প্রতীত হল অনিবার্য মৃত্যুফাঁস রূপে! মুহূর্তের মধ্যে প্রেমকে, হৃদয়াবেগকে নিশ্চিহ্ন করে "দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল!" .... সুখীর মৃতদেহ তলিয়ে গেল একটু পরেই — জলের উপর ভেসে উঠে বুক ভরে বাসাত টেনে তারিণী পেতে চাইল — "আলো ও মাটি।"

এই হল এ-কাহিনীর পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান — যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বিক্ষিপ্ত নয়। দুটি মানুষের নিবিড় আত্মিক বন্ধনও যে জীবনার্তির কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই নির্মম নিষ্ঠুর সত্যটিকে এইভাবেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন তারাশঙ্কর।

॥ ৩ ॥

মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা কয়েকটি মৌল ঈপ্সার কথা হামেশাই বলে থাকেন। ক্ষুধা, যৌনবাসনা এবং আত্মরক্ষার সহজাত তাড়না — এই তিনটিই হল সেই সব মৌল ঈপ্‌সার (Basic urge) মধ্যে প্রবল। এদের মধ্যে আবার প্রবলতম কোন্‌টি তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের ঐক্যমত ঘটতে দেখা যায় না বিশেষ। তারাশঙ্করের এই কাহিনী হয়ত বা সেই বিতর্কের একটা সুষ্ঠু সমাধানের পথ নির্দেশ দিতে পারে।

অধ্যাপক ফ্রয়েড এবং তাঁর চিন্তানুসায়ী মনোবিদ্‌রা বলে থাকেন যৌনবাসনাই হল প্রবলতম অভীপ্সা মানুষের জীবনে। পরিশীলিত হয়ে সেটাই প্রেমে রূপান্তর লাভ করে এবং জীবনের সমস্ত কিছুই পরিচালিত হয় তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রণোদনায়। প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে প্রেম যেখানে অনুপস্থিত, সেখানেও অলক্ষ্যসঞ্চিত যৌন-অভীপ্সাই নিয়ন্ত্রণ করে সব কিছু — এমনই সিদ্ধান্ত ফ্রয়েডপন্থীদের।

কিন্তু ক্ষুধা এবং আত্মরক্ষার তাড়নাই (বহুক্ষেত্রেই এই দুই ঈপ্‌সা আবার পরস্পরের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে থাকে) সম্ভবত প্রবলতর — কামনা (বা প্রেম) তাদের তুলনায় শেষ বিচারে পিছিয়ে পড়ে। যে সুখী ছিল তার ধ্যানজ্ঞান, যার আনন্দবিধানের জন্য সে মানুষের পরিহাস-বিদ্রূপও গায়ে মাখেনি, রাত-

দুপুরে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরেও সে যে সুখীর গায়ে হাত না তুলে (যা তার সমতুল্য আর পাঁচটা কঠিন - শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে ছিল একান্তই স্বাভাবিক) তাকে নিয়ে গান গেয়ে, গয়না পরিয়ে আহ্লাদ করেছে — নিজের প্রাণটুককে রক্ষা করার সহজাত প্রবণতার পথে যখন নদীর ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সেই সুখীই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, তখন নিজেকে বাঁচানোর জৈবিক প্রণোদনায় তারিণী তাকেও 'দুই হাতে সুখীর গলা পেষণ করিয়া' হত্যা করে নিজের নিরাপত্তা সন্ধানে প্রয়াসী হয়েছে। অন্ধ আত্মরক্ষার তাড়নাই তার কাছে তখন সর্বব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে প্রেম-নারী-সংসার-গৃহ-দাম্পত্য — সমস্ত কিছু সেই ভয়াল মৃত্যুর বিভীষিকার সামনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অবশিষ্ট থেকেছে শুধুমাত্র ব্যাকুল জীবনাতিটুকুই। সুখীর সঙ্গে সঙ্গে তার অন্যান্য সমস্ত মানবিক বৃত্তি এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিও তলিয়ে গেছে বানভাসি ময়ূরাক্ষীর বুকে মৃত্যুফাঁদস্বরূপ জলের অতলস্পর্শী ঘূর্ণির গহ্বরে।

অথচ, এই মানুষটির স্বাভাবিক প্রবণতাই ছিল বিপন্ন মানুষকে (এমন কি অবলা পশুকেও) জল থেকে তুলে আনার — প্রায়শই সেটা বিনা লোভেই। ঘোষবাড়ির কিশোরী বউটিকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচানোর পরে পুরস্কার হিসেবে প্রথমে সে চেয়েছিল মাত্র আট আনা পয়সা — এক বোতল দেশি মদের দাম — তারপরে সাবি প্রমুখের তাগিদে তার হুঁস হয়েছে দামী কিছু চাওয়া যেতে পারে বলে। পাঁচ টাকা বকশিস পেয়ে, তার থেকে দু-টাকার সে অকাতরে দান করে দিতে পারে 'কেলে'-কে — সে ঐ উদ্ধারের কাজে আদৌ কোনো সহায়তা না করলেও! সুখীকে মেরে ফেলবার সামান্য কিছু আগেই সে তো ঐ বিপর্যয়ী প্লাবনকে অগ্রাহ্য করেই জলে পড়ে যাওয়া শিশুকে নিজের প্রাণের মায়া না রেখে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছে তার মায়ের কোলে। সেখানে তো পুরস্কার-পার্বণীর কোনো দূরতম হাতছানিও ছিল না।

॥ ৪ ॥

প্রকৃতির দুই রূপ ঃ হনাত, সমাতি এবং প্রলয়ঙ্করী। ময়ূরাক্ষী যখন স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলে, তখন মানুষের মধ্যেও সেই ধীরতোয়া শান্ত ভাবটিই দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। তখন তারিণীও খেয়াযাত্রীদের নিয়ে পরিহাস করে, মায় কালাচাঁদও। যাত্রীরাও করে। সেই রঙ্গ-রসিকতা, হাসি-গল্প ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যায়, যখন প্রবল খরায় সমস্ত এলাকাটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতির নির্মম নিষ্ঠুরতা মানুষের পেটের ভাত, মাথার ছাদ এবং মুখের হাসি সবই কেড়ে নেয় তখন। এরপরে প্রকৃতি যখন ভয়ালতর রূপ ধরে বিধ্বংসী বন্যায়, তখনও মানুষের মানবীয় বৃত্তিগুলি প্রারম্ভিক ভাবে সচেতন থাকে (ভূপতে ভল্লার ছেলেকে তারিণীর নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাঁচানো যার প্রমাণ), কিন্তু তারপরেই সংকট যত বাড়ে মানুষ আর সব ভুলে যায় — তর সমস্ত অস্তিত্ববোধ টিকে থাকে আদিম এবং হিংস্র মানসিক প্রবৃত্তির কাঠামোর ওপরে ভিত্তি করে, আত্মরক্ষার জন্য সে তখন পশুর মতো নৃশংস (সুখীর হত্যা যার নির্দশন)।

প্রকৃতি এবং মানুষের এই বিচিত্র পারস্পরিকতাকেও এই কাহিনীর মাধ্যমে সুনিপুণভাবে প্রতিবেদিত করেছেন তারাশঙ্কর। বীরভূমের মানুষ এবং প্রকৃতি — দুইই ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় — খরা, বন্যা ইত্যাদিকে যেমন তিনি আপন অভিজ্ঞতার তুলিতে চিত্রায়িত করেছেন, ঠিক একইভাবে ময়ূরাক্ষী পারের গ্রামীণ মানুষগুলিকেও বাস্তব করে তুলেছেন।

'তারিণী মাঝি' গল্পের এই বাস্তবধর্মিতারও একটি বিশেষ মাত্রা আছে। জীবনের নির্মম রূপটিকে এই কাহিনীতে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাকে রিয়ালিজম বলার চেয়ে ন্যাচারালিজ্‌ম বলাই হয়ত বেশি

বাঞ্ছনীয়। রূঢ় বাস্তবকে কোনো পেলব আস্তরণে না-মুড়ে, মানুষের মনের আদিম জান্তবতাকে যেভাবে এই গল্পে উন্মোচিত করা হয়েছে তাকে সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষায় ন্যাচারালিশ্টিকই বলতে হয়। তবে এভাবে সীমানাবদ্ধ করে একটি সৃষ্টির কুলপ্রতীক নির্দেশ অবশ্য সাম্প্রতিককালে বিশেষ আর করা হয় না। আসলে কাহিনীর এই আচম্বিত পরিণামের ফলশ্রুতিতে 'তারিণী মাঝি' একটি বন্দেজী ছোটগল্প বলে যেমন পরিগণ্য হয়, তেমনই আবার এই পরিণামেরই প্রেক্ষিতে এটিকে গ্রিক ট্রাজেডি-সুলভ 'হ্যামার্তিয়া' জনিত নিয়তি নির্দেশের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিও হয়ত বা বলা যায়।

॥ ৫ ॥

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এই গল্পটি সম্বন্ধে। তিনি লিখছেন ঃ ''স্বয়ং লেখক বহুকাল পরে গল্পটিকে আবার স্মরণ করেছিলেন। প্রবন্ধে স্মরণ নয়, কাহিনীতে স্মরণ — একরকম রি-মেক। বার্ধক্যে 'বিচারক' নামে একটি ছোট উপন্যাস লিখতে গিয়ে তিনি নিজের পরিণত যৌবনকালকে তার ভাবনা-চিন্তা-বিশ্বাসকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই তারিণী মাঝি লেখককে ভিতরে ভিতরে ভুগিয়েছিল অনেক বছর। অথবা তারিণী শুধুই উপলক্ষ। ওঁর অনেক গল্পই এই যন্ত্রণার উৎস হয়ে উঠেছিল। নিজের সৃষ্টি যখন তাড়া করে সে বড় কঠিন পলায়ন — নিজের কাছ থেকে বলেই না।'' (তারাশঙ্কর ঃ অনুসন্ধান '৯৮ / ১৯৯৮; পৃঃ ১২৮)

ক্ষেত্রবাবু যে মনোকূটের ইঙ্গিত করেছেন, তার বিস্তার গভীরপ্রসারী। 'বিচারক' উপন্যাসের নায়ক তাঁর প্রথমা স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব — অন্ততপক্ষে নিজের মনের গভীরে অস্বীকার করতে পারেন নি। পরবর্তী সমস্তটা জীবনের প্রতিটি চেতন-মুহূর্তে তাঁকে সেই দায়িত্বচ্যুতিজনিত অপরাধবোধ যেন এক অনির্দেশ্য প্রেতচ্ছায়ার মতো অনুসরণ করে বেড়িয়েছে। তারিণী একান্তভাবেই জৈবিক এক প্রবৃত্তির অমোঘতার বশে প্রিয়তমা পত্নীকে হত্যা করে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে — আসন্ন মৃত্যুঘূর্ণির ভয়াল নাগপাশবন্ধন থেকে রেহাই পেয়ে সে খুঁজেছে বাতাস, আলো, মাটি। গল্পে তো ঐখানেই শেষ; পরবর্তী সময়ে তারিণী তার ঐ আচম্বিত অপরাধের গ্লানিতে জর্জর হয়েছে কি-না, গল্পকার তা আর জানাননি; জানালে গল্প আর 'ছোটগল্প' থাকত না, হয়ে উঠত উপন্যাস। কিন্তু ঔপন্যাসিক ঠিক সেইটিই করেছেন। ফলত, সে জিজ্ঞাসা অনিরসিত থেকে গেছে এই গল্পে, তাকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যাখ্যান করেছেন তারাশঙ্কর তাঁর ঐ উপন্যাসে। গল্পেতে যা ছিল আংশিক, উপন্যাসে সেটাই হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ। একটু পার্থকয অবশ্য আছে ও-দুয়ের মধ্যে — প্রেমের প্রতিমা হওয়া সত্ত্বেও জীবনসঙ্গিনী সুখীকে তারিণী হত্যা করেছে এক লহমার মধ্যে, নিজেকে বাঁচাবার তাগিদে। আর 'বিচারক'-এর নায়ক তাঁর প্রেমহীন জীবনসঙ্গিনীকে উদ্ধার করেন নি আগুণের মৃত্যুফাঁদ থেকে — হয়ত এভাবেই তিনি রেহাই পেতে চেয়েছেন জীবনের নিষ্করুণ অপ্রেম থেকে, অবচেতন বিতৃষ্ণার প্ররোচনায়। তারিণীর কাছে যা ছিল চেতনালুপ্ত সহজাত এক জৈবিক অভীপ্সা, 'বিচারক'-এর হাকিম সাহেবের কাছে সেটাই ছিল অবচেতন (না-কি, চেতন?) একটি গূঢ় কুটিল মনোকূট। তাই গল্প এবং উপন্যাস — দুয়ের মধ্যে সমধর্মিতা যতটাই থাকুক, বৈষম্যও কিছু কম নয়।

আসলে তারিণীর সত্তার অন্তর্গত বিচিত্র বৈপরীত্যের টুকরো-টুকরো ইঙ্গিত দিয়ে তার পরিপূর্ণ রূপটিকে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন গল্পকার। সে পত্নীপ্রাণ, ধর্মনিষ্ঠ, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী, অকুতোভয়, পরিশ্রমী, এবং নেশাখোর, অহঙ্কারী, কটুভাষী; আবার পরিহাসপ্রিয়, বিনয়ী উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, সেই সঙ্গেই দায়িত্বশীল,

সরল, সৎ ও নির্লোভ। এত ধরনের বৈপরীত্য-সাদৃশ্যের সমাহারেও তার চরিত্রটি কিন্তু দুজ্ঞেয় হয়ে ওঠেনি। তাই কাহিনীর শেষ পরিণামে যখন তার প্রেম ও দায়িত্ববোধকে সে আক্ষরিক অর্থেই গলা টিপে মেরে আত্মরক্ষার আদিমতম প্রবৃত্তিকে যখন উদ্‌ঘাটিত করল আজীবনের সুপ্তি-আচ্ছন্নতাকে এক লহমায় ঝেড়ে ফেলে — তখন সেই আচম্বিত পরিণতি পাঠকের মনকেও বিমূঢ় করে তোলে। এরই মধ্যে গল্পটির শিল্প-পরিণাম আত্মপ্রকাশ। করেছে। তারিণীর অবচেতনের ঐ আদিম হিংস্রতাকে উচ্চকিত করেছে বন্যায় উন্মত্ত হয়ে ওঠা ময়ূরাক্ষী নদীও। আর সমস্ত বিবাহিত জীবনভোর যে তাকে লতার মতো অবলম্বন করে বেঁচে থেকেছে নির্ভয় নিশ্চিন্ততায়, সেই সুখী — তার বউ — অতলজলের মধ্যে হারিয়ে গেল, তলিয়ে গেল ঐ চিরাভ্যস্ত নির্ভরতারই পরিণামে। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে তাই ‘তারিণী’ এবং ‘সুখী’ নামদুটি যেন নির্মম পরিহাসের প্রবল নির্ঘোষে ধ্বনিত হয়ে গল্পের ট্রাজিক পরিণতির মধ্যে সৃষ্টি করল একটি অকল্পনীয় বৈপরীত্যের মাত্রা।

৪০.৭ অনুশীলনী

□ বিস্তৃত আলোচনামূলক □

১) যে-সুখী, তারিণীর কাছে পৃথিবীতে একান্ততম প্রিয়জন ছিল, নিজের বাঁচবার তাগিদে তাকেই সে হত্যা করে বসল — এই কাহিনী পরিণাম কতখানি স্বাভাবিক ও সম্ভাব্য বলে মনে হয়?

২) ‘‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মানুষের মনোগহনের আলো-আঁধারিতে সন্ধিৎসু অভিযাত্রিক।’’ — ‘তারিণী মাঝি’ গল্পটির বিশ্লেষণ করে এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা কতটা, বিচার কর।

৩) রাঢ়-বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তারাশঙ্করের যে গভীর পরিচয় ছিল, ‘তারিণী মাঝি’ গল্পে তা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখাও।

৪) ‘বিচারক’ উপন্যাস এবং ‘তারিণী মাঝি’ গল্প — দুয়ের কাহিনী-কাঠামো মোটামুটি একই ছাঁচের হলেও, ভাবপরিণামে দুটি পৃথক হয়েছে কেন এবং কীভাবে, বল।

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) ময়ূরাক্ষীতে আসন্ন বন্যার সংকেত কীভাবে পাওয়া গিয়েছিল?

২) ময়ূরাক্ষীর বন্যার ফলে পারিপার্শ্বিক এলাকার চেহারা কেমন হয়?

৩) তারিণী-সুখীর দাম্পত্যজীবন কীভাবে কাটত?

৪) ‘‘ময়ূরাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব’’ কীভাবে হয় না?

□ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক □

১) ঘোষবাড়ির বধূটি জলে পড়ে গিয়েছিল কবে?

২) ‘তারিণী মাঝি’ গল্পের ঘটনাকাল কোন্ বছরের?

৩) বৃদ্ধা যাত্রিণীটি সাবিত্রীকে কীভাবে হাসতে বারণ করেছিলেন?

৪) যে বানের জলে ডুবে সুখীর মৃতুয হয়, তেমন বানের নাম কী?

৫) কত বছর আগে শেষবারের মতো সেই বান এসেছিল ময়ূরাক্ষীতে?

৬) তারিণী "ফাঁদি লত" বখশিস পাবার পর সাবি তাকে কী শুধিয়েছিল?

৭) তারিণীর খেয়া নৌকা কোথা থেকে কোথায়-কোথায় পাড়ি দিত?

৮) মদন গোপ তারিণীকে কেন বখশিস দিয়েছিলেন?

৯) কেষ্ট দাসের বাড়ি কোথায় ছিল?

১০) সুখীর কানের ফুল কীভাবে হয়েছিল?

১১) বর্ধমানে যারা মজুর খাটতে যাচ্ছিল, তারা কোন্ গাঁয়ের লোক?

১২) কার ছেলেকে তারিণী বাঁচিয়েছিলেন বন্যার জল থেকে?

৪০.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) মূলপাঠ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় অংশের শেষাংশ ও তৃতীয় অংশের প্রথমার্থ অবলম্বনে উত্তর তৈরী করুন।

২) মূলপাঠ এবং আলোচনা পঞ্চম অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

৩) মূলপাঠ এবং আলোচনা চতুর্থ অংশের সহায়তায় উত্তর করুণ

৪) আলোচনার শেষাংশ অবলম্বনে উত্তর দিন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) গল্পের শেষাংশ যেখানে খেয়ামাঝি তারিণী লক্ষ্য করেছে পশ্চিমা বাতাস বওয়া, কাকের কুটো সংগ্রহ, টিপ্‌টিপ জল প্রভৃতি। এ থেকে সংকেত পাওয়া গিয়েছিল। — এর সাহায্যে উত্তর করুন।

২) গল্পের শেষাংশে বন্যার জল প্রবল বেগে প্রবেশের যে বর্ণনা আছে তার সাহায্যে উত্তর তৈরী করুন।

৩) মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাহায্যে উত্তর দিন।

৪) মূলপাঠ-এ গল্পের প্রথমাংশে তারিণী-সুখীর সংলাপে এ পরিচয় আছে। এই অংশের সাহায্যে উত্তর প্রস্তুত করুন।

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

সংকেত নিষ্প্রয়োজন / মূলপাঠের সাহায্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য রচনা করে উত্তর দিন।

৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় — *শ্রেষ্ঠ গল্প (সম্পাঃ জগদীশ ভট্টাচার্য)*

২) ড. সুবোধ সেনগুপ্ত (প্রথম সম্পাদক) — *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*

৩) ড. ভূদের চৌধুরী — *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*

৪) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত — *তারাশংকর অনুসন্ধান '৯৮*

৫) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*

৬) ড. সত্যজিৎ চৌধুরী (সম্পাঃ) — *তারাশংকর ঃ শততম বর্ষাপন*

৭) ড. পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাঃ) — *তারাশংকর ঃ আলোকিত দিগ্বলয়*

৮) ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় — *এক আকাশ দুই নক্ষত্র*

৯) ড. নিতাই বসু — *তারাশংকরের শিল্পীমানস*

১০)

একক ৪১ ❑ সুবোধ ঘোষ ঃ সুন্দরম্

গঠন

৪১.১ উদ্দেশ্য
৪১.২ প্রস্তাবনা
৪১.৩ সুবোধ ঘোষ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা
৪১.৪ মূলপাঠ ঃ সুন্দরম্
৪১.৫ সারাংশ
৪১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ
৪১.৭ অনুশীলনী
৪১.৮ নির্ধারিত পাঠ্যগ্রন্থ
৪১.৯ উত্তর সংকেত

৪১.১ উদ্দেশ্য

বাংলা কথা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের আভির্ভাব চল্লিশের দশকে। দেশের আকাশ-বাতাসে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালোছায়া। — রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিতে প্রবল আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের উঠানেও এসে সে প্রবল আঘাতে আঘাতে সমস্ত কিছুকে ভাঙচুর করছে। বাংলা সাহিত্যের এর প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্ভব ছিল না। সুবোধ ঘোসের রচনাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এতদিন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের পাতার গল্প নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করলেও নিজে কোন গল্প লেখেন নি। তাঁর গল্প লেখার সূচনা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় 'অনামী সংঘের' সাহিত্যিক আড্ডার বন্ধুদের প্রেরণায় 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' দুই স্মরণীয় রচনায়। বন্ধুদের দ্বারা তো বটেই 'আনন্দবাজার বার্ষিকী ও 'অগ্রণী' প্রত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের দ্বারা বিপুল অভিনন্দিত হয়েছে। ছোটগল্প গ্রন্থ 'ফসিল' (১৯৪০)-এর পরে সংকলিত হয়। এই 'ফসিলে'রই অন্যতম রচনা — 'সুন্দরম্'-এ পূর্বেই রচিত।

'সুন্দরম্' গল্পটি পাঠ করে আপনি সুবোধ ঘোষের গল্প রচনার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে তাঁর মানবচরিত্র অধ্যয়নের অসামান্য কৃতির পরিচয় পাবেন। সেগুলি হোল —

১) গল্পটিতে আপনি লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাবেন।

২) বুঝতে পারবেন চরিত্রপ্রধান এই গল্পটি লেখক মনোবৈজ্ঞানিকের গভীর দৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন।

৩) গল্পের নাম 'সুন্দরম'। লেখক সম্ভবত সৌন্দর্যতত্ত্বের অভিনব ব্যাখ্যা দেবার জন্যই এ নামকরণ করেছেন।

৪) পুত্রের বিবাহের যোগ্য পাত্রী সন্ধানকালে নারীর প্রতি যে নির্মম অবমাননা প্রকাশ পেয়েছে, তার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র এ গল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

৫) মধ্যবর্গীয় কৈলাস ডাক্তারের পরিবার এবং অবরবর্গীয় তুলসী-যদু-নিমাই শ্রেণী বিভাজিত সমাজে এদের স্বতন্ত্র অবস্থান। আর্থ-সামাজিক ভিত্তিও স্বতন্ত্র। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিভূ যদুর গল্পের শেষ বাক্যটি যে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝতে পারবেন।

৬) সুকুমার চরিত্রের অস্বাভাবিক আচরণ — আশৈশব নিরামিশ ভোজন, ব্রহ্মচর্য পালন ও সংযম অভ্যাস অনেকটা বাতিকে পরিণত হয়েছিল। এ হেন স্খলন-পতন অপ্রত্যাশিত হলেও অনেকটা নিয়মিত মতই অনিবার্য ছিল। গল্পের শেষ পরিণতি, এক দিক থেকে ট্র্যাজিক হলেও কতটা বাস্তব তা বুঝতে পারবেন।

৪১.২ প্রস্তাবনা

মহৎ প্রতিভার আশ্রয়ে পুষ্ট তরুণ প্রজন্ম নতুনতর কিছু করার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁদের ভাবনা চিন্তা অনেকটা বিপন্ন বোধ করে। ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তরুণ লেখকদের মনে যে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্রোহী মনোভাব দানা বেধেছিল, তা থেকে মুক্তির আকাঙ্খা — তাঁদের সে সময়ের গল্প উপন্যাসে স্পষ্টত পাওয়া যায়। এ সময়ের বিপন্ন, বিরক্ত লেখকরা বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্রে বিশ্বসাহিত্য সংস্কৃতি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় কিছুটা প্রভাবিত হলেও বস্তুত সোভিয়েত বিপ্লবের শুরু ও সাফল্যে তাঁরা যেন নিশ্চিত আশ্রয় পেয়েছিলেন। নতুনতর ভিন্নতর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন। কল্লোলের লেখকদের রচনায় তারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ও সমকালীন মন্বন্তর, গণ-আন্দোলন চল্লিশেক দশকের কথাসাহিত্যিকদের নতুনতর পথের দিশা নিয়ে আসে। সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সূচনা পর্বে। বাংলার নতুন প্রজন্ম এ সময় নতুন যুগের নতুনতর ধ্যান ধ্যারণায় ছিল উদ্বেল। তাঁরা ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউটের ছত্র ছায়ায় নতুনতর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরী করছেন। সুবোধ ঘোষের গল্প ‘ফসিল’ অবলম্বনে ‘অঞ্জনগড়’ নাটক অভিনীত হচ্ছে। জার্মানীর ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিশ্বের নানা দেশের লেখক-শিল্পীরা একত্রিত হয়ে সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারের সঙ্কল্প নিচ্ছেন। শহরের সর্বত্র বিভিন্ন সভা-সমিতি গড়ে শিল্পী সাহিত্যিকরা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সঙ্কট উত্তরণের স্বপ্ন দেখছিলেন। ফসিল সেই স্বপ্নের ‘ফসল’। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ হাত ধরাধরি করে সমাজের ধারক সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষককে নিষ্পেষণ করে। তেমনি এক ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সর্বহারা শ্রেণীর দ্বন্দ্বের পরিচয় তুলে ধরে রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক সুবোধ ঘোষ এই গল্পে। ‘সুন্দরম’ গল্পে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, মনস্তত্ত্বের অতি গূঢ় কিছু বিশ্লেষণ।

সুবোধ ঘোষের লেখায় বিশিষ্ট উপকরণ হল মনোবিকলন। সেটা কেবলমাত্র সমাজের শিক্ষিত মধ্যবর্গীয় মানুষদের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যতর স্তরের মানুষেরও মনের গভীরে তিনি প্রবেহ করেছেন তাঁর সুবিপুল অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গেই। ন্যায় ও অন্যায়, নীতি ও নীতিভ্রংশতা, সঙ্গত ও অসঙ্গতর সীমারেখা যে বহু সময়েই নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না, এই সুকঠিন সত্যটিকে তিনি বহুভাবে উদঘাটিত করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। আর্থ-সামাজিক ইতিহাসকে সুবোধবাবু অন্বেষর করেছেন। দার্শনিকের মতো নিরাসক্ত অথচ স্থিতপ্রজ্ঞভাবে। দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের সাহচর্য তিনি প্রথম বয়সে পেয়েছিলেন। হয়ত সেটাই তাঁর এই স্থিতধী দ্রষ্টা রূপে শিল্পীসৃষ্টির অন্তরীক্ষে ছিল।

'সুন্দরম' সুবোধ ঘোষের লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত ছোটগল্পগুলির অন্যতম। শুধুমাত্র এইটুকু বললে হয়ত এর প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দেওয়া যাবে না, কারণ যদি কেউ এটিকে বাংলাসাহিত্যের সেরা গল্পগুলির বর্গভুক্ত করেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হওয়া খুব কঠিন। জীবনের নির্মম কিছু সত্য-উপলব্ধি এবং সামাজিক-অপহ্নুতকে অবলম্বন করে এই গল্প তৈরি করা হলেও, এর মাধ্যমে যে রূঢ় ব্যঙ্গকে উন্মোচিত করা হয়েছে, তার শিল্পগত মূল্যও কিন্তু খুব কম নয়। নৈতিক মূল্যবোধগুলির কীভাবে এই জটিল সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে অবক্ষয় ঘটে যে, তারও এক সুতীব্র উদঘাটন হয়েছে এই গল্পে। গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই বর্তমান আলোচনার যাথার্থ ও গল্পের রসাস্বাদন করতে পারবেন।

৪১.৩ সুবোধ ঘোষ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

সুবোধ ঘোষের জন্ম বিহারের হাজারিবাগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর (মৃত্যু ১০ই মার্চ, ১৯৮০) তাঁর বাবা সতীশচন্দ্র ও মা কনকলতা। তাঁদের আদি নিবাস অধুনা বাঙলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের 'বহর' গ্রামে। সতীশচন্দ্র কর্মব্যাপদেশে বিহার প্রবাসী হন। তিনি সরকারী জেলের অধঃস্থন কর্মচারী ছিলেন। সুবোধ ঘোষ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্য ও তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি হাজারিবাগ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে হাজারি বাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। সহাধ্যায়ী বন্ধুর বাবা নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে নৃতত্ত্বে আগ্রহ জন্মে। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অনটনে পনের বছর বয়সেই জীবিকার সন্ধানে পথে নামতে বাধ্য হন। এ সময় তিনি ছ'মাস মেয়াদি প্রথম চাকরি — হাজারিবাগের দেহাতি কুলিবস্তিতে কলেরার মড়ক লাগায় মিউনিসিপ্যালিটি কর্মী হিসেবে টীকা দেওয়ার কাজ পান। এরপর তিনি বিহারের বিখ্যাত লাল মোটর কোম্পানির বাসের নাইট সার্ভিসে কণ্ডাকটর হিসেবে হাজারিবাগ থেকে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে যাতায়াত করতেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই পরবর্তীকালে 'অযান্ত্রিক' গল্প লেখেন। পরে কিছুদিন তিনি সার্কাস পার্টিতেও কায়িকশ্রমের কাজ করেছেন। 'অঙ্গদ' গল্পে সে অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। মাঝে 'হজ' যাত্রীদের টীকা দেওয়ার কাজ নিয়ে বোম্বাই এবং এডেন গিয়েছিলেন। কখনো বাড়ী থেকে উধাও হয়ে সন্ন্যাসী'র বেশে অজ্ঞাতবাস বা জিপসী দলের সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গিয়েছেন। অভ্রখানির সেটারকিপার ও সুপারভাইজারিও করেছেন একসময়। আবার স্বাধীন ব্যবসার বাসনা নিয়ে কেক-পাউরুটি-ঘি-মাঘন সরবরাহের ব্যবসাও করেছেন। এই সব বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে সুবোধ ঘোষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত।

অন্তহীন এই চলার পথে ঘুরতে ঘুরতে ঘোষ পরিবারের আকস্মিক ভাবে যোগাযোগ ঘটে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। তাঁরই প্রবর্তনায় সুবোধ ঘোষ শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরীডারের কাজ পান। ছ'মাস পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় বিভাগে স্থানান্তরিত হন। সে ১৯৪০-এর ১লা জানুয়ারীর কথা। ঐ একই দিনে কাজে যোগ দিয়েছিলেন সাগরময় ঘোষ। আর তখন থেকেই দুজনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।

সুবোধ ঘোষ প্রথম লেখেন 'প্রস্তর যুগের চিত্র কথা' (৪ঠা মে, ১৯৪০)। পরে ভবানীপাঠক ছদ্মনামে লিখেছেন 'ছোটনাগপুরের আদিবাসী' (৩০শে নভেম্বর, ১৯৪০)। তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' ও পরে 'ফসিল' প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর জয়যাত্রার শুরু। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার

সম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম প্রভৃতি লেখার পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৮০টি।

তাঁর 'তিলাঞ্জলি', 'ত্রিযামা', 'সুজাতা', 'জিয়া ভরলি' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস খ্যাতিলাভ করেছে। তবে ছোটগল্পকার হিসেবেই সুবোধবাবুর ব্যাপকতর প্রতিষ্ঠা। ১৫৭টি গল্প লিখেছেন তিনি সারাজীবনে। 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'জতুগৃহ', 'থিরবিজুরী', 'মনভ্রমণ' প্রভৃতি তিরিশটি গল্পগ্রন্থ এবং কতিপয় প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনি লিখেছেন।

৪১.৪ মূলপাঠ ঃ সুন্দরম্

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য সমাধা করে দেওয়া; মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো।

কিন্তু বাধা আছে — সুকুমারের ব্রহ্মচর্য। বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ ফোটা তিলক ধরেছে সে। আজও পায়ে সেধে তাকে মুসুরির ডাল খাওয়ান যায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে ক'খানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা। বাগানের নির্জন পুকুরঘাটে গভীর রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার সুষুম্না। প্রতি কুম্ভকে রেচকে সুকুমার অনুভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তড়িৎস্পর্শ, শ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতে।

সুকুমার চোখ বুজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভলত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে — মুক্তি দে, মক্তি দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে — বাস্, এই এগজামিনটা পর্যন্ত, তার পর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার।

সুকুমারের বাবা কৈলাসডাক্তার বলতেন — প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভালো জিনিস পড়ুক, গায়ে মাংস লাগুক, এসব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম।

কিন্তু মা, পিসিমা, ছোটবোন রাণু আর ঝি, তাদের মন প্রবোধ মানে না।

সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাসডাক্তারকে — যত শীগগির পার পাত্রী ঠিক করে ফেল আর দেরী নয়।

ঝিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে — ছি ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস। ছোটজাতের ছোটঘরেও কেউ এমন কসাইপনা করে না বাপু।

সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হলো। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন। ভগ্নীপতি কানাইবাবু, সুকুমারের মতিগতির চার্জ নিলেন। যেমন করে পারেন কানাইবাবু সুকুমারকে সংসারমুখো করবেন।

পাশের খবর বেরিয়েছে। কানাইবাবু সুকুমারকে দিয়ে জোর করে দরখাস্তে সই করালেন। নাও, সই কর। মুন্সেফী চাকরি ঠাট্টার নয়। সংসারে থেকেও সাধনা হয়। ঐ যাকে বলে, পাঁকাল মাছের মত থাকবে। জনকরাজা যেমন ছিলেন।

বাড়ির বিষন্ন আবহাওয়া ক্রমে উৎফুল্ল হয়ে আসছে। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখে এসেছেন। এখন সমস্যা

সুকুমারকে কোন মতে পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাওয়া। কানাইবাবু সকলকে আশ্বস্ত করলেন — কিছু ভাবনার নেই; সব ঠিক হো যায়েগা।

সংসারের ওপর সুকুমারের এই নির্লেপ, এখনও কেটে যায়নি ঠিকই! তবু একটু চাঞ্চল্য, আচারে আচরণে রক্তমাংসের মানুষের মেজাজ এক-আধটুকু দেখা দিয়েছে যেন।

তবু একবার পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সঙ্গে সুকুমারের একটা বচসা শোনা গেল। বাড়ির সবারই বুক দুরদুর করে উঠলো। ব্যাপার কি?

কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে সুকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে, জীবনে এই প্রথম। নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হল বলা তো যায় না।

কিন্তু উপন্যাস না নরক। যতসব নীচ রিপুসেবার বর্ণনা। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি, এখনও গা ঘিন ঘিন করছে।

সুকুমার বলে — আপনাকে এবার ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম কানাইবাবু।

মানে অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন — আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞাচক্রের দিব্যি। তা ছাড়া ভাল ছবি, ধ্রুবের তপস্যা। মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবে।

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেন্ট বোধহয় সার্থক হয়ে উঠলো। ক'দিন পরেই দেখা গেল, সুকুমার কাব্য পড়ছে, কোন এক আখড়ায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন ঘন সিনেমায় যাচ্ছে। এদিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পত্রও চলে এসেছে।

কিন্তু অনাসক্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। আজকাল সুকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবুফুলের সুগন্ধে মনটা অকারণে উড়ে চলে যায় — ধুলিধুসর সংসারে বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমার সাঁতার দিয়ে বেড়ায়! একটা বিষন্ন সুখকর বেদনা। কিসের অভাব। কাকে যেন চাই। কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় সুকুমার।

রাত করে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবার পথে কানাইবাবু সুকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন — নাচটা কেমন লাগলো?

সুকুমার সহসা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললো — কানাইবাবু?

— কি?

— মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

— নিশ্চয়। কালই চল বারাসাত। যাদব ঘোষের মেয়ে বনলতা। তোমার মেজদি যেতে লিখেছে। আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেন।

উকীলের মুহুরী যাদব ঘোষ। বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালই। যাদব ঘোষ অল্প পণে সৎপাত্র খুঁজছেন।

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেন। — ভাল করে দেখে নে সুকু, মনে যেন শেএস কোন খুঁতখুঁত না থাকে।

যাত্রাদলের রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব জবরজং করে সাজানো হয়েছে। বিরাট একটা ঝকমকে বেনারসী শাড়ী আর পুরু সাটিনের জ্যাকেট। পাড়ার মেয়েদের কাছ থেকে বার করা চুড়ি রুলি বালা ও অনন্ত, কনুই পর্যন্ত বোঝাই করা দুটি হাত। ঘামে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গলার ওপর। মেয়েটি দম বন্ধ করে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়ালো।

বনলতার শক্ত খোঁপাটা চট করে খুলে, চুলের গোছা দুহাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন — দেখে নে সুকু। গাঁয়ের মেয়ে হলে হবে কি? তেলচিটে ঘাড় নয়, যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেখেছি। রামোঃ।

মেজদি যেন ফিজিয়লজি পড়াচ্ছেন। বনলতার থুতনিটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন। চোখ মেলে তাকাতে বললেন — ট্যারা কানা নয়। পায়চারি করালেন — খোঁড়া নয়। সুকুমারের মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন — দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নেই।

দেখার পালা শেষ হলো। বাড়ি ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন — কি যোগীবর, পছন্দ তো?

সুকুমার চুপ করে বসে রইল। মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়। কানাইবাবু বুঝলেন, এক্ষেত্রে মৌনং অসম্মতি লক্ষণং।

— সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া, এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয়। — কানাইবাবু মনের বিরক্তি মনে চেপে রাখলেন।

পিসিমা — ছেলের আপত্তি তো হবেই। হা-ঘরের মেয়ে এনে হবে কি? মুহুরী-টুহুরীর সঙ্গে কুটুম্বিতা চলবে না।

সুন্দরী মেয়ে চাই। এইটেই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। কৈলাসডাক্তার পাত্রী দেখেছেন আর বিপদের কথা এই যে, তাঁর চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়। তাই কৈলাসডাক্তার কাউকে সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর রুচি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথম ছেলে, জীবনসঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে যাকে, তারই মতটা গ্রাহ্য। তারপর আর সকলের।

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্তার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালো। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাসডাক্তারকে মর্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে সেই পীড়িত মর্মের কোন অভিমান আর নেই।

বাংলোর বারান্দায় সোফায় বসে নির্দিষ্ট মনে কৈলাসডাক্তার এই কথাই ভাবছিলেন। এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জন ময়নাঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না, কা'কে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ-এর পরিচয় কৈলাসডাক্তারের মত আর কে জানে! কিন্তু তাঁর এই ভিন-জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কৈ? দুঃখ এইটুকু।

হঠাৎ শেকল-বাঁধা হাউণ্ডটার বিকট চিৎকার আর লাফঝাঁপ। ফটক ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো মানুষের ব্যঙ্গমূর্তি কয়েকটি প্রাণী। যদু ডোম আর নিতাই সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে।

যদু ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুত করে বসলো একটা ভিখারী পরিবার। নোংরা চটের পোটলা, ছেঁড়া মাদুর, উনুন, হাঁড়ি ক্যানেস্তারা, পিঁপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদর্য জগতের অংশ। সোরগোল শুনে সবাই বেরিয়ে এল।

কৈলাসবাবু বললেন — কে রে এরা যদু? চাইছে কি?

— এ ব্যাটার নাম হাবু বোষ্টম, তাঁতীদের ছেলে। কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছে।

কুষ্ঠী হাবু তার পট্টিবাঁধা হাত দুটো তুলে বললো — কৃপা করো বাবা!

— এই বুড়ীটা কে?

— এ মাগীর নাম হামিদা। জাতে পশ্চিমা বেদিয়া, বসন্তে কানা হবার পর দলছাড়া হয়েছে। ও এখন হাবুরই বৌ।

হামিদা কোলের ভেতর থেকে নেকড়ার জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললো — বাচ্চাকা জান হুজুর! এক পিয়ালী দুধ হুজুর! এক মুঠঠি দানা হুজুর!

— আর এই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা কে? পিসিমা প্রশ্ন করলেন।

— ওর নাম তুলসী। হাবু আর হামিদার মেয়ে।

— আপন মেয়ে?

— হ্যাঁ পিসিমা। যদু উত্তর দিল।

তুলসী একটা কলাই-করা থালা হাতে চুপ করে বসে আছে। পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে একটা কৌড়ির তাবিজ।

দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূপ পরিপুষ্টি। ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার বেঢপ খুলিটা যেন একটা চোট লেগে টেরে বেঁকে গেছে। বড় বড় দাঁত, যেন একটা জন্তুর হিংসে ফুটে রয়েছে। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে, ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যাবে, গা শিরশির করবে। কিন্তু যদু বললো — তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভর।

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসেনি। মিউনিসিপ্যালটিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে। নতুন আফিমের গুদাম হবে সেখানে। শহরের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নেই।

হাবু কান্নাকাটি করলো — একটা সার্টিফিকেট দিন বাবা। মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পেছনে থাকবো। দীননাথের দিব্যি, হাটবাজারে ঘেঁষবো না কখনো। তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো আর রাগ বালাই নেই।

পিসিমা বললেন — যেতে বল, যেতে বল। গা ঘিন্ ঘিন্ করে। কিছু দিয়ে বিদেয় করে দে রাণু।

রাণু বললো — আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাইজটা দিয়ে দিই। এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবে।

— হ্যাঁ দিয়ে দে। থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়িও দিয়ে দে। বয়স হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তো।

কৈলাসডাক্তার বললেন — আচ্ছা যা তোরা। সার্টিফিকেট দেব, কিন্তু খবরদার হাটবাজারে আসিস না।

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলে তুলসীর কথাটাই আলোচনা হলো আর একবার। কৈলাসবাবু হেসে বললেন — দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে। ওরই বিয়ে হয়ে যাবে, জানো?

ঝি উত্তর দিল — বিয়ে হবে না কেন? সবই হবে। তবে সেটা আর বিয়ে নয়।

কৈলাসবাবু একটি পাত্রী দেখে এসেছেন। নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়া। মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুক।

দেখানো হল দেবপ্রিয়াকে। মেদের প্রাচুর্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় না। চওড়া কপাল, ছোট চিবুক গোল গোল চোখ। গায়ের রঙ মেটে, কিন্তু সুমসৃণ। ভারি ভুরু দুটোতে যেন তিব্বতী উপত্যকার ধূর্ত একটা ছায়া, প্রচ্ছন্ন এক মঙ্গোলিনীকে ইশারায় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। সে বোধহয় জানে, তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতই। দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভাল।

সুকুমার হ্যাঁ না কিছুই বলে না। বলা তার স্বভাব নয়। বোঝা গেল, এ মেয়ে তার পছন্দ নয়।

পিসিমাও বললেন — হবেই না তো পছন্দ। শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় না। তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটো।

কৈলাসডাক্তার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সমস্যা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। এ মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে একে একে। শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না। বংশ, বিত্ত,শিক্ষা ও রুচি দেখতে হবে।

মাঝে পড়ে পুরুত ভটচায্যি আরও খানিকটা ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন। সমস্যাটা ক্রমেই তেতে উঠেছে। ভটচায্যি বাড়ির সকলকে বুঝিয়ে গেলেন — নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিসটা। কুলনারীর গুণ-লক্ষণ মিলিয়ে পাত্রী নির্বাচন করতে হবে। গৃহিণী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা, সব যাচাই করে দেখতে হবে। সারাজীবনের ধর্মসাধনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ধরে বেঁধে একটা নিয়ে এলেই চলবে না। ওসব যাবনিক অনাচার চলবে না।

হ্যাঁ, তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ই। কারণ সৌন্দর্য একটা দেবসুলভ গুণ।

এবার যতদূর সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবেচিন্তে, কৈলাসডাক্তার এক পাত্রী দেখে এলেন। অনাদি সরকারের মেয়ে অনুপমা সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী।

অনুপমার বয়স একটু বেশি। রোগা বা অতি তন্বী দুই-ই বলা যায়। মুখশ্রী আছে কি না আছে তা বিতর্কের বিষয়। তবে চালচলনে সুরুচির আবেদন আছে নিশ্চয়। রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষার হ্লাদিনী গুণে।

প্রতিবাদ করলো রাণু। — না, ম্যাচ হবে না। যা ঝিরকুট চেহারা মেয়ের।

ঋসি বালকের মত কাঁচা মন সুকুমারে। হাঁ-না বলা তার ধাতে সম্ভব নয়। কিংবা অতিরিক্ত লজ্জা, তাও হতে পারে। তবে তার আচরণেই বোঝ গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয়।

পিসিমা বললেন — ভালই হল। জানি তো, কী কিপটে এই অনাদি চাষা। বিনা খরচে কাজ সারতে চায়। পাত্র যেন পথে গড়াচ্ছে।

দৈবজ্ঞ মশায় এসে পিসিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন — পাত্রীর রাশি আর গণ খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসিমা। ওসব কোন তুচ্ছ করার জিনিস নয়।

— সবই গ্রহের কৃপা। দৈবজ্ঞী সুকুমারের কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ির সকলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেলন। — যা দেখছি তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছে। পাতকী রিষ্টি আর নেই, এবার কেতুর দশা চলেছে। এই বছরের মধ্যে ইষ্টলাভ। সুন্দরা রামা, রাজপদং, ধনসুখং। আর, অর কত বলবো।

— এই ছুঁড়ি ওখানে কি করছিস? কৈলাসবাবু ধমকে উঠলেন। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের কাছে বসে আছে তুলসী। হাতে কলাই-করা থালাটা।

যদু কেত্থেকে এসে একসঙ্গে হুমকি দিল। — ওঠ্ এখান থেকে হারামজাদি। কেমন ঘাপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরে।

কৈলাসডাক্তার বললেন — যাক্, গালমন্দ করিস নে। খিড়কির দোরে গিয়ে বসতে বল।

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন — কি কানাই? এবার আমাকে বিড়ম্বনা থেকে একটু রেহাই দেবে কি না? সুন্দরী পাত্রী জুটলো তোমাদের?

— আজ্ঞে না। চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না।

— চেষ্টা করেও কিছু হবে না। তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ড কিছু নেই।

— কি রকম?

—কি রকম আবার? চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাসডাক্তার বললেন — পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি। ধন্যি বাবা কাশীরাম। একবার ভাব তো কানাই, কোনো ভদ্রলোকের যদি নাক থেকে কান পর্যন্ত ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কী চীজ হবে সেটা।

কানাইবাবু বললেন — যা বলছেন। কত যে বাজে সংস্কারের সাত-পাঁচ রয়েছে লোকের। তবে মানুষের রূপের একটা স্ট্যান্ডার্ড অবশ্য আছে। অ্যানথ্রপলজিস্টরা যেমন বলেন ....।

— অ্যানথ্রপলজিস্ট না চামড়াওয়ালা। কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন — আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়নাঘরে। দুটো লাশের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন নেগ্রিটো আর কে প্রোটো-অস্ট্রাল। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ। মেলা বকো না আমার কাছে।

কানাইবাবু সবে পড়ার পথ দেখলেন।

— জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালোজিভ বলে ডাকে। বর্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব করে! আধুনিক হয়েছে! যত সব ফাজিলের দল!

কৈলাসডাক্তার ক্ষুব্ধ লাল চোখ দুটিকে শান্ত করে চুরুট ধরালেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যদাসের বাড়িতে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুশি মনে কৈলাসডাক্তার ফিরলেন। ফটকে পা দিয়েই দেখলেন, সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যদু আর নিতাই তুলসীর সঙ্গে হাসি-মস্কর করছে।

— এই রাস্কেল সব। কি হচ্ছে ওখানে?

তুলসী ওর থালা হাতে নিয়ে আর দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল। যদু নিতাই আমতা আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বলতে বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে রইল। কৈলাসবাবু সুকুমারকে ডেকে বললেন — ঘরের দোর খোলা রাখ কেন? সেই ভিখিরি ছুঁড়িটা কদিন থেকে ঘুরঘুর করছে এদিকে। খুব নজর রাখবে, কখন কি চুরি করে সবের পড়ে, বলা যায় না।

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাসবাবু জানালেন — সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে দেখে এলাম। একরকম

পাকা কথাই দিয়ে এসেছি। এবার সুকুমার আর তোমরা দেখে এস। আমায় আর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিও না।

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হলো। মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে, সন্দেহ নেই। যেন একটি অমাবস্যা কুমারী, ঘুটঘুটে কালো। সমস্ত-অবয়বে একটা সুপেশল কাঠিন্য। মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত হাড় আর হাতপায়ের রোমঘন পারুষ্য পুরুষকে লজ্জা দেয়। চওড়া করোটির ওপর অতিকুঞ্চিত স্থূলতন্তু চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর মেঘস্তবকের দৃশ্যটা মনে পড়িয়ে দেয়। মূর্তির শিল্পীর অবশ্য খুশি হয়ে বলবেন, এ যেন এক দৃঢ়া দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তি। মমতার প্রখর দৃষ্টির সামনে সুকুমারই সঙ্কুচিত হল। বরমালা-কাঙাল অবলার দৃস্টি এ নয়; বরং এক অকুতোলজ্জা স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসা যেন জ্বলজ্বল করছে মমতার দুই চোখে।

সত্যবাবু গুরপনার পরিচয় দিলেন — বড় পরিশ্রমী মেয়ে, কারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছাত্রীজীবনে প্রতিবছর স্পোর্টে প্রাইজ পেয়ে এসেছে।

মেয়ে দেখে এসে সুকমার মুখভার করে শুয়ে রইল। রাণু বললো — এ নিশ্চয় রাক্ষসগণ।

পিসিমাও একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন — হ্যাঁ, সেই তো কথা। বড় হট্টাকট্টা চেহারা। নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দানসামগ্রীও।

তবু কৈলাসডাক্তার তোড়জোড় করছেন। মমতারই সঙ্গে বিয়ে একরকম ঠিক। এবার একটু শক্ত হয়েছেন তিনি। দশজনের দশ কথার চক্রে আর ভূত সাজতে পারবেন না।

কিন্তু যা কখনও হয়নি, তাই হল। সুকুমারের প্রকাশয বিদ্রোহ। সুকুমার এবার মুখ খুলেছে। রাণুকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে — সত্যদাসের সঙ্গে বড় গলাগলি দেখছি, বাবার! ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগেভাগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছি।

কথাটা শুনে পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সুকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুর সঙ্গে একপ্রস্থ বাকযুদ্ধ সেরে এলেন। কিন্তু ফল হল না কিছুই। কৈলাসবাবু এবার অটল।

সুকুমারের মা কেঁদে ফেললেন — ঐ হৃদকুচ্চিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়ের ছায়া মাড়াবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিমটে দিয়ে বিদেয় করে দাও না।

কৈলাসবাবুর অটলতার ব্যতিক্রম হল না কিছুই। তিনি শুধু একটা দিন স্থির করার চেষ্টায় রইলেন।

সুকুমার মারমূর্তি হয়ে রাণুকে বললো — সেই দৈবজ্ঞীটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তো।

— কোন্ দৈবজ্ঞী?

— ঐ যে বেটা সুন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলবো ওর।

আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাসডাক্তার শুনলেন এ বার্তালাপ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠলো তাঁর। সুকুমারের মাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন — কি পেয়েছ।

শঙ্কিত চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন — কি হয়েছে?

— ছেলের বিয়ে দিতে চাও?

— কেন দেব না?

— সৎপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও?

সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন — সুন্দরী পাত্রী।

— বেশ তবে লিখে দাও আমাকে, সুন্দরী কাকে বলে। তন্বী শ্যামা পক্কবিম্বাধর, আরও যা আছে সব লিখে দাও। আমি সেই ফর্দ মিলিয়ে পাত্রী দেখবো।

এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমারের মা'র মেজাজও ধৈর্য হারাবার উপক্রম করলো। তবু মনের ঝাঁজ চেপে নিয়ে বললেন — তার চেয়ে ভাল, তোমায় পাত্রী দেখতে হবে না, আমরা দেখছি।

— ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। এবার তা হলে আমি দায়মুক্ত।

— হ্যাঁ।

কৈলাসডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছে। হাসপাতালে যান আসেন। রুগী নিয়ে, ময়নাঘরের লাশ নিয়ে দিন কেটে যায়। যেমন আগে কাটতো।

বাগানের দিকে একটা হট্টগোল। কৈলাসডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখেন, যদুডোম আর নিতাই তুলসীকে ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

— কি ব্যাপার নিতাই?

— বড় পাজি এ ছুঁড়িটা, হুজুর। পয়সা দেয়নি বলে দাদাবাবুর ঘরে ঢিল ছুঁড়ছিল। আর, এই দেখুন আমার হাত কামড়ে দিয়েছে।

কৈলাসডাক্তার বললেন — বড় বাড় বেড়েছে ছুঁড়ির। ভিখিরীর জাত, দয়া করলেই কুকুরে মত মাথায় চড়ে। কেবলই দেখছি মাস তিন চার থেকে শুধু এদিকেই নজর। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবি।

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়েও মত্তা বাতুলীর মত আরও কয়েকটা ইটপাটকেল ছুঁড়ে চলে গেল। কৈলাসডাক্তার বললেন — সব সময় ফটকে তালা বন্ধ রাখবে।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা। অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ি ফিরতেই কৈলাসডাক্তার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে-টিপে সরে পড়ছে তুলসী। কৈলাসবাবুকে দেখে আরও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কৈলাসডাক্তার হাঁক দিতেই যদু ও নিতাই হাজির হল লাঠি হাতে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন — এ কি? ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, সুকুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা; তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা বেমালুম চুরি করে সরে পড়লো।

কৈলাসডাক্তার সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে দেখলেন। — আমার ঘরটা সব তছতছ করেছে কে? টেবিল থেকে নতুন বেলেডোনার শিশিটাই বা গেল কোথায়?

অনেকক্ষণ বকাবকি করে শান্ত হলেন কৈলাসডাক্তার। কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হল।

পরের দিন। দিনটা আজ ভাল নয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আছে। কানাইবাবু এসে কৈলাসডাক্তারকে জানালেন — সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গেছে। জগৎ ঘোষের মেয়ে। সুকুমার এবং আর সবারও পছন্দ হয়েছে। বংশের শিক্ষায় ও গুণে কোন ত্রুটি নেই।

কৈলাস ডাক্তার বললেন — বুঝলাম, তোমরা কল্পতরুর সন্ধান পেয়েছ, সুখবর।

— আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্বাদ করতে যেতে হবে।

— তা, যাব।

যদুডোম এসে তখুনি খবর দিলে, তিনটে লাল এসেছে ময়না তদন্তের জন্য। কৈলাসডাক্তার বললেন — চল রে যদু। এখনি সেরে রাখি। রাত্রে আমার নানা কাজ রয়েছে।

ময়না ঘরে এসে কৈলাসডাক্তার বললেন — বড় মেঘলা করেছে রে। পেট্রোমাক্স বাতি দুটো জ্বেলে দে।

যন্ত্রপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন — রাত হবে নাকি রে যদু?

— আজ্ঞে না। দুটো আগুনে পোড়া লাশ, পচে পাঁক হয়ে গেছে। ও তো জানা কেস, আমি চিরে ফেড়ে দেব। বাকি একটা শুধু ....।

— নে কোনটা দিবি, দে! কৈলাসডাক্তার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

লাশের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাসডাক্তার চমকে উঠলেন — অ্যাঁ, এ কে রে যদু?

যদু ততক্ষণে আলগোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাসডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বললো — হ্যাঁ হজুর, তুলসীই, সেই ভিখিরী মেয়েটা।

কৈলাসডাক্তার বোকার মত যদুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যদু চটপট হাত চালিয়ে তুলসীর নোংরা শাড়ীটা আর গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই কৈলাসডাক্তার বললেন — যাচ্ছিস কোথায়? স্পিরিট দিয়ে লাশটা মোছ ভাল করে। ইউক্যালিপটাসের তেলের বোতলটা দে। কিছু কর্পুর পুড়তে দে, আরও একটা বাতি জ্বাল।

— ওয়ান মোর আনফর্চুনেট।

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিল। তুলসীর লাশে হাত দিলেন কৈলাসডাক্তার।

করাতের দু'পোঁচে খুলিটা দুভাগ করা হল। কৈলাসডাক্তারের হাতের ছুরি ফোঁস ফোস করে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চললো লাশের উপর। গলাটা চিরে দেওয়া হল। সাঁড়াশি দিয়ে পটপট করে পাঁজরাগুলো উল্টে দিলেন কৈলাসডাক্তার।

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাসডাক্তার দেখলেন, নিশ্চল দুটি কণীনিকার যেন নিদারুণ কোন অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছে। শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের শ্বেতপটল। সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিষণ্ণ।

— ইস, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাসডাক্তার বললেন।

যদু বললো — হ্যাঁ হুজুর, কাঁদবেই তো। সুইসাইড কিনা। করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।

— গলা টিপে মারেনি তো কেউ? কৈলাসডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কৈ কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, শ্বাসবহা নালিটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিকা।

— এত লালা! মরবার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরে।

— হ্যাঁ হুজুর, ভিখিরি তো খেয়েই মরে।

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাসডাক্তার। তাঁকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধুর, কত রূপাজীবা নটীর লাশ পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ, ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত।

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাসডাক্তার তাকিয়ে রইলেন — প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশির জাল।

কৈলাসডাক্তার তেমনই বিমুগ্ধ হয়ে দেখলেন — থরে বিথরে সাজানো সারি সারি রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাসডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে আর দুচোখ অপলক করে দেখতে থাকেন — খণ্ডস্ফটিকের মত পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুটধমনী। সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা ঝাঁপিখোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাসডাক্তার। কুৎসিতা তুলসীর এই রূপের পরিচয় কে রাখে? তবুও এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদা। নতুন অনুরাগের তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন। যাক্

কৈলাসডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যদু বললো — এ সবে কোন জখম নেই হজুর। পেটটা দেখুন।

ছুরির ফলার এক আঘাতে দুভাগ করা হল পাকস্থলী। এইবার কৈলাসডাক্তার দেখলেন, কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাথা একটা অজীর্ণ পিণ্ড — সন্দেহ পাউরুটি আর ... আর বেলেডোনা।

— মার্ডার।

হাতের ছুরি খসে পড়লো মেঝের ওপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাসডাক্তার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাসডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো দপ দপ করে। পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়লো মেঝের ওপর।

হঠাৎ ছটফট করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাসডাক্তার। ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কন বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন, পরিশুল্কে ঢাকা সুডৌল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর, মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট ও কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে একটি শিশু এশিয়া।

আবেগে কৈলাসডাক্তারের ঠোঁটটা কাঁপছিল থরথর করে। যদু এসে ডাকালো — হুজুর।

ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে তিনিই সহিসের পাশে বসলো।

নিতাই জিজ্ঞেস করে — এত দেরী কেন রে যদু?

— শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

৪১.৫ সারাংশ

একটি মধ্যবিত্ত বাড়ির এক অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে সুকুমার। বাবা কৈলাসবাবু মফঃসল শহরের সরকারী ডাক্তার। বাড়ির অন্য সকলে গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের লোকজন যেমন হয়, তেমনই। ব্যতিক্রম শুধু সুকুমার। অকৈশোর ব্রহ্মচর্য এবং সংযম তার বাতিকে পরিণত হয়েছে। তার বাবার মতে সেটা আসলে নিরামিষভোজী সুকুমারের শরীরে প্রোটিন পদার্থের ঘাটতিজনিত কারণে। এ হেন সুকুমার পড়াশুনো শেষ করে চাকরী পাবার পথে। হবু-মুন্সেফ সায়েবের জন্য পাত্রী খোঁজ শুরু হয় কাজেকাজেই। আপাদমস্তক ব্রহ্মচর্যের বর্ম-আঁটা সুকুমারকে সংসারদুরস্ত জ্ঞানগম্যি দেবার জন্য তার জামাইবাবু কানাই তাকে নভেল পড়ান, সিনেমায় নিয়ে যান জোর করে। প্রথম প্রথম সুকুমার রাগ-বিরক্তি দেখালেও অচিরেই নমনীয় হয়ে আসে এবং বাড়ির লোকে প্রবল উদ্যমে পাত্রী দেখতে ও সুকুমারকে দেখাতে থাকেন।

॥ ২ ॥

মূল সমস্যার সূত্রপাত এইখানে। পিসিমা, মা, বোন, দিদি, জামাইবাবু মায় বাড়ির পুরনো পরিচারিকা অবধি প্রত্যেকেই নিজস্ব নানান মাপকাঠিতে সম্ভাব্য পাত্রীদের দোষগুণ নির্ণয় করে সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করতে চান। সঙ্গে মদত জোগান কুলপুরোহিত, এমনকি এক দৈবজ্ঞ পণ্ডিতও। এঁদের বহুবিচিত্র চাহিদা এবং নানাবিধ মানদণ্ডে বিচারের ফলে পাত্রের পিতা হিসেবে কৈলাসবাবু একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েন। কারুর বক্তব্য সুন্দরী বউ আসা দরকার, কেউ চান বংশগৌরবসম্পন্না কনে, কারুর অভিপ্রায় ভাল মতো পাওনা-থোওনা, কারুর আর কিছু। কেবলমাত্র সুকুমারেরই মন বোঝা দায়, সে যে কী চায়, তা বোঝা দুরূহ। ফলে পুতুলসাজানো পনের বছর বয়সী বনলতা মুহুরীর মেয়ে বলে নাকচ হয়ে পিসিমার কাছে; সুকুমারও মুখবার করে থাকে, অর্থাৎ অপছন্দ। দেবপ্রিয়া ভাল গান গায় বটে, কিন্তু সে হল মেদস্বিনী পৃথুলা এবং মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখচোক। সুতরাং সেও নাকচ। অনুপমা শিক্ষিতা এবং সুশ্রী, কিন্তু অতযন্ত রোগাটে চেহারার মেয়ে, তার ওপরে বাপের কৃপণতার অখ্যাতি আছে। অতএব প্রথম কারণে সুকুমারের, দ্বিতীয় কারণে পিসিমার আপত্তি। সুতরাং বাতিল সেও। মমতা স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু পুরুষালি অপেলব চেহারা, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা। অবশ্য স্পোর্টসে প্রাইজ পাওয়া মেয়ে। কিন্তু সেটা তাকে পাশমার্কা পাওয়ালো না পিসিমা, মা, রাণু, সুকুমার — কারুর কাছেই।

কৈলাসবাবুর গায়ের রংও হাকুচ কালো — মন্দ লোকে নষ্টামি করে তাঁকে ‘‘জিভ কালো ডাক্তার’’ বলেও উল্লেখ করে। তিনি আদৌ বুঝতে পারেন না বাড়ির লোকের কাছে সৌন্দর্যের বিচারটা ঠিক কীভাবে হয়। ফলে স্ত্রীর সঙ্গে বিতণ্ডা এবং পাত্রীনির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাঁর অব্যাহতি লাভ। ওদিকে সুকুমার ছোট বোন রাণুর মারফতে প্রায়ই ভয় দেখায় যুদ্ধের চাকরী নিয়ে চলে যাবে (এই গল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন)।

॥ ৩ ॥

এরই পাশাপাশি, আর একটি কিশোরী মেয়েও বারবার এসে উপস্থিত হয় কাহিনীর মধ্যে। তার নাম তুলসী — কুষ্ঠরোগী হাবু আর বেদেনী হামিদার মেয়ে।

ভিখারিনী কিশোরীটিকে কুদর্শনা বললে খুব কমই বলা হয় তার চেহারার সম্পর্কেঃ ‘‘বছর চৌদ্দ বয়স,

তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মতো কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার বেঢপ খুলিটা যেন একটা চোট লেগে টেরে-বেঁকে গেছে। বড় বড় দাঁত, যেন একটা জন্তুর হিংসে ফুটে রয়েছে। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙে চুরে গেছে, ছন্নছাড়া বিক্ষোভে।''

এই তুলসী প্রথমবার কৈলাসবাবুর বাড়ি আসে বাপ-মায়ের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট চাইতে, যাতে ওরা মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পিছনে থাকতে পারে। এরপর থেকে মাঝে মধ্যেই তুলসীকে দেখা যায় — কৈলাসডাক্তারেরও নজরে পড়ে বাড়ির আশেপাশে যে ঘোরাঘুরি করে, বসে থাকে বাগানে। একদিন তাকে দেখা গেল ক্ষিপ্ত মূর্তিতে ঢিল ছুঁড়তে — যদু ডোম এবং নিতাই সহিস ঠেকাতে গেলে তাদের হাতে কামড়েও দেয় সে। এর আগে একবার অবশ্য কৈলাসবাবুর নজরে পড়েছিল ঐ নিতাই এবং যদু তুলসীর সঙ্গে বসে-বসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে। আজকে একেবারে অন্য মূর্তি। এরও পরে এক সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফিরে কৈলাসডাক্তার দেখলেন চোরের মতো পা টিপে টিপে অন্ধকারে ফটক খুলে সরে পড়ছে তুলসী। তাঁর রোগী দেখার জন্য বৈঠকখানা ঘর, সুকুমারের পড়ার ঘর সব খোলা পড়ে রয়েছে। তাঁর ঘরটা তছনছ হয়ে রয়েছে, হারিয়েছে নতুন কোন বেলেডোনার শিশিটা। বিশেষ কিছু চুরি টুরি হয়নি অবশ্য।

এইসব তুলসী-কাণ্ডের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে সুকুমারের বিয়ের তোড়জোড়। স্ত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে নিয়ে ঝগড়া করে কৈলাসডাক্তার অবশয রেহাই পেয়েছেন পাত্রী বাছাইয়ের জটিল দায়িত্ব থেকে। কারণ, বাড়ির সকলের সঙ্গে সুন্দরের সংজ্ঞা নিয়ে তাঁর প্রবল মতানৈক্য! চুল কালো হলে সুন্দর, আর চামড়া কালো হলে নয় — এই ব্যাসকূট কৈলাসবাবু বুজে উঠতে পারেন না। অবশেযে তাঁকে বাদ দিয়েই অন্যরা সুন্দরী সুপাত্রীর সন্ধান জোটান মায়, আশীর্বাদেরও তারিখ ঠিক হয়ে যায়।

যে রাত্রে কন্য আশীর্বাদের বন্দোবস্ত হয়, ঠিক সেদিন সন্ধ্যাতেই সরকারী ডাক্তার কৈলাসবাবুর ডাক পড়ে শহরের মর্গ থেকে — তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ময়নাতদন্তের জন্য। সেখানেই আচমকা, অবিশ্বাস্যভাবে তুলসীর মৃতদেশের সম্মুখীন হলেন তিনি কৈলাস ঃ স্তম্ভিতপ্রায় বিমূঢ়তার মধ্যে কৈলাসবাবু আবিষ্কার করেন তুলসীর কুৎসিৎ-দর্শন বহিরঙ্গের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য, এবং তার পাকস্থলীর মধ্যে পাউরুটি -সন্দেশ-বেলেডোনার দলা; .... এবং একটি প্রস্তুয়মান মানব-ভ্রূণ। অপলক দৃষ্টিতে কৈলাস তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। মর্গের দরজার পাল্লার ওপর থেকে সরকারী ডোম যদু এবং ডাক্তারের টমটম গাড়ির সহিস নিতাই নিজেদের মধ্যে সবিদ্রুপ-রসিকতায় মেতে ওঠে ঃ ''শালার বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।''

৪১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পের বিশ্লেষণ করতে হলে অনিবার্য ভাবেই সেটি দ্বিমাত্রিক হয়ে পড়বে। একদিকে রয়েছে এর সামাজিক দিক, অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক একটি প্রেক্ষিত। সমাজ-মনস্তত্ত্ব এবং ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব-এ দুইয়েরই অন্বেষণ এই কাহিনীর মধ্যে করতে হয়। সুকুমারের জন্য বিয়ের পাত্রী খোঁজার আপাত-হাস্যকর পরিস্থিতির আড়ালে যে নির্মম সামাজিক মানসিকতাটা লুকিয়ে রয়েছে, তাকে আমাদের সামনে অনাচ্ছাদিত করে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ বারবারই। বংশকৌলীন্য, কাঞ্চনকৌলীন্য ইত্যাদি তো আছেই; তারই সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারবাবুর বোন, স্ত্রী, কন্যা মায় প্রাচীনা পরিচারিকা পর্যন্ত (পুরোহিত-দৈবজ্ঞদের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া হয়) যেভাবে আরো নানান চাহিদার ফর্দ বাড়িয়ে গেছেন ক্রমান্বয়ে, তাতে তাঁরা যে ঠিক কী চান — সেটা বুঝে ওঠা নেহাৎই কঠিন। রূপ-লাবণ্য নিয়েও তাঁদের যে-বহুবিধ খুঁতখুঁতুনি, সেটাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

আসলে, আমাদের সামাজিক কাঠামোয় মেয়েদের যে এক ধরনের 'বিড়ম্বনা' (অথবা, অর্থনীতির পরিভাষায় বললে — 'ভোগ্যপণ্য', ওরফে 'কমোডিটি') বলেই গণ্য করা হয় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই, এই গল্প তার সপক্ষে একটি তাৎপর্যময় দলিল হয়ে আছে। এইজন্য কনের তথাকথিত সৌন্দর্য, তার পিতার অর্থ-সামর্থ্য এবং জাঁক করে বলার মতো পারিবারিক পরিচয়কে এত বড় করে দেখা হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, মেয়েদের এই অবমাননার (না-কি, অবমূল্যায়নের) মূল হোত্রী কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোদ মেয়েরাই। এই গল্পের পিসিমা-প্রমুখ পার্শ্বচরিত্রগুলি তারই প্রমাণস্বরূপ।

সমাজ-মানসিকতার এই কদর্য দিকটি যেমন এ গল্পে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে একদিকে, অন্যদিকে তেমনই আবার এক জাতীয় শ্রেণীশোষণও এর মধ্যে রূপায়িত। মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রে যে সবসময়েই একটা টানাপোড়েন বা স্ব-বিরোধী প্রবণতা থাকে, তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ এখানে স্বয়ং কৈলাসডাক্তার। তিনি সৌন্দর্যের অলীক মানদণ্ড হাতে নিয়ে বিচার করেন না, ফর্দ মিলিয়ে যে রূপ লাবণ্যের হিসেব হয় না, তা তিনি স্পষ্টই বলেন এবং এই সব নিয়ে বাড়ির আর সকলের সঙ্গে তাঁর বিরোধটাও বেড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে।

এরই অনুষঙ্গে 'সুন্দর' কী — সেই অত্যন্ত জটিল প্রশ্নটি অনিবার্য হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে 'সুন্দর' কথাটি একান্তভাবেই আপেক্ষিক, কেননা, একের চোখে যা সুন্দর, অন্যের চোখে তা আদৌ সুন্দর না হতেও পারে। ঠিক একই রকমের মতপার্থক্য 'অসুন্দর' বা কুৎসিৎ সম্পর্কেও ঘটতে পারে। এই সত্যটিকেই এই গল্পের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিভাজনের প্রেক্ষিতে সংঘটিত একটি গুরুতর নৈতিক অপহ্নবের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ব্যক্ত করেছেন। সুন্দর কী; সৌন্দর্য কাকে বলে? কৈলাস ডাক্তার নানাভাবে সে প্রশ্ন কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। যেমন—

ক — ''চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত — এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে শাশ্বত কালি দিয়ে?''

খ — (কানাইবাবু অ্যানথ্রপলজিস্টদের মত উদ্ধৃত করার চেষ্টা করে মানুষের রূপের স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে অভিমত দেবার প্রয়াস পেলে, তার জবাবে) ''আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়নাঘরে। দুটো লাশের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রাল। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ।''

গ. — ''প্রবালপুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সূক্ষ্ম কৈশিক জাল। ... কুৎসিতা তুলসীর এই রূপের পরিচয় কে রাখে?'

মানুষের রূপের বহিরঙ্গ যেটা সেটা সাজসজ্জা, রং-পালিশে আপাত-মনোহারী করে তোলা যায়। কিন্তু বহিরঙ্গে চূড়ান্ত কুৎসিত তুলসীর ব্যবচ্ছিন্ন মৃতদেহের অন্তর্লোকে যে সুস্বাস্থ্য এবং পবিত্র রূপটি লুকিয়ে আছে মানুষের আসল সৌন্দর্য সেখানেই, কৈলাসডাক্তারের এই অনুভবটুকুকে লেখকও প্রচ্ছন্ন সমর্থক জ্ঞাপন করেছেন। রূপাজীবা নটী কিংবা রূপসী কূলবধুর মৃতদেহেরও ময়নাতদন্ত করেছেন কৈলাস; তাদের কারুরই ব্যবচ্ছিন্ন শবের অভ্যন্তরে 'কুদর্শনা' এই তুলসীর মতো 'ভিন্নতর' সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি পাননি। তাই, এই প্রেক্ষিতে সৌন্দর্য কাকে বলে — সে বিষয়ে এক বিচিত্র অভিজ্ঞানকে খুঁজে পেয়েছেন কৈলাস; এবং অবশ্যই লেখকও।

এই অনুষঙ্গেই 'সুন্দরম' শব্দটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও বিচার্য। এই গল্পের নাম 'সুন্দর' হলে সেই তাৎপর্য অণ্বেষণের কোনো প্রয়োজন ঘটত না। কিন্তু নাম যেহেতু 'সুন্দরম' — তাই সেই শব্দের ব্যঞ্জনা কী, 'সুন্দর' শব্দের প্রচলিত ব্যাখ্যানের মাধ্যমে সেটা অনুভব করা সম্ভব নয়।

''সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম''—ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পরম্পরায় এই কথাটি বহু-প্রচলিত, বহুল-প্রচারিত। যা 'সত্য', তাই মঙ্গলময় (অর্থা, 'শিব') এবং সেটিই হল সুন্দর। সত্য, শুভ এবং সুন্দরের এই অভিন্নতার ধারণাকে এখানে তির্যক বিদ্রূপে খানখান্ করে ভেঙে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। এই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 'সত্য' মানেই যে — 'সত্য' মাত্রেই যে, মঙ্গলসূচক নয়, সুন্দরও নয় — পরোক্ষ ইঙ্গিতে সেই নির্মম কথাটিই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন গল্পের এমন শিরোনামের মাধ্যমে। তুলসীর প্রতি যে ভয়ঙ্কর এক অন্যায় করা হয়েছে, কাহিনীর শেষ পর্বে তো তা দিবালোকের মতোই সুস্বচ্ছ। কিন্তু সেই 'সত্য' (কঠিন নিশ্চয়!)কিন্তু মঙ্গলপ্রদ কিংবা সুন্দর নয়। 'সুন্দরম নামের এমন তির্যক প্রয়োগের সাহায্যে তিনি সেটিই মর্মান্তিক শ্লেষের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। যে তিক্ত বিদ্রূপ যদু ডোমের কণ্ঠে ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠেছে গল্পের শেষ পংক্তিতে। ঠিক তারই সমধর্মী একটি ধিক্কার যেন এই 'সুন্দরম' শব্দের মাধ্যমে সুবোধবাবুর কলমে ঝড়ে পড়েছে।..... হয়ত 'সুন্দরম।'' কিংবা 'সুন্দরম?' এই চেহারায় এ গল্পের নামকরণটা করলে তাঁর অভীষ্ট শ্লেষের ব্যঞ্জনাটুকু সোচ্চারভাবে ফুটে উঠত। কিন্তু তা না করে, তিনি ওটুকু পাঠকের অনুভবশক্তির ওপর ভরসা রেখে সাদামাটা ভাবেই শুধু 'সুন্দরম' লিখে ছেড়ে দিয়েছেন।

গল্পের মধ্যে আরও একটি গভীর ব্যঞ্জনাবহ সংকেত অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন সুবোধ ঘোষ। তুলসীর গর্ভস্থ ভ্রূণটিকে একটি অপ্রত্যাশিত বিশেষণে মণ্ডিত করেছেন তিনি ঃ (শিশু) এশিয়া। এই আপাত অসংলগ্ন শব্দটি ব্যবহার করে তিনি আর এক ব্যঞ্জনায় শোষণ ও প্রতারণার বিরুদ্ধে বাঙ্ময় হয়েছেন। ধর্ষিতা এবং প্রতারিতা ভিখারিণী কিশোরী তুলসীর ভ্রূণদেহী সন্তানকে ''এশিয়া'' বলে অভিহিত করে, সাম্রাজ্যবাদের কাছে লাঞ্ছিত এশিয়ার মানুষের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। গভীর তাৎপর্যময় এই শব্দটি এখানে কাহিনীকে একটা অন্যতর মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে সন্দেহ নেই।

[প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতিকালে সুবোধ ঘোষের গল্পসমগ্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ''এশিয়া'' শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে ''আশা'' রূপে। এই রূপান্তরণ কেন এবং কীভাবে, তার কিছু ব্যাখ্যানেই। এটা সুবোধবাবুর অনুমোদিত কি-না, সেটিও অনুল্লেখিত। এর ফলে গল্পের একটি বিশিষ্ট ভাবমাত্রার ব্যঞ্জনা পরিবর্তিত হয়েছে অবশ্যই। 'আশা' কেবলমাত্র তুলসীর অবোধ-ভাবনার প্রেক্ষিতেই ব্যঞ্জনাময়। কিন্তু 'এশিয়া'-র ভাবগত সংকেত সুদূরবিস্তারী।]

এই গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সুকুমার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার (আপাত) ব্রহ্মচর্যের ভড়ং করা তারপরে দু-চারটে নভেল পড়ে এবং সিনেমা দেখেই জীবনের ভোগ-সুখ ইত্যাদিতে আগ্রহী হওয়া, রূপসী পত্নী না-জুটলে যুদ্ধে সার্ভিস নেবার ভয় দেখানো বাড়ির লোককে এবং রূপ-গুণ-বংশকৌলীন্য-বিত্তস্বাচ্ছল্য ইত্যাদির জন্য তাঁদের বাছাবাছির বিলম্ব সইতে না-পেরে কুৎসিতা ভিখারিণী কিশোরী (যে, কুষ্ঠরোগীর কন্যাও বটে) তুলসীকে প্রলুব্ধ করে তার সর্বনাশ করা এবং পরিশেষে কেলেংকারি ঢাকতে তাকে গর্ভবতী অবস্থায় খুন করা — ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরার মধ্যে সুকুমারের চরিত্রের ভণ্ড, কামুক এবং হিংস্র রূপগুলি পরের পর ঝিলিক দিয়ে যায়। সুবোধবাবুর অসামান্য শিল্পকৃতিত্ব এইখানেই যে, গল্পের শেষ পংক্তিতে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত সুকুমারের এই মুখোসটা খসে পড়ে না। একটা বিচিত্র উৎকণ্ঠা কাহিনীর শেষ পর্যন্ত তিনি টানটান করে রেখেছেন — বিশেষত তুলসীর অপঘাতে মৃত্যু এবং তার গর্ভে মৃত ভ্রূণ দেখার পর থেকে। অথচ এই

কাহিনী শুরু হয়েছিল বেশ একটা হালকা পরিহাস বিজল্পিত ভঙ্গীতেই — বিশেষত সুকুমারের ব্রহ্মচর্য পালনের হাস্যকর ভড়ঙের বর্ণনার অনুষঙ্গে।

বারংবার পাত্রী দেখানোর যে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই গল্পের মধ্যে ক্রমান্বয়ে করা হয়েছে, সেখানেও এই ধরনের ব্যঙ্গ মনস্কতার ইঙ্গিত মেলে। আবার তারই পাশাপাশি সুকুমারের পিসি, মা, বোন, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ প্রমুখের কথাবার্তার মাধ্যমে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের ঠিক কথখানি অবমাননা সইতে হয় এবং ছেলের বিয়ে উপলক্ষে কেমনভাবে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যার মালিকানা অর্জনের লোলুপ অপচেষ্টা চলে, তারও নিখুঁত এবং তীব্র প্রতিবেদন করেছেন গল্পকার। আর সেই সূত্রেই এইসব পার্শ্বচরিত্রগুলির ছোট-ছোট স্কেচ এঁকে গেছেন তিনি। মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে যেসব হীনতা, লোভ এবং দৈন্য লুকিয়ে থাকে, তাদেরকে অনাবৃত করে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ এভাবেই।

মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের আরেকটি দিকের প্রতিনিধি হলেন কৈলাস ডাক্তার। তিনি উদারচেতা, স্পষ্টবক্তা এবং সংস্কারবিমুক্ত মানুষ। পরোপকারী, দয়ালু এবং সংবেদনশীল এক জনহিতব্রতী চিকিৎসক। সুকুমারের ব্রহ্মচর্যের নামে আধ্যাত্মিক ভাবালুতার ভণ্ডামি, বাড়ির সকলের হীনতা-দীনতা-লোলুপতা এবং নারীর রূপ-সম্পর্কে অনির্দেশ্য কিছু বিচারপদ্ধতির অসারতা — এই সমস্ত কিছু ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ, নিশ্চয়ই তাঁকে তাঁর ছেলের বিপ্রতীপ মেরুতে প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুত, মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে যে একটি প্রতিবাদী প্রগতিশীল মানসিকতা ক্রিয়াশীল থাকে, সেটারই প্রমাণ হিসেবে কৈলাসবাবুকে গ্রহণ করলে ভুল হবে না।

আর্ত-সামাজিকভাবে অবরবর্গীয় — সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় সাব-অল্টার্ন-বলে গণ্য যে — চরিত্রগুলি গণ্য এই কাহিনীতে, তাদেরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই তুলসী। অবশ্য এই গল্পের কোথাও তার মুখে একটি শব্দও শোনানি আমাদেরকে লেখক, যদিচ পরিণামে তার মাধ্যমেই তারসপ্তকে বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে লেখকের অভীপ্সিত বক্তব্য। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যৌবনতৃষ্ণা এবং বোধবুদ্ধির ক্ষীণতা — এই সব কিছু একসঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে তার 'প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করে।'' তুলসীর জীবনের যে করুণ এবং ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি, তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী অবশ্যই সুকুমার, পরিণাম বোধহীন, নাবালিকা তুলসীর দায় সেখানে অনেক লঘু। তবে, সুকুমার এখানে একক নয়; তুলসীর এই মর্মান্তিক পরিণতির অন্তরালে ডাক্তারবাবুর বাড়ির সকলের দায়িত্বও কিছু কম নয়। তাঁদের খুঁতখুঁতানি এবং মাত্রাছাড়া 'লাভের' আকাঙ্খার ফলে সুকুমারের বিয়েটা পেছিয়েছে যতই, ততই ভিতরে-ভিতরে সুকুমারও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য সুকুমারের 'রূপ-তৃষ্ণা'-ও তার বিয়ের ফুল ফোটার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে।

এইখানেই মানবচরিত্রের এক বিচিত্র এবং অব্যাখ্যেয় রহস্য লুকিয়ে আছে। বনলতা, দেবপ্রিয়া, মমতা প্রমুখ মেয়েরা তার পছন্দ হয়নি তার এবং তার বাড়ির লোকের বিচারে 'সুন্দরী' নয় বলে। অথচ সর্বজনীন নিরিকেই কুরূপা বলে গণ্য তুলসীকে উপলক্ষ করে তার কাছে প্রত্যাশিত সুশালীন নৈতিকতা এবং সংযমবোধ চুরমার হয়ে গেল — যার মর্মন্তুদ পরিণাম তুলসীর গর্ভবতী হওয়া এবং (বিষাক্ত) সুখাদ্যের প্রলোভনে অপঘাতে মরা।

তুলসী হতদরিদ্র এবং একান্তই অসহায় একটি পরিবারের কন্যা হওয়ার ফলেই সুকুমারের পক্ষে তাকে এভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল যে, তাতে সংশয় নেই। ফলত, সুন্দর-অসুন্দর নিয়ে সুকুমারের যে-বাছবিছার দেখা গেছে, সেটা যে নেহাৎই ঠুনকো এবং ভিত্তিহীন তাও এর থেকে প্রতীয়মান হয়েছে।

তুলসীকে লালসার শিকার বানিয়ে, তারপর সমস্ত ঝামেলা এড়ানোর সহজ পন্থা হিসেবে সুকুমার তাকে বেলেডোনা খাইয়ে হত্যা করে — এটাকে শ্রেণীগত চরিত্রলক্ষণ বললে হয়ত একটু বেশিই বলা হবে। তবে খুন করার ব্যাপারটুকু ছাড়া বাকিটার মধ্যে মধ্যবিত্তের ধূর্ততা প্রতিভাত হয়েছে যে, সেটা অবশ্য বলাই যায়। মনোবিজ্ঞানীরা 'কপ্রোফিলিয়া' বলে এক ধরনের বিকারের কথা বলেন, যার ফলে যৌনাবদমন-জনিত কাররে হতকুৎসিতের প্রতিও এক সময়ে আকর্ষণ জন্মাতে পারে। সুকুমারও তেমন মনোবিকারগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

অবরবর্গীয় অন্য চরিত্রদুটির মধ্যে নিতাই সহিসকে মোটামুটিভাবে অপ্রাসঙ্গিক বলেই গণ্য করা যায়। কিন্তু যদু ডোম সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। কাহিনীর সমাপ্তির মুহূর্তে তার অনুচ্চ কণ্ঠে যেন স্বয়ং মহাকাল তাঁর ক্রুদ্ধ বিদ্রুপ এবং ঘৃণা উদ্‌জীবিত করে দিয়েছেন ঃ ''শালার বুড়ো নাতির মুখ দেখছে রে।'' শেষ বিচারে সে, নিতাই এবং তুলসী যে একই শ্রেণী সীমানার অন্তর্গত এটা মনের গভীরে যদু ডোমের অনুভব না করার কথা নয়। সেই অনুভূতি, রূপান্তরিত হয়েছে তুলসীর প্রতি আর্থ-সামাজিক শ্রেণীতে প্রবল এক সহানুভূতিতে। তাই কৈলাসডাক্তার যত ভাল লোকই হোক না কেন, শেষ বিচারে তিনিও তো সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই মানুষ—যারা চিরকালই যদু-তুলসীদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়ে আসছে একদিকে; অন্যদিকে নির্মমভাবে শোষণও করে আসছে। যদুর এই তীব্র ঝাঁঝের বিদ্রুপ তাই কেবলমাত্র আঁশটে রসিকতা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আকণ্ঠ ঘৃণা এবং প্রতিবাদেরও দ্যোতক বলেই বুঝে নিতে হবে। মুখে হরহামেশা ''হুজুর' বলে কৈলাসকে সম্বোধন করে বিনয় এবং সম্ভ্রম দেখানোর ভাণ করে সে ঠিকই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই নম্রতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক অতলান্ত ঘৃণা এবং আক্রোশ। সেটা 'ব্যক্তি' কৈলাসের প্রতি নয়, তিনি যে আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত, তার প্রতি। 'ব্যক্তি' কৈলাসকে (সম্ভবত) যদু-নিতাইদের অপছন্দ করার কোনো প্রত্যক্ষ হেতু নেই, কিন্তু সে-মুহূর্তে তাদের মনে পড়ে তিনি 'সুকুমারের বাবা'— তখনই মনের গহনে তাঁর সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট বিরূপতা সঞ্জাত হয়। সুকুমার যেহেতু এখানে প্রতিভাত হচ্ছে, তাদের কাছাকাছি থাকা আর্থ-সামাজিক স্তরভুক্ত একটি নিরপরাধ কিশোরীর ধর্ষক এবং হত্যাকারী রূপে, তখন সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিই তাদের এক ধরনের অসহায় কিন্তু অপরিমিত আতীব্র আক্রোশ বিষিয়ে দেয় সমস্ত মানসিকতাটাকে; আর সেটারই প্রকাশ ঘটেছে যদূর ঐ শ্লেষতিক্ত টিপ্পনীর প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে। মাত্র একটি ছয় শব্দের বাক্যের মাধ্যমে এমন একটা প্রচণ্ড শ্রেণীবিরোধের মানসকিতাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়াটা নিঃসন্দেহে লেখকের অসাধারণ দক্ষতার দ্যোতনা বহন করে।

এই আলোচনা সাঙ্গ করার আগে আরো একটি বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলা বাঞ্ছনীয়। তুলসীর ময়নাতদন্তের যে-অণ্বিষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ, তার মধ্যে একই সঙ্গে ভাষাকুশলী এক শিল্পীর দক্ষতা এবং শারীরবিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন মানুষের পাণ্ডিত্য সুসমন্বিত হয়ে উঠেছে। ডাক্তারী শাস্ত্রে প্রচলিত লাতিন নামগুলির বদলে চরক-সুশ্রুতের প্রাচীর গ্রন্থে প্রাপ্য। সংস্কৃত শারীরবিদ্যাকেন্দ্রিক শব্দাবলীর এই সুষ্ঠ প্রয়োগ — মৃতদেহের ময়নাতদন্তের মতো একটা বীভৎস রকমের অস্বস্তিকর ব্যাপারকেও শিল্পরসেমরিডত করতে পেরেছে। পাঠকের কাছে সেটা অবশ্যই অতিরিক্ত একটা পাওনা অবশ্যই।

৪১.৭ অনুশীলনী

□ বিস্তৃত আলোচনামূলক □

১) 'সুন্দরম' শিরোনামটি গল্পের পক্ষে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বলুন।

২) সুন্দরের সংজ্ঞা কৈলাস ডাক্তারবাবুর উপলব্ধিতে কীভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে, আলোচনা করুন।

৩) 'সুন্দরম' গল্পে সমাজ-মন এবং ব্যক্তিমন কীভাবে দুয়েরই বিকলন করেছেন সুবোধ ঘোষ, আলোচনা করুন।

৪) সুকুমার ছেলেটি শয়তান, না মনোবিকারগ্রস্থ — বুঝিয়ে বলুন।

৫) তুলসীর জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য সুকুমারদের পরিবার এবং সুকুমার স্বয়ং, কার দায়িত্ব বেশি, কার কম, আলোচনা করুন।

৬) 'সুন্দরম' গল্পের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক কূটেষণা প্রবলতর শক্তি হিসেবে প্রতীত হলেও, আর্থ-সামাজিক বিভেদের শ্রেণীচেতনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় — আলোচনা করুন।

৭) কৈলাস ডাক্তার এবং তাঁর ছেলে সুকুমার, মানুষ হিসেবে দুটি পরস্পর-বিপ্রতীপ অবস্থানে আছেন; একই পরিবেশে, একই পরিবারের পরস্পরার মধ্যে থেকেও এই বৈপরীত্য কেন, বুঝিয়ে বলুন।

৮) ''সুবোধ ঘোষের ভাষাশৈলী একটি অনন্য মাত্রায় উপনীত হয়েছে 'সুন্দরম' গল্পে।'' —আলোচনা করুন।

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) যতগুলি মেয়েকে সুকুমারের সম্ভাব্য পাত্রী হিসেবে দেখা হয়েছিল, তাদেরকে কী কী ছুতো দেখিয়ে অমনোনীত করা হয়?

২) সুকুমারের 'ব্রহ্মচর্য' কীভাবে চলত, বলুন।

৩) 'পুরুতমশাই' এবং 'দৈবজ্ঞী' সুকুমারের বিয়ে সম্পর্কে কী কী অভিমত দিয়েছিলেন বলুন।

৪) কানাইবাবুর তালিমে সুকুমারের কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

□ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক □

১) ''অদ্ভুত আত্মিক শক্তির রেচকস্পর্শ'' সুকুমার কোথায় কোথায় অনুভব করেছিল?

২) সুকুমার সম্পর্কে তার বাবা কী বলতেন?

৩) কানাইবাবু সুকুমারকে কোন সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন?

৪) বনলতারা কোথায় থাকত?

৫) সিনেমায় কার নাচ পছন্দ করত সুকুমার?

৬) তুলসীরা কোথায় থাকতে চেয়েছিল?

৭) অনুপমা সম্পর্কে রাণু কী মন্তব্য করেছিল?

৮) সুকুমার কোথায় চাকরি করতে যাবে বলেছিল?

৯) কৈলাসবাবুর ডিসপেনসারী থেকে কী হারিয়েছিল?

১০) সুকুমারের কার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ের ঠিক হয়?

১১) কৈলাস ডাক্তার কিসের পাকা জহুরী?

১২) পোখরাজের দানার সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে?

১৩) 'সুন্দরম' গল্পের ঘটনাকাল কখন?

১৪) তুলসী কবে মারা গিয়েছিল?

১৫) তুলসী কার মেয়ে?

১৬) ক্লোমরসে মাখা কিসের পিণ্ড পাওয়া গিয়েছিল?

৪১.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের শেষাংশ অনুসরণে উত্তর করুন।

২) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের প্রথম অংশ অবলম্বনে উত্তর দিন।

৩) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। সেটি অনুসরণ করে উত্তর দিন।

৪) মূলপাঠ এবং আলোচনার প্রথম পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। তার সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরী করুন।

৫) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। তার সাহায্যে উত্তর দিন।

৬) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। তার সাহায্যে উত্তর দিন।

৭) কৈলাস ও সুকুমারের বিপ্রতীপ অবস্থানের কারণ দু'জনের বয়স ও জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা। প্রথমজন ডাক্তার ও লাসকাটা তার অন্যতম কাজ। তিনি মন-নিয়ে চর্চার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিকের

দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনকে দেখেছেন। সুকুমার অস্বাভাবিক ধ্যান ধারণার বশবর্তী। আশৈশব সনাতন জীবন যাপন করেছে। কতকগুলি অন্ধ প্রত্যয় নিয়ে। বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে শেষে উপলব্ধি করেছে —মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

৮) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ে 'সুন্দরের' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ অবলম্বনে উত্তর তৈরী করুন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) মূলপাঠ অনুসরণে বনলতা, দেবপ্রিয়া, মমতাকে দেখে সুকুমারের আচরণ ব্যাখ্যা করে উত্তর দিন।

২) ৩),৪) — মূলপাঠ অনুসরণে উত্তর করুন।

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ ভাল করে পড়লেই উত্তর করতে পারবেন। অবশ্যই একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর লিখবেন।

৪১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) সুবোধ ঘোষ — *শ্রেষ্ঠ গল্প (জগদীশ ভট্টাজার্য সম্পাঃ)*

২) অরিন্দম গোস্বামী — *সুবোধ ঘোষ ঃ কথা সাহিত্য*

৩) উত্তম ঘোষ — *সুবোধ ঘোষা ঃ বড় বিস্ময় জাগে*

৪) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় — *কালের পুত্তলিকা*

৫) সরোজ মোহন মিত্র — *ছোট গল্পের বিচিত্র কথা।*

৬) সুবোধ ঘোষ — *অযান্ত্রিক শিল্পী ঃ সম্পাদনা উত্তম পুরকাইত*

তাঁরা এগুলির স্বরূপ নির্ধারণ করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল,—কথোপকথনের আকারে কিছু রচনা করলেই তা নাটক হয়ে যায় ; কিংবা টানা গদ্যে কিছু রচনা করলেই তা উপন্যাস হয়ে যায়। আসলে সাহিত্যের মূল স্বরূপ নির্ভর করে রচনাটির আন্তর সত্তার উপর, বাইরের কোনো রূপ বা অবয়বের উপরে নয়। এই অর্থে—কথোপকথনের আকারে লিখলেও তা কাব্য হতে পারে ; কিংবা, আখ্যানের আকারে লিখলেও। মূলত বাঙালি বা বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলেও আলোচনার পটভূমিকাটি কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গীতিকবিতা। সে হিসেবে রচনাটির একটি ব্যাপকতা ও সমগ্রতা আছে। গীতিকবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে তার দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। এখানেই এ প্রবন্ধটির বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে।

৪২.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা

ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র (জন্ম ঃ ২৬শে জুন, ১৮৩৮। মৃত্যুঃ ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪)। ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রের প্রথম উদ্‌গাতা। পিতা যাবদচন্দ্র ছিলেন মেদিনীপুরে ডেপুটি কলেকটর। যাদবচন্দ্রের চার পুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। প্রকৃত বাল্যশিক্ষার শুরু মেদিনীপুর, এফ টীড নামে এক ইংরেজ শিক্ষকের স্কুলে। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কাঁটাল পাড়ায় ফিরে এসে সংস্কৃত বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। এ বছরই ভর্তি হন হুগলী কলেজে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এখানেই লেখাপড়া করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮ মার্চ, ১৮৫৩) তাঁর কবিতা 'কামিনীর উক্তি' পত্রস্থ হলে এর জন্য পুরস্কার পান-কুড়ি টাকা। 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও 'সংবাদ সাধু বঞ্জনে তাঁর গদ্য-পদ্যাদি রচনা বের হতে থাকে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে আইন পড়বার জন্য তিনি ভর্তি হলেন—প্রেসিডেন্সি কলেজে। এখানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাশ করেন বি.এ.। এ বছই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর নিযুক্ত হন—যশোহরে। চাকুরি জীবন থেকে অবসর নেন—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১। তাঁর প্রতিভা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে বিরোধিতার জন্য আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেননি। বাল্যকালে তাঁর এক বিবাহ হয়, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তিনি রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সন্তান ছিল না। তিন কন্যা ঃ শরৎকুমারী, নীলাব্জ কুমারী এবং উৎপলা কুমারী।

প্রথম চাকুরি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন যশোহরে গেলেন, তখন তার সঙ্গে সেখানে দীনবন্ধু মিত্রের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেন। এ দু'জনের পারস্পরিক সাহচর্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সাহিত্য জীবনের এক পরিপোষক ছিলেন। কিশোরী চাঁদ মিত্র-সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায়, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে ধারাবাহিকভাবে একটি ইংরেজি উপন্যাস লিখতে থাকেন—'Rajmohon's wife'। তখন তিনি খুলনায়। তারপর বের হল প্রথম উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ; ক্রমে 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। এর মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' তাকে বিশেষভাবে বিখ্যাত করে তোলে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) থাকাকালীন সময়টি (১৮৬৯-১৮৭৪) খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। এখান থেকেই বের হয় তাঁর বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা—'বঙ্গদর্শন' (এপ্রিল, ১৮৭২)। এই পত্রিকাকে অবলম্বন করে, বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে, এক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর জন্ম হয়, যাঁরা পরবর্তীকালে এক মননধর্মী ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যধারার প্রবর্তন করেন। 'বঙ্গদর্শন' এক নাগাড়ে চার বছর চলে বন্ধ হয়ে যায়। দু বছর এর কোনো প্রকাশ ঘটেনি। ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায়, পত্রিকাটি আবার বের হতে থাকে। এ বছর নবম খণ্ডটি বের হবার পর তাও শেষে বন্ধ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত বের হত সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায়। অতঃপর সম্পাদক হন—শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিচন্দ্রকে 'সব্যসাচী' আখ্যা দিয়েছিলেন। একদিকে নিজে যেমন সৃষ্টিকর্মে রত ছিলেন, অপর দিকে অক্ষম রচনাবলীর "ধূম ও ভস্মরাণি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।" বঙ্গদর্শনে প্রথম সংখ্যা

থেকেই ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে। ক্রমে ‘ইন্দিরা’, ‘যুগলাঙ্গুরীয়’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রাধারানী’ প্রভৃতি ছোটো বড়ো রচনা প্রকাশ পেল। সঞ্জীবচন্দ্র যখন ‘বঙ্গদর্শনে’র সম্পাদক, তখন পত্রস্থ হয়—‘রজনী’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল,’ ‘রাজসিংহ’, ‘আনন্দমঠ’। ‘কমলাকান্তের দপ্তর’, ‘লোকরহস্য’ ও ‘বিজ্ঞান রহস্য’-প্রভৃতি রচনাও তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক। বঙ্কিচন্দ্রের শেষের দিকে উপন্যাসগুলি এক বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত। স্বাদেশিকতা এর প্রধান দিক। ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসটিকে এজন্যে তিনি বিস্তৃততর করেন (১৮৮২ এবং ১৮৯৩-তে)। ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২), ‘দেবীচৌধুরাণী’ (১৮৮৪) সীতারাম (১৮৮৭) উপন্যাসে তার সেই ভাবনা রূপ পায়। ‘সীতারাম’ই তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস। অতঃপর তিনি ‘নবজীবন’ এবং ‘প্রচার পত্রিকায়’, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় রত হন। প্রচারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়—‘কৃষ্ণচরিত্র’ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ‘কৃষ্ণ চরিত্রে’র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বের হয়—১৮৯২ তে। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ বঙ্কিম প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ‘নবজীবন’ পত্রিকাতেও তিনি ‘ধর্ম জিজ্ঞাসা’ ও ‘অনুশীলন’ তত্ত্ব নিয়ে লিখতে থাকেন। ‘ধর্মতত্ত্ব’ প্রথম ভাগ, ‘অনুশীলন’ নামে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বের হয়। ‘প্রচারে ‘শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা’র ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করে শেষ করে যেতে পারেননি। বৈদিক যুগের পটভূমিকায় একটি উপন্যাস লিখবার পরিকল্পনা থাকলেও তাও অ-রচিতই থেকে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় অবস্থিত, সেই সময় তিনি ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন’ বা ‘ভারতবর্ষীয় সভা’র সভ্যপদ লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হন। সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অফ ইয়ং মেন’ (পরবর্তী কালে এটির নাম হয়—‘ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট’)-এর সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘Companion of the Indian Empire’ (সংক্ষেপে C.I.E.) উপাধি দিলে তা নিয়ে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সুশাসক ও সুবিচারক ছিলেন। শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান—প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল উদার ও মুক্ত। যৌবনে তিনি ফরাসী দার্শনিক Comte-এর Positivism মতবাদে বিশ্বাসী হন। এছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও তাঁকে প্রভাবিত করেন।

৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪ (২৬শে চৈত্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দে) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৪২.৪ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য

‘প্রবন্ধ’ কথাটির মূল অর্থ ‘প্রকৃষ্ট বন্ধন’। ভাবের বন্ধন, যুক্তির বন্ধন, ছন্দের বন্ধন, বাক্যের বন্ধন। সংস্কৃতে ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ‘প্রবন্ধ’ কথাটি সাহিত্যে কোনো নির্দিষ্ট Form বা রূপকল্পকে বোঝাত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন গদ্যের সুস্পষ্ট প্রবর্তন ঘটল, তখন গদ্যে লেখা বিষয়বস্তু প্রধান রচনাকে ‘প্রবন্ধ’ বলা হতে থাকল। কখনও বা ‘প্রবন্ধকে’ ‘প্রস্তাব’ ও বলা হয়েছে। মোটামুটিভাবে ইংরেজি Essay এবং বাংলা প্রবন্ধ সমার্থক। Essay-কে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হল—বিষয়বস্তুভিত্তিক, Objective রীতিসম্পন্ন, নৈর্ব্যক্তিক গদ্য রচনা। অপরটি রচয়িতার মানস ও ব্যক্তিত্ব ভিত্তিক, Subjective রীতিতে রচিত। বাংলা প্রবন্ধকেও এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধধারার প্রথম ধারাটি।

এই প্রথম ধারাটির উদ্ভবের ও পরিপুষ্টির পেছনে কয়েকটি বিশেষ দিকে ভূমিকা লক্ষণীয়। প্রথমত, বাংলা গদ্যের সুস্পষ্ট প্রবর্তন। দ্বিতীয়, বাঙালির জীবনে বিশ্বের বিবিধ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা ও মানসিকতা। তৃতীয়ত, সাময়িক পত্রের প্রকাশ, যে সাময়িক পত্রগুলিতেই বিবিধ সাময়িক ঘটনা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। চতুর্থত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ব্রাহ্ম-খ্রিস্টানধর্মকে অবলম্বন করে যে নানা তর্কালোচনা চলতে থাকে, তারই প্রতিক্রিয়ায় সাময়িক পত্রাদিতে নানা প্রবন্ধ রচিত হয়। পঞ্চমত, এই প্রবন্ধ ধারাটিকেই অবলম্বন করে একদিকে বাঙালির মননশক্তির যেমন বিকাশ ঘটতে থাকে, তেমনি বাঙালির গদ্য রচনাও

বিবর্তিত উন্নততর হতে থাকে। ষষ্ঠত, এই প্রবন্ধধারাটিকে বাঙালির রেনেসাঁসের একটি দিক বলে মনে করা যেতে পারে। বাঙালির সাংস্কৃতিক মনীষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল প্রবন্ধসাহিত্য। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ সকলেই প্রবন্ধ রচনা করে এবং ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাসটিকে কয়েকটি পর্বে বা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাগ দুভাবে করা হয়েছে—কখনও কোনো সাময়িক পত্রিকা বা সাংস্‌সৃতিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত প্রবন্ধ ধারা, কখনও বা কোনো দেশনেতা বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা কোনো গোষ্ঠীকে ভিত্তি করে রচিত প্রবন্ধ ধারা। এই ধরনের সাময়িক পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, ভারতী, বঙ্গবাসী, সাধনা, সাহিত্য, প্রবাসী, নব পর্যায় বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, বিচিত্রা প্রভৃতি। এক-একজন চিন্তাবিদ্ ও লেখককে অবলম্বন করে বাংলা প্রবন্ধের যুগ বিভাগ এই ভাবে করা যায় ঃ রামমোহনের যুগ, অক্ষময়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ; রবীন্দ্রনাথের যুগ। প্রত্যেক যুগেরই যুগ নায়কদের সঙ্গে ছিলেন বহু লেখক-লেখিকা। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার গোষ্ঠীই হোক, আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোনো যুগই হোক, দুয়ের মধ্যে দিয়েই বাঙালি মানসের এক সার্বিক প্রকাশ ঘটেছে, অনেক সময়েই এই দুই দিকের মধ্যে সংযোগও লক্ষ করা গেছে। একদিনেই সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ (Form) রূপে প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশিষ্টতাকে অর্জন করা বাঙালির পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেমন বাংলা ছোটোগল্পের প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রের একটি মূল্যবান ভূমিকা ছিল, প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও সেইরকম। সাময়িক পত্র সমসাময়িক বিবিধ-বিচিত্র প্রসঙ্গ-ঘটনা-তথ্যকে যেমন আশ্রয় করে, তেমনি এক সংখ্যাতেই সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে (ধারাবাহিক প্রবন্ধ ব্যতীত) এই দায়িত্ব ও স্বীকার করে। ফলে বাংলা প্রবন্ধের বিষয় ও দৈর্ঘ্য, এইভাবে নিরূপিত হতে থাকে। অপরদিকে যুগনায়কগণ তাঁদের বিশিষ্ট ভাবনা-চিন্তাকে প্রবন্ধে দিতে থাকেন, সঙ্গে থাকতেন তাঁদের সহযোগীগণ। অবশ্য এসব কথা সাধারণভাবে বলা হল, ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। এইভাবে দুদিক থেকে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের অগ্রগতি ঘটতে থাকে।

রামমোহনের যুগে স্বয়ং রামমোহন এবং সে যুগের অন্যান্য লেখকেরা যে প্রবন্ধধারার সূচনা করেন, তাকে মূলত Polemic বা বিতর্কমূলক প্রবন্ধ সাহিত্য বলা যায়। নিজের মত প্রতিষ্ঠা এবং অপরের মত খণ্ডন এগুলির লক্ষ্য ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকগণের প্রয়াস এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁদের প্রবন্ধের বিষয় যেসব বিতর্কমূলক ভাষাও তেমনি সংস্কৃত ঘেষা। রামমোহনের পক্ষে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—ব্রজমোহন মজুমদার, বিপক্ষের লেখক—গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও রামমোহন পক্ষীয় লেখক। আজ এঁদের সকলের রচনাই বিস্মৃতি গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই যুগের খ্রিস্টান লেখক রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানচর্চার কারণে এবং নানাবিধ আলোচনার কারণ এখনও বিস্মৃত হয়নি।

অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যেমন বিবর্ধন ঘটেছে, বিষয়গত বিস্তার যেমন ঘটেছে, তা অবিস্মরণীয়। বিশেষত বিদ্যাসাগরের অবদান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এই সময়কার অপর দুই শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এই যুগে নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঘটনা এঁদেরও বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তার ফল তাঁদের প্রবন্ধে ধরা পড়েছে। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-চেতনা, প্রবন্ধের রূপকল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা বাংলা গদ্যের সহজরূপের অনুবর্তন তাঁকে অমর করে রেখেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৌলিক রচনা তেমন লেখেননি বটে কিন্তু বাংলা গদ্যের শিল্পরূপটিকে তিনিই প্রথম অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। নায়ক রূপে তিনি এবং তাঁর প্রতিভাধর অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে এই যুগ। পরবর্তী অংশে এই যুগ নিয়ে আলোচনা করছি।

রবীন্দ্রযুগের পত্তন ধরা যায় মোটামুটিভাবে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। তিনিও জীবনের পর্বে নানা সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, সম্পাদক রূপে তিনিই সেখানকার প্রধান লেখক রূপে বিদ্যমান। কিংবা কখনও বা অন্য কোনো সাময়িক পত্রের লেখক। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধে-সমালোচনাদি বের হয়, নিজেও পরবর্তীকালে এই পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। তাঁর নিজ-সম্পাদিত পত্রিকা হল, 'সাধনা', 'নব-পর্যায় বঙ্গদর্শন', 'ভাণ্ডার'। এছাড়া 'হিতবাদী,' 'বসুমতী', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা' প্রভৃতিতেও তিনি লিখেছেন। এমন কি, বিরোধী ভাবনার পত্রিকা 'সাহিত্য,' 'নারায়ণ' প্রভৃতিতেও তিনি লিখেছেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং সাহিত্য আন্দোলন নিয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, আজ সেগুলি ইতিহাসের বিষয় হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ধারায় আছে তাঁর নিজস্ব সাহিত্য তত্ত্ব, সাহিত্য ভাবনা, এবং সাহিত্য জীবনের পরিচয়। 'লোকসাহিত্য' নিয়ে বিশদ আলোচনা তার প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রবন্ধের রূপকল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনিই বাঙলায় পত্র-প্রবন্ধের ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেন। তারপর প্রাচীন ভারত ও ভারতের সাহিত্য নিয়ে তাঁর প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। বিদেশি সাহিত্য, সাহিত্যিক এবং সাহিত্য প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক, তাঁর অধ্যয়নশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের কয়েকটি বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, তাঁর সৃষ্টিমূলক সাহিত্যেক তিনি যা বলতে তাঁর প্রবন্ধেও তার জের তিনি টেনেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রবন্ধের ভাষারীতিতে কাব্যের ছোঁয়া অনেকের কাছেই পছন্দসই ছিল না। তৃতীয়ত, বহুক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধ ব্যক্তিগত ভাবনামূলক হয়ে উঠেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে এই ধরনের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদরূপে গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্রযুগের অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছে স্বামী বিবেকানন্দ (তাঁর প্রবন্ধের কথা বলে বলেছি), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী (তাঁর প্রবন্ধের কথা পরে বলেছি), দীনেশচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, অজিত কুমার চক্রবর্তী, ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ এবং এইসব প্রতিভাধর প্রবন্ধকারগণ মিলিতভাবে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করেন।

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগেও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। প্রবন্ধের বিষয় ও রূপকল্প নিয়ে, ভাষা ও প্রকাশকাল নিয়ে এঁরাও নানা পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে আছেন, রাজশেখর বসু, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, অন্নদাশঙ্কর রায় (এঁরা প্রবন্ধের কথা পরে বলেছি) প্রভৃতি এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রতিভাধর লেখক-লেখিকাগণ। বাংলা প্রবন্ধের ধারা নব-নব পথে বিস্তৃত ও অগ্রসর হয়ে চলেছে।

৪২.৫ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্য

বঙ্কিচন্দ্রের মূলত ঔপন্যাসিক। কিন্তু তাঁর প্রতিভা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও সমভাবে সার্থক হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি যেন তত্ত্ব-দর্শনের প্রকাশক, আর তাঁর উপন্যাসবলি যেন সেই তত্ত্ব-দর্শনের রসতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। এর ফলে তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ যেন একে অপরের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'নবজীবন'—প্রধানত এই তিনটি সাময়িক পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। নানা বিষয়কে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ লিখেছেন। ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ তাঁর একটি প্রিয় বিষয় ছিল। সাহিত-তত্ত্ব, সমালোচনা তত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলা—সকল দিকেই তিনি সমান দক্ষতায় বিচরণ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য—সবই তাঁর আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। তিনিই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতিকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাশ্চাত্য দর্শনতত্ত্বকে তিনি তাঁর আলোচ্য একটি দিক করে তুলেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার একটি বিভাগ ছিল সমসাময়িক পত্র-পুস্তকের সমালোচনা। এই বিভাগে তিনি অসম্পূর্ণ

লেখকদের নানাভাবে সমালোচনা করেছেন, ফলে তাঁরাও এতে উপকৃত হয়েছেন। কেবল একা বঙ্কিমচন্দ্রই নন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহযোগীগণ, তাঁরা ছিলেন এক-একজন বিশিষ্ট ও সমর্থক লেখক। এর ফলে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রবর্তন ঘটে। এঁদের মিলিত চেষ্টায় বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। স্বাদেশিকতা ছিল এই গোষ্ঠীর মূল মন্ত্র। দেশের স্বাধীনতা এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধি—এই দুই দিক তাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করত।

ঔপন্যাসিক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যের একটি শিল্পিত রূপকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। গদ্যের সেই শিল্পিত রূপটিই তাঁর প্রবন্ধের গদ্যের মধ্যেও গৃহীত হল। ফলে তার প্রবন্ধ সাধারণ মানুষের কাছেও সহজ-বোধ্য হয়ে উঠল। দ্বিতীয়ত, যে স্মিতহাস্য রসবোধ তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে কিংবা সে সপ্রতিভতা, তাঁর প্রবন্ধেও তা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হল। তৃতীয়ত, যুক্তিবোধ সেই প্রবন্ধকে আরো আর্কর্ষণীয় করে তুলল। চতুর্থত, তাঁর প্রবন্ধের আয়তন। সাময়িক পত্রের প্রয়োজনপূরণের জন্য, একটি বিশিষ্ট আয়তনের মধ্যে প্রবন্ধে সীমা রক্ষা করতে হয়। কেবল তাই নয়। একটি বিশিষ্ট সীমার মধ্যে একটি প্রবন্ধের সুসম্পূর্ণতার প্রসঙ্গটিও আছে। অকারণে দীর্ঘ বা অতিভাষণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লে একটি প্রবন্ধের গঠনগত সুষমাও যে ব্যাহত হয়, তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধধারা থেকেই বাঙালি পাঠক বুঝেছে। তাঁর অনুগামীরাও এ বিষয়ে তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন। একদিকে প্রবন্ধের গদ্যকে হতে হবে সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য, অন্যদিকে গঠনের ক্ষেত্রে চাই একটি নির্দিষ্ট অবয়বের মধ্যে সুষমাময় সম্পূর্ণতা। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কোনো প্রবন্ধকার এই দুই দিককে এক করে তুলতে পারেননি।

সমসাময়িক যেসব গ্রন্থের তিনি সমালোচনা করতেন, সেই সব গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক সাহিত্যতত্ত্বের দিকটিকেও তিনি তুলে ধরতেন। এর ফলে তখনকার পাঠক সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারতেন। যেমন ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটক নিয়ে আলোচনা কালে, কিংবা জয়দেবের কবিকৃতি আলোচনা করেছেন বিদ্যাপতির সঙ্গে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে গীতিকবিতার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। এই ভাবে তিনি তাঁর গ্রন্থ সমালোচনাকে একটি সাহিত্যিক মাত্রা প্রদান করেছেন। এ কারণেই গ্রন্থ সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি সমসাময়িকতার সীমা লঙ্ঘন করে চিরায়ত সাহিত্যে পরিণত হতে পেরেছে।

তবে, একথা বলাই বাহুল্য, তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে মূল শক্তি হল—তাঁরই অন্তর্দৃষ্টি, তাঁরই সৃষ্টি নৈপুণ্য। 'বিবিধ প্রবন্ধে' যখন তিনি 'প্রাচীনা এবং নবীনা' লেখেন তখন তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা বেরিয়ে আসে। আবার, 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি' রচনা কালে তিনি কথোপকথনের রীতি অবলম্বন করেন। 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধটি যে রীতিতে লিখিত, 'ভালবাসার অত্যাচার' ঠিক সেই একই রীতিতে লিখিত নয়। প্রবন্ধের বিষয় অনুসারে তার প্রকাশরীতিও যে ভিন্ন হবে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। 'দ্রৌপদী' প্রন্বন্ধে দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করবার জন্য আর এক রীতির আশ্রয় নিয়েছেন—এখানে মহাভারতের প্রাসঙ্গিক আখ্যানের অনুসরণ করে প্রবন্ধের সার গ্রহণে পাঠকের সহায়ক হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলির মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

১। বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬)

২। প্রবন্ধপুস্তক (১৮৭৯)

৩। বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ, ১৮৮৭ বিবিধ সমালোচনা ও প্রবন্ধপুস্তক গ্রন্থ দুখানির সম্মিলিত রূপ)

৪। বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২)

৫। লোকরহস্য (১৮৭৪)

৬। বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫)

৭। সাম্য (১৮৭৯)

৮। কৃষ্ণচরিত্র (প্রথম ভাগ) (১৮৮৬)

(আকারে দীর্ঘ রচনাকে এখানে ধরা হয়নি)

বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী লেখকদের মধ্যে আছেন ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্য পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি।

৪২.৬ মূলপাঠ ঃ 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের প্রথমাংশ

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য য- করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও য- সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে দুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ, সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলি গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য ; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষ কাব্য ; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি ; নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা ১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি ; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য ; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত ; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত ; এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গানে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনের গ্রথিত এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছেণীস্থ, এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রথিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনেকগুলির উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনের গ্রথিত কিন্তু বস্তুত নাটক নহে। "Comus", "Manfred", "Faust" ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরেজি ও গ্রিক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor" কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে ; অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে "Excursion" এবং "Childe Harold" কে ঐ না দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

৪২.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে সাহিত্যিক রচনামাত্রকেই 'কাব্য' বলবার প্রথা ছিল। এ প্রথা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির মধ্যেও দেখা গেছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই, রামায়ণ মহাভারত 'ইতিহাস' বলে খ্যাত হলেও, এ দুটিকে কাব্য বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত 'পুরাণ' হলেও তার অংশ বিশেষকে কাব্য বলেন। আধুনিক যুগের পাঠক রামায়ণ-মহাভারতকে 'ইতিহাস' বলে স্বীকার করুন বা না করুণ, কাব্য বলেই স্বীকার করেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গো আধুনিক পাঠকের মতগত পার্থক্য তেমন নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসগুলিকে 'উৎকৃষ্ট কাব্য' বলেন, তা আধুনিক যুগের পাঠক স্বীকার করবেন না। এগুলিকে তাঁরা 'উপন্যাস' বলেই মানবেন। Walter Scott (১৭৭১-১৮৩২) অষ্টাদশ শতাব্দীর ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজের রোমান্টিকতাকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ইতিহাসকে তিনি রোমান্টিক রূপ দান করে উপন্যাসকে এক বিস্তৃত পটভূমিকায় বিন্যস্ত করেছিলেন। হয়তো রোমান্টিকতার এই বিস্তৃতির কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের উপন্যাসগুলিকে সরাসরি 'কাব্য' বলেছেন ; আধুনিক পাঠক এই ধরনের উপন্যাসকে রোমান্সধর্মী উপন্যাস' আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু সরাসরি কাব্য বলবেন না। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাসের এত বৈচিত্র্য এবং সে অনুযায়ী পারিভাষিক নাম প্রদানের প্রথা সৃষ্টি হয়নি। আধুনিক পাঠক এক-একটি সাহিত্যে রূপের নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গো পরিচিত বলেই এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গো তাঁর সহমত পোষণ করা সম্ভব হবে না।

নিতান্ত অক্লেশে অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'নাটককে আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি।' কিন্তু নাটকের মধ্যেও আজ নানা রূপ-বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে ঃ কাব্য নাট্য, নাট্যকাব্য রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটি গদ্যে লেখা, তথাপি তা কবিতার কাছাকাছি। গদ্য কাব্যের প্রবর্তনের পর গদ্যে-পদ্যে ভেদ অনেকটাই ঘুচে গেছে ; কাজেই বিশেষ বিশেষ সাহিত্যরীতির আশ্রয়ে লেখা নাটক কবিতার কাছাকাছি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুসারে, নাটক মাত্রই কাব্য,—আধুনিক পাঠক তা নাও মানতে পারেন। নাটক বিচারের দৃষ্টিকোণ আজ যেমন পরিবর্তিত, নাট্যকারের দিক থেকে তার রচনারীতিও আজ ঠিক তেমনটি নেই।

এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণটিকে সমকালীন পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ হয়তো প্রভাবিত করেছে। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে খাঁটি নাটক কেবল গ্রিক বা ইংরেজি ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় নেই। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' বা ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত'—এই দৃষ্টিতে নাটক নয়, কাব্য। Goethe-র মত উদ্ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। গ্যেটে নিজে কবি, দীর্ঘদিন ধরে তিনি "Faust" নাটকটি লিখেছেন, ফাউস্টের জীবনের ট্র্যাডেজিকে তুলে ধরেছেন। হয়তো গ্যেটের সময় Reading drama এবং Stage drams-র পার্থক্য তেমন প্রবল ছিল না ; আজকের সমালোচক Faust কে Reading drama ধরে নিয়ে তার মঞ্চগত দিক উপেক্ষাও করতে পারেন, কিন্তু 'কথোপকথনে' গ্রন্থনা তো করতেই হবে। আজকের সমালোচক নাটক বলতে তার মঞ্চায়ন ও আভিনায়িক দিককেই মুখ্য বলে মানবেন এবং সেই কারণে কাব্য নাট্যেরও অভিনয় আজ বিরল নয়। Closet বা Reading drama রূপে আজ নতুন এক ধারার নাটকেরই সৃষ্টি হয়েছে। Absurd নাটক পাঠ্য নাটক রূপে বেশি সফল হলেও তারও অভিনেয়তা আজ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আজ যেখানে পাঠ্য ও অভিনয়—দু'ধরনের নাটকের প্রবর্তন ঘটেছে' সেখানে গ্যেটে কথিত এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থিত, কথোপকথন বিহীন, অভিনয়শূন্য নাটকের কল্পনা করবেন না।

আসলে এই ধরনের পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণের অনুসারী গবেষক-শিল্পী-সমালোচকগণ নাটককে খোঁজেন কোনো রূপের মধ্যে নয়, রচনার আত্মার মধ্যে। তাই কথোপকথন এবং অভিনয় নাটকের পক্ষে অপরিহার্য বলে তাঁরা মানেন না। নাটকের সেই আত্মা লুকিয়ে আছে কাব্যের মধ্যে, আখ্যায়িকার মধ্যে এবং খাঁটি নাটকের মধ্যে তো বটেই। এই জন্য তাঁরা গদ্য-পদ্য, অভিনয়-কথোপকথন প্রভৃতির বালাই স্বীকার করেন না। অথচ, আধুনিক যুগেই, পাশ্চাত্য

জগতে নাটক বিচার করতে গিয়ে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের দ্বন্দ্ব-বিবর্তনকে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে রূপদানকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য নাটকের ভাব ও রস অনুযায়ী তার অভিনয় ও মঞ্চব্যবস্থাও ভিন্ন হবে। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রঙ্গমঞ্চকে প্রাধান্য দিতে চাননি।

এই পটভূকিায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণটি বিচার্য। 'বিবিধ প্রবন্ধে'-রই অন্তর্ভুক্ত 'শকুন্তলা', 'মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আর একটু বেশি আলোচনা করেছেন। শেকসপিয়র এবং কালিদাসের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাট্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন, শকুন্তলার মনোভাব কালিদাসের টীকা ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না ; কিন্তু ওথেলোর মনোভাব শেকসপিয়র ওথেলোরই কর্ম ও সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ শেকসপিয়রীয় রীতিকেই তিনি খাঁটি নাট্যরীতি বলে মনে করেন। ভারতবর্ষে নাটককে সেখানে বলা হয়—'দৃশ্যকাব্য'। অর্থাৎ কাব্যত্বই এখানে প্রধান নাটকত্ব নয়। কেন এই পার্থক্য বঙ্কিমচন্দ্র তার উত্তর দেননি। আমাদের মতে এর উত্তর এই ঃ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে নাটককে দেখা হয়েছে রসসৃষ্টির উপায় রূপে ; কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র সংস্থা-পরের দিক থেকে নয়। রসসৃষ্টিই এখানে নাটকের মূল লক্ষ্য বলে কাব্যত্ব এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। একথা এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, যে, খাঁটি নাটকের মাধ্যমেও রসসৃষ্টি হতে পারে, হয়েও থাকে। রসশাস্ত্রের নির্দেশ মান্য করবার জন্যই নাটক 'দৃশ্যকাব্য' হয়ে পড়েছে কিনা, কে জানে।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির প্রথম অংশ নাটক এবং কাব্যের আপেক্ষিক প্রাধান্য নিয়ে ব্যাপৃত। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্য জগৎ থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত চয়ন করে আপন বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। তিনি জন মিল্টনের Comus (সম্পূর্ণ নাম—Mark of Comus, ১৬৩৪ খ্রিঃ), George Gordon Byron-এর (১৭৮৮-১৮২৪, Lord Byron নামে সমধিক পরিচিত) Canfred (Faust-এর Parody বা লালিকা রূপে রচিত) নাটকগুলির কথা বলেছেন। বায়রনেরই Childe, Harold (সম্পূর্ণ নাম—Childe Harold's Pilgrimage; প্রথম দুই সন ১৮১২ খ্রিঃ, শেষ দুই সন ১৮১৬-১৮১৮) নাটকটির কথাও বলেছেন। Mark of Comus, নাম থেকেই বোঝা যায় এটি মুখোশ-নাটক ; নাচ-গান নাটকে পূর্ণ। সমালোচকেরা এটিকে Pastoral drama বলে থাকেন। আমোদই এর মূল লক্ষ্য। এ ছাড়া উল্লেখ করেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (The) Excursion (১৮১৪ খ্রিঃ)। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে The Recluse নামে তাঁর যে কাব্যগ্রন্থটি বের হয় তার প্রথম পর্বের নাম The Prelude, দ্বিতীয় পর্বের নাম The Excursion তৃতীয় অংশটি অলিখিত। ওয়াল্টার স্কটের একটি প্রেমের উপন্যাস 'The Bride of Lammermor' তখন বাঙালির কাছে একটি প্রিয় উপন্যাস ; 'নরনারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও এই উপন্যাসটির কথা বলেছেন।

উপরে উল্লিখিত এই বিভিন্ন রচনাগুলির মধ্যে কাব্য ও নাটকের মাত্রা-পরিমাণ অন্বেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য" নাম দেওয়া যায়, 'তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের Excursion এবং বায়রনের Childe Harold তাই। আবার স্কটের লেখা উপন্যাস Bride of Lammermoor কে তিনি 'নাটক' বলেন, যেমন, উপাখ্যানকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য বলেন (এ দুয়ের মধ্যে কিন্তু তিনি পার্থক্য করলেন না), তেমনি উপন্যাসকেও 'নাটক' বলেন। আবার, Comus, Manfred Faust, যা, কথোপকথনের আকারে লিখিত, সে সব রচনাকে তিনি 'কাব্য' বলেন। অর্থাৎ রচনার বাহ্যিক আকৃতি-অবয়ব দেখে তিনি তার সাহিত্যিক প্রকৃতি নিরূপণ করতে চান না। রূপকে অতিক্রম করে তার আত্মাতে পৌঁছতে চান।

এইভাবে কাব্যের সঙ্গে নাটকের ভেদ বিশ্লেষণ করে কাব্যেরই একটি অঙ্গ 'গীতিকাব্যে'র ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছে। কাজেই এই ভূমিকা অংশটির একটি অপরিহার্যতা আছে। এই অংশটিকে প্রথম ধাপ বলে মেনে নিয়ে পাঠক মূল আলোচ্য ক্ষেত্রে উপনীত হতে পারবেন।

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে সাহিত্য মাত্রই 'কাব্য' এবং সেই কাব্য আবার তিন ধরনের ঃ দৃশ্যকাব্য (নাটক) ; আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য ; আর যা কিছুই এ দুয়ের বাহিরে, তাই 'খণ্ডকাব্য'। খণ্ডকাব্যের মধ্যেও যে নানা শ্রেণী

আছে, রকমফের আছে, এই বিভাগ অনুসারে তা ধরা পড়ে না। এ বিভাগ অতি-ব্যপ্তি দোষে দুষ্ট। ইউরোপে যাকে 'লিরিক' বলে খণ্ডকাব্য তার কাছাকাছি, কিন্তু সর্বাংশে অভিন্ন নয়। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ বঙ্কিমচন্দ্র লিরিক কবিতা রূপে খণ্ডকাব্যের যে টুকু অংশ গ্রহণীয়, তার কথা বলেছেন।

৪২.৮ সারাংশ (প্রথম অংশের)

আমাদের দেশের আলংকারিকেরা সাহিত্যমাত্রই 'কাব্য' বলে মনে করতেন। 'কাব্য' বলতে তাঁরা একটি ব্যাপক ধারণা পোষণ করতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'কাব্য' কে তাঁরা তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন ঃ ক) দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটক ; খ) আখ্যান কাব্য, অর্থাৎ গদ্যে রচিত গল্পমূলক রচনা ; গ) খণ্ডকাব্য এবং মহাকাব্য। এই তিন ধরনের রচনার মধ্যে যে রূপগত পার্থক্য আছে, যে কেউ তা বুঝে নিতে পারেন। কিন্তু সেই রূপগত বাইরের পার্থক্যটাই এদের পরস্পরের সঙ্গো পার্থক্যের মূল দিক নয়। যেমন, কথোপকথনে রচিত গ্রন্থ মাত্রই নাটক নয় ; আবার অনেক আখ্যানও নাটকের আকারে রচিত হতে পারে, কিংবা অনেকগুলি খণ্ডকাব্যের সমষ্টি। এই খণ্ডকাব্যেরই একটি বিশেষ দিক ইউরোপে 'লিরিক' নামে পরিচিত। এই 'লিরিক' বা গীতিকবিতার স্বরূপ সন্ধানই আলোচ্য প্রবন্ধটির লক্ষ্য। ভারতের 'খণ্ডকাব্য' এবং ইউরোপের 'লিরিক' সর্বাংশে এবং সর্বত্র এক বা অভিন্ন নয়। এইভাবে প্রবন্ধটির ভূমিকা করে লেখক মূল বক্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। এই পর্যন্ত এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ।

৪২.৯ অনুশীলনী-১

ক. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন (২০০ শব্দের মধ্যে)

১। বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক ও চাকুরি জীবনের পরিচয় দিন।

২। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি উপন্যাস এবং প্রথম তিনটি বাংলা উপন্যাসের নাম করুন এবং মন্তব্য করুন।

৩। কালানুক্রমিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনটি উপন্যাসের নাম করুন এবং এগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৪। 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকার প্রসঙ্গো মন্তব্য করুন।

৫। 'প্রচার' এবং 'নবজীবন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশিষ্ট রচনাগুলি প্রকাশিত, তার বিবরণ দিন।

৬। 'প্রবন্ধ' কথাটির মূল অর্থ কী ? ক' ধরনের প্রবন্ধে আছে ?

৭। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক উল্লেখ করুন। তাঁর সহযোগী লেখকগণের নাম কী ?

৮। প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিতে 'কাব্য' বলতে কী বোঝান হ'ত ? তখন 'কাব্য' কীভাবে বিভক্ত করা হত ?

৯। এই রচনাগুলির পরিচয় দিন ঃ Faust, comus' Manfred, childe Harold.

১০। Walter Scott এবং Bride of Lammermoor প্রসঙ্গো আলোকপাত করুন।

খ. নিম্মলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত উত্তর দিন (১০০ শব্দের মধ্যে) ঃ

১। বাংলা বিষয়বস্তু প্রধান (objective) প্রবন্ধ ধারার উদ্ভব ও পরিপুষ্টির পেছনের কারণগুলি নির্দেশ করুন।

২। বাংলা বিষয়বস্তু প্রধান (objective) প্রবন্ধের ধারাটিকে কী কী ভাবে বিভক্ত করা যায় ?

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের পূর্ণ পরিচয় এবং প্রবন্ধকার রূপে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করুন।

৫। কাব্য এবং নাটকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে পার্থক্যের কথা বলেছেন, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিন। Reading drama এবং stage drama-র মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

৪২.১০ মূলপাঠ ঃ 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক, সেখানে নামও পৃথক হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোন বস্তু থাকে যে, তাঁহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। "আঃ" এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!" ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিতে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ য-শীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না। অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পরিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি-স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য ; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল ; আগের গীতিকাব্য রচিতই হতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকুই গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যকতির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে ; ব্যকত্যি এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে ; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ে উত্তর উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জ্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা

যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। শেকসপিয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যর্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখা যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়বের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতির ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেকসপিয়রের ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন।।

সহজেই অনুমেয় যে, তাহা বক্তব্য, তাহা পর সম্বন্ধীয় বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অবক্তব্য, তাহা আত্মচিত্র সম্বন্ধীয় ; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমনত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

৪২.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'গীতিকাব্য' ('অবকাশরঞ্জিনী' নামে 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত। বৈশাখ, ১৮২০। এটি নবীনচন্দ্র সেনের একটি গীতিকাব্য সঙ্কলন। এই গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষে এটি লিখিত) প্রবন্ধটি যখন লিখিত হয়, তখন 'লিরিক' বা গীতিকবিতা সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির মনে কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে গীতিকবিতা সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে আলোচনা শুরু করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি অতি সুন্দরভাবে গীতিকবিতার একেবারে মূল ধারণায় গিয়ে পৌঁছেছেন। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ গীতিকবিতাকে যে Lyre (Lyrea) বীণাজাতীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গো গেয় রচনা বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা প্রথমেই উল্লেখ করেছেন এবং সেখান থেকেই তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। মূলত গ্রিকগণ ছিল এই ধারণার পরিপোষক। Lyre (Lyra) থেকেই Lyric শব্দের উদ্ভব হয়েছে। ভাবের দিক থেকে পাশ্চাত্য জগতে গীতিকবিতাকে 'Reflexive' বা 'আত্মবাচক' বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একেই বলেছেন 'আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়'। গীতিকবিতার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিভা ও সাহিত্য রসবোধের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের মনের তাবৎ ভাবকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছেন ঃ ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য। ব্যক্তব্য অংশ নাট্যকারের ক্ষেত্রে ; অব্যক্তব্য অংশ লিরিক কবির ক্ষেত্র। অর্থাৎ কবির 'আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়', অব্যক্তব্য বিষয়ই গীতিকাব্যের বিষয়। তবে, কেবল একা কবিরই আত্মবিষয়ক হবে, এমন কোনো মানে নেই। তা একক একজন বক্তার আলোচ্য বিষয়ও হতে পারে। এই পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অতি সুন্দর এবং যথার্থ। কিন্তু সেই অব্যক্তব্য অংশের প্রকাশকাল ও প্রকরণ সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট কোনো আলোকপাত করেননি। কিংবা, ভাবের বৈচিত্র এবং প্রকাশকলার প্রকরণ অনুযায়ী গীতিকবিতার শ্রেণীবিভাগও তিনি করেননি। অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে বাংলা ভাষায় গীতিকবিতা নিয়ে এই আলোচনা করেছিলেন, সে সময়ে এর চেয়ে বেশি কিছু করাও সম্ভব ছিল না। এই দিক থেকে বিচার করে আজ তাঁর প্রবন্ধটিকে আংশিকভাবে অসম্পূর্ণ বলে মনে হলেও তাঁকে আমরা দোষ দিতে পারি না।

একদা গীতিকবিতার স্বরূপ প্রসঙ্গো বলা হয়েছিল, 'একটুখানির মধ্যে অনেকখানি ভাবের বিকাশ'। 'একটুখানি' কথাটির মধ্যে গীতিকবিতার সংজ্ঞিপ্ত সংহত-তীক্ষ্ণ-যথাযথ রূপগত পরিসরের কথাটি আছে। গীতিকবিতার এই

বিশেষ রূপবন্ধটিকে সবার আগে লক্ষ করতে হবে। গীতিকবিতার প্রকরণ বা প্রকাশকলার প্রধান উপকরণ হল ভাষা (শব্দ চয়ন, গীতিময় পদসৃষ্টি), ছন্দ এবং চিত্রকল্প। ভাবের তীক্ষ্ণতা ও প্রসারতা, গভীরতাকে ব্যক্ত করতে সরাসরি ভাষাভঙ্গি অপেক্ষা চিত্রকল্পের আশ্রয় নিতে হবে। ভাষা-ছন্দ-চিত্রকল্প সবই হবে ভাবের প্রকৃত প্রকাশক এবং সেই কারণে অপরিহার্য। নিসর্গজগৎ গীতিকবিতার এটি বড়ো অবলম্বন। নিসর্গজগৎ গীতিকবির মনে নানা তত্ত্ব-ভাবনার সূচনা করে। গীতিকবির আত্মবিশ্লেষণের ফলে কখনো তিনি রোমান্টিক, কখনো বা মিষ্টিক।

আধুনিক যুগে গীতিকবিতার এক নতুন মাত্রা দেখা যাচ্ছে। এখানকার 'গীতিকবিতা' একদিকে পাঠ্য বটে অপরদিকে, সুরসহযোগে তা গেয়ও বটে। এর সুন্দর দৃষ্টান্ত 'গীতাঞ্জলি'র গান-কবিতাগুলি। মূলত এগুলি গান, গানরূপেই রচিত এবং সুরে সমর্পিত। কিন্তু কেউ ইচ্ছে করলে এ রচনাগুলিকে পাঠ্য কবিতারূপেও ব্যবহার করতে পারেন। আধুনিক গীতিকবিতার এই প্রয়োগ বা ব্যাবহারিক দিকটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল গীতিকবিতার তত্ত্বগত দিকটির কথা বলেছেন। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে গীতিকবিতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি ব্যক্ত করার অবকাশ পাননি।

আদিতম গীতিকবিতার নিদর্শন মিলেছে ইজিপ্টের পিরামিড-সাহিত্যে অন্ত্যেষ্টির কালে রচিত শোকগীতিরূপে (খ্রি. পূ. ২৬০০)। মৃত রাজার প্রশস্তিরূপে কিংবা দেবতার প্রতি স্তোত্র রূপে। এই পর্বে মেষপালক ও জেলেদের গানও মিলেছে। পরবর্তীকালে (খ্রি. পূ. ১৫০০) সমাধিফলকে উৎকীর্ণ গানও পাওয়া গেছে গীতিকবিতা রূপে। ইজিপ্শীয়দের মতো হিব্রু এবং গ্রীক লিরিকের জন্ম হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গ্রিক গীতিকবিতা গীত বা মন্ত্রবৎ উচ্চারিত হত, কখনও বা নৃত্যের সঙ্গে।

হোমারের রচনার মধ্যেও গীতিকবিতার বিষয় ও মানসভঙ্গির ইঙ্গিত আছে। খ্রিঃ পূঃ সপ্তম শতকের আগে খাঁটি অর্থে গীতিকবিতার জন্ম হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীর পিন্ডার (Pinder) প্রভৃতি গ্রিক কবিগণ এবং ইস্কাইলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিডস প্রভৃতি নাট্যকারগণ কিছু শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের গীতিকবিতা লেখেন। রোমান গীতিকবিগণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মচরিতমূলক গীতিকবিতা রচনায় প্রবণতা দেখিয়েছেন। খ্রিস্টিয় ৩০০ পর থেকে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন গীতিকবিতায় বিষয়বস্তুর বিস্তার এবং শিল্পগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেল। রেনেসাঁসের যুগে ইটালিতে পেত্রার্ক (Petrach) এবং ফ্রান্সের Ronsand গীতিকবিতার যুগের প্রবর্তন করেন, বিশেষত সনেট কবিতায়।

ইংলন্ডেও গীতিকবিতার অনুশীলন চলতে থাকে। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে থেকে Restoration যুগ পর্যন্ত বহু ইংরেজ কবি গীতিকবিতা রচনা করেন। ষোড়শ শতকে এই ধরনের গীতিকবিতার সঙ্কলন বের হতে থাকে। সিডনি (Sidney), স্পেনসার (Spenser), শেকসপিয়ার, বেন জনসন (Ben Janson), হেরিক (Herrick), মিল্টন (Milton) প্রভৃতি এ যুগে গীতিকবি। এঁদের মধ্যে সিডনী, স্পেনসার এবং শেকসপিয়রের সনেটধারা উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের কলিন্স (William Collins) এবং গ্রে-র (Thomas Gray) 'ওড' কবিতা গীতিকবিতার একটি বিশেষ ধারাকে সমৃদ্ধ করে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে, রোমান্টিক পর্বে, গোটা ইউরোপেই গীতিকবিতার জোয়ার আসে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বার্নস (Burns) ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্লেক (Blake) কোলরিজ, বায়রন, শেলী, কীটস ; জার্মানিতে গ্যেটে (Goethe), শিলার (Schiller), ফ্রান্সো ভিকটর হুগো (Victor Hugo), রাশিয়ায় পুশকিন (Pushkin) প্রভৃতি এঁদের মধ্যে আছেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সের বোদলেয়ের (Baudelaire) যিনি একজন সাংকেতিকতার প্রবর্তক, ফরাসিভাষায় তিনি কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখেন। অন্যান্য গীতিকবিদের মধ্যে আছেন ঃ য়েটস (W.B. Yeats), এজরা পাউন্ড (Ezra Pound), এলিয়ট (T.S. Eliot), অডেন (W.H. Auden) প্রভৃতি।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারাটি খুবই সমৃদ্ধ। মূলত বিহারীলাল চক্রবর্তী খাঁটি অর্থে এই ধারার সূচনা করলেও, তাঁর আগে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অন্যান্য অসংখ্য কবি

এদিকে লেখনী সঞ্চালন করে। রবীন্দ্রনাথ এসে এই ধারার চরমোৎকর্ষ সূচিত হয়। এই পর্বের আর এক বৈশিষ্ট্য, বাঙালি মহিলা গীতিকবির রচিত গীতিকবিতার প্রচলন। এই সব মহিলা গীতিকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন। দাম্পত্য প্রেম এবং গার্হস্থ্য ধর্ম এঁদের গীতিকবিতার মূল বিষয় ছিল।

৪২.১২ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশের)

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশের বক্তব্যকে আমরা তিনটি ধারায় বিভক্ত করে নিতে পারি ঃ প্রথমত, 'গীতিকাব্য' নাম বা অভিধার অর্থ জ্ঞাপন, এর উদ্ভবের ইতিহাস ও স্বরূপ কথন ; দ্বিতীয়ত, সাহিত্যকারের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব অনুসারে সাহিত্যের প্রকাশরীতির দিক থেকে, বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক তিন ধরনের কবি-সাহিত্যিকের কল্পনা ; এই ভাবনাটির মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূল দিক ধরা পড়েছে। তৃতীয়ত, দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধকারের মূল বক্তব্যকে বিশদ করা।

'গীতিকাব্য' এই সমাসবদ্ধ পদটির বিগ্রহবাক হল ঃ যা 'গীতি', তাই 'কাব্য'। 'গীতি'ও যা 'কাব্য'ও তাই। পাশ্চাত্য Lyric অভিধার বাংলা প্রতিশব্দরূপে বঙ্কিমচন্দ্র এটির প্রর্বতন করেছেন। 'গীতি' বলতে সংগীত ; 'সংগীত' বলতে কণ্ঠস্বরের বিশেষত্বের মাধ্যমে মনের কোনো আবেগের প্রকাশ। আর 'কাব্য' হল ছন্দোময় বাক্য। 'গীত' হওয়াই ছিল 'গীতিকাব্যে'র আদিম উদ্দেশ্য। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, গান গেয়ে না শোনালেও, কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই মনের আবেগকে প্রকাশ করতে পারে এবং তা আনন্দদায়কও বটে, তখন গান গাইবার দিকটি অপ্রধান হয়ে পড়ে। এইভাবে 'গীতিকাব্য' গেয় থেকে অ-গেয় অর্থাৎ নিছক আবৃত্তিযোগ রচনায় পরিণত হয়। ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস প্রকাশ গানেরও লক্ষ্য, কাব্যেরও লক্ষ্য। গীতের যে উদ্দেশ্যে, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। এইভাবে যা গীতি তাই কাব্য—এই অভিন্নতার বোধে এসে পৌঁছান রসিকেরা।

দ্বিতীয় ধারায় বক্তব্যে এসে লেখক সাহিত্যের প্রকাশগত দিক এবং সাহিত্যকারের প্রকাশ ক্ষমতার দিকে কথা তুলেছেন। আমাদের মনের মধ্যে স্নেহ-শোক-ভয় প্রভৃতি নানা ধরনের ভাব থাকে। সাহিত্যের মধ্যে সেই ভাবগুলির সবটাই প্রকাশ করা যায় না। কিছু প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয়, কিছু অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত থাকে। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন প্রকাশ সাহিত্যরূপের (যথাঃ নাটক, গীতিকাব্য, মহাকাব্য) কথা তুলেছেন। মানুষের মনের যেসব ভাব ও আবেগ ব্যক্ত করা সম্ভব হয়, সেগুলি ধরা পড়ে নাটকের মধ্যে। পাত্র-পাত্রীর কথা ও কাজের মাধ্যমে ভাবের সেই প্রকাশ ঘটে। কিন্তু যেসব ভাব আবেগ প্রকাশ করা যায় না, ব্যক্ত হয় না, সেগুলির ক্ষেত্র হল গীতিকবিতা। নাটক ও গীতিকবিতার মধ্যে এটি একটি প্রধান পার্থক্যের দিক। এ দুয়ের মিশ্রণ অনুচিত, কারণ, নাটকের নাট্যকার নিজে নিজের কথা বলেন না, চরিত্রগুলির কথাই তুলে ধরেন (অবশ্য পরে যে 'কাব্য নাট্য'-এর উদ্ভব ঘটেছে তাতে গীতিকবিতার কিছু ধর্ম পাওয়া যায়)। আর মহাকাব্য হল,—মানুষের মনের ব্যক্ত-অব্যক্ত দু'দিকেরই প্রকাশস্থল। এইজন্য মহাকাব্য হল,—নাটক ও গীতিকাব্যের মিলিত দিক। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য—'গীতিকাব্য'। গীতিকবিতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য লেখক গীতিকবিতাকে মাঝখানে রেখে, তার একদিকে নাটক আর অন্যদিকে মহাকাব্যকে রেখেছেন। এইভাবে তিন ধরনের সাহিত্যরূপের পটভূমিকায় গীতিকবিতার বিশেষত্ব নিরূপণ করেছেন লেখক।

তাঁর বক্তব্যের তৃতীয় ধারায় এসে বঙ্কিমচন্দ্র উদাহরণ দিয়ে উল্লিখিত তত্ত্বটি বিশদ করেছেন। তিনি মহাকবি বাল্মীকি এবং নাট্যকার ভবভূতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এখানে। আলোচ্য বিষয়টি ধরা যাক সীতাবর্জন কালে এবং তারপরে রামচন্দ্রের মনোভাব। ভবভূতি নাট্যকার। কাজেই তার 'উত্তররামচরিত' নাটকে রামচন্দ্রের মনোভাবেব যেসব দিক প্রকাশযোগ্য বা ব্যক্ত করবার মতো কেবল সেই সীমাতেই তার আবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি নাট্যকারের সীমা লঙ্ঘন করে গীতিকবির রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন। অর্থাৎ, রামচন্দ্রের মনের যেসব দিক অব্যক্ত-অপ্রকাশযোগ্য, যা গীতিকবির ক্ষেত্র, তাও তিনি প্রকাশ করতে গেছেন। উল্টোদিকে বাল্মিকী মহাকবি।

মানবমনের ব্যক্ত-অব্যক্ত দুই ক্ষেত্রেই তার অধিকার। তিনি করেছেনও তাই। প্রবন্ধকারের অভিযোগ, নাটকের মধ্যে গীতিকবিতাকে এনে ফেলে ভবভূতি ঠিক কাজ করেননি। অবশ্য, একথাও তিনি বলেছেন, ঈষৎ মাত্রায় নাটকের মধ্যে গীতিকবিতার অনুপ্রবেশ সহনীয়। মানবমনের ব্যক্তব্য, বিষয়টি হল,—'পরসম্বন্ধীয়' ; আর, অব্যক্তব্য বিষয়টি—'আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়'। গীতিকবিতার বিষয় হল,—'আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়'।

৪২.১৩ অনুশীলনী-২

ক. সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে ক'টি ধারায় বিভক্ত করা যায় ?

২। 'গীতিকাব্য' পদটির বিগ্রহবাক্য বলুন।

৩। কোন্ পাশ্চাত্য শব্দের প্রতিশব্দ রূপে বাংলা 'গীতিকাব্য' অভিধাটি প্রদত্ত হয়েছে ?

৪। সীতা বর্জন কালে রামচন্দ্রের মনোভাব ব্যক্ত করতে বাল্মীকি ও ভবভূতির শিল্পরূপের সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৫। 'পরসম্বন্ধীয় এবং আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়' বিষয় দুটির পার্থক্য বোঝান।

৬। 'বঙ্গদর্শনে'র কোন্ সংখ্যায় 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটি বের হয় ? তখন এর নাম কী ছিল ?

৭। আদিতম গীতিকবিতার নির্দশন মিলেছে কোথা থেকে ?

৮। ইংলন্ডের কয়েকজন গীতিকবির নাম করুন।

৯। ঊনবিংশ শতকের কয়েকজন বাঙালি গীতিকবির নাম উল্লেখ করুন।

১০। ঊনবিংশ শতকের বাঙালি মহিলা গীতিকবিদের বিষয়বস্তু প্রধানত কী ছিল ?

খ. বিশদ আলোচনা করুন ঃ

১। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে 'গীতিকাব্যে'র সংজ্ঞা দিন।

২। গীতিকবিতা এবং নাটকের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩। গীতিকবিতার রূপবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৪। পাশ্চাত্য গীতিকবিতার ক্রমবিকাশের রূপরেখাটি তুলে ধরুন।

৪২.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী পর্ব)—ড. সুকুমার সেন।

২) বাঙ্গালা প্রবন্ধ—ড. সুকুমার সেন।

৩) আধুনিক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারা—অধীর দে।

৪) সাহিত্য সন্দর্শন—শ্রীশ চন্দ্র দাস।

৫) J.A. Cuddon (সম্পাদিত)—A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.

৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—ভূদেব চৌধুরী (দ্বিতীয় পর্যায়)

একক ৪৩ ❒ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ শূদ্র জাগরণ

গঠন

৪৩.১ উদ্দেশ্য
৪৩.২ প্রস্তাবনা
৪৩.৩ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ জীবনকথা
৪৩.৪ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যি
৪৩.৫ মূলপাঠ - ১
৪৩.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৪৩.৭ সারাংশ - ১
৪৩.৮ অনুশীলনী - ১
৪৩.৯ মূলাপাঠ - ২
৪৩.১০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৪৩.১১ সারাংশ - ২
৪৩.১২ অনুশীলনী - ২
৪৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি স্বামী বিবেকানন্দের—

- গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করতে পারবেন ;
- তৎকালীন বিশ্বের ও ভারতবর্ষের শূদ্রজাতির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৪৩.২ প্রস্তাবনা

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেবল ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেননি ; তিনি ছিলেন—কর্মবীর। কর্মের মধ্য দিয়েই তিনি জগৎকে দেখেছিলেন। সেই কর্মের দিক থেকে জগৎকে দেখবার ফলে ইতিহাস, রাজনীতি এবং স্বদেশপ্রেমকে তিনি বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের সব বাঙালি মনীষীই তাদের স্বদেশ প্রেমের ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং রাজনীতিকে বিশেষভাবে ভিত্তি করেছেন এবং দেশে-দেশে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাবলির যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথেরও স্বদেশপ্রেম ইতিহাস ও রাজনীতির পটভূমিকায় আলোচিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও সেই পথে চারণা করেছেন, তবে তা একান্তভাবে তাঁরই অনুগত পথে। আলোচ্য ‘শূদ্র জাগরণ’ (এটি তাঁর ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থ থেকে গৃহীত) প্রবন্ধটিতেও তিনি ভারতবর্ষের শূদ্র জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানটি গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন। শূদ্র বলতে তিনি কেবল ভারতীয় একটি বিশিষ্ট বর্ণকেই বোঝাননি, বিশ্বের যেখানেই যত অনুন্নত, পীড়িত মানুষ আছে, তাদেরও বুঝিয়েছেন। এখানেই তিনি মানবতাবাদী, এখানেই তাঁর দৃষ্টি কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত ভারতীয় শূদ্রকে তিনি ইংরেজের শাসনাধীন যে কোনো ভারতীয়কেই

বুঝিয়েছেন। এইভাবে তিনি প্রবন্ধটির ভাব ও অর্থগত সীমাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিচিত্র অর্থে 'শূদ্র' বর্ণটিকে গ্রহণ করে তাদের সর্বপ্রকার সমস্যার উৎস যেমন নিরূপণ করেছেন তেমনি সেই সমস্যার পথও নির্দেশ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য কথা হল,—ইংরেজের প্রসঙ্গের উত্থাপন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সকলেই স্বাভাবিক কারণেই ভারীতয় জীবনের সমস্যার ক্ষেত্রে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা, ইংরেজের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। সব ভারতীয় আলোচকই ভারতীয় জীবনের সর্বপ্রকার সমস্যাকে দু'দিক থেকে লক্ষ করেছেন ; একদিক হল ভারতবাসীর নিজের কর্তব্য, অপরদিক হল শাসকরূপে ইংরেজের কর্তব্য। এই দুই দিকের কর্তব্য যখন একসঙ্গে মিলবে, তখনই শূদ্রদের জাগরণ সম্ভব ও সার্থক হবে। সমগ্র বিশ্বের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কে বিবেকানন্দের যে বিস্তৃত পড়াশোনা ছিল, এই প্রবন্ধটি থেকে তা প্রমাণিত হয়। তাঁর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর মনীষার শুভ সংযোগের পলে এটি একটি বিখ্যাত প্রবন্ধরূপে পরিচিত লাভ করে।

৪৩.৩ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথা

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ক'জন কর্মবীর ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতিবিধানকল্পে আত্মনিয়োগ করেন, স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ জন্ম ঃ ১২.১.১৮৬৩। প্রয়াণ ঃ ৪.৭.১৯০২) তাঁদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য পুরুষ। রোমাঁ রোল্যাঁ, ভগিনী নিবেদিতা, সহোদর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অসংখ্য লেখক-লেখিকা তাঁর জীবন ও কর্মসাধনা নিয়ে তথ্যবহুল , বিশ্লেষণীধর্মী আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ পরস্পরের সম্বন্ধে তেমন আলোচনা করেনি। রবীন্দ্রনাথ স্বল্পকথায় তাঁর কর্মসাধনার মূল্যায়ন করেছেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ও পশ্চিমের সাধনাকে দক্ষিণে ও বামদিকে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে চিরদিন সংকীর্ণতার মধ্যে সংকুচিত করিয়া রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। তিনি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মিলন সেতু রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার ও সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।"

বিবেকানন্দ জেনারেল এসেম্বলি কলেজের (পরে যার নাম হল—স্কটিশচার্চ কলেজ) স্নাতক। ছাত্রাবস্থাতেই দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। বিজ্ঞানের মধ্যে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সমকালীন পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা স্বভাবতই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তিনি ছিলেন তর্কনিপুণ, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করতেন। তাঁর মধ্যে ছিল নেতৃত্ব করবার শক্তি ও ব্যক্তিত্ব। সংগীত বিষয়ে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ, নিজে সংগীতও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত যে গানটি শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম দুই পঙ্ক্তি ঃ 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,/ভাবো ব্যোমে ছায়াসম, ছবি বিশ্ব-চরাচর'। আসলে তাঁদের বাড়িতেই ছিল সংগীত-চর্চার ধারা। এই সংগীত-প্রিয়তা ও সংগীত প্রতিভা তাঁর মানসকে এক বিশেষ স্তরে উন্নীত করে। তাঁর জীবনের এক বিশেষ ঘটনা আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান এবং সেখানে তাঁর পরিচিত। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, এই মহাধর্ম সম্মেলন শুরু হয়, ১৭ দিন ধরে তা চলে। তিনি চার বছর ধরে (১৮৯৪—১৮৯৭) আমেরিকা ও ইংলন্ড পরিভ্রমণ করেন। বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে, বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষকে জানবার জন্য তিনি ভারত ভ্রমণ করেন, তারই অভিজ্ঞতা 'পরিব্রাজক' নামে তাঁর গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি ভাবনা-চিন্তা করেছেন। তাঁর ধর্ম মানুষ তৈরির ধর্ম। তিনি বলতেন ঃ "যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন—" একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, স্বদেশি বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি এবং বিজ্ঞান পড়াতে হবে। দিতে হবে টেকনিক্যাল এডুকেশন, দেশে যাতে ইন্ডাস্ট্রি বাড়ে। তাঁর এ চিন্তা ও যুগের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক। তিনি আরো বলেছেন ঃ "জনশিক্ষা বিস্তারই জাতীয় উন্নতির মূল।"

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল—প্রাচীন ভারতের আদর্শকে উজ্জীবিত করা, তাঁর জীবনের ভিত্তি হল—অদ্বৈত বেদান্তবাদ। তাঁর সাধনা—ত্যাগ ও সেবার সাধনা, নানাপ্রকার অস্পৃশ্যতাকে পরিহার করা। জীবনই তাঁর কাছে শিব। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" ভারতবর্ষের দরিদ্রজনের অস্পৃশ্যজনের হীনজনের প্রতীক ও প্রতিনিধি তিনি। দেশের যুবশক্তির প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা, সর্বপ্রকার কর্মে তিনি তাদেরই আহ্বান করেছেন। তিনি নিজেই বলতেন ঃ "আবার ভারতকে জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবন-স্বপ্ন।" নারীজাতির প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা। 'হিন্দুনারীর আদর্শ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত রচনাও তিনি লিখেছিলেন।

শ্রী অরবিন্দ এই জন্যেই তাঁকে "এক শক্তিধর পুরুষ' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

৪৩.৪ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য

অকাল মৃত্যুর কারণে বিবেকানন্দের অনেক রচনাই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ইংরেজি এবং বাংলা—দুই ভাষাতেই তিনি প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন ; ইংরেজি—বাংলাতে আছে তাঁর পত্রাবলী। যাকে বলে 'পত্র-প্রবন্ধ' এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সেই ধারার। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে পত্র-প্রবন্ধ বিশেষ পরিচিতি লাভ করে, যদিও প্রথম বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথও ভ্রমণ-পত্র ইত্যাদি লিখে এসেছেন।

বাংলা ভাষায় বিবেকানন্দের প্রবন্ধের ও পত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—কথ্য বাংলাকে গুরুত্ব দেওয়া। তাঁর সাধু ভাষায় লেখা গদ্য যেমন সহজ-সাবলীল, কথ্য ভাষায় লিখিত গদ্য তেমনি স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী। যে সময়ে অন্যান্য গদ্য শিল্পীরা সাধু বাংলায় রচনাদি লিখছেন, সেই সময় কথ্য গদ্যকে এসব স্বীকৃতি দান বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় কথ্য গদ্যই ব্যবহৃত হতে থাকে।

বিবেকানন্দের কর্ম ও সাধনার দিকটি তাঁর প্রবন্ধে ও পত্রে সম্যক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়—'উদ্বোধন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দুটি সাময়িক পত্রে। প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল ঃ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৫), 'ভাববার কথা' (বিভিন্ন বিষয়ের রচনার সংকলন, (১৯০৭), এছাড়া পত্র-সংকলন 'পত্রাবলী'। 'ভাববার কথা' বইতে তিনি কথ্য বাংলা ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

"...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না ; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেলে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনওকালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাৎ মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"

ধর্মচিন্তা, রাজনৈতিক ও স্বাদেশিকতার চিন্তা, শিক্ষা ও ইতিহাস-চিন্তা তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের নানা দিক। 'রাজযোগ' গ্রন্থে ধর্মগত জটিলতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। নব্য ভারতকে তিনি রজোগুণ ও কর্মযোগের সম্মিলনে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর 'সংস্কারক কে ?' রচনাটি উল্লেখযোগ্য। খাঁটি সংস্কারক বলতে তিনি এই বুঝিয়েছেন ঃ

"যুদি তুমি দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে দাও, তবে তোমার তিনটি জিনিস থাকা চাই-ই চাই। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা। তোমার ভাইদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে ?... তারপর চাই কৃতকর্মতা। বল দেখি, তুমি দেশের কল্যাণের কোন নির্দিষ্ট উপায় স্থির করিয়াছ কি ?...আরও একটি জিনিসের প্রয়োজন-প্রাণপণ অধ্যবসায়।"

বিবেকানন্দের পূর্বে মূর্খ, চণ্ডাল, দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য এমন করে কেই ভাবেননি। আলোচ্য 'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটি তারই ফল। এই মানুষদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতার কারণে দূরে ঠেলে রাখা,

তাদের সামাজিক উর্ধ্বায়ন—প্রভৃতিকে তিনি একদিকে আবেগ, অপরদিকে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক যুক্তি—দুদিক থেকেই দেখেছেন। বেদান্তধর্মকে তিনি জীবনের Practical ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন এভাবেই। তিনি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, কিন্তু সে সন্ন্যাস কর্মময় সন্ন্যাস। নিষ্কাম কর্মসাধনাই তাঁর মূল সাধনা। তাঁর গদ্যের স্টাইল হল একদিকে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা (সংস্কৃতে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল, সংস্কৃতেও তিনি কয়েকটি কবিতাও লিখেছেন), আবার অন্যদিকে শ্লেষ-ব্যঞ্জাকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর বাংলা ভাষায় লেখা প্রবন্ধের পরিমাণ ইংরেজির তুলনায় কম। মানুষকে একটি বিশেষ ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত করবার জন্যই তাঁর ভাষা এই বিশেষত্ব অর্জন করেছিল।

৪৩.৭ মূলপাঠ - ১

শূদ্র-জাগরণ

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব তাহারা কোথায় ? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত ? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান', ভারতেতর দেশের 'ভারবাহী পশু' সে শূদ্রজাতির কি গতি ?

এদেশের কথা কি বলিব ? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক ; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায় ; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এমন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই ; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকিরণে ; এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা। ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কি হয় ? যে একতাবলে দশজনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর ; শূদ্রজাতিমাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিময়ে পরাধীন।

কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইওরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুত পদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খধ্‌পতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতন্য এস্থলে বিবেচ্য।

তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম কর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম, নাইহিলিজম[১] প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্রপশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিস্ফল ; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।

পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির

১. সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিবাদ

একে বিদ্যার্জন বা ধন সংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হন, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের ভাগ পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্মণ্য মনুষ্যসকল শূদ্রবর্ণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ[১] ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর[২] ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল ; তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শূদ্রকুলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের স্বসমাজত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মর্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্যগত লোকসকলের ধীরে ধীরে উন্নতিবিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে, জাতিনির্বিশেষে দণ্ড পুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।

সমাজে নেতৃত্বে বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার— প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়। তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তৎকালীন প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল ; রাজশক্তি ও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখাক খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে ; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি-সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী[৩] পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মূর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান-বিদ্বেষ ইংলন্ড ও জার্মানির এবং ইংলন্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনওমতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য

---

১. বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত - ঋগ্বেদ, ৭।৩৩।১১-১৩

২. ধীবরজননীর পুত্র

৩. পশু শিকার করিয়া জীবনধারণ করে যে।

আছে। প্রজোৎপাদন ও 'যেত তেন প্রকারেণ' উদরপূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি ; আর উচ্চবর্ণের—ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই, ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

৪৩.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

এই নিবন্ধটি বিবেকানন্দের প্রতিভার এক বিশিষ্ট নিদর্শন। শূদ্র জাগরণের বিষয়টিকে তিনি সমকালের বিশ্বের যুগস্বভাবের দিক থেকে ইতিহাসের তথ্যমালার উপস্থাপনের প্রেক্ষাপটে, এবং সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের পটভূমিকায় পর্যবেক্ষণ করেছেন ; আলোচনার মূল দৃষ্টিচকোণটি হল—তুলনামূলকতার দিক। সবার শেষে আছে—সাহিত্যিক দিক থেকে বিষয়টির প্রকাশগত দিক। এই সবগুলি মিলিত ও একত্র হয়ে রচনাটিকে করে তুলেছে একান্তভাবেই বিবেকানন্দীয়।

প্রবন্ধের প্রাথমিক পর্বেই দেখা যায়, লেখক প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক ভারতের ইংরেজ প্রশাসনের (Administration) তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তুলনাটি সমাজব্যবস্থার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার। দুই ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা। ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা বলেই তা প্রতিভার পরিচায়ক। লেখক বলেন ঃ ইংরেজ আজ ব্রাহ্মণ, ইংরেজই আজ ক্ষত্রিয় এবং পুনশ্চ ইংরেজই আজ বৈশ্য। একা ইংরেজ প্রশাসনই প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছে। আর সেই ইংরেজের দ্বারা শাসিত গোটা ভারতীয়গণই আজ শূদ্রে পরিণত। এইভাবে 'শূদ্র' এই আখ্যাটিকে একটি অভিনব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পটভূমিকায় দেখা হয়েছে। লেখকের আক্ষেপ, এই রাজনৈতিক 'শূদ্রত্ব' ঘোচাবার জন্য ভারতবাসীদের মধ্যে কোনো প্রয়াস নেই, উদ্যম নেই। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অপরদিকে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যেই আছে ঈর্ষা ও অনৈক্য, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেমন জাতিগত দিক থেকে শূদ্রদের নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা-অনৈক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, রাজনৈতিক শূদ্র অর্থাৎ পরাধীন ভারতবাসীদের মধ্যেও তাই দেখা যায়। একদিকে ব্রাহ্ম-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, অপরদিকে শূদ্রগণের মধ্যেও তাই। এই স্বাভাবিক কারণেই শূদ্রগণ আজ একটি পতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর লেখক রচনাবলির বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণে রত হয়েছেন এবং সমগ্র সমকালীন বিশ্বের একটি লক্ষণকে খুঁজে পেয়েছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'যুগস্বভাব'। এই 'যুগস্বভাব'কে তিনি অবহেলিত উপেক্ষিত বিধ্বস্ত শূদ্রগণের পক্ষে আশাব্যঞ্জক বলে মনে করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তখন দেখা যাচ্ছিল যুগ প্রভাবে বা কাল প্রভাবে সমাজের উচ্চবর্ণ ক্রমেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ নিম্নবর্ণে পরিণত হচ্ছে, বর্ণভেদ ঘুচে যাচ্ছে, শূদ্রদের পক্ষে তা শুভ ঘটনা। লেখকের মন্তব্য ঃ "কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্র জাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে।" সমকালীন ইতিহাস থেকে তিনি তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন, রোমরাজ্যের পতনের পর ইউরোপের নানা পরাধীন দেশের উত্থান ঘটেছে ; মহাবল চীনের পতন ঘটছে, নগণ্য জাপান রাজনৈতিক উচ্চবর্ণ প্রাপ্ত হচ্ছে। গ্রীস-ইতালি-তুরস্ক-স্পেনের নিম্নাভিমুখ পতনও এখানে উল্লেখযোগ্য। সর্বত্রই উচ্চশক্তির পতন পরাভব এবং নিম্নশক্তির উত্থান সূচিত হচ্ছিল। বিশ্বের এবং ভারতের শূদ্রগণের পক্ষে এইসব ঘটনা বিশেষ উদ্দীপনার সূচক, সন্দেহ নেই। বিশ্বের এবং ভারতের শূদ্রগণের পক্ষে এইসব ঘটনা বিশেষ উদ্দীপনার সূচক, সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য জগতে এই যে উচ্চশক্তির ক্রমাবনতি, তার পেছনে কারণ হিসেবে আছে সোস্যালিজম (সমাজতন্ত্রবাদ), এনর্কিজম্, (নৈরাজ্যবাদ) এবং জাইহিলিজম্ (জাতিবাদ)। ইউরোপের এইসব রাজনৈতিক মতবাদগুলিকেই লেখক "বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা" বলে মনে করেন। এই সব বিপ্লবের ফলেই উচ্চশক্তির পরাভব ঘটে চলেছে। এরই ফলে, অর্থাৎ ইতিহাসের এক অমোঘ নির্দেশের ফলে ও বলে ভারত ও বিশ্বের শূদ্রগণের উন্নতি আসন্ন।

কিন্তু শূদ্রগণের এই বিশ্বব্যাপী আসন্ন উন্নতি প্রসঙ্গে লেখকের দুটি বিশেষ বক্তব্যও এখানে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, শূদ্রের যে জাগরণ ও উন্নয়ন ঘটবে, তাতে শূদ্রগণ তাদের নিজস্ব ধর্ম-কর্ম-সংস্কার-সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলবে না,—"শূদ্র 'ধর্ম-কর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।" দ্বিতীয়ত, সেইটি আয়ত্ত করতে গেলে শূদ্রদের নিজেদেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে, তার জন্য জাতিগত প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ "যুগ-যুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র পশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিস্ফল ; এবং দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।" অর্থাৎ কেবল যুগস্বভাব বা কালপ্রবাহের কারণেই নিতান্ত অনায়াসে ও অবলীলাক্রমেই শূদ্র-জাগরণ ঘটবে না ; তাদের পক্ষ থেকেও তাদের জাতীয় কর্মসম্পাদন করতে হবে,—তবেই জাগরণ ও উন্নতি সম্ভব হবে।

লেখক এরপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজকাঠামোর দৃঢ়তা ও স্থায়ী দিকে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং সমাজে শূদ্রগণের অবস্থানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। প্রথমেই লক্ষণীয়, পাশ্চাত্য জাতি 'গুণগতজাতি'। এর অর্থ হল, ব্যক্তির নিজস্ব quality বা গুণ অনুসারে সমাজে সে উচ্চ বা নীচ স্থানে অবস্থান করে। পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও এই গুণগত জাতির দকি একটি দোষের বা অনিষ্টের কারণ। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এই 'গুণগতজাতি' তত্ত্ব "শূদ্রগণকে দৃঢ় বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল"। 'গুণগতজাতি' তত্ত্ব পাশ্চাত্যের পক্ষে অনিষ্টের আর ভারতের পক্ষে ইষ্টের কারণ কেন ? আপন প্রতিভাবলে কোন শূদ্র ধনশালী বা বলবান হলে, তাকে সমাজের উপরিতলে স্থান দেওয়া হত, এতে তার জাতি আপন বিশুদ্ধতা নিয়ে আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। তবে এ প্রথার বড়ো দোশ উন্নত ও প্রতিভাশীল শূদ্রের বিদ্যা-বুদ্ধি-ধনের ভাগ তার নিজের জাতি পেতে পারে না। তেমনি আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকুল থেকে পতিতেরা স্বাভাবিক কারণেই শূদ্রকুলে গৃহীত হত। এই শূদ্রের সংখ্যাও বেড়ে যেত।

কিন্তু আধুনিক ভারতে, ইংরেজের শাসনের ফলে কোন শূদ্র পণ্ডিত বা ধনবান হলেও, তার নিজের সমাজ ত্যাগের অধিকার নেই। "কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে।" এর ফলে আপন বৃত্তমধ্যগত শূদ্রগণের ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। ভারতে যতদিন ইংরেজ শাসনব্যবস্থার এই বিধি প্রচলিত থাকবে, ততদিন নীচ জাতিদের এইভাবে উন্নতি হতে থাকবে। সমাজতত্ত্বের সঙ্গো এইভাবে লেখক অর্থনৈতিক দিকটি জড়িত করে নিয়েছেন।

এইবার সমাজের নেতৃত্ব-শক্তির সঙ্গো সমাজের সাধারণ প্রজাগণের সম্পর্কের ফলাফল ব্যক্ত করেছেন লেখক। প্রজাগণই সমাজের মূল শক্তি। কাজেরই এই শক্তির সঙ্গো নেতৃত্বশক্তির যদি বিচ্ছেদ ঘটে তবে, তা ওই নেতৃত্বশক্তিরই পতনের কারণ হয়। ইতিহাসেও তাই দেখা গেছে পৌরোহিত্য শক্তি রাজশক্তির কাছে, রাজশক্তি বৈশ্য শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে। অতঃপর এই বৈশ্য শক্তি শূদ্রশক্তির কাছে পরাভূত হবে। প্রতিক্ষেত্রেই পরাভবের কারণ কর্তৃসম্প্রদায় ক্ষমতাগর্বে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল।

কিন্তু এখানেও শূদ্রগণের প্রতি বিবেকানন্দের সাবধানী বাণী উচ্চারিত হয়েছে। শূদ্রশক্তির আধিপত্যের দিন সমাগত। তবে সে জন্য চাই শূদ্রদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য, প্রীতি ও সহানুভূতি। ইতিহাসেও দেখা যায়, স্বজাতি বাৎসল্য এবং শত্রুবিদ্বেষই কোনো জাতির উন্নতির মূল কারণ। স্বার্থই জীবনের শিক্ষক। ব্যক্তি ও ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষাই দেশ-জাতি-সমষ্টির উন্নতির কারণ হয়ে ওঠে। অবশ্য ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত স্বার্থের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হওয়াটাই যেন শেষে বড়ো না হয়ে ওঠে। বর্তমান ভারতে সাধারণ ভারতবাসী কোন প্রকারে উদরপূর্তিতেই সন্তুষ্ট ; উচ্চবর্ণের ভারতবাসী কোনপ্রকারে ধর্মরক্ষাকেই জীবনের বড়ো আশা বলে মনে করে। লেখকের মতে, এখানেই আত্মস্বার্থ রক্ষা কোনো বৃহৎ জাতীয় স্বার্থরক্ষার সোপান না হয়ে সমাপ্তি হয়ে থাকে, যা বিশেষ শোচনার কারণ। আত্মস্বার্থ ও ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষাই হবে বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার প্রাথমিক স্তর।

লেখকের এই বক্তব্য এক বিশেষ গদ্যশৈলীতে ব্যক্ত হয়েছে। মানুষকে, দেশবাসীকে আবেগচালিত করবার জন্য

তিনি প্রথমাংশে নিয়েছেন পুনরাবৃত্তির আশ্রয়, একটু বা ব্যঙ্গাত্মক তির্যক দৃষ্টির অনুসরণ। নতুবা এই রচনাটিতে ইতিহাসবোধ ও যুক্তি নিষ্ঠা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশেষ প্রশংসার কারণ। শব্দচয়নের মধ্যে যে দৃঢ়তা আছে, তা প্রবন্ধটিরই অন্তর্নিহিত দৃঢ়তার সূচক।

তবে, বক্তব্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি অসম্পূর্ণতা ঈষৎ পীড়াদায়ক ঃ 'গুণগত জাতি' সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য আর একটু প্রসারিত হবার অপেক্ষা রাখে। 'গুণগত জাতি' পাশ্চাত্য দেশের শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের পক্ষে কিভাবে দোষ বা অনিষ্টের কারণ হয়ে উঠেছে, সাধারণ পাঠক তা সহজে ধারণা করে উঠতে পারে না। তেমনি, বিপরীত দিকে, সেই তত্ত্বটি প্রাচীন ভারতের শূদ্রকুলকে কিভাবে "দৃঢ়বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল" তাও স্পষ্টতর হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

৪৩.৭ সারাংশ - ১

প্রাচীন ভারতের সামাজিক কাঠামোটি ছিল এইরকম ঃ সবার উপরে ব্রাহ্মণ, তার নীচে ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য এবং সবার নীচে শূদ্রগণ। স্বভাবতই এই শূদ্রগণ ছিল সমাজে অবহেলিত ও অনুন্নত। উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা শোষিত। লেখক এই অর্থে 'শূদ্র' বর্ণকে যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি আর একটি অর্থাৎ এটিকে প্রয়োগ করেছেন ঃ ইংরেজের রাজত্বে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-মারাই, যে কোন ভারতীয় শূদ্রে পরিণত। অর্থাৎ সব ভারতবাসীই তৎকালীন ইংরেজ রাজশক্তির দ্বারা দলিত, পরাভূত। সব ভারতীয়ই তখন তাই শূদ্রের সমান। এইভাবে লেখক 'শূদ্র' আখ্যাটিকে একটি প্রসারিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কেবল সব ভারতীয়ই নয়,—পৃথিবীর যেখানে যত দলিত উপেক্ষিত-অনুন্নত সমাজ ও গোষ্ঠী আছে, তারও যেন শূদ্র। এইভাবে ক্রমে-ক্রমে শূদ্র আখ্যাটিকে প্রবন্ধকার প্রসারিত ও বিস্তৃত করে নিয়েছেন। এই শূদ্রের জাগরণ ও উত্থান প্রসঙ্গটি আলোচ্য প্রবন্ধের বিবেচ্য। এই উত্থান ও জাগরণের আছে দুটি দিক ঃ একদিকে শূদ্রদের নিজের মধ্যে চাই ঐক্য-সংহতি-প্রীতির প্রতিষ্ঠা ; অন্যদিকে তাদের সঙ্গো শাসনগমের সহযোগিতা। লেখকের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য দেশে তৎকালে যে নানা রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার দেখা গেছে, তা শূদ্র জাগরণেই পূর্বাভাস ও তার পরিপোষক। অবশ্য উচ্চবর্ণের মানুষেরা সেজন্য ভীত ও উদ্বিগ্ন। শূদ্রের এই জাগরণ হবে—শূদ্রদেরই নিজস্ব ধর্ম-কর্ম—সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার করে নিয়ে তাদেরই জীবনবৃত্তের মধ্যে এবং সর্বদেশের শূদ্রের সমাজে।

সমাজের প্রচলিত কাঠামোটিকেও এজন্য দৃঢ় করা প্রয়োজন। দেখা যায়, কোনো মানুষের গুণ বা দোষ অনুসারে সে সেই সমাজের উঁচু স্তরে ওঠে বা নীচে স্তরে নেমে যায়। এতে সমাজের বাঁধুনির দৃঢ়তা থাকে না। আবার, গুণ বা প্রতিভাবলে কোন নীচু বর্ণের মানুষ যদি সমাজের উচ্চস্তরে উঠে যায়, তবে তার নিজস্ব সমাজ তার গুণ বা প্রতিভার সুফল পায় না। তেমনি কোন ব্যক্তিগত দোষের ফলে সমাজের উঁচু তলার মানুষ নীচে নেমে এসে নীচু সমাদেল আবর্জনা বাড়ায়। সমাজে ব্যক্তি মানুষের এই ওঠা-নামাটি বন্ধ করতে হবে। তবেই শূদ্রজাতির উত্থান ও উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। আধুনিক ভারতে কোন শূদ্র মহাপন্ডিত হলে কিংবা বিশেষ ধনবান হলেও আপন বর্ণ ও সমাজ পরিত্যাগ করতে পারে না। এটিকে শূদ্র-জাগরণের একটি সহায়ক কারণ বলা যায়। এতে শূদ্রের ধন এবং প্রতিভা তাদের নিজ সমাজেরই কাজে লাগবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নীচ জাতির উন্নতি হতে থাকবে।

মানুষের সমাজ সর্বদাই বিবর্তনশীল। তাই প্রাচীন পৌরোহিত্য শক্তি একদিন রাজশক্তির নিকট পরাভূত হয়েছে ; রাজশক্তি আবার পরাভূত হয়েছে বৈশ্য শক্তির কাছে। এইবার বৈশ্য শক্তি ও শূদ্রশক্তির কাছে পরাভূত হবে বলে আশা করা যায়। ইতিহাসই এ কথা বলে। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, উপরের বর্ণ বা শক্তি নীচের বর্ণ বা শক্তি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবার ফলে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। বৈশ্য শক্তিও তেমনি শূদ্রশক্তি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে নিজেদের পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। ফলে শূদ্রের আধিপত্যের দিন সমাগত। এই অবস্থায় শূদ্রদের আশু কর্তব্য হল, নিজেরা একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 'জাতি' বা 'দেশ' গঠন করুক। কেননা, ইতিহাসে দেখা গেছে, স্বজাতির প্রতি প্রীতি এবং শত্রুর প্রতি বিদ্বেষেই এক-এক দেশ বা জাতির উন্নতি হয়েছে।

৪৩.৮ অনুশীলনী - ১

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) স্বামী বিবেকানন্দকে কেন 'কর্মবীর' বলা হয় ?

(খ) কোন্ কোন্ দৃষ্টির সমন্বয়ে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য রচিত ?

(গ) 'শূদ্র' বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন ?

(ঘ) শূদ্র-জাগরণের প্রাক্‌কালে শূদ্রদের কর্তব্য প্রসঙ্গে স্বামীজির নির্দেশ ব্যক্ত করুন।

(ঙ) তাঁর সংগীতপ্রিয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

(চ) বিশ্ব ধর্মমহাসভা ক'দিন চলেছিল ?

(ছ) কে তাঁকে 'শক্তিধর পুরুষ' বলেছিলেন ?

(জ) বিবেকানন্দের রচনাবলী কোন্ কোন্ সামায়িক পত্রে প্রকাশিত হয় ?

(ঝ) তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

(ঞ) কথ্য বাংলা সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য বলুন।

২। নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

(ক) বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নটি তুলে ধরুন।

(খ) বিবেকানন্দের প্রবন্ধসাহিত্য সম্পর্কে দু-কথা বলুন।

(গ) বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তার বিশেষত্ব কী ?

(ঘ) তাঁর মতে খাঁটি সংস্কারক কে ?

(ঙ) 'শূদ্র জাগরণ' প্রবন্ধটির গদ্য শৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

(চ) 'বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন ?

৪৩.৯ মূলপাঠ - ২

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবণ গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ এই যে, পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এ দেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ[১] দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুন, ক্ষতি নাই ; সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচারণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয় ; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে ? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি ? চিন্তাশীলতার লোপের

১. চিহ্ন

সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহতশক্তি সম্রাটের প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোন প্রজারই রাজশক্তির নিয়মে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজ বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশ ভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমাক-শাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিত ইহুদীবংশোদ্ভূত হইয়াও খ্রিস্টধর্মপ্রচারক পোল (St. Paul), কেশরী (Caesar) সম্রাটের[১] সমক্ষে আপনার অপরাধ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি' পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে? প্রাচ্য আর্যাবর্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণেরা 'মারাঠা' জাতির যে সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাতিদের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সমর্থিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরেজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্যে তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজজাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতে ইংলন্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরূপ রাখা। এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয়। ভারতনিবাসী ইংরেজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতিবলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন যে সদাজাগরূপ বিজ্ঞান-সহায় বাণিজ্য বুদ্ধিবলে সর্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলন্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরেজের থাকিবে এমন ভারতরাজ্য—শত শত লুপ্ত হইলেও শত শত আবার অর্জিত হইবে। কিন্তু যদি ঐ সকল গুণ প্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়; বৃথা গৌরবঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য যে সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বেও অর্থহীন 'গৌরব' রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক। উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ।

৪৩.১০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটির প্রথমাংশ যেমন লেখকের প্রতিভার দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল, দ্বিতীয়াংশ তদ্রূপ নয়। আসলে প্রথম অংশেই ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং বিশ্লেষণী প্রতিভার যে প্রয়োজন ছিল, দ্বিতীয়াংশে সে প্রয়োজন যেন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রথমাংশে শূদ্রজাগরণের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর দ্বিতীয়াংশে শূদ্রজাগরণের ক্ষেত্রে ইংরেজের ভূমিকাটিই লেখকের দৃষ্টিকে কেড়ে নিয়েছে। আবার, এই ইংরেজের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যে যে পথে চারণা করেছেন, সমস্যার পটভূমিকাটি অভিন্ন বলে, বিবেকানন্দও মোটামুটি সেই পথে গিয়েছেন। সকলেই ইংরেজের মধ্যে দুই বিপরীত সত্তাকে দেখেছেন ঃ একটি ভালোর দিক, ভারতবাসী যার ফলে নানাভাবে উন্নত হবার সুযোগ পেয়েছে। অপরটি ইংরেজের দোষ-দুর্বলতার দিক।

১. রোমক সম্রাট সীজার

শূদ্র-ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র তুলেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে তোলেননি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের যে রাজনৈতিক সামাজিক সুযোগ সুবিধের কথা তুলেছেন, আধুনিক ভারতে ব্রাহ্মণের রাজনৈতিক-সামাজিক সুযোগ সুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, প্রাচীন ভারতীয় শূদ্র আর আধুনিক ভারতের শূদ্রগণের মধ্যে কোনো তফাত নেই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণই ছল ইংরেজবৎ। কাজেই তখন শূদ্রগণ অত্যাচারিত হত ব্রাহ্মণের দ্বারা, আধুনিক ভারতে ইংরেজের দ্বারা। কিন্তু শূদ্রের উন্নতির বা জাগরণের কোনো পথ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ করেননি। আলোচ্য প্রবন্ধে বিবেকানন্দ যা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ তিনজনেই ইংরেজের সহযোগিতার প্রশ্নটি তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, বিবেকানন্দের মতে, ইংরেজের 'গৌরব রক্ষা', প্রভৃতি কারণে ইংরেজ ভারতবাসীর জন্য কল্যাণকর্ম করতে রাজি নয়। শূদ্রের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের নিপীড়ণমূলক আচরণকে রবীন্দ্রনাথ কবি-সুলভ মানবিক দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, যাকে নীচেও পশ্চাতে রাখা হয়, সেই উচ্চবর্ণকে 'পশ্চাতে টানিছে'। বিবেকানন্দ সেখানে ইতিহাসের নজির উত্থাপন করে বলেন, সমগ্র বিশ্বেই আজ উচ্চবর্ণের ও শক্তিধর রাষ্ট্রের পতনের পালা এবং শূদ্রের উত্থানের যুগ চলছে। স্বাভাবিক কারণেই বিবেকানন্দ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের দিকটিকে আশ্রয় করেছেন। অবশ্য, 'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথও ইতিহাসের তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

বিবেকানন্দের 'শূদ্রজাগরণে'র প্রসঙ্গে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' এবং তারই অন্তর্গত 'কবির দীক্ষা' রচনা দুটির উল্লেখ করে থাকেন। বিবেকান্দ দেখিয়েছেন, বিচ্ছিন্ন করে রাখবার ফলে পৌরোহিত্য শক্তি রাজশক্তির কাছে এবং রাজশক্তি বৈশ্য শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে আসছে এবং এই সূত্রানুযারী এই বার শূদ্রের আধিপত্যের দিন সমাগত। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' এবং 'কবির দীক্ষা' বিবেকানন্দের পরবর্তীকালে রচিত, স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ আরো পরবর্তীকালীন চিন্তার অবকাশ পেয়েছেন। রথের চাকা আর্য শক্তির টানে না চলে অনার্য শক্তির টানে যেখানে চলতে শুরু করেছে সেখানে শূদ্র বা অনার্য শক্তির উল্লাসিত হবার কারণ নেই। কারণ, বিজয়লাভের পর তারাও যতি নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তবে তাদেরও পতন অনিবার্য। 'কবির দীক্ষা'র সন্ন্যাসী কি বিবেকানন্দ ? বিবেকানন্দ হোন বা না হোন রবীন্দ্রনাথের রাজাগণ 'রাজর্ষি', একাধারে রাজা ও ঋষি। এই ঋষিবৎ নিরাসক্ত চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথকে প্রথমাবধি আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রকল্পনায় 'রথের রশি'র 'রশি' শেষে মানববন্ধনে পরিণত হয়েছে—'এখন আর দেরী নয় ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্‌গো।' উচ্চ নীচ সকলের হাতে হাতে বন্ধন তৈরি করে কালের রথ চালনা করা। আর যদি তা না করা হয় তবে শূদ্রদেরও একদিন পরাভব স্বীকার করতে হবে।

৪৩.১১ সারাংশ - ২

প্রবন্ধের প্রথম অংশে শূদ্রদের অবনতিরও অনুন্নতির কারণ নির্দেশ করেছেন লেখক। সেই সঙ্গে নির্দেশ করেছেন শূদ্রগণের জাতীয় কর্তব্য। আর, প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে আছে, ভারতের তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর কর্তব্য কথা। ভারতের তৎকালীন শাসক বলতে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রাচীন ভারতের মৌর্যযুগের পর ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার মতো এত সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা আধুনিক ভারতে আর দেখা যায়নি। তবে, ব্রটিশ শাসনব্যবস্থার দোষ এবং গুণ—দুইই আছে। গুণের দিকটি এই ঃ ব্রিটিশ জাতি যেন বৈশ্যজাতি, বৈশ্যের মতোই বেণে। তবে ব্রিটিশ-বানিয়া দেশ-বিদেশ থেকে কেবল ভোগ্যপণ্যই ভারতে নিয়ে আসেনি ; সঙ্গে এনেছে দেশ-বিদেশের নানা ভাব-ভানা। শূদ্র-ভারতবাসী দেশ বিদেশের সেইসব ভাব-ভাবনায় ক্রমে ক্রমেই উন্নত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কিছু দোষের দিকও আছে ; এই শাসনব্যবস্থা এত দৃঢ় ও নিয়মবদ্ধ যে তা ভারতবাসীর চিন্তা শক্তিকে হ্রাস করে দিচ্ছে, জাতীয় জীবনে তাকে জড় করে রাখছে।

অতঃপর লেখক রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র—এই দুই শাসনব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করে দেখাচ্ছেন, রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই প্রজার পক্ষে মঙ্গালদায়ক হয়,—অন্তত ইতিহাসে সাক্ষ্য তাই। ইতিহাস থেকে লেখক তার দৃষ্টান্ত সংকলন করেছেন। রাজতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারী রাজা কোন প্রজাকেই সুবিধা দেন না, কাজেই বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সুযোগ পাবার কোন সম্ভাবনাই সেখানে নেই। প্রজাদের মনের মধ্যেও এজন্য কোন অসন্তোষ থাকে না। রাজার কৃপা অর্জনের জন্য প্রজাদের মধ্যেও কোন প্রয়াস ও প্রতিযোগিতা থাকে না। কিন্তু প্রজাতন্ত্রে বা প্রজা নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থায় শাসক-শাসিতের মধ্যে বহু পার্থক্য এসে পড়ে। প্রজাদের স্ববশে রাখবার জন্য, শাসকগোষ্ঠী তাদের সব শক্তি শাসিতের কল্যাণের জন্য ব্যয় না করে নিজেকে দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে তা নিয়োগ করে। এতে শক্তির অপচয় এবং অপব্যয় ঘটে। ইংরেজের শাসনপ্রণালীর বিশিষ্টতা ও দৃঢ়তা একদিকে শূদ্ররূপী ভাবতবাসীকে জড়ত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ; অপরদিকে শাসকরূপে ইংরেজ তার আপন শক্তিকে নিজে গৌরব প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করছে।

আজ ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য নিজেদের মধ্যে যে সংশয়-বিতর্ক-বিদ্বেষের ভাব আছে, তাকে সরিয়ে ফেলে একত্র হওয়া। অন্যদিকে ইংরেজও আজ ভুল করছে ঃ যে বীরত্ব, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে তারা একদিন ভারতবর্ষ জয় করেছে, তারা মনে করে, তাদের সেই জাতীয় 'গৌরব' রক্ষা করে চললেই বুঝি এদেশে তা চিরস্মরণীয় হবে। তাদের সব শক্তি তাই আজ সেই জাতীয় 'গৌরব' রক্ষার প্রতি নিয়োজিত। তাদের এই শক্তিকে তারা যদি শূদ্র-ভারতের কল্যাণকর্মে নিযুক্ত করত, তবে ভারত ও ব্রিটেন উভয় দেশেরই মঙ্গাল হত। ফলে শূদ্র ভারতের জাগরণ ও উন্নতি ত্বরান্বিত হত।

৪৩.১২ অনুশীলনী - ২

১। **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ**

(ক) ব্রিটিশ-শাসনব্যবস্থার গুণের দিকটি কী ?

(খ) ইংরেজকে 'বৈশ্য' কেন বলা হয়েছে ?

(গ) কেন ব্রিটিশ-শাসনব্যবস্থায় ভারতবাসী 'জড়' হয়ে পড়ছে ?

(ঘ) কেন ইংরেজগণ ভারতবাসীর মনে ইংরেজ জাতির 'গৌরব'কে সদাই জাগিয়ে রাখতে চায় ?

(ঙ) 'যেন তেন প্রকারেণ'—এই বাগধারাটি আলোচ্য প্রসঙ্গো কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে ?

২। **নীচের প্রশ্নগুলির বিস্তৃত উত্তর দিন ঃ**

(ক) রাজতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দোষ গুণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। বর্তমান প্রবন্ধে প্রসঙ্গাটির অবতারণার কারণ কী ?

(খ) শূদ্রজাগরণের প্রসঙ্গো বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সহজ কথা বিশ্লেষণ করুন।

(গ) 'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটির প্রথমাংশের সঙ্গো দ্বিতীয়াংশের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বর্তমান ভারত।

(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালান্তর। সভ্যতার সংকট। রথের রশি। কবির দীক্ষা।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিবিধ প্রবন্ধ।

(৪) অধীর দে ঃ আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা।

একক ৪৪ ❒ নিয়মের রাজস্ব — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

গঠন

৪৪.১ উদ্দেশ্য
৪৪.২ প্রস্তাবনা
৪৪.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ঃ জীবনকথা
৪৪.৪ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্য
৪৪.৫ মূলপাঠ (প্রথম অংশ)
৪৪.৬ সারাংশ
৪৪.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৪৪.৮ অনুশীলনী - ১
৪৪.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
৪৪.১০ সারাংশ
৪৪.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৪৪.১২ অনুশীলনী - ২
৪৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

- তাঁর গদ্যরীতির বিশেষত্বগুলি অনুধাবন করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে জানতে পারবেন।

৪৪.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির জীবনে যে রেনেসাঁস দেখা দেয়, তার ফল রূপে রস-সাহিত্যের সঙ্গো সঙ্গো জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় বাঙালি আপনাকে বিস্তৃত করতে আগ্রহী-উৎসাহী হয়। নানা সাময়িক পত্রে এবং গ্রন্থাদিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ—কেউই এ বিষয়ে গ্রন্থ-প্রবন্ধাদি না লিখে পারেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেই সব লেখকের অন্যতম। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা নির্মাণে অধিকতর উদ্যোগী ছিলেন এবং বাঙালির জীবনে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান-মনস্ক করে তোলবার দিকে মন দিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাদি অত্যন্ত অন্তরঙ্গা ভঙ্গিতে লিখিত হয়—যাতে সাধারণ বাঙালি সে সব রচনাদি পড়ে সচেতন হয়ে ওঠে। রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের এক দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি দর্শনিকের মতো চিন্তা করেছেন, বৈজ্ঞানিকের বস্তুনিষ্ঠা নিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করেছেন এবং সবার শেষে সাহিত্যিকের রসবোধ দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষায় চার্লস ডারউইনের তত্ত্বকে তিনিই প্রথম বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় দর্শনের বেদান্তবাদও তাঁর আলোচ্য দিক। ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গো ভারতীয় দর্শনের মিশ্রণসাধন তাঁর একটি বড়ো অবদান। দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময়েই সাহিত্য বা প্রাত্যহিক জীবনের

নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটিকে হৃদ্য ও প্রাঞ্জল করে তুলতেন। তাঁর গদ্যও বিশেষত্বপূর্ণ। আলোচ্য 'নিয়মের রাজস্ব' প্রবন্ধটি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) থেকে গৃহীত। প্রবন্ধটি একটি সুলিখিত প্রবন্ধ এবং সে কারণেই এটি বহুপঠিত।

৪৪.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ঃ জীবনকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১২৭১ বঙ্গাব্দ/ইং ১৮৬৪—১৩২৬ বঙ্গাব্দ/ইং ১৯১৯) পূর্বপুরুষ বুন্দেলখণ্ড থেকে বঙ্গাদেশের ফতেপুরে আসেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরের কাছে টেঙা বৈদ্যপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। কর্ম ও বিবাহসূত্রে এঁরা জেমো (কান্দি) রাজবাড়ির সঙ্গো যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে প্রথম হন, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। ১৮৮৭-তে তিনি বিজ্ঞানে এম.এ. (তখন এম.এস.সি. চালু হয়নি) পাশ করেন। প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতার রিপণ কলেজের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, পরে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হন,—আমৃত্যু সেই পদেই কর্ম করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র বলতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, নানাভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গো তিনি যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গোও তাঁর সংযোগ দীর্ঘদিনের নানাভাবে। তাঁর দুই কন্যা—চঞ্চলা ও গিরিজা।

রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রভাবিত করেছেন একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সাহিত্যের সহযোগীরূপে পান। বি.এ. পড়বার সময়েই 'নবজীবন' পত্রিকায় 'মহাশক্তি' (১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৌষ মাসে) তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়, যদিও তা বেনামীতে। তিনি ছিলেন স্বভাষা ও স্বদেশানুরাগী, আদর্শনিষ্ঠ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি করবার জন্যই তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষিক শব্দের বঙ্গানুবাদে ব্রতী হন। ভারতের প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বাস একদিকে যেমন তাঁর প্রশংসার কারণ হয়েছে অপরদিকে কেউ কেউ সে বিষয়ে সপ্রশংস হতে পারেনি। 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে' বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধে বিজ্ঞানের সঙ্গো বেদান্তদর্শনের সমন্বয়কে প্রশংসা চোখে দেখেননি। নিজে বিজ্ঞানী বলেই সত্যেন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা আশা কলেছিলেন। আসলে এ বিষয়ে যাঁরা রামেন্দ্রসুন্দরের সমর্থক তাঁরা অন্য কথা বলতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারায় রামেন্দ্রসুন্দর কোনো মৌলিক গবেষণা না করে প্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত দর্শনেরক আলোকে তিনি বিজ্ঞানের 'ফাঁকি' ধরে ফেলেছিলেন, এতেই তারা উল্লসিত হতেন।

মানুষ হিসেবে শিক্ষক হিসেবে একটি কলেজের প্রশাসক হিসেবে, আদর্শ একজন গৃহীরূপে, স্বদেশসেবক রূপে, রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিত্বের যে প্রমাণ-পরিচয় মেলে, তা খুবই প্রীতিপ্রদ। শিক্ষক হিসেবে ক্লাসে বিজ্ঞান বিষয়টি বাংলা ইংরেজি—দু'ভাষাতেই পড়াতেন। তাঁর শিক্ষকসত্তা তাঁর প্রবন্ধের রচনারীতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে যে অতি-কথন দোষ আবিষ্কার করেছিলেন, মনে হয়, শিক্ষকরূপে পাঠকদের বোঝাতে গিয়েই সেটি ঘটেছে।

রাত জেগে পড়া শোনা করতেন তিনি। এর ফলে শীঘ্রই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। যকৃতের পীড়া এবং মস্তিষ্কের রোগে তিনি আক্রান্ত হন। মাতা এবং কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুশোকে তিনি মানসিক দিকে থেকে বিশেষ আহত হন। মাত্র ৫৫ বছর বয়সেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৪৪.৪ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্য

তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনে রামসুন্দর বেশি পরিমাণে রচনাদি লিখে যেতে পারেননি। জীবনের শেষ পর্বে তিনি যখন নব্য-ডারউইনবাদ এবং জগতের নিয়মশৃঙ্খলার কঠোরতাকে পরিত্যাগ করে এক দার্শনিক অনুভবের ক্ষেত্রে এসে

পৌঁছেছিলেন, সেই সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। রোগাক্রান্ত হয়ে শেষের দিকে তিনি নিজে আর লিখতে পারতেন না, তাঁর বক্তব্য লিখে নেওয়া হত। তাঁর এই কথন ছিল বিচিত্র প্রসঙ্গকে ঘিরে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থগুলি এই ঃ ‘প্রকৃতি’ (১৮৯৬), ‘জিজ্ঞাসা’ (১৯০৪), ‘বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা’ (১৯০৬)। ‘মায়াপুরী’ (১৯১১), ‘কর্মকথা’ (১৯১৩), ‘চরিতকথা’ (১৯১৩), ‘বিচিত্র প্রসঙ্গ’ (১৯১৪), ‘শব্দকথা’ (১৯১৭), মৃত্যুর পর প্রকাশিত—‘বিচিত্র জগৎ’ (১৯২০), ‘যজ্ঞকথা’ (১৯২০), ‘নানাকথা’ (১৯২৪), ‘জগৎকথা’ (১৯২৬)। রামেন্দ্রসুন্দরের অধিকাংশ গ্রন্থের নামে ‘কথা’ শব্দটি আছে। এটি অকারণে নয়। তাঁর বক্তব্যকে দুরূহ প্রবন্ধের ভঙ্গিতে প্রকাশ না করে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলার ভঙ্গিতে যেন প্রকাশ করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি বিচার করলেই তাঁর আলোচ্য বিষয়গুলি মোটামুটি জানা যায়। যেহেতু তিনি মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক, সেইহেতু বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক থেকে বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে লক্ষ্য করার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল। জীবনের প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে উৎসাহী হন। বিভিন্ন বঙ্গীয় সাময়িক পত্রে (যথা ঃ ‘প্রদীন’, ‘জন্মভূমি’, ‘সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’, ‘সাহিত্য ভারতী’, ‘সাধনা’, ‘নবপর্যায় বঙ্গ-দর্শন’, ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘মানসী ও মর্মবাণী’) তিনি অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ লিখে গেছেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিলেন চার্লস ডারউইন। ডারউইনের তত্ত্বকে যাঁরা বিস্তৃত করে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—টমাস হেনরি হাক্সলি। হার্বার্ট স্পেনসারের Synthetic Philosophy অর্থাৎ সমন্বয়ী দর্শনের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত। এই সমন্বয়মূলক দর্শনকে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন, হিন্দু ও খ্রিস্টানের ধর্মচিন্তা, কর্ম ও বৈরাগ্যের বিরুদ্ধতার মধ্যে সম্মিলন—ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে নিয়েছিলেন। ‘চরিত কথা’ গ্রন্থে জার্মান বৈজ্ঞানিক হেলস হোলৎজ এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরেরক বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং সেগুলির অন্তর্নিহিত চিন্তার মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি রিপণ কলেজে রামেন্দ্রসুন্দরের সহকর্মী ছিলেন এবং এঁর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর নিজের গভীরতম চিন্তাগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের কোনো মৌলিক গবেষণা করেননি, তথাপি প্রথমনাথ তাঁকে ‘বিজ্ঞানের ঋষি’ অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। প্রমথনাথের মন্তব্য ঃ “যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞানের সৃষ্টি না করিলেও বীজমন্ত্রগুলি যাঁহাদের ধ্যানে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়, তাঁহারা বিজ্ঞানর কবি ; রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ঋষি ছিলেন, কেন না, তাঁহার ধ্যানে বিজ্ঞান যেমন স্বরূপে ধরা দিয়াছিল, তেমন ধরা বিজ্ঞান সচরাচর দেয় না।” বিজ্ঞানের এই স্বরূপ যাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়বে, তিনিই বিজ্ঞানকে যথার্থভাবে আয়ত্ব করতে পারবেন। বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য হল, বিজ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ যা নতুন নিয়ম কালকের গবেষণায় তা মিথ্যে বলে প্রায়ই প্রমাণিত হয়। আলোচ্য ‘নিয়মের রাজত্ব’ প্রবন্ধটির মধ্যেও পরোক্ষভাবে একথা বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব একটি স্থায়ী সত্যকে আবিষ্কার করেছিল ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা যা পারেনি। এইখানেই বিজ্ঞানবিদ্যা (বা অপরাবিদ্যা)-র ওপর পরবিদ্যা বা দর্শনের জিত। রামেন্দ্রসুন্দর শেষপর্যন্ত তাই বিজ্ঞানের ওপর দর্শনকে স্থান দিয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ ‘প্রকৃতি’তে তিনি বিজ্ঞানের জগৎকেই মূলত প্রাধান্য দিয়েছেন। তারপর ‘জিজ্ঞাসা’, ‘কর্মকথা’ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর দার্শনিক চিন্তার ক্রমিক উন্মেষ ঘটতে থাকে। ‘বিচিত্র জগৎ’ (১৯২০) বইতে তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনকে সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তাঁর চিন্তার মধ্যে আমরা একটি বিবর্তন দেখতে পাই।

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের যে style বা শৈলীটি তা সাহিত্যের দিক থেকে আজও তাঁকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। দুরূহ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং নানা ধরনের সাহিত্য থেকে আহৃত রূপ-উপমা-উদাহরণ দিয়ে পরিস্ফুট করতেন। এতে যেন এক ধরনের কথা শিল্পী সুলভ ভঙ্গি তাঁর রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠত। রামায়ণ-মহাভারত, ঈশপের গল্প, কালিদাসের সাহিত্য (আলোচ্য

'নিয়মের রাজত্বে', 'কুমারসম্ভব' থেকে একটি প্রসঙ্গাকে উদাহরণরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন।) বঙ্কিমসাহিত্য (কখনো রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ কিংবা তির্যক উল্লেখ), বিবিধ অভারতীয় সাহিত্য, এবং এমনকি সমকালীন নানা ঘটনার উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের কাছে হৃদ্য ও মনোরম করে তুলতেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক William Kingdom Clifford (১৮৪৫-১৮৭৯) ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়বার সময় একটি উদ্ভট ছোটগল্প লিখেছিলেন। 'প্রকৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রকৃতির মূর্তি' প্রবন্ধে কিংবা 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'অতিপ্রাকৃত-প্রথম প্রস্তাব' প্রবন্ধে ক্লিফোর্ড-এর সেই গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশটির উল্লেখ করে আপন রচনার সুখপাঠ্যতা বৃদ্ধি করেছেন, যদিও ক্লিফোর্ড-এর নাম সেখানে করেননি। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য খুব সচল এবং কৌতুকদীপ্ত ছিল।

৪৪.৫ মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় ...... দূরের তারাগুলি পরস্পর হইতে এতদূরেআছে যে, পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ফল এত সামান্য যে, তাহা আমাদের গণনাতেও আসে না, আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরও হয় না।

৪৪.৬ সারাংশ

পার্থিব জগতে বা সৌরলোকে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের কোথাও কোন প্রকার অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা নেই। সর্বত্রই নিয়ম। নিয়মের রাজত্ব সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত। এই নিয়মের মূল কারণ—বস্তু ও পদার্থের 'আকর্ষণ' এবং 'চাপ'। আকর্ষণ এবং চাপ-এর নিয়মটিকে তিনটি ধারায় ব্যক্ত করা যায়। প্রথমত, পার্থিব আকর্ষণে রপ্ত মাত্রই নিম্নগামী হয়। এই নিয়মের নাম 'ভৌম আকর্ষণ' বা 'মাধ্যাকর্ষণ'। দ্বিতীয়ত, তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই উর্ধ্বগামী হয়। তরল পদার্থ বলতে যেমন—জল, তেল বা পারদ। এইখানে বস্তু বা দ্রব্যের লঘু-গুরুর তারতম্যের দিকটি আছে। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের চেয়ে গুরু কি লঘু, তা দুটি সমান আয়তনের দ্রব্য নিয়ে ওজন করে দেখতে হবে। যেটি ওজনে গুরু, সেটি তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিম্নগামী হবে ; আর যদি লঘু হয়, তবে উর্ধ্বগামী হবে। তৃতীয়ত, আকর্ষণ ও চাপ একই সঙ্গো কাজ করে ; আকর্ষণ প্রবল হলে বস্তুকে নামায় ; চাপ প্রবল হলে বস্তুকে ওপরের দিকে তোলে। সেখানে আকর্ষণ ও চাপ সমান, বস্তু সেখানে স্থির থাকে।

এই নিয়ম কেবল পার্থিব জগতের পদার্থের ক্ষেত্রেই ঘাটে না। স্যার আইজ্যাক নিউটন প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন—সৌরজগৎও এ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও চালিত ; আকর্ষণ এখানেও কাজ করছে। পৃথিবীর আকর্ষণে সৌরজগতের চন্দ্র-সূর্য পৃথিবীর দিকে আসতে চাইছে। পৃথিবীও আবার, সেই আকর্ষণের কারণেই চন্দ্র-সূর্যের দিকে যেতে চাইছে। ফলত, সব গ্রহ-উপগ্রহই অপর গ্রহ-উপগ্রহের দিকে ধাবমান। তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট বটে, তবে তার পেছনেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এ হল, বিশ্বজগতের এক 'মহা-নিয়ম'। অঙ্গা কষে আগের থেকেই বলে দেওয়া যায়, কবে, কোনদিন কখন, কোন্ গ্রহ বা উপগ্রহ তার কক্ষ-পথের কোথায় অবস্থান করবে। সৌরজগতে যখন এই রকম নির্দিষ্ট নিয়মের আবর্তন বর্তমান তখন অনুমান করা যায়, সৌরজগতের বাইরেও যে জগৎ আছে, সেখানেও এই ধরনের কোন নিয়ম অনুসৃত হয়। তবে প্রবন্ধ রচনাকালীন সময় পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

৪৪.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের প্রথম অংশের উপস্থাপন রীতিটি খুবই হৃদ্য এবং মনোহর। লেখক এক কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে সম্মুখে রেখেছেন। সেই কাল্পনিক প্রতিপক্ষ যেন একটার পর একটা প্রশ্ন করছেন আর লেখক তার উত্তর দিয়ে গেছেন।

এইভাবেই প্রবন্ধটির কায়া নির্মিত হয়েছে। যেন একটা প্রশ্ন-উত্তরের ভঙ্গি, যা কথোপকথনেরই প্রসারিত একটি দিক। কাল্পনিক প্রতিপক্ষের প্রশ্নগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে করা হয়েছে। তার একটি ক্রমও অনুসরণ করা হয়েছে। এক একটি প্রসঙ্গ আসছে, সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে এবং পরবর্তী সূক্ষ্ম স্তরের প্রশ্ন আসছে এইভাবে সরল থেকে জটিল দিকে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম দিকে প্রসঙ্গের প্রবর্তন ঘটেছে। এর ফলে একটি বিশেষতত্ত্বকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে আন্তরে ধারণ করা সহজতর হয়েছে। ইচ্ছে কলেই লেখক এখানে এই Style বা শৈলীটি গ্রহণ করেছেন।

প্রবন্ধটির রচনাগত অপর বিশেষত্ব হল সমগ্র রচনাটির মধ্যে আইনের রূপক গ্রহণ করা। যেহেতু প্রবন্ধটির নামের মধ্যে 'রাজত্ব' কথাটি আছে, সেই জন্য সেই রাজত্বের আইন-শৃঙ্খলা-নিয়ম অনুসরণের দিকেও আছে। এইজন্য প্রবন্ধটিতে আইন প্রণয়ন, আইন প্রবর্তন মান্য করে চলা—এইসব দিকগুলির রূপকময় উল্লেখ আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়।

প্রবন্ধটির রচনাগত তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, লৌকিক ও প্রাত্যহিক জগৎ থেকে অতি পরিচিত দৃষ্টান্তমালা প্রয়োগ করে বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করা। আপরদিকে তেমনি সেই দৃষ্টান্তগুলিকে লঘু হাস্যরসাত্মক করে তোলা। এতে পাঠকের সঙ্গে একটি Intimacy বা অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ক. ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক, তির্যক উক্তি ঃ "কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠ হইয়া থাকেন ; তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।"

খ. রসিকতা ঃ "যে দিন লোষ্ট্রপতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মানুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।"

গ. কারো গাছের নারিকেল বৃন্তচ্যুত হয়ে 'বেলুনে'র মতো আকাশে উঠতে দেখলে তাকে বলা হবে—সে 'মিথ্যাবাদী' বা পাগল বা বলবে 'লোকটা গুলি খায়' যিনি রাসয়ন শাস্ত্র পড়েছেন তিনি হয়তো বললেন ঃ "হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল।"

ঘ. "আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুরও নহে ; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী।" 'গুরু' শব্দটি নিয়ে এখানে Pan বা ঘমক সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঙ. "রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মতে ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকেক রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।" এখানে ব্যক্তিকে পদার্থ রূপে কল্পনার মধ্যে রসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

চ. "যেখানে চাপ আকর্ষম অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"। এখানে প্রসঙ্গটি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' বাক্য থেকে গৃহীত। উমা তপস্যারতা ছিলেন, হঠাৎ মহেশ্বর তাঁর সম্মুখে আবির্ভুত। উমা অগ্রসর হতেও পারছিলেন না, পেছতেও পারছিলেন না। একই স্থানে স্থির থাকলেন। উমার অবস্থাটি সমান আকর্ষণ ও চাপযুক্ত কোনো পদার্থের মতো।

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা হল। এই রকম উদাহরণ আলোচ্য অংশেই আরো আছে। বিশেষ করে আইজ্যাক নিউটন কর্তৃক প্রকৃতিকে 'মাতৃ' সম্বোধন করে উক্তিটি। কিংবা শনি, নেপচুন বা ইউরেনাস-এর প্রসঙ্গে লেখকের সকৌতুক মন্তব্য।

বিষয়বস্তুর বিন্যাসের দিক থেকে আলোচন্য অংশটির বিশেষত্ব হল, লেখত তাঁর বক্তব্যকে দুটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম স্তরে আছে পার্থিব বস্তুর চাপ ও আকর্ষণের প্রসঙ্গ। আর দ্বিতীয় স্তরে আছে অপার্থিব ও

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ। এইভাবে দুটি স্তরে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করবার ফলে পাঠকের কাছে বিষয়টিও সহজবোধ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। সৌরজগৎও যে একটা নিয়মের অধীন লেখক তার নাম দিয়েছেন—মহানিময়'। এটি তাঁর নিজের সৃষ্ট শব্দ,—এ ধরনের শব্দের সৃষ্টি ও ব্যবহারও রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

লেখক পাঠককে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর বক্তব্যের দিকে নিয়ে গেছেন। এ জন্যই তিনি বিশেষভাবে প্রবন্ধটির কায়া বিন্যাস করেছেন এবং পাঠকের সঙ্গে communication সৃষ্টির জন্য প্রশ্ন উত্তরের উপস্থাপন রীতিটি গ্রহণ করেছেন।

৪৪.৮ অনুশীলনী - ১

ক. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

১। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞানের কোন্ দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন ?

২। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি কেন অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লিখিত হয়েছে ?

৩। তিনি ভারতীয় দর্শনের কোন্ দিকটিকে ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেলেছিলেন ?

৪। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি তাঁর কোন্ প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে গৃহীত ?

৫। রামেন্দ্রসুন্দরের মূল কর্মক্ষেত্র দুটির নাম বলুন।

৬। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম কী ?

৭। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে কী মন্তব্য করেছেন ?

৮। রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষক-সত্তা তাঁর প্রাবন্ধিক-সত্তার মধ্যে কিভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল ?

৯। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির নাম করুন।

১০। রামেন্দ্রসুন্দরকে কেন 'বঙ্গের হাক্সলি' বলা হত ?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

১। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাদির মূল্যায়ন করুন।

২। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাদির উপস্থাপন ও গদ্যরীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

৩। বিজ্ঞান থেকে দর্শনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রমানসের বিবর্তনের ধারাটি তুলে ধরুন।

৪। বস্তুর 'আকর্ষণ' ও 'চাপে'র যে নিয়মগুলির কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, সেগুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করুন।

৫। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির এই অংশে বিন্যাসের যে দুটি স্তর দেখা যায়, সে বিষয়ে মন্তব্য করুন।

৪৪.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

সম্ভবত এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত "………বৌদ্ধ একেবারে চুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।"

৪৪.১০ সারাংশ

আইজাক নিউটন আবিষ্কৃত বিশ্বজগৎব্যাপী যে এক 'মহানিয়মের' কথা প্রবন্ধের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে সেই মহা-নিয়মের ব্যভিচার-ব্যতিক্রম সম্পর্কে লেখক আরো নতুন কথা বলেছেন। লেখকের প্রথম বক্তব্য ঃ সেই 'মহানিয়ম' যদি সর্বত্র নাও খাটে, তবু বলতে হবে, সেখানেও কোন না কোন নিয়মের অস্তিত্বও বন্ধ আছেই। কারণ, নিয়ম ছাড়া বিশ্ব জগতে কোন ঘটনাই কাদাপি ঘটতে পারে না। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ঃ কোন ঘটনাকে সাবেক নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হতে পারে ; কিন্তু সত্য

নয়। আসল সত্য হল ঃ আমাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের অভাবে, যাকে সাবেক নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত করেছি,—তা সেই প্রদেশেরই একটি নিয়ম,—সে কথা ভেবে দেখি না। কাজেই তা একটা 'নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব নিয়ম'—অভিজ্ঞতার অভাবে যা আমাদের জানা ছিল না। সেখানকার সেই 'অজ্ঞাতপূর্ব নিয়মটি' জানার ফলে আর সেগুলিকে পরিচিত নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে মনে হবে না। সেখরে তৃতীয় বক্তব্য হল এই ঃ বিশ্বজগতে যা কিছুই ঘটে, তাই-ই কোন নিয়মের বশে ঘটে ; প্রতিটি ঘটনারই একটি 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলা থাকে বা আছে। আমাদের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণের ফলে, ক্রমে ক্রমে, সেই 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলাটিকে আর কোন বে-নিয়মের ফল বলে মনে হয় না। যতদিন সেই 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলাটিকে আবিষ্কার করতে না পারি, কেবল ততদিনই ওই বিশেষ ঘটনা বা ঘটনা-ধারাকে মূল নিয়মের ব্যতিক্রম বলে ভুল করি। লেখক তাঁর প্রবন্ধ এই বলে শেষ করেছেন ঃ বিশ্বজগতের সর্বত্রই নিয়মের বন্ধনকে দেখে আমাদের বিস্মিত বা আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই। বরং এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সর্বত্রই এবং সর্বদাই কোন না কোন ঘটনা নিরন্তর ঘটেই চলেছে কিন্তু সেই সব ঘটনা যে ঘটে চলেছে, কী তার প্রয়োজন কেউ তা জানে না। নানা ধরনের মানুষ তার নানা উত্তর দেন।

৪৪.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশটির তুলনায় প্রথম অংশটিতে বক্তব্য যতখানি বিশদ ও বিস্তৃত, সেই কারণেই তা প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় অংশটিতে বক্তব্য জটিলতর, কিন্তু তা উপযুক্ত পরিমাণে বিস্তৃত করা হয়নি। এই অংশের একেবারে শেষে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাক দুরূহ।

এই দ্বিতীয়াংশে পর-পর কেবলই ব্যতিক্রমাত্মক দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং সেগুলির যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। সেটি ঘটেছে একটি বিশেষ পথ ধরে। প্রথমে তাঁর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক দিকটি কার্যকরী হয়েছে, তার কথা বলি। লেখক জগদ্ব্যাপী নিয়মকে দেখেছেন—দুটি দিক থেকে। একদিকে তিনি বিশ্বচরাচর ব্যাপী একটি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ; অপরদিকে বিশ্বচরাচর ব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নিরন্তরতায় বিশ্বাসী। একটি নিয়ম এখন পর্যন্ত স্থির, অপর নিয়ম নিরন্তর আবিষ্কৃত দিক। বর্তমানের দৃষ্ট সত্য ও নিয়ম এবং ভবিষ্যতের অ-দৃষ্ট অনাগত অনাবিষ্কৃত নিয়ম—দুই নিয়মেই তিনি সমপরিমাণে বিশ্বাসী। ফলে তাঁর বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টি ও মন একটি আধুনিক সচল দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেছে।

নিয়মের এই নিরন্তরতায় এবং নতুন নতুন নিয়মের আবিষ্কারের বিশ্বাস স্থাপন একটি সচল মনের পরিপোষক এবং এত এক ধরনের দার্শনিকতা বটে। কিন্তু এইখানেই বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গো দার্শনিকের সত্যের একটি বিরোধও রামেন্দ্রসুন্দর লক্ষ্য করেছিলেন। বৈজ্ঞানিকের সত্য স্থির-স্থায়ী-ধ্রুব সত্য নয়। আজ যা সত্য, কাল তা অন্য সত্য আবিষ্কারের ফলে নাকচ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দার্শনিকের সত্য স্থির-ধ্রুব সত্য। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের সত্যের চাইতে দার্শনিকের সত্যের ওপরেই পরবর্তীকলে অধিকতর গুরুত্ব ন্যস্ত করেছেন।

তবে, বৈজ্ঞানিকের এই সত্যের নিরন্তররতা বা ক্রমে ক্রমেই নবতর আবিষ্কারের পলে পূর্ববর্তী সত্যের খারিজ হয়ে যাওয়ায় সঙ্গো সঙ্গো তিনি আরো একটি কথাও বলেছেন ঃ জগদ্ব্যাপারে এই যে নিরন্তরতা ক্রমে-ক্রমেই ঘটনাবলি কেবলই ঘটে চলেছে, তার কারণও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গো রামেন্দ্রসুন্দর যে কথা বলেছেন,—তাও একটি দার্শনিক মন-প্রসূত। তিনি বলেছেন ঃ "জগতে কিছু-না কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মেরআর কোন তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই।.... একটা কিছু যে ঘটিতেছে ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।" লেখকেরক এই উক্তিটিই একটি দার্শনিক উক্তি।

তাঁর উত্থাপিত শেষ প্রশঙ্গাটি হল ঃ "জগৎ ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন..." তার উত্তর অন্বেষণ করা। সেই উত্তর অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি নানা স্তরের নানা ধরনের মানুষের কাল্পনিক উত্তর প্রদান

করেছেন, এবং তারই মধ্যে চিন্তাধারার বিস্তৃতি ধরা পড়েছে। প্রথমত, 'অজ্ঞানবাদী'র 'অজ্ঞতাবাদ (Agnosticism), যে তত্ত্বের মূল কথা হল—জগতের চরমতত্ত্ব চিরকাল অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় থাকে। কাজের উল্লিখিত নিয়ম সম্পর্কে প্রত্যাশিতভাবেই তাঁরা বলবেন—'জানি না'। বৈদান্তিকেরা অদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ জীবন ও ব্রহ্ম অভিন্ন, একাত্ম। কাজেই ব্রহ্মই এই সব ঘটাচ্ছেন, অর্থাৎ 'আমি'ই যেন তা ঘটাচ্ছি। বৈদান্তিকের উত্তর তাই ঃ "আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু।" বৌদ্ধদের নাস্তিক্যবাদের কারণেই লেখক সেই অনুযায়ী জগদ্ব্যাপী নিয়মের ব্যাখ্যা তাঁদের মুখে দিয়েছেন।

আলোচ্য অংশটির রচনারীতি প্রথম অংশটিরই মতো। এখানেও সেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লেখক পাঠকের সঙ্গে একটি সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন। তারপর যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, ফলে একটি কথোপকথনের ভঙ্গি তাতে ফুটে উঠেছে। যেমন,

"চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমনকি কথা আছে ? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়,...উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত, সময়ে সময়ে নাচাইতে নিয়ম। প্রতি এগারো বৎসরে একবার উহার এইরূপ নর্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে।" এখানে বাক্য ভঙ্গিতে অব্যয় 'ত' এর প্রয়োগ একটি সহজ স্নিগ্ধতার সৃষ্টি করেছে। তেমনি, চুম্বকের কাঁটার 'নর্তনপ্রবৃত্তি'র উল্লেখ মৃদু রসিকতার প্রবর্তন করেছে।

কিংবা আর একটি দৃষ্টান্তে—এখানে পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করে বক্তব্য বলা হয়েছে।

"তুমি সোজা চলতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম ; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিময়, তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী, কাঁদিতেছে, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।"

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে যাঁরাই বিজ্ঞানচর্চা করেছেন (যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু) তাঁরাই অতি সহজ, কৌতুক-স্নিগ্ধ সরস গদ্যে তা করেছেন। রামেন্দসুন্দর সেই ধারারই সাধক। ইংরেজি Popular science এর সঙ্গে তুলনীয়।

৪৪.১২ অনুশীলনী - ২

ক নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

১। 'মহানিয়ম' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন ?

২। প্রত্যেক ঘটনার 'সম্বন্ধ' ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য কী ?

৩। বিশ্বজগতের সর্বত্রই নিয়মের অস্তিত্ব দেখে আমরা কি বিস্মিত বা আনন্দিত হব ?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

১। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে ঘটেছে ?

২। বিশ্বব্যাপী নিয়মের কারণরূপে বিভিন্ন স্তরের মানুষের বক্তব্য কী ?

৩। আলোচ্য অংশটির গদ্যশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৪৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) অধীর দে — আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা।

(২) নির্মলেন্দু ভৌমিক — রামেন্দ্র রচনা সঞ্চয়ন (ভূমিকা)।

(৩) সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য।

করেছেন, এবং তারই মধ্যে চিন্তাধারার বিস্তৃতি ধরা পড়েছে। প্রথমত, ‘অজ্ঞানবাদী’র ‘অজ্ঞতাবাদ (Agnosticism), যে তত্ত্বের মূল কথা হল—জগতের চরমতত্ত্ব চিরকাল অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় থাকে। কাজের উল্লিখিত নিয়ম সম্পর্কে প্রত্যাশিতভাবেই তাঁরা বলবেন—‘জানি না’। বৈদান্তিকেরা অদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ জীবন ও ব্রহ্ম অভিন্ন, একাত্ম। কাজেই ব্রহ্মই এই সব ঘটাচ্ছেন, অর্থাৎ ‘আমি’ই যেন তা ঘটাচ্ছি। বৈদান্তিকের উত্তর তাই ঃ “আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু।” বৌদ্ধদের নাস্তিক্যবাদের কারণেই লেখক সেই অনুযায়ী জগদ্ব্যাপী নিয়মের ব্যাখ্যা তাঁদের মুখে দিয়েছেন।

আলোচ্য অংশটির রচনারীতি প্রথম অংশটিরই মতো। এখানেও সেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লেখক পাঠকের সঙ্গে একটি সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন। তারপর যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, ফলে একটি কথোপকথনের ভঙ্গি তাতে ফুটে উঠেছে। যেমন,

“চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমনকি কথা আছে ? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়,...উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত, সময়ে সময়ে নাচাইতে নিয়ম। প্রতি এগারো বৎসরে একবার উহার এইরূপ নর্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে।” এখানে বাক্য ভঙ্গিতে অব্যয় ‘ত’ এর প্রয়োগ একটি সহজ স্নিগ্ধতার সৃষ্টি করেছে। তেমনি, চুম্বকের কাঁটার ‘নর্তনপ্রবৃত্তি’র উল্লেখ মৃদু রসিকতার প্রবর্তন করেছে।

কিংবা আর একটি দৃষ্টান্তে—এখানে পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করে বক্তব্য বলা হয়েছে।

“তুমি সোজা চলতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম ; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিময়, তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী, কাঁদিতেছে, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।”

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে যাঁরাই বিজ্ঞানচর্চা করেছেন (যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু) তাঁরাই অতি সহজ, কৌতুক-স্নিগ্ধ সরস গদ্যে তা করেছেন। রামেন্দসুন্দর সেই ধারারই সাধক। ইংরেজি Popular science এর সঙ্গে তুলনীয়।

৪৪.১২ অনুশীলনী - ২

ক নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

১। ‘মহানিয়ম’ বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন ?

২। প্রত্যেক ঘটনার ‘সম্বন্ধ’ ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য কী ?

৩। বিশ্বজগতের সর্বত্রই নিয়মের অস্তিত্ব দেখে আমরা কি বিস্মিত বা আনন্দিত হব ?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

১। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে ঘটেছে ?

২। বিশ্বব্যাপী নিয়মের কারণরূপে বিভিন্ন স্তরের মানুষের বক্তব্য কী ?

৩। আলোচ্য অংশটির গদ্যশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৪৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) অধীর দে — আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা।

(২) নির্মলেন্দু ভৌমিক — রামেন্দ্র রচনা সঞ্চয়ন (ভূমিকা)।

(৩) সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য।

নয়। আসল সত্য হল ঃ আমাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের অভাবে, যাকে সাবেক নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত করেছি,—তা সেই প্রদেশেরই একটি নিয়ম,—সে কথা ভেবে দেখি না। কাজেই তা একটা 'নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব নিয়ম'—অভিজ্ঞতার অভাবে যা আমাদের জানা ছিল না। সেখানকার সেই 'অজ্ঞাতপূর্ব নিয়মটি' জানার ফলে আর সেগুলিকে পরিচিত নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে মনে হবে না। সেখরে তৃতীয় বক্তব্য হল এই ঃ বিশ্বজগতে যা কিছুই ঘটে, তাই-ই কোন নিয়মের বশে ঘটে ; প্রতিটি ঘটনারই একটি 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলা থাকে বা আছে। আমাদের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণের ফলে, ক্রমে ক্রমে, সেই 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলাটিকে আর কোন বে-নিয়মের ফল বলে মনে হয় না। যতদিন সেই 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলাটিকে আবিষ্কার করতে না পারি, কেবল ততদিনই ওই বিশেষ ঘটনা বা ঘটনা-ধারাকে মূল নিয়মের ব্যতিক্রম বলে ভুল করি। লেখক তাঁর প্রবন্ধ এই বলে শেষ করেছেন ঃ বিশ্বজগতের সর্বত্রই নিয়মের বন্ধনকে দেখে আমাদের বিস্মিত বা আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই। বরং এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সর্বত্রই এবং সর্বদাই কোন না কোন ঘটনা নিরন্তর ঘটেই চলেছে কিন্তু সেই সব ঘটনা যে ঘটে চলেছে, কী তার প্রয়োজন কেউ তা জানে না। নানা ধরনের মানুষ তার নানা উত্তর দেন।

৪৪.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশটির তুলনায় প্রথম অংশটিতে বক্তব্য যতখানি বিশদ ও বিস্তৃত, সেই কারণেই তা প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় অংশটিতে বক্তব্য জটিলতর, কিন্তু তা উপযুক্ত পরিমাণে বিস্তৃত করা হয়নি। এই অংশের একেবারে শেষে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাক দুরূহ।

এই দ্বিতীয়াংশে পর-পর কেবলই ব্যতিক্রমাত্মক দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং সেগুলির যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। সেটি ঘটেছে একটি বিশেষ পথ ধরে। প্রথমে তাঁর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক দিকটি কার্যকরী হয়েছে, তার কথা বলি। লেখক জগদ্ব্যাপী নিয়মকে দেখেছেন—দুটি দিক থেকে। একদিকে তিনি বিশ্বচরাচর ব্যাপী একটি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ; অপরদিকে বিশ্বচরাচর ব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নিরন্তরতায় বিশ্বাসী। একটি নিয়ম এখন পর্যন্ত স্থির, অপর নিয়ম নিরন্তর আবিষ্কৃত দিক। বর্তমানের দৃষ্ট সত্য ও নিয়ম এবং ভবিষ্যতের অ-দৃষ্ট অনাগত অনাবিষ্কৃত নিয়ম—দুই নিয়মেই তিনি সমপরিমাণে বিশ্বাসী। ফলে তাঁর বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টি ও মন একটি আধুনিক সচল দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেছে।

নিয়মের এই নিরন্তরতায় এবং নতুন নতুন নিয়মের আবিষ্কারের বিশ্বাস স্থাপন একটি সচল মনের পরিপোষক এবং এত এক ধরনের দার্শনিকতা বটে। কিন্তু এইখানেই বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে দার্শনিকের সত্যের একটি বিরোধও রামেন্দ্রসুন্দর লক্ষ্য করেছিলেন। বৈজ্ঞানিকের সত্য স্থির-স্থায়ী-ধ্রুব সত্য নয়। আজ যা সত্য, কাল তা অন্য সত্য আবিষ্কারের ফলে নাকচ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দার্শনিকের সত্য স্থির-ধ্রুব সত্য। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের সত্যের চাইতে দার্শনিকের সত্যের ওপরেই পরবর্তীকলে অধিকতর গুরুত্ব ন্যস্ত করেছেন।

তবে, বৈজ্ঞানিকের এই সত্যের নিরন্তররতা বা ক্রমে ক্রমেই নবতর আবিষ্কারের পলে পূর্ববর্তী সত্যের খারিজ হয়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো একটি কথাও বলেছেন ঃ জগদ্ব্যাপারে এই যে নিরন্তরতা ক্রমে-ক্রমেই ঘটনাবলি কেবলই ঘটে চলেছে, তার কারণও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যে কথা বলেছেন,—তাও একটি দার্শনিক মন-প্রসূত। তিনি বলেছেন ঃ "জগতে কিছু-না কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মেরআর কোন তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই।.... একটা কিছু যে ঘটিতেছে ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।" লেখকেরক এই উক্তিটিই একটি দার্শনিক উক্তি।

তাঁর উত্থাপিত শেষ প্রশঙ্গটি হল ঃ "জগৎ ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন..." তার উত্তর অন্বেষণ করা। সেই উত্তর অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি নানা স্তরের নানা ধরনের মানুষের কাল্পনিক উত্তর প্রদান

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ। এইভাবে দুটি স্তরে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করবার ফলে পাঠকের কাছে বিষয়টিও সহজবোধ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। সৌরজগৎও যে একটা নিয়মের অধীন লেখক তার নাম দিয়েছেন—মহানিময়'। এটি তাঁর নিজের সৃষ্ট শব্দ,—এ ধরনের শব্দের সৃষ্টি ও ব্যবহারও রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

লেখক পাঠককে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর বক্তব্যের দিকে নিয়ে গেছেন। এ জন্যই তিনি বিশেষভাবে প্রবন্ধটির কায়া বিন্যাস করেছেন এবং পাঠকের সঙ্গে communication সৃষ্টির জন্য প্রশ্ন উত্তরের উপস্থাপন রীতিটি গ্রহণ করেছেন।

৪৪.৮ অনুশীলনী - ১

ক. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

১। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞানের কোন্ দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন ?

২। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি কেন অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লিখিত হয়েছে ?

৩। তিনি ভারতীয় দর্শনের কোন্ দিকটিকে ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেলেছিলেন ?

৪। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি তাঁর কোন্ প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে গৃহীত ?

৫। রামেন্দ্রসুন্দরের মূল কর্মক্ষেত্র দুটির নাম বলুন।

৬। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম কী ?

৭। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে কী মন্তব্য করেছেন ?

৮। রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষক-সত্তা তাঁর প্রাবন্ধিক-সত্তার মধ্যে কিভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল ?

৯। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির নাম করুন।

১০। রামেন্দ্রসুন্দরকে কেন 'বঙ্গের হাক্সলি' বলা হত ?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

১। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাদির মূল্যায়ন করুন।

২। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাদির উপস্থাপন ও গদ্যরীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

৩। বিজ্ঞান থেকে দর্শনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রমানসের বিবর্তনের ধারাটি তুলে ধরুন।

৪। বস্তুর 'আকর্ষণ' ও 'চাপে'র যে নিয়মগুলির কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, সেগুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করুন।

৫। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির এই অংশে বিন্যাসের যে দুটি স্তর দেখা যায়, সে বিষয়ে মন্তব্য করুন।

৪৪.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

সম্ভবত এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত "………বৌদ্ধ একেবারে চুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।"

৪৪.১০ সারাংশ

আইজাক নিউটন আবিষ্কৃত বিশ্বজগৎব্যাপী যে এক 'মহানিয়মের' কথা প্রবন্ধের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে সেই মহা-নিয়মের ব্যভিচার-ব্যতিক্রম সম্পর্কে লেখক আরো নতুন কথা বলেছেন। লেখকের প্রথম বক্তব্য ঃ সেই 'মহানিয়ম' যদি সর্বত্র নাও খাটে, তবু বলতে হবে, সেখানেও কোন না কোন নিয়মের অস্তিত্বও বন্ধ আছেই। কারণ, নিয়ম ছাড়া বিশ্ব জগতে কোন ঘটনাই কাদাপি ঘটতে পারে না। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ঃ কোন ঘটনাকে সাবেক নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হতে পারে ; কিন্তু সত্য

এইভাবেই প্রবন্ধটির কায়া নির্মিত হয়েছে। যেন একটা প্রশ্ন-উত্তরের ভঙ্গি, যা কথোপকথনেরই প্রসারিত একটি দিক। কাল্পনিক প্রতিপক্ষের প্রশ্নগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে করা হয়েছে। তার একটি ক্রমও অনুসরণ করা হয়েছে। এক একটি প্রসঙ্গ আসছে, সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে এবং পরবর্তী সূক্ষ্ম স্তরের প্রশ্ন আসছে এইভাবে সরল থেকে জটিল দিকে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম দিকে প্রসঙ্গের প্রবর্তন ঘটেছে। এর ফলে একটি বিশেষতত্ত্বকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে আন্তরে ধারণ করা সহজতর হয়েছে। ইচ্ছে কলেই লেখক এখানে এই Style বা শৈলীটি গ্রহণ করেছেন।

প্রবন্ধটির রচনাগত অপর বিশেষত্ব হল সমগ্র রচনাটির মধ্যে আইনের রূপক গ্রহণ করা। যেহেতু প্রবন্ধটির নামের মধ্যে 'রাজত্ব' কথাটি আছে, সেই জন্য সেই রাজত্বের আইন-শৃঙ্খলা-নিয়ম অনুসরণের দিকেও আছে। এইজন্য প্রবন্ধটিতে আইন প্রণয়ন, আইন প্রবর্তন মান্য করে চলা—এইসব দিকগুলির রূপকময় উল্লেখ আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়।

প্রবন্ধটির রচনাগত তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, লৌকিক ও প্রাত্যহিক জগৎ থেকে অতি পরিচিত দৃষ্টান্তমালা প্রয়োগ করে বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করা। আপরদিকে তেমনি সেই দৃষ্টান্তগুলিকে লঘু হাস্যরসাত্মক করে তোলা। এতে পাঠকের সঙ্গে একটি Intimacy বা অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ক. ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক, তির্যক উক্তি ঃ "কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠ হইয়া থাকেন ; তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।"

খ. রসিকতা ঃ "যে দিন লোষ্ট্রপতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মানুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।"

গ. কারো গাছের নারিকেল বৃন্তচ্যুত হয়ে 'বেলুনে'র মতো আকাশে উঠতে দেখলে তাকে বলা হবে—সে 'মিথ্যাবাদী' বা পাগল বা বলবে 'লোকটা গুলি খায়' যিনি রাসয়ন শাস্ত্র পড়েছেন তিনি হয়তো বললেন ঃ "হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল।"

ঘ. "আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুরও নহে ; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী।" 'গুরু' শব্দটি নিয়ে এখানে Pan বা ঘমক সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঙ. "রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মতে ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকেক রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।" এখানে ব্যক্তিকে পদার্থ রূপে কল্পনার মধ্যে রসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

চ. "যেখানে চাপ আকর্ষম অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"। এখানে প্রসঙ্গটি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' বাক্য থেকে গৃহীত। উমা তপস্যারতা ছিলেন, হঠাৎ মহেশ্বর তাঁর সম্মুখে আবির্ভুত। উমা অগ্রসর হতেও পারছিলেন না, পেছতেও পারছিলেন না। একই স্থানে স্থির থাকলেন। উমার অবস্থাটি সমান আকর্ষণ ও চাপযুক্ত কোনো পদার্থের মতো।

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা হল। এই রকম উদাহরণ আলোচ্য অংশেই আরো আছে। বিশেষ করে আইজ্যাক নিউটন কর্তৃক প্রকৃতিকে 'মাতৃ' সম্বোধন করে উক্তিটি। কিংবা শনি, নেপচুন বা ইউরেনাস-এর প্রসঙ্গে লেখকের সকৌতুক মন্তব্য।

বিষয়বস্তুর বিন্যাসের দিক থেকে আলোচন্য অংশটির বিশেষত্ব হল, লেখত তাঁর বক্তব্যকে দুটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম স্তরে আছে পার্থিব বস্তুর চাপ ও আকর্ষণের প্রসঙ্গ। আর দ্বিতীয় স্তরে আছে অপার্থিব ও

'নিয়মের রাজত্বে', 'কুমারসম্ভব' থেকে একটি প্রসঙ্গকে উদাহরণরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন।) বঙ্কিমসাহিত্য (কখনো রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ কিংবা তির্যক উল্লেখ), বিবিধ অভারতীয় সাহিত্য, এবং এমনকি সমকালীন নানা ঘটনার উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের কাছে হৃদ্য ও মনোরম করে তুলতেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক William Kingdom Clifford (১৮৪৫-১৮৭৯) ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়বার সময় একটি উদ্ভট ছোটগল্প লিখেছিলেন। 'প্রকৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রকৃতির মূর্তি' প্রবন্ধে কিংবা 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'অতিপ্রাকৃত-প্রথম প্রস্তাব' প্রবন্ধে ক্লিফোর্ড-এর সেই গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশটির উল্লেখ করে আপন রচনার সুখপাঠ্যতা বৃদ্ধি করেছেন, যদিও ক্লিফোর্ড-এর নাম সেখানে করেননি। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য খুব সচল এবং কৌতুকদীপ্ত ছিল।

৪৪.৫ মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় ...... দূরের তারাগুলি পরস্পর হইতে এতদূরেআছে যে, পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ফল এত সামান্য যে, তাহা আমাদের গণনাতেও আসে না, আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরও হয় না।

৪৪.৬ সারাংশ

পার্থিব জগতে বা সৌরলোকে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের কোথাও কোন প্রকার অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা নেই। সর্বত্রই নিয়ম। নিয়মের রাজত্ব সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত। এই নিয়মের মূল কারণ—বস্তু ও পদার্থের 'আকর্ষণ' এবং 'চাপ'। আকর্ষণ এবং চাপ-এর নিয়মটিকে তিনটি ধারায় ব্যক্ত করা যায়। প্রথমত, পার্থিব আকর্ষণে রপ্ত মাত্রই নিম্নগামী হয়। এই নিয়মের নাম 'ভৌম আকর্ষণ' বা 'মাধ্যাকর্ষণ'। দ্বিতীয়ত, তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই উর্ধ্বগামী হয়। তরল পদার্থ বলতে যেমন—জল, তেল বা পারদ। এইখানে বস্তু বা দ্রব্যের লঘু-গুরুর তারতম্যের দিকটি আছে। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের চেয়ে গুরু কি লঘু, তা দুটি সমান আয়তনের দ্রব্য নিয়ে ওজন করে দেখতে হবে। যেটি ওজনে গুরু, সেটি তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিম্নগামী হবে ; আর যদি লঘু হয়, তবে উর্ধ্বগামী হবে। তৃতীয়ত, আকর্ষণ ও চাপ একই সঙ্গে কাজ করে ; আকর্ষণ প্রবল হলে বস্তুকে নামায় ; চাপ প্রবল হলে বস্তুকে ওপরের দিকে তোলে। সেখানে আকর্ষণ ও চাপ সমান, বস্তু সেখানে স্থির থাকে।

এই নিয়ম কেবল পার্থিব জগতের পদার্থের ক্ষেত্রেই ঘাটে না। স্যার আইজ্যাক নিউটন প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন—সৌরজগৎও এ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও চালিত ; আকর্ষণ এখানেও কাজ করছে। পৃথিবীর আকর্ষণে সৌরজগতের চন্দ্র-সূর্য পৃথিবীর দিকে আসতে চাইছে। পৃথিবীও আবার, সেই আকর্ষণের কারণেই চন্দ্র-সূর্যের দিকে যেতে চাইছে। ফলত, সব গ্রহ-উপগ্রহই অপর গ্রহ-উপগ্রহের দিকে ধাবমান। তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট বটে, তবে তার পেছনেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এ হল, বিশ্বজগতের এক 'মহা-নিয়ম'। অঙ্ক কষে আগের থেকেই বলে দেওয়া যায়, কবে, কোনদিন কখন, কোন্ গ্রহ বা উপগ্রহ তার কক্ষ-পথের কোথায় অবস্থান করবে। সৌরজগতে যখন এই রকম নির্দিষ্ট নিয়মের আবর্তন বর্তমান তখন অনুমান করা যায়, সৌরজগতের বাইরেও যে জগৎ আছে, সেখানেও এই ধরনের কোন নিয়ম অনুসৃত হয়। তবে প্রবন্ধ রচনাকালীন সময় পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

৪৪.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের প্রথম অংশের উপস্থাপন রীতিটি খুবই হৃদ্য এবং মনোহর। লেখক এক কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে সম্মুখে রেখেছেন। সেই কাল্পনিক প্রতিপক্ষ যেন একটার পর একটা প্রশ্ন করছেন আর লেখক তার উত্তর দিয়ে গেছেন।

পৌঁছেছিলেন, সেই সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। রোগাক্রান্ত হয়ে শেষের দিকে তিনি নিজে আর লিখতে পারতেন না, তাঁর বক্তব্য লিখে নেওয়া হত। তাঁর এই কথন ছিল বিচিত্র প্রসঙ্গাকে ঘিরে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থগুলি এই ঃ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'বঙ্গালক্ষীর ব্রতকথা' (১৯০৬)। 'মায়াপুরী' (১৯১১), 'কর্মকথা' (১৯১৩), 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গা' (১৯১৪), 'শব্দকথা' (১৯১৭), মৃত্যুর পর প্রকাশিত—'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০), 'যজ্ঞকথা' (১৯২০), 'নানাকথা' (১৯২৪), 'জগৎকথা' (১৯২৬)। রামেন্দ্রসুন্দরের অধিকাংশ গ্রন্থের নামে 'কথা' শব্দটি আছে। এটি অকারণে নয়। তাঁর বক্তব্যকে দুরূহ প্রবন্ধের ভঙ্গিতে প্রকাশ না করে পাঠকের সঙ্গো অন্তরঙ্গা কথা বলার ভঙ্গিতে যেন প্রকাশ করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি বিচার করলেই তাঁর আলোচ্য বিষয়গুলি মোটামুটি জানা যায়। যেহেতু তিনি মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক, সেইহেতু বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক থেকে বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে লক্ষ্য করার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল। জীবনের প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে উৎসাহী হন। বিভিন্ন বঙ্গীয় সাময়িক পত্রে (যথা ঃ 'প্রদীন', 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'সাহিত্য ভারতী', 'সাধনা', 'নবপর্যায় বঙ্গা-দর্শন', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী') তিনি অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ লিখে গেছেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিলেন চার্লস ডারউইন। ডারউইনের তত্ত্বকে যাঁরা বিস্তৃত করে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—টমাস হেনরি হাক্সলি। হার্বার্ট স্পেনসারের Synthetic Philosophy অর্থাৎ সমন্বয়ী দর্শনের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত। এই সমন্বয়মূলক দর্শনকে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন, হিন্দু ও খ্রিস্টানের ধর্মচিন্তা, কর্ম ও বৈরাগ্যের বিরুদ্ধতার মধ্যে সম্মিলন—ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে নিয়েছিলেন। 'চরিত কথা' গ্রন্থে জার্মান বৈজ্ঞানিক হেলস হোলৎজ এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরেরক বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং সেগুলির অন্তর্নিহিত চিন্তার মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি রিপণ কলেজে রামেন্দ্রসুন্দরের সহকর্মী ছিলেন এবং এঁর সঙ্গো রামেন্দ্রসুন্দর নিজের গভীরতম চিন্তাগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের কোনো মৌলিক গবেষণা করেননি, তথাপি প্রথমনাথ তাঁকে 'বিজ্ঞানের ঋষি' অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। প্রমথনাথের মন্তব্য ঃ "যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞানের সৃষ্টি না করিলেও বীজমন্ত্রগুলি যাঁহাদের ধ্যানে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়, তাঁহারা বিজ্ঞানর কবি ; রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ঋষি ছিলেন, কেন না, তাঁহার ধ্যানে বিজ্ঞান যেমন স্বরূপে ধরা দিয়াছিল, তেমন ধরা বিজ্ঞান সচরাচর দেয় না।" বিজ্ঞানের এই স্বরূপ যাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়বে, তিনিই বিজ্ঞানকে যথার্থভাবে আয়ত্ব করতে পারবেন। বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য হল, বিজ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ যা নতুন নিয়ম কালকের গবেষণায় তা মিথ্যে বলে প্রায়ই প্রমাণিত হয়। আলোচ্য 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির মধ্যেও পরোক্ষভাবে একথা বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব একটি স্থায়ী সত্যকে আবিষ্কার করেছিল ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা যা পারেনি। এইখানেই বিজ্ঞানবিদ্যা (বা অপরাবিদ্যা)-র ওপর পরবিদ্যা বা দর্শনের জিত। রামেন্দ্রসুন্দর শেষপর্যন্ত তাই বিজ্ঞানের ওপর দর্শনকে স্থান দিয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'তে তিনি বিজ্ঞানের জগৎকেই মূলত প্রাধান্য দিয়েছেন। তারপর 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর দার্শনিক চিন্তার ক্রমিক উন্মেষ ঘটতে থাকে। 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) বইতে তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গো দর্শনকে সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তাঁর চিন্তার মধ্যে আমরা একটি বিবর্তন দেখতে পাই।

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের যে style বা শৈলীটি তা সাহিত্যের দিক থেকে আজও তাঁকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। দুরূহ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং নানা ধরনের সাহিত্য থেকে আহৃত রূপ-উপমা-উদাহরণ দিয়ে পরিস্ফুট করতেন। এতে যেন এক ধরনের কথা শিল্পী সুলভ ভঙ্গি তাঁর রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠত। রামায়ণ-মহাভারত, ঈশপের গল্প, কালিদাসের সাহিত্য (আলোচ্য

নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটিকে হৃদ্য ও প্রাঞ্জল করে তুলতেন। তাঁর গদ্যও বিশেষত্বপূর্ণ। আলোচ্য 'নিয়মের রাজস্ব' প্রবন্ধটি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) থেকে গৃহীত। প্রবন্ধটি একটি সুলিখিত প্রবন্ধ এবং সে কারণেই এটি বহুপঠিত।

৪৪.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ঃ জীবনকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১২৭১ বঙ্গাব্দ/ইং ১৮৬৪—১৩২৬ বঙ্গাব্দ/ইং ১৯১৯) পূর্বপুরুষ বুন্দেলখণ্ড থেকে বঙ্গাদেশের ফতেপুরে আসেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরের কাছে টেঙা বৈদ্যপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। কর্ম ও বিবাহসূত্রে এঁরা জেমো (কান্দি) রাজবাড়ির সঙ্গো যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে প্রথম হন, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। ১৮৮৭-তে তিনি বিজ্ঞানে এম.এ. (তখন এম.এস.সি. চালু হয়নি) পাশ করেন। প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতার রিপণ কলেজের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, পরে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হন,—আমৃত্যু সেই পদেই কর্ম করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র বলতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, নানাভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গো তিনি যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গোও তাঁর সংযোগ দীর্ঘদিনের নানাভাবে। তাঁর দুই কন্যা—চঞ্চলা ও গিরিজা।

রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রভাবিত করেছেন একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সাহিত্যের সহযোগীরূপে পান। বি.এ. পড়বার সময়েই 'নবজীবন' পত্রিকায় 'মহাশক্তি' (১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৌষ মাসে) তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়, যদিও তা বেনামীতে। তিনি ছিলেন স্বভাষা ও স্বদেশানুরাগী, আদর্শনিষ্ঠ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি করবার জন্যই তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষিক শব্দের বঙ্গানুবাদে ব্রতী হন। ভারতের প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বাস একদিকে যেমন তাঁর প্রশংসার কারণ হয়েছে অপরদিকে কেউ কেউ সে বিষয়ে সপ্রশংস হতে পারেনি। 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে' বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধে বিজ্ঞানের সঙ্গো বেদান্তদর্শনের সমন্বয়কে প্রশংসা চোখে দেখেননি। নিজে বিজ্ঞানী বলেই সত্যেন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা আশা কলেছিলেন। আসলে এ বিষয়ে যাঁরা রামেন্দ্রসুন্দরের সমর্থক তাঁরা অন্য কথা বলতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারায় রামেন্দ্রসুন্দর কোনো মৌলিক গবেষণা না করে প্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত দর্শনেরক আলোকে তিনি বিজ্ঞানের 'ফাঁকি' ধরে ফেলেছিলেন, এতেই তারা উল্লসিত হতেন।

মানুষ হিসেবে শিক্ষক হিসেবে একটি কলেজের প্রশাসক হিসেবে, আদর্শ একজন গৃহীরূপে, স্বদেশসেবক রূপে, রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিত্বের যে প্রমাণ-পরিচয় মেলে, তা খুবই প্রীতিপ্রদ। শিক্ষক হিসেবে ক্লাসে বিজ্ঞান বিষয়টি বাংলা ইংরেজি—দু'ভাষাতেই পড়াতেন। তাঁর শিক্ষকসত্তা তাঁর প্রবন্ধের রচনারীতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে যে অতি-কথন দোষ আবিষ্কার করেছিলেন, মনে হয়, শিক্ষকরূপে পাঠকদের বোঝাতে গিয়েই সেটি ঘটেছে।

রাত জেগে পড়া শোনা করতেন তিনি। এর ফলে শীঘ্রই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। যকৃতের পীড়া এবং মস্তিষ্কের রোগে তিনি আক্রান্ত হন। মাতা এবং কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুশোকে তিনি মানসিক দিকে থেকে বিশেষ আহত হন। মাত্র ৫৫ বছর বয়সেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৪৪.৪ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্য

তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনে রামসুন্দর বেশি পরিমাণে রচনাদি লিখে যেতে পারেননি। জীবনের শেষ পর্বে তিনি যখন নব্য-ডারউইনবাদ এবং জগতের নিয়মশৃঙ্খলার কঠোরতাকে পরিত্যাগ করে এক দার্শনিক অনুভবের ক্ষেত্রে এসে

একক ৪৪ ❒ নিয়মের রাজস্ব — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

গঠন

৪৪.১ উদ্দেশ্য
৪৪.২ প্রস্তাবনা
৪৪.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ঃ জীবনকথা
৪৪.৪ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্য
৪৪.৫ মূলপাঠ (প্রথম অংশ)
৪৪.৬ সারাংশ
৪৪.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৪৪.৮ অনুশীলনী - ১
৪৪.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
৪৪.১০ সারাংশ
৪৪.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৪৪.১২ অনুশীলনী - ২
৪৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

- তাঁর গদ্যরীতির বিশেষত্বগুলি অনুধাবন করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে জানতে পারবেন।

৪৪.২ প্রস্তাবনা

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির জীবনে যে রেনেসাঁস দেখা দেয়, তার ফল রূপে রস-সাহিত্যের সঙ্গো সঙ্গো জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় বাঙালি আপনাকে বিস্তৃত করতে আগ্রহী-উৎসাহী হয়। নানা সাময়িক পত্রে এবং গ্রন্থাদিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ—কেউই এ বিষয়ে গ্রন্থ-প্রবন্ধাদি না লিখে পারেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেই সব লেখকের অন্যতম। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা নির্মাণে অধিকতর উদ্যোগী ছিলেন এবং বাঙালির জীবনে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান-মনস্ক করে তোলবার দিকে মন দিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাদি অত্যন্ত অন্তরঙ্গা ভঙ্গিতে লিখিত হয়—যাতে সাধারণ বাঙালি সে সব রচনাদি পড়ে সচেতন হয়ে ওঠে। রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের এক দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি দর্শনিকের মতো চিন্তা করেছেন, বৈজ্ঞানিকের বস্তুনিষ্ঠা নিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করেছেন এবং সবার শেষে সাহিত্যিকের রসবোধ দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষায় চার্লস ডারউইনের তত্ত্বকে তিনিই প্রথম বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় দর্শনের বেদান্তবাদও তাঁর আলোচ্য দিক। ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গো ভারতীয় দর্শনের মিশ্রণসাধন তাঁর একটি বড়ো অবদান। দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময়েই সাহিত্য বা প্রাত্যহিক জীবনের

একক ৪৫ ❒ হুতোমপ্যাঁচার নক্সা ঃ চড়ক—কালীপ্রসন্ন সিংহ

গঠন

৪৫.১ উদ্দেশ্য
৪৫.২ প্রস্তাবনা
৪৫.৩ লেখক-পরিচিতি ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ
৪৫.৪ মূলপাঠ—হুতোমপ্যাঁচার নকশা ঃ চড়ক—বিশ্লেষণী পাঠ
৪৫.৫ সারাংশ
৪৫.৬ অনুশীলনী
৪৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪৫.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করে পাঠক ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজজীবন সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল ধারণা করতে পারবেন।
- কালীপ্রসন্ন সিংহের বিশিষ্ট গদ্যশৈলী সম্বন্ধেও পাঠক অবহিত হবেন।
- তৎকালীন জীবনের প্রেক্ষিতে আজকের সমাজজীবন সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক ধারণায় উপনীত হবেন।

৪৫.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব হল। প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ হল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। সাধারণত প্রবন্ধ সাহিত্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তামূলক ও তত্ত্বমূলক গদ্য রচিত হয়।

প্রবন্ধ সাহিত্যের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

১) প্রবন্ধ সাহিত্য গদ্যে লেখা হলেও তা রস সাহিত্য নয়। মানুষের চিন্তা, মনন ও তত্ত্বই এখানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

২) আবেগ ও কল্পনার কোনো স্থান প্রবন্ধে নেই।

৩) কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্বকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ এখানে লেখকের নিজের ভাবনা চিন্তার কোনো গুরুত্ব নেই।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সাথে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম জড়িয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেরী সাহেবের 'দিগদর্শন' পত্রিকাটি প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত সাহিত্যের যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দদান, তাই প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্দেশ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রবন্ধকে দুভাগে ভাগ করা হয়—(১) বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা গুরু প্রবন্ধ ও (২) মন্ময় বা ব্যক্তিগত বা লঘু প্রবন্ধ।

বস্তুনিষ্ঠ তথা বিষয় গৌরবী প্রবন্ধ যুক্তি তর্ক, তত্ত্ব তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠককে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে প্রয়াসী। ব্যক্তিগত তথা আত্মগৌরবী প্রবন্ধে পাঠকের সঙ্গো প্রাবন্ধিকের গড়ে ওঠে এক নিকট

বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তত্ত্ব, তথ্য জ্ঞান ইত্যাদি এ জাতীয় রচনায় লেখকের হৃদয়ানুভূতির রসে জারিত হয়ে পাঠকের আবেগ ও কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে। ফরাসি প্রাবন্ধিক মঁতায়েন প্রথম এ জাতীয় রচনার সূত্রপাত করেন। রোমান্টিক যুগের ইংরেজ প্রাবন্ধিক চার্লস ল্যাম্ব তাঁর Essays of Elia'-র প্রবন্ধগুলিতে আত্মপ্রক্ষেপময়, সরসতা ও বিষণ্ণতার আশ্চর্য মিশ্রণে উজ্জ্বল এক জগৎ নির্মাণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' বা রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' আত্মগৌরবী প্রবন্ধের স্মরণীয় উদাহরণ।

রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত নিবন্ধ একই গোত্রভুক্ত সাহিত্য, তবে এদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রভেদ টানা যায়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মতো রম্যরচনায় থাকে রমণীয়তা, খেয়ালি কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং তথ্যভাবের পরিবর্তে রচনারস সম্ভোগের আস্বাদ্যমানতা। তবে রম্যরচনাকে ব্যক্তিগত হতেই হবে, এমন নয়, তা বস্তুগত কোনো অবলম্বনকে উপলক্ষ করেও রচিত হতে পারে। যে গদ্য রচনায় জীবনের লঘু চপল দিকগুলি নিয়ে উচ্চতর সারস্বত কর্ম সম্পাদিত হয় তাকে রম্যরচনা বলা হয়। চিত্তের ক্ষণ প্রকাশ রুচির উন্নত প্রকাশ, সংযত ভাবাবেগ প্রভৃতি তাই রম্যরচনার অচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। রম্যরচনা প্রসঙ্গে ড. জনসনের বহুল প্রচারিত উক্তি—

"...loose sally of mind which is an irregular undigested piece and not regular or orderly composition."

প্রবন্ধে রচয়িতার মেধা ও বুদ্ধির ছাপ পড়ে, কিন্তু রম্যরচনায় রচয়িতার হৃদয়ের পরিচয় ছড়িয়ে থাকে। গল্প, নাটক বা উপন্যাসের সঙ্গেও রম্যরচনার পার্থক্য আছে ; কারণ ঐ সাহিত্য বিভাগগুলিতে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী বৃত্ত থাকে, যার থাকে একটি নির্দিষ্ট সূচনা, শীর্ষবিন্দু ও সমাপ্তি ; যা রম্যরচনায় থাকে না। কবিতাও রমণীয়, কিন্তু কবি ও পাঠকের মধ্যে একটি দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক থাকে ; যা রম্যরচনায় থাকেনা। রম্যরচনায় বক্তা ও শ্রোতা অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু, সেখানে তাই থাকে এক বৈঠকী মেজাজের আড্ডা প্রবণতা। রচয়িতা এখানে পাঠককে তত্ত্ব আর তথ্যের ভারে অভিজ্ঞ করতে আসেন না বরং জীবন ও জগতের বৈষম্য বিষয়ে কিছু কটাক্ষপাত করে থাকেন বা কিছু 'বাজে কথা' বলে থাকেন। বন্ধুর সেই উচ্চারণে ধার থাকলেও ভার থাকে না। বাজে খরচের মতো বাজে কথাতেই তিনি সম্পূর্ণ ধরা দেন ; এখানেই রম্যরচনার আসল ব্যক্তিগত রসের প্রকাশ।

রম্যরচনার কোনো বাঁধাধরা রচনারীতি নেই। জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে তা লেখা হতে পারে। তবে রম্যরচনায় রসিকতার স্থলে স্থূলতা বা ব্যক্তিগত সুরের স্থলে অহমিকা প্রকাশ কাঙ্ক্ষিত নয়। বর্তমান কালের জটিল জীবনে অপসৃয়মান যে অবসরটুকু আমরা পাই তাতে রম্যরচনা পাঠ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আর তাই রচয়িতাদের খেয়াল রাখতে হবে কোনো আতিশয্য, পুনরুক্তি, আমিত্ব, স্থূলতা-র প্রকাশ এর রসাবেদন সৃষ্টিতে যেন বাধা না আনে। ভঙ্গিসর্বস্ব রম্যরচনা লেখকদের সম্পর্কেই বুদ্ধদেব বসু এহেন সরল মন্তব্যটি করেছিলেন—"যাঁদের না আছে তথ্য বা জ্ঞান, না উদ্ভাবনশক্তি বা কলানৈপুণ্য.....তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগল্ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ভূত হয়ে উঠতে পারতো না, যদি না রম্যরচনা শব্দটির সৃষ্টি হত।"

বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনা ইউরোপীয় প্রভাবজ। ডি, কুইন্সির Confessions of an English Opium Eater-এর অণুপ্রেরণায় রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা-ই নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও স্থান পাবার যোগ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাঁচার নক্শা'তে এর প্রাথমিক উপাদান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পর প্রমথ চৌধুরী, সৈয়দ মুজতবা আলি, বুদ্ধদেব বসু, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখেরা বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনার ধারাটিকে পুষ্ট করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর সাবধান বাণীটি মনে রেখেও বলা চলে সাম্প্রতিক বাংলা রম্যরচনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তর অতটা আতঙ্কিত বা নৈরাশ্যবাদী হওয়ার কারণ বোধহয় এখনো আসেনি।

প্রথম এককটিতে প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এককের মূলপাঠে কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নকশ্া" গ্রন্থের "চড়ক" প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে উনিশ শতকের কলকাতার সমাজজীবন সম্পর্কে একটি বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাবে।

আপনি এই এককটি পড়লে তৎকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে যেমন ধারণা পাবেন, তেমনি হুতোমের ভাষা সম্পর্কেও ধারণা করতে পারবেন। এর পাশাপাশি এককটিতে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা"-র সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বিখ্যাত রম্যরচনার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এককটি ভালো করে পাঠ করুন এবং অনুশীলনীগুলির সমস্ত উত্তর করুন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।

৪৫.৩ লেখক-পরিচিতি ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহ জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র দু বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হলে (নন্দলাল সিংহ) তাঁর প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর অভিভাবক ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। হরচন্দ্রের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে বালক কালীপ্রসন্নের শিক্ষালাভ ও প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল। মাত্র তেরো বছর বয়সেই তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র কালীপ্রসন্ন বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্ব না দেখালেও তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে ও পারে স্বাধীনভাবে তিনি বিশেষ বিদ্যার্জন করেছিলেন। তাঁর সত্যবাদিতা ও আড়ম্বরহীনতা বাল্যজীবনেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, রঙ্গামঞ্চ স্থাপন, সংবাদপত্র পরিচালন, সমাজসংস্কার, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি নানা দিক থেকে তাঁর জীবন ছিল কর্ম্মমুখর। বিচারপতি হিসেবেও তিনি ছিলেন দক্ষ। সাধ্যের অতিরিক্ত দান ও সদনুষ্ঠানের ব্যয়ে তিনি শেষ জীবনে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মহাভারত অনুবাদ সম্পূর্ণ হওয়ার চার বছর পরে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

৪৫.৪ মূলপাঠ "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" ঃ চড়ক

কলিকাতায় চড়ক পার্ব্বন

"কহই টুনোয়া——————
সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি——————টুনোয়ার টপ্পা।

———————

হে শারদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে,
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
এ কুৎসিত! কোন লাজে সপত্নী-সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে - দুষিবে জগৎ - হাঁসিবে
সতিনী পোড়া; অপমানে উভয়রায়ে কাঁদিবে
কুমার সে সময় মনে য্যান থাকে ; চির অনুগত লেখনীরে।

১২০২ *সাল। কলকাতা সহরের চারদিকেই ঢাকের বাদ্দি শুনা যাচ্চে, ও চড়কির পিঠ সড়্ সড়্ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বাঁটি প্রস্তুত কচ্চে,—সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ের নূপুর, মাথায় জরীর টুপী, কোমোরে চন্দ্রহার আর সেপাইপেড়ে ঢাকাই শাড়ী মালকোচা করে পরা, ছোপানে তারকেশ্বরে গামছা হাতে, বিল্বপত্র-বাঁধা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজন!"*

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসী হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিকের দাওয়ান ছিলেন। সেকালে নিম্কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল ; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড়মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদী বড়মানুষ

বলতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে, বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়ীতে ক্রিয়ে-কর্ম্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ বাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে। আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আক্‌বরী মোহরপোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।

এদিকে দুলে, বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নুপুর পায়ে, উত্তরী সুতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীর-ব্রতের মহত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের ও ঢোলের সঙ্গাতে নেচে বেড়াচ্ছে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখীর পালক, ঘন্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ী করে তুলেছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে পেচোনে রোদে রোদে রপ্টে রপ্টে বেড়াচ্চে, কখন বলে "ভদ্দেশ্বরে শিব মহাদেব" চীৎকারের সঙ্গো যোগ দিচ্চে। কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে ; কখন ঢাকের পেছনটা দুম দুম করে বাজাচ্চে-বাম মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যয়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটা-ঝাঁপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কানে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে এক মুঠো বিল্বপত্র নিয়ে ধুঁকেত ধুঁকেত বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো ; সে নিজে কাওয়া হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবুকে তারে নমস্কর কল্লেন, মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাসের উপর দিয়ে গিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন, বাবা তটস্থ !

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজলো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আসতে লাগলো। সহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফ ড্রাইভিং বগি ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেন্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গো নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্লেন—দুই চারজন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পেছনে মালভরা মোদাগাড়ি চল্লো ; পাছে লোকে জানতে পারে, এই ভয়ে কেউ সে গাড়ীর সইস-কৌচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন। কেউ কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন, বিবিজানের সঙ্গো একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ !—কুঠিওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাধা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তিযোগ হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েছে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিট্‌চে, প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না ; কি হবে। বাড়ীর ভিতরে খবর গেলো ; গিন্নিরা পরস্পর বিষন্ন বদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাকবে" বলে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয় মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে, সন্ন্যাসীর দোষেই এইসব হয়" এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে ; অবশেষে গুরু পুরুত ও গিন্নীর ঐক্য মতে বাড়ির কর্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচজন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে, ফুল ত পড়ে না" সন্ধ্যা হয় বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোষাক পরা, রুমালে বোকো মেখে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান ! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়েকাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌কান পরে, সাজগোজ সমতেই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার গেঁতে চল্লো ; মোসাহেবেরা বাবুর সমুহ বিপদ মনে করে বিষন্ন বদনে বাবুর পেচোনো পেচোনে যেতে লাগলো।

গাজনতলায় সজোরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চস্বরে "ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" বলে চীৎকার কত্তে লাগলো ; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাত পাখা দুপাশে চলতে লাগলো। বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পার্‌তো যে, আজ বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দু-হাত একত্র ক'রে ফুলের

মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন ; পুরোহিত শিবের কাছে 'বাবা ফুল দাও, ফুল দাও', বারংবার বলতে লাগলো, বাবুর কল্যাণে একঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাথায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাথা ঘুরতে লাগলো, আধঘন্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাথা থেকে একবোঝা বিল্বপত্র স'রে পড়লো। সকলের আনন্দের সীমা নাই, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠলো "না হবে কেন—কেমন বংশ!"

ঢাকের তাল ফিরে গেল। সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আনলে। গাজোনতলায় বিশ আঁটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো ; কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে ব'সে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো। উঃ! "শিবের কি মাহাত্ম্য"! কাঁটা ফুটলে বলবার যো নাই। এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু'একজন কুটেল চোরা-গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন, বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জানতে পাল্লে না। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো ; দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগলেন—"গিন্নীরা বলে দিয়েচেন—"ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুম যে, ধরে রাখলে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।"

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসর-ঘন্টার শব্দ থামেলো। সকল পথের সমুদয় আলো জ্বালা হয়েচে। 'বেলফুল', 'বরফ', 'মালাই'! চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে, অথচ খদ্দের ফিচ্চে না—ক্রমে অন্ধকার গা-ঢাকা হয়ে এলো ; সে সময় ইংরেজি জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোটলোক ভদ্দরলোক চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরেজি কথার ফর্‌রার সঙ্গো খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় টুঁ মেরে মেরে বেড়াচ্চেন। এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা পেষা দেখে বাড়ী ফির্‌বেন। মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোনাগছির গলি ও আহিরীটোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন, কেউ তারে চিনতে পারবে না। আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে কেশে হেঁচে লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।"

সৌখীন কুঠীওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন। পাশের ঘরের ছোট চীৎকার করে—বিদ্দেসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়চে। পীল-ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্‌তে শিখ্‌চে, স্যাকরারা দুর্গা প্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ-কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে, রোকোড়ের দোকানদার ও পোদ্দার ও সোনার বেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোণা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গাম্‌চাকাঁধে, ভাল মাচ নিবে"? "ও খেংরা গুপো মিন্সি, চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেছুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালেরা লাঠি হাতে ক'রে কানা সেজে 'অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ' বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে। এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, "বলে ভদ্দেশ্বর শিবো।" চীৎকার হতে লাগলো, গোল উঠ্‌লো, এবারে ঝুল-সন্ন্যাস। বাড়ীর সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে ; বাড়ীর ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হুজুরেরা দারোয়ান চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজনতালায় ঘুর-ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জ্বেলে ভারার নীচে ধল্লে—একজনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড় ধুনো ফেলতে লাগ্‌লো। ক্রমে একে একে অনেকে ঐ রকম ক'রে দুল্লে, ঝুলসন্ন্যাসী সমাপন হলো ; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের মত সেতার বাজাতে লাগলো, বেলফুল, বরফ ও মালাই যথামত বিক্রী করবার অবসর পেলে ; শুক্রবারের রাত্রি এই রকমে কেটে গ্যালো।

আজ নীলের রাত্তির, তাতে আবার শনিবার। শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুলজার থাকে। পানের খিলির দোকানে বেললণ্ঠন আর দেয়ালগিরি জ্বলচে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গো বেলফুলের গন্ধ ভুরভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুলচে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়ীতে খেম্‌টা নাচের তালিম হচ্চে অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন ; কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা একজন চোর ধরে বেঁদে নে যাচ্চে—তার চারদিকে চার পাঁচজন হাস্‌চে আর মজা দেখচে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে ; তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়বে, তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজনতলায় চিৎপুরের হর ; ওদের মাঠে সিঙ্গির বাগানের প্যালা ; ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালী। আজ সহরের গাজনতপায় ভারী ধূম—চৌমাথার চৌকিদারদের পোহাবারো। মদের দোকান খোলা না থাক্‌লেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রী হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকারে শুনবেন যে—“ঘোষেরা পাতকোতলায়র বড় পেতলের ঘটীটি পাচ্চে না,” “পালেদের একধামা পেতলের বাসন গেছে’ ও গন্ধবেণেদের সর্বনাশ হয়েছে।” আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি সন্ন্যাসীরা হর্‌রা ও “বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব” চীৎকার।

এ দিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফটকা বাবুরা ঘরমুখো হচ্চে। উড়ে বামুনেরা ময়দানে ময়দা পিষতে আরম্ভ করেছে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নেই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে। বেশ্যালয়ের বারান্ডার কোকিলেরা ডাকতে আরম্ভ করেচে ; দু একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর কেউ খেউ রব শোনা যাচ্চে ; এখনও মহানগর যেন নিস্তব্ধ ও লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন,—“রামের মা চল্‌তে পারে না,” “ওদের ন-বউটা কি বজ্জাত মা” “মাগী যে জব্বী” প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে রত দুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েচেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের তার নিয়ে চলেছে। পুলিশের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরীবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্ মস্ করে থানায় ফিরে যাচ্চেন। সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়া ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট পরিপূর্ণ—হজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গম্ গম্ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেচেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দবনি ও ক্যারামত জাহির করবেন সুপারিন্টেডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর, কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেন্ড নিয়তই কাচে থাকে, হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান—সুতরাং ইনস্পেকটর মহলে একাদশ বৃহস্পতি।

গুপুস ক’রে তোপ প’ড়ে গ্যালো। কাকগুলো কা কা ক’রে বাসা ছেড়ে ওড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম ক’রে, দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে, হুঁকার জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফর্‌সা হয়ে এলো—মাছের ভারীরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে—মেছুনীরা ঝগড়া কত্তে কত্তে তার পেছু পেছু দৌড়েচে। বদ্দিবাটির আলু, হাসমানের বেগুন বাজরা আস্‌চে, দিশী বিলিতী যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ী পাল্কী চ’ড়ে ভিজিটে বেরিয়েছিলেন। জ্বরবিকার, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না। উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সঙ্গাতি ক’রে নেছেন ; কলিকাতা সহরেও দু-চার গো-দাগাকে প্রাকটিস্ কত্তে দেখা যায়, এদের ওযুধ চমৎকার ; কেউ মতন রোগীর নাক ফুড়ে আরাম করেন ; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে—সহুরে কবিরাজেরা আবার এঁদের হতে এককাটি সরেশ ; সকল রোগেই সদ্য মৃত্যুশর ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাণক্য-শ্লোক ও কর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেছেন।

টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরা কাপড় বগলে ক’রে স্নান কত্তে চলেচে, আজ বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ী সকাল সকাল যেতে হবে। আদবুড়ো বেতোরা মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছেন। উড়ে বেহারারার দাঁতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিকস, একসচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায়—হয়েছে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ দেখা না হলে গ্রাহকেরা পান না ইংরেজী কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাস্টের

সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেক্‌সন লেখা কেরাণীর মত কলুর ঘানির বলদ বদলী হলো, পাগড়ী বাঁধা প্রথম ইনষ্টলমেন্টে শিপ সরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পারমাণবিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন। আজ গবর্ণমেন্টের অফিস বন্ধ, সুতরাং আমরা ক্লার্ক কেরাণী, বুক্‌কিপার ও হেড রাইটারদিগকে দেখতে পেতাম না। আজকাল ইংরেজী লেখাপড়ার আধিক্যে অনেকে নানারকম বেশ ধরে অফিসে যান—পাগড়ী প্রায় উঠে গ্যাল দুই একজন সেকেল কেরাণীই চিরপরিচিত পাগড়ীর মান রেখেচেন ; তাঁরা পেন্সন নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায়ট পাগড়ী দেখতে পাব না ; পাগড়ী মাথায় দিলে আলবার্ট ফেশনের বাঁকা সিঁথেটি ঢাকা পড়ে, এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ী প্রায় থাকে না থাকে হয়েচে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েছে ? হাতে কাজ কিছু নাই, অথচ যে রকমে হক না চোটাখোর বেণের ঘরে ও টাকাওয়ালা, বাবুদের বাড়ীতে একবার যেতেই হবে। "কার বাড়ী বিক্রী হবে," কার বাগানের দরকার, "কে টাকা ধার করবে," তারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার বেণে সহুরে বাবু দালাল চাকর থাকেন ; দালালেরা শিরা ধ'রে আনে—বাবুরা আড়ে গেলেন।

দালালী কাজটা ভাল "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়ী -ঘোড়ায় চ'ড়ে দালালী কত্তে দেখা যায়। অনেকে "রেস্তহীন মুচ্ছদী" চারবার "ইন্সালভেন্ট" নিয়ে এখন দালালী অনেক পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন এঁরা বর্ণচোরা আঁক এঁদের চেনা ভার, না পারেন, হেন কর্ম্মই পসাদার চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার-বেণে বড়মানুষের ছলনারূপ জাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান সাড়া দেন, সুতরাং মনে মত কোটাল হলেঁ চুলেনাপুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চারিদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতো, শোনা, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুঁড়ে, একেবারে মোরিয়া হয়ে নাচতে নাচতে কালীঘাট থেকে আসচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ, সুখের দলের পাঁচালী ও হাপ আখড়াইয়ের দোহার, গুলগার্জেনের মেম্বরই অধিক—এঁরা গাজন দেখবার জন্য ভোরের বেলা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড়মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্ছে। কেউ সিভিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন ; কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—"সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন ; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা। কি করেন, বড়দাদা সেজোপিস বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনও কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।

অনেক চড়ক, বাণ ফোঁড়া তলোয়ার ফোঁড়া, দেখতে ভালোবাসেন। প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পোঁত্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গো নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্সে হয়েও হীরেবসান টুপী, বুকে জরীর কারচোপের কর্ম্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তার মালা, হীরের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটী পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না ; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর—ভাগ্নের চুল পেকে গেচে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ ক'রে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হ'লে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়া-গাঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোনা লাগত, এখন লোনা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিস লেগে থাকে—অনেকে তার দরুণ একেবারে আঁতকে পড়েন ; ঘাগিগোচের পাল্লায় পড়ে শেষে সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ী যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এইখানেই কাটান ; দুপুরবেলা ফেটিং গাড়ী চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ-বারো মোসাহেব সঙ্গো বাঈজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা ; দেখলেই চেনা যায় ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার

বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্ত্তিমান্ মা ! বিসর্জ্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা-নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত। মধ্যে মধ্যে খুনী মামলায় গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা-ঢাকা দেন। রবিবার, পাল-পার্ব্বণ, বিসর্জ্জন আর স্নানযাত্রায় সেজেগুজে গাড়ী চলে বেড়ান।

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ দুই-একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতার এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোণাগাছিতে বাসা ক'রেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না। তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বোড়স্যা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে চব্বিশ ঘন্টা সোনাগাছিতেই কাটান। লোকের বাড়ী চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন ; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধ'রে যুগলবেশে জ্যাটা, খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতী কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গী উপস্থিত হয়—পেড়াপীড়ি হলে দেশে স'রে পড়েন—সেথায় রামরাজ্য !

জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে, সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড়মানুষ সহরে এলেই দালাল পেস হন। দালাল বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ী ভাড়া করা, খ্যামটা-নাচের বায়না করা প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটীকেল এজেন্টের কাজদ করেন। বাবুকে সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম -বালির ব্রিজ, বাগবাজারের খালের কলের দরজা—রকমওয়ারি বাবুর সাজানো বৈঠকখানা ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ী দেখিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদ যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালার এজেন্টি কর্ম্মে মক্‌রর হয়।

আজকাল সহরে ইংরেজি কেতার বাবুরা দু'টি দল হয়েছেন ; প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্টদ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ" ; প্রথম দলের সকলি ইংরেজী কেতা, টেবিল-চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরোট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডি ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া, হরকরা ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পলিটিক্স ও 'বেষ্ট নিউস অব দি ডে' নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁছেন। এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, কেবল সর্বদাই রোগ, মত খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবার হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে ; এঁরাই ওল্ডা ক্লাস।

দ্বিতীয়ের মধ্যে বাগম্বর মিত্র প্রভৃতি সাপ হতেও ভয়ানক বাঘের চেয়ে হিংস্র বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ স্বার্থ-সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "কেমন ক'রে আপনি বড়লোক হব," "কেমন ক'রে সকলে পায়ের নীচে থাকবে," এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁফে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূর পরিহার—চার আনারক বেশি দান নাই।

সকালবেলা সহরের বড় মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ির হেড কেরাণী তীর্থের কাকের মত বসে আচেন। তিন-চারিটি "ইকুটি", দুটি "কমন লা" আদালতে ঝুলচে। কোথাও পাওনাদার বিল-সরকার উটনোওয়ালা মহাজন খাতা বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন-চার মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। "শমন', 'ওয়ারিন', 'উকিলের চিঠি' ও সফিনে' বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছল না মনে করে অন্তর্দ্দাহ হচ্চে। "য্যায়সা দিন নেহি রহেগা" অঙ্কিত আংটি আঙ্গুলে পরেচেন ; কিন্তু কিছুতেই শান্তি-লাভ করতে পাচ্চেন না।

কোথাও একজন বড়মানুষের ছেলে অল্পবয়সে বিষয় পেয়ে, কান্নেখেকো ঘুড়ীর মত ঘুরচেন। পরশুদিন "বউ বউ", "লুকোচুরি", "ঘোড়াঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দেওয়ানজীর কুটকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকীলের বাড়ীর বাবুর পাকা চালে নজর রেখে স'রে বসতে হবে, নইলে ওঠসার কিস্তিতেই মাত ! ছেলের হাতে ফল দেখলে

কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার ;—কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু", কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তার "মেজোপিসের মামার খুড়োর পিসতুতো ভেয়ের মামাতো ভাই" পরিচয় দিয়ে পেশ হচ্চেন, "উমেদার", কন্যাদায় (হয়ত কন্যাদায়ের বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুটেছেন, আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবা রয়েছে, সময়ে আমলে আসবে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েছে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে ভরে গেছে। নানা রকম রকম বেশ—কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগ্‌লেস আঁটা শাইনিং লেদর ; কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ডচেন গলায় ; আলবার্ট ফেশানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর র-াকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই ঃ রাস্তার দু-পাশে অনেক আমোদগেঁড়ে মহাশয় দাঁড়িয়েছেন, ছোট আদালতের উকীল সেক্‌সন রাইটার, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে তেলী, ঢাকাই কামার আর ফরারে যজমেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু তিনটে ছেলে।

কোথাও পাদ্‌রী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাচে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া—সূর্ব্বন চৌকীদারের মত পোষাক—পেনটুলেন, ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখলে বোধ হয়ে যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুঠে পাঠশানের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বল্‌চেন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না। পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গো ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রিস্টান হতো ; কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে আর দিশী খ্রিস্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রিস্টান হতেও ভয় হয়।

চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ কল্লে সাদা হয়—ধুলোয় ধুলো ; তার মধ্যে চাকের—গাজন বেরিয়েছে। প্রথম দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁধে কাঁধে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ী বাজাতে বাজাতে চলেছে—তার পেচোনে এলোমেলো নিশানের শ্রেণি। মধ্যে হাড়ীরা দল বেঁধে ঢোলের সঙ্গাতে "ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা, লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা", ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তক্‌মাওয়ালা দরোয়ান, হর্‌করা সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গো ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপী মাথায়, শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং। তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকি ফুড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচতে নাচতে চলছে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেছে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার চিংড়িমাছ বাঁধা। সেট্‌কে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক করে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগ্নে ছোট ভাই—পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ী চ'ড়ে চলেছেন—তাঁরা রাত্রি তিনটার সময় উঠেছেন, টাক লাল টকটক্ কচ্চে মাথা ভবানীপুরে, কালীঘেটে ধুলোয় ভ'রে রয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেঁপচ্ছে হুড়মুড় করে কেউ দোকালে কেউ খানার উপর পোড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুমমত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাস্তায় ঘোড়া চলে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে, অমনি মার্শাল ল জারি হলো, "ঢাক বাজালে থানায় ধ'রে নিয়ে যাবে।" ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়বামাত্রেই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে ক'রে চুপে চুপে বাড়ী এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্বকালের এক বৎসর গেল দেখে যুবকযুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দ্দিষ্টকালের এক বৎসর কেটে গেল। দেখে আহ্লাদের চারিসীমা রহিল না। আজ বুড়োটি বিদেয় নিলেন—যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা—কষ্ট ভোগ করেছি, যেসব ক্ষতি স্বীকার করেচি—আগামীর মুখ চেয়ে,—আশার মন্ত্রণায়, আমরা সেসব মন থেকে তাঁরই সঙ্গো বিসর্জ্জন দিলেম। ভূতকাল—আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্ত্তমান বৎসর স্কুল মাস্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত !—পুরাণ হাকিম বদলী হ'লে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুকপুক্ করে স্কুলে নতুন

ক্লাসে উঠলে নতুম মাস্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্ গুর্ করে—মুড়ঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়সে চেলে, হ'লে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসাকর তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাঁড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ ক'রে ন্যান—নেশার খোঁয়ারির সঙ্গো পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙালীর বছরটি ভাল রকমেই যাক্ আর খারাপেই শেষ, হোক্ সজনেখাঁড়া চিবিয়ে, ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে, পুরাণকে বিদায় দেন। কেবল কল্সী উচ্চুগণ্ডকর্ত্তারা আর নতুন খাতাওলারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন !

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্চুগণ্ড করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ী শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেননি। আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়ীতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদির ক'রে মড়াকান্না কাঁদতে হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে, বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না ? ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে, মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ প'ড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটিং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানারকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েছেন ; কেউ কাঁসারীদের সংয়ের মত পাল্কীগাড়ীর ছাদের উপর ব'সে চলেচেন। ছোটলোক, বড়মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন-কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরে নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়েরাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন ; ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর দু-খানি চাপাটি ও একটু ন্যাব্ড়ানের বদলে ফাউলকারী ও রোল রুটি ইন্ট্রডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহার করা, মেয়েদের বা নাক বেঁধান চলিত হলো দে'খে বোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকু, ঠেলা ও ভালুকের লোমব্যাচা কোলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগলো। সবকামান চৈতনফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেসান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁধে ক'রে টেনা ধুতি প'রে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না ; সুতরাং অবস্থাগত জুড়ী, বর্গী ও ব্রাউহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গো সঙ্গো বেকার ও উমেদারী হালোতের দু-একজন ভদ্রলোক মোসাহেব, তকমা-আরদালী ও হরকরা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কলে কৌশলে বেণেত বেসাতে টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোটলোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুনওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন—প্রায় অনেকেরই এক-একটি পাশবালিশ আচে—"যে আজ্ঞে" ও 'হুজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক" বলবার জন্য দুই-এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভকর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা। কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন ফিষ্টের খরচে—চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শীগ্গির ফুরায় না, বারোইয়ারি পুজার প্রতিমা পূজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসি, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে—সেসব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাটকা চড়ক টাটকা-টাটকাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের বারঘুরী টিনের মুহুরী দেওয়া তল্তাবাঁশের বাঁশী, হলদে রং-করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তইরি গুড়িয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির-করা হাঁড়ি বিক্রী কত্তে বসেচে। "ড্যানাক্, ড্যানাক, ড্যাডাং ডাং চিংড়িমাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজচে। গোলাপী খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে।

একজন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুড়ে নাচতে নাচতে এসেন চড়কগাছের সঙ্গে কোলাগুলি কল্লে মেয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিছেন দিকে চেয়ে রইলেন চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে পা নেড়ে নেড়ে ঘুরতে লাগলো। কেবল "দে পাক দে পাক" শব্দ, কারু সর্বনাশ, কারু পৌষমাস। একজদনের পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখচেন।

পাঠক ! চড়কের যথাকিঞ্চিৎ নকসার সঙ্গে কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্সাইড জানলে ক্রমে আমাদের সঙ্গো যত পরিচিত হবে ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েচে "সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি।"

বিশ্লেষণী পাঠ ঃ

বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে বিচরণ করলেও 'হুতোমপ্যাঁচার নক্শা'র জন্যই কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বইটির প্রথম ভাগ ১৮৬২ খ্রিঃ ও প্রথম দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১৮৬৪ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। এর প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড 'চড়ক' এর আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ ঃ

[হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নক্শা। চড়ক। প্রথম খণ্ড। আশমান। রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুঁকোরাম বসুর ইস্ট্রীট। মূল পয়সায় দুখানা।]

প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভে মধুসূদনের এই কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হয়েছিল—

[হে শারদে ! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে ? কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান ?]

কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এই কবিতার পরিবর্তে একটি টপ্পা গানের দুটি পংক্তি উদ্ধৃত হয়—

"কহইটুনোয়া

সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী।"

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একটি শাখা ছিল সমকালীন সমাজ সমস্যা ও সামাজিক অবক্ষয় অবলম্বনে ব্যঙ্গামূলক নক্শা। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানে' এই ধারার সূত্রপাত এবং পরবর্তীকালে এই ধারায় পাওয়া গেছে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) 'নববাবুবিলাস' (১৯২৫), রামনারায়ণ তর্করত্ন-রে 'কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) মুধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'রও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)। লক্ষণীয় কালীপ্রসন্নই কেবল গ্রন্থনামে প্রথম সচেতন ভাবে 'নকশা' কথাটি ব্যবহার করেছেন ও ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর ব্যঙ্গারচনাকে প্রকৃত নকশাধর্মী করেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে প্রকাশিত ব্যঙ্গারচনাগুলির মধ্যে 'কলিকাতা কমলালয়' ছাড়া সবগুলিতেই সুনির্দিষ্ট কাহিনী আছে এবং নকশাধর্মিতার চেয়ে উপাখ্যান ধর্মিতাই প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই কালীপ্রসন্ন নতুন আঙ্গিক প্রবর্তনের দাবী করে লিখেছেন—"...আমরাও এই নক্শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নূতন বলে দাঁড়ালেম....।

'হুতোমপ্যাঁচার নক্শা'য় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতার সমাজজীবনকে রঙ্গো ব্যঙ্গো, চিত্রণ নৈপুণ্যে ও বাস্তবতায় তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্রুপের চাবুক দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজের সকল কুপ্রথা, কুরীতি, দুর্নীতি ও হীনতার উপর আঘাত হেনেছিলেন। ভবাণীচরণ, প্যাঁরীচাঁদ, রামনারায়ণ বা মধুসূদনের সমাজের প্রতি ব্যঙ্গাবিদ্রুপ এমন ব্যাপক ও সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চরণশীল হতে পারেনি। হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া অবতার, মোসাহেব পরিবৃত-জমিদার, মাতাল, উমেদার, ব্রাহ্ম, পাদরী, ইয়ংবেঙ্গাল বাবু, বৈষ্ণববাজী, ভিখারী, কেরানী, দোকানী, ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক, চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, কলকাতার পথ, যাত্রা, কবি, হাফ আখড়াইয়ের আসল, শ্যাম্পেনের মজলিস, গঙ্গায় নৌকাবিলাস, নগরের বারবিলাসিনী—লেখকের দৃষ্টি সর্বত্র পতিত হয়েছে। তৎকালীন কলকাতার সমাজজীবন যেন ফোটোগ্রাফিক বাস্তবতায় এখানে বিধৃত হয়েছে। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের পরস্পর বিরোধী আঘাতে

সেদিনকার সমাজ হয়েছিল তরঙ্গিত, আর সেই তরঙ্গের তলায় তলায় ছিল যাবতীয় কপটতা ও ভণ্ডামী—যা হুমোদের বিদ্রুপের কশাঘাতে হয়েছিল জর্জরিত। তিনি বিশেষ কোনো গল্পে আবদ্ধ না থেকে সমাজের যেখানেই অসঙ্গতি বা বিকৃতি দেখেছেন, সেকানেই রঙ্গব্যঙ্গমুখর ছবি এঁকেছেন। এখানে লেখক সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে সমাজচেতনা ও সমাজচিত্রের বিচিত্র প্রদর্শনী করেছেন। একথা স্বীকার করেই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বাঙ্গালাদেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে হুতোমপ্যাঁচার ন্যায় লেখকের প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক। পুরানো দিনের কলকাতার ছবি তুলে ধারা এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক রসটুকু 'হুতোমপ্যাঁচার নক্শা'র স্থায়ী মূল্য।

তবে ঐতিহাসিক রস ছাড়াও এর হাস্যরস গ্রন্থটির স্থায়ীমূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই লেখক 'স্বভাবের সুনির্মল পটে'ই শুধু চিত্রাঙ্কন করেননি, তাকে রহস্যরসের রঙ্গেও রাঙিয়ে তুলেছেন। তাঁর সামাজিক বিকৃতি ও দূষিত ক্ষত সংশোধনের মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও তিনি নীতির বেত্রদণ্ড হাতে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত থাকলেও আজ তা সাময়িকতার সীমা পেরিয়ে এসেছে বলেই হাস্যরসটুকুই এখন প্রধান উপভোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ব্যক্তিরা প্রায়শঃই তাদের ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। এই কৌশল কালীপ্রসন্নই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। হয়তো তিনি পূর্ববর্তী প্যারীচাঁদ, ভবানীচরণদের সঙ্গে সুইফ্‌ট, ডিকেন্স, এডিসনের ব্যঙ্গ সাহিত্যের সমন্বয়ে এই কৌশল করায়ত্ব করেছিলেন। এভাবেই তিনি মধ্যযুগীয় অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামির পর্দা থেকে উন্নীত করেছিলেন তাঁর নক্শাকে। তাঁর নকশায় কিছু হিউমার ও ফান থাকলেও উইট ও স্যাটায়ারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন কপট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় হাস্যকর অসঙ্গতি বা বিকৃতি হুতোমের সচেতন মনের শ্রেষ্ঠত্ববোধ নিয়ন্ত্রিত অব্যর্থ ব্যঙ্গবিদ্রুপের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তাঁর হাসি "প্রস্ফুটিত রক্ত গোলাপের জ্বলন্ত বুদবুদের মতো, কঠিন বৃন্তে বিধৃত এবং তীক্ষ্ণ কাঁটায় সুরক্ষিত" (বাঙলা সাহিত্যের নরনারী—প্রমথনাথ বিশী)। তিনি শুধু হাসির আঘাতে অপরকে বিব্রত করেননি, নিজেকেও অনেক সময়ে সেই ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত করেছেন। স্যাটায়ারের সঙ্গে ফান মিশিয়ে হজরতকে লন্ডনে পাঠিয়ে এবং কালী ও কেষ্টর মধ্যে কে বড় ময়ূরের লেজ ধরে তার হিসাব করে হুতোম এবং বিচিত্র হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। হুতোমের নক্শায় হিউমার কম থাকলেও তা যে একেবারে নেই তা নয়।

'হুতোমপ্যাঁচার নক্শা'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল এর ভাষা। কালীপ্রসন্ন এবং প্যারীচাঁদ সংস্কৃত বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ভাষার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। প্যারীচাঁদ অবশ্য সাধু গদ্যরীতির আধারে কিছু লঘু চলিত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বিশুদ্ধ চলিতরীতি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর নক্শার শব্দ ব্যবহারে, ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের চলিতরূপ প্রয়োগে, বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে, বানান পদ্ধতিতে চলিত ভাষা তার স্বকীয় স্বভাবের পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পেরেছিল। হুতোমী ভাষায় বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—

১। কলকাতার চলতি মুখের বুলি (তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি বিদেশি শব্দ) এবং বাংলার নিজস্ব প্রবাদ-প্রবচনের প্রাধান্য।

২। শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও সর্বনাম পদের চলিতরূপের ব্যবহার।

৩। শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার।

৪। চলিত রীতির আধারে ভাষার স্বচ্ছতা ও সংক্ষিপ্তি।

৫। বর্ণনায় বিষয়ের নিপুণ চিত্রধর্মিতা।

৬। বাক্যগঠনরীতি কথনভঙ্গিমায় স্বচ্ছন্দ এবং প্রাণের প্রবাহে গতিময় ও চঞ্চল।

কি শাণিত ব্যঙ্গারচনায়, কি কৌতুক তরল পরিহাস রসিকতায় এবং গভীর গভীর বিষয়ের উপস্থাপনায় হুতোমী ভাষার আশ্চর্য সাবলীলতা ও সজীবতা দেখে এ ভাষাকে বিদ্যাসাগর প্রশংসা করেছিলেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের চলিত ভাষার সমালোচনায় কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে বিবেকানন্দ ছিলেন এ বিষয়ে সংস্কারমুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ও সাধু চলিতের দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত চলিতের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। সংস্কৃত ঘোমটা খুলে আমাদের ভাষাবধূটির কালো চোখের চাহনি দেখার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বিবেকানন্দেরও পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন কালীপ্রসন্ন।

আবার শুধু ভাষা নয়, নূতন ছন্দের দিক থেকেও 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণে 'নক্‌শা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে কালীপ্রসন্ন যে দুটি কবিতা রচনা করেন তাতেই পরবর্তীকালে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে চিহ্নিত বাংলা ছন্দের প্রথম সূচনা হয়। সত্যপ্রিয় কৃতজ্ঞ গিরিশচন্দ্র একথা গোপন রাখেন নি। (গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাবণবধ' নাটকের title page)।

বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেছেন 'অশ্লীল,' বিদ্যালাগর তাকেই বলেছেন 'বড়ই আবশ্যক'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান আপত্তি ছিল অশ্লীল শব্দ সম্বন্ধে, কিন্তু এই তথাকথিত অশ্লীলতা গ্রন্থটির সামান্য অংশেই আছে, সমগ্র গ্রন্থ সম্পর্কে এ অভিযোগ তাই প্রযোজ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে নীতির দোহাই দিয়ে অশ্লীল বলেছেন, আধুনিক পাঠকের কাছে তা অশ্লীল নয়, কারণ তা থেকে আমরা তৎকালীন সমাজের একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্র পাই। তাছাড়া হুতোম সমাজের বিকৃতি সংশোধনের উদ্দেশ্যেই তাঁর নকশা এঁকেছিলেন, তাই পিউরিটান মনোভাব নিয়ে সমাজের নৈতিক অধঃপতনের দিকগুলিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। সুতরাং সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেন নি। দু-একটি অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে সবক্ষেত্রেই ব্যাপারটা অশ্লীল হয়ে ওঠে না। যেমন "কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরির কাজ মনে করেন" (কলিকাতার চড়ক পার্বন)-বাক্যটিকে সার্বিকভাবে অশ্লীল বলা চলে না। এই প্রবন্ধে মোট শব্দসংখ্যা ৩৯০০ আর বিতর্কযোগ্য অশ্লীল শব্দ সংখ্যা-৫। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে "পরদ্বেষী, পরনিন্দুক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত" বলেও নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি পরিচয়ের সাধারণীকৃতিত্বে হুতোমরে নক্‌শা সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছিল। তাছাড়া ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও (মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত) ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উপাদান ছিল। প্রকৃতপক্ষে হুতোম নিজে ছিলেন উদার, প্রগতিবাদী ও পরোপকারী, তাই সমাজের দুনীর্তিগ্রস্ত অধঃপতনের উপর তাঁর মর্মভেদী আঘাত এমন অভ্যর্থভাবে এসে পড়েছিল তাই নীতিবাগীশ শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছেও হুতোমের নক্‌শা সুনীতি ও সুরুচির বিরোধী মনে হয়নি, বরং মনে হয়েছিল "সরল, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী"। হুতোমের পূর্বে বা পরে সমাজের এমন সর্বত্রসঞ্চারী ফটোগ্রাফিক বাস্তবতাধর্মী নক্‌শা আর কারো কলমেই ফুটে ওঠে নি। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক নক্‌শা রচনার নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি সমাজচেতনা, হাস্যরসসৃষ্টি, সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক চলিতভাষার সাহিত্যে প্রবর্তন, বিষয় বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণে বাস্তবতা ও সরসতার অপূর্ব সমন্বয়ে 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র রচনারীতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আর কয়েকজন প্রখ্যাত হাস্যরসিকের রচনারীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে জরুরী। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচারনক্‌শা'-র মধ্যে সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও গ্রন্থদুটি সগোত্র প্রায়। কারণ প্যারীচাঁদ সাধুগদ্যরীতির আধারে কিছু লঘু চলিত শব্দের মিশ্রণে ডিকেন্সের 'পিক্‌উইক পেপাস' এর মতো চিত্রধর্মী ব্যঙ্গোপন্যাস লিখতে চেয়েছিলেন। আর কালীপ্রসন্ন বিশুদ্ধ কথ্যভাষায়, রঙ্গব্যঙ্গের শাণিত সুচতুর বৈঠকিভঙ্গিতে ডিকেন্সের 'স্কেচেজ বাই বজ' এর মতো নক্‌শাই লিখেছিলেন। বরং হুতোমের নক্‌শার উপর মধুসূদনের প্রহসন দুটির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি ['একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)]। পরবর্তী দীনবন্ধু মিত্রের 'বিধবার একাদশী' (১৮৬৬) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬)

ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রহসনগুলিতে হুতোমের মতই ব্যক্তিগত পটভূমিকায় হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস আছে। তবে হুতোমের নক্‌শায় ব্যঙ্গাতীক্ষ্ণ উইট এবং স্যাটায়ারই বেশি আর সহানুভূতিসম্পন্ন দীনবন্ধুর প্রহসনে হিউমারের করুণ হাস্যরস বেশি। বঙ্কিমের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এর পূর্বাভাষ পাওয়া যায়' 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতারে'। হুতোম এবং কমলাকান্ত উভয়েই নিজ নিজ ষ্টাইলে অর্থাৎ হুতোম স্যাটায়ারের মাধ্যমে এবং কমলাকান্ত হিউমারের মাধ্যমে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয় রেখে গেছেন। হুতোমের ব্যঙ্গের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গের একটি প্রধান পার্থক্য এই যে বিদ্যাসাগরের বেনামী ব্যঙ্গ পুস্তিকার ব্যঙ্গ পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রীর তর্কযুদ্ধ উপলক্ষ্য করে অনেকটাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবদ্ধ, কিন্তু হুতোমের ব্যঙ্গ কখনো ব্যক্তিগত পটভূমিকায় বিধৃত হলেও প্রায়শঃই তা ব্যক্তিচরিত্রের সীমা পেরিয়ে শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক রূপে সামাজিক বিদ্রূপে পরিণত হয়েছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী হুতোমের প্রধান সাদৃশ্য হল উভয়ের রচনাতেই ব্যঙ্গের ঝাঁঝ অত্যন্ত তীব্র, কিন্তু প্রধান পার্থক্য হল হুতোম পরিচালিত হয়েছেন মূলতঃ প্রগতিশীল মনোভাবের দ্বারা আর ইন্দ্রনাথ পরিচালিত হয়েছেন মূলতঃ রক্ষণশীল মনোভাবে দ্বারা। ত্রৈলোক্যনাথের বাস্তব কাহিনীতে উদ্ভটত্ব কম, কিন্তু শ্লেষ ও বিদ্রূপের আঘাতে এখানে সমাজের ভণ্ডামি প্রভৃতি অনাবৃত হয়ে পড়েছে এবং এখানেই পূর্বজ হুতোমের স্যাটায়ারের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য ও সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দ তাঁর পরিব্রাজক গ্রন্থে ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের কথ্যরূপ সমন্বিত, দেশি-বিদেশি সর্বাধিক শব্দের স্বীকরণযুক্ত, হুতোমী ভাষার মত তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন খাঁটি চলিত ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। পরবর্তী বীরবলের সঙ্গে হুতোমের সর্বপ্রধান সাদৃশ্য হল উভয়েই চতুর, বুদ্ধিদীপ্ত, নাগরিক শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যকে তার আবেগব্যাকুল করুণ রসার্দ্র আবহাওয়া থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তবে উভয়ের লক্ষণীয় পার্থক্য হল হুতোমে কিছু অশ্লীল শব্দের ব্যবহার থাকলেও বীরবলে তা একেবারে নেই। তাছাড়া হুতোমের তুলনায় বীরবলে উইটের অনেক বেশি প্রাধান্য। শেষকথায় বলা চলে ভাবী ফরাসি সাহিত্যিক, মোপাঁসার মেজাজ নিয়ে, ডিকেন্সের 'স্কেচেজ বাই বজ' এক নক্‌শাধর্মী আধারে উনিশ শতকীয় নাগরিক বাঙালী সমাজের বাস্তব পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পুরো খাঁটি চলিত ভাষায় চিত্র ও চরিত্রের রঙ্গাব্যঙ্গাময় নিপুণ প্রদর্শনীতে 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

৪৫.৫ সারাংশ

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' বইটি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সমাজের নানা সমস্যা এবং সামাজিক বিকৃতি নিয়ে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। উনিশ শতকীয় কলকাতার সামাজিক জীবনের নানা কুপ্রথা, কুরীতি, দুর্নীতির ছবি গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায়। লেখকের দৃষ্টি মাতাল, ব্রাহ্ম, পাদরী, ইয়ংবেঙ্গাল বাবু, বৈষ্ণব বাবাজী, ভিখারি, কেরানি, দোকানি, স্টেশন মাস্টার, বুকিং ক্লার্ক, মোসাহেব পরিবৃত জমিদার, এছাড়া নানা ধরনের উৎসব যেমন চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, কলকাতার পথ, যাত্রা, হাফ আখড়াইয়ের আসর, গঙ্গায় নৌকাবিলাস, নগরের বারবিলাসিনী ইত্যাদি সবদিকেই পড়েছে।

গ্রন্থটির মধ্যে ঐতিহাসিক রসের পাশাপাশি হাস্যরসের অবতারণাও লক্ষ্য করা যায়। হাস্যরসের প্রকারভেদের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর রচনা উইট এবং স্যাটায়ারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

তবে গ্রন্থটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এর ভাষা। গ্রন্থটির মধ্যে কালীপ্রসন্ন বিশুদ্ধ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এই ভাষাকে স্বয়ং বিদ্যাসাগরও প্রশংসা করেছিলেন। ভাষার পাশাপাশি গ্রন্থের মধ্যে ছন্দের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত ছন্দর পরবর্তীকালে "গৈরিশ ছন্দ" নামে চিহ্নিত হয়।

"হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা" গ্রন্থটির সঙ্গে মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা", "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ", দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী", 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' "জামাই বারিক" ইত্যাদি প্রহসনগুলির হাস্যরসের সৃষ্টির

মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মুচিরাম গুড়ের জীবনাচরিত"-এর সঙ্গেও গ্রন্থটির "বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতারে"-র মিল পাওয়া যায়। এছাড়া ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, বীরবল প্রমুখ লেখকের লেখার সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহেবর লেখনভঙ্গির মিল পাওয়া যায়।

৪৫.৬ অনুশীলনী

১। "হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা"-র চড়ক নিবন্ধ অবলম্বনে লেখকের সমাজ মনস্কতার পরিচয় দিন।

২। কালীপ্রসন্ন সিংহের ভিতরে যে সমাজসংস্কারক মন, হাস্যরসিক প্রাণ ও চিন্তাশীল মনন ছিল—তার পরিচয় পাঠ্য নিবন্ধ অনুসারে দিন।

৩। পাঠ্য 'চড়ক' নিবন্ধে গৃহীত কালীপ্রসন্নের ভাষারীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

খ. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা" কেন বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ?

২। 'চড়ক' নিবন্ধে ব্যবহৃত অশ্লীল শব্দের পাঠান্তে আপনি নিবন্ধটিকে কী অশ্লীল বলবেন ? আপনার মতের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৩। কালীপ্রসন্নের মেজাজ পরবর্তীকালে কার রচনায় লক্ষ্য করা যায় ?

৪। 'আলালের ঘরের দুলাল' কার লেখা ? এই গ্রন্থটি কি ধরনের ?

৫। কালীপ্রসন্নের ব্যবহৃত কলকাতার চলতি মুখের বুলির উদাহরণ দিন।

৬। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

"একেই কি বলে সভ্যতা" গ্রন্থের রচয়িতা—

(ক) মধুসূদন দত্ত, (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) কালীপ্রসন্ন সিংহ।

৪৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২-য় খণ্ড।

২। মন্মথ নাথ ঘোষ—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ।

৩। অজিত দত্ত—বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস।

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যাপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত—"হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা"-র ভূমিকা অংশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

৬। ড. সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে গদ।

৭। ড. অজিতকুমার ঘোষ—বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা।

৮। পরেশচন্দ্র দাস—বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ।

একক ৪৬ ❒ পঞ্চতন্ত্র ঃ বই কেনা — সৈয়দ মুজতবা আলী

গঠন

৪৬.১ উদ্দেশ্য
৪৬.২ প্রস্তাবনা
৪৬.৩ লেখক-পরিচিতি ঃ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী
৪৬.৪ মূলপাঠ — বই কেনা — বিশ্লেষণী পাঠ
৪৬.৫ সারাংশ
৪৬.৬ অনুশীলনী
৪৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪৬.১ উদ্দেশ্য

- সৈয়দ মুজতবা আলীর বিশিষ্ট গদ্যশৈলী সম্পর্কে পাঠক অবহিত হবেন।
- তাঁর জ্ঞানের বিশাল পরিধি সম্বন্ধে পাঠকের একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে।
- পাঠক সর্বোপরি এই প্রবন্ধ পাঠ করে আরো বেশি বই কেনায় ও বই পড়ায় আগ্রহী হবেন।
- যে বিশিষ্টজনদের কথা লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক আরো বিশদ জানতে আগ্রহী হবেন।

৪৬.২ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এককের মূলপাঠে মুজতবা আলীর "পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থের "বইকেনা" প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। মুজতবা আলীর রচনাশৈলীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ করা আছে। "বাজে কথা" প্রবন্ধটি যে সাধারণ বাঙালিকে বই কেনা ও পড়ার জন্য উৎসাহিত করতে লেখা হয়েছে, সে কথাও এককের মধ্যে পাওয়া যাবে।

আপনি এককটি ভালো করে পাঠ করুন এবং অনুশীলনীগুলির সমস্ত উত্তর করুন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার অসুবিধা হবে না।

৪৬.৩ লেখক পরিচিতি ঃ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জে জন্ম। পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্কুল ছেড়ে দেন। ১৯২১-২৬ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা শেষে তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগের ফরাসী ও ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৮-৩০ জার্মানি থেকে বৃত্তি পেয়ে বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। তারপর সমস্ত ইউরোপ এবং জেরুসালেম দামাস্কাস প্রভৃতি দেশে ঘুরে এক বছর কায়রোতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৬-এ তিনি বরোদা রাজ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ভারত বিভাগের পর বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৫০-এ আকাশবাণীর কেন্দ্রপরিচালক হন। বিশ্বভারতীর ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপকও ছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু, মারাঠী গুজরাটী, ইতালিয়ান, ফরাসি, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও রম্যরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—দেশেবিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, ময়ূরকন্ঠী, শবনম্‌, ধূপছায়া টুনিমেম প্রভৃতি। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি নরসিংহ দাস পুরস্কার পান। ১১ই ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৭৪-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

উনিশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যাঁদের লেখনী বাংলা রসসাহিত্যের ধারাটিকে পুষ্ট করেথেছ, আলী সাহেব তাঁদের অন্যতম। মূলত তিনি রস-সাহিত্যের বা রম্যরচনার লেখক হলেও অন্যান্য লেখকদের সঙ্গো তাঁর পার্থক্য অনেক। তাঁর রচনায় যেমন হাসির খোরাক আছে, তেমনি আছে উপাদেয় ভ্রমণকাহিনী ; গভীর রোমান্টিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যেমন তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে, তেমনি বেরিয়েছে ভয়াল রোমাঞ্চকর আধা গোয়েন্দাকাহিনী, রাজনীতির নানা লোমহর্ষক ঘটনার বিশ্লেষণ ; কাব্যসুষমামণ্ডিত প্রকৃতি বর্ণনা যেমন পাওয়া গেছে তাঁর কাছ থেকে, তেমনি পাওয়া গেছে, ভাষা-ধর্ম-শিক্ষা নিয়ে মূল্যবান চিন্তাপূর্ণ আলোচনা। একই লেখকের এমন বহুমুখী রচনার নির্দশন সাহিত্যে খুবই দুর্লভ। তাই তাঁর রচনা প্রচুর জনসমাদর পেয়েছে।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে নতুন প্রকাশভঙ্গিতে যে লেখক প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি যাযাবর। তাঁর অনবদ্য সুন্দর প্রথম গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাত' বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এরফরেই মুজতবা আলী এই ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর রচনাশৈলীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি তাঁর মনের ভাব বাচনভঙ্গির উপর এঁকে দিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি অনেক আর্বি ফার্সি শব্দ ও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দকে বাংলাভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর কলমের গুণে তাঁর ব্যবহৃত নতুন শব্দ আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর গদ্যে ফরাসি ভাষার প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা, সরসতা ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্নতা লক্ষ্য করা যায়। লঘু চালের ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত রচনাশৈলীতে চমক ও শ্লেষের ব্যবহারে তিনি এক অভিনব রম্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। অতি সাধারণ ঘটনাকেও তিনি তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে এক তীব্রতর স্বচ্ছ রূপ প্রদান করতেন। আর এখানেই তাঁর সাহিত্যিক অনন্যতা নিহিত।

৪৬.৪ মূলপাঠ — বই কেনা ঃ বিশ্লেষণী পাঠ

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যেদিন দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্দান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গোই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি সে কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গো সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ব করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এ চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি ? প্রথমতঃ—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, "সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।"

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভুগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে ?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবে হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন—

> *Here with a loaf of bread*
> *beneth the bough*
> *A flask of wine, A book of*
> *verse and thou,*
> *Beside me singing in the wilderness*
> *And wilderness if paradise enow.*

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন, তাতে আছে "আল্লামা বিল কলমি" অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই Per excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক — The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনি তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভাবে আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব ?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকানো রয়েছে। সেইটুকুই এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্‌। এর বেশী আর কিছু নিয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও,' তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে ?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ ভাষার বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ 'সিকে দিয়ে যেকোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন ?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি ?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে ? প্রকাশক না ক্রেতা ? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। একস্‌পেরিমেন্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে এবং সর্বশেষে সে সে কনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র বাসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখেল সামনে সারে সারে গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি ? আমি একাধারে producer এবং consumer তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer আরও বুঝিয়ে বলতে হবে ? আমি একখানা বই producer করেছি—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

* * *

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। একবন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে ; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন ?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চলিকে বললেন, 'ভাই বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে ; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বাইরের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত। তার কারণটি কি ?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন ধর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর ? আইম নিজের জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে যের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ. ই. ডি নিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপুত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললেন 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না ?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালোবাস দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জং করতে চায় ; তবে সে অপমার করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আইন হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান অপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুসিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ টুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলাম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েচিলেন—যত কম লোকে কেনা কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গাল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

* * *

আর কত বলবো ? বাঙালীর কি চেতনা হবে ?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে ? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা ? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা ? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গো সঙ্গো রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া চেড়ে দিয়েছে।

বিশ্লেষণী পাঠ ঃ

সাধারণ বাঙালীকে বই পড়া ও তার জন্য বই কেনায় প্রবৃত্ত করানাই এই প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু মূল বিষয়ে যাবার আগে তিনি স্বভাবসঞ্জাত ভাবে হালকা একটি প্রসঙ্গা নিয়ে সরলভাবে নিবন্ধটি শুরু করেছেন। তাই মাছি-মারা কেরানীর সূত্রে তিনি মাছি ধরার আপাত কঠিন কাজিটির কথা বলেছেন। মশার মতো মাছি সহজে মারা যায় না, কারণ তাদের সম্বল কেবল দুটে চোখ নয়, তাদের সমস্ত মাথা জুড়েই নাকি অজস্র চোখ আছে। তাই ধরার আগেই মাঠি ঠিক উড়ে যায়। মাছিদের এই চোখ সমৃদ্ধতা নিয়ে আনাতেলে ফ্রাঁস আক্ষেপ করেছিলেন। কারণ যদি তাঁর মাথার চতুর্দিকে চোখ থাকতো তবে তিনি এই সুন্দরী ধরণীর অপূর্ব সৌন্দর্যকে আরো বেশি করে একসঙ্গো দেখতে পেতেন। তবে ফ্রাঁস এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন যে, মানুষের চক্ষু-ইন্দ্রিয় দুটি থাকলে কি হবে, সে মনের চোখের সংখ্যা সর্বদা বাড়াতে পারে। আর এটা করা সম্ভব জ্ঞানের পিপাসা বাড়িয়ে। চোখ বাড়াবার পন্থ স্বরূপ তাই আলী সাহে বই পড়া ও বই কেনার কথা বলেছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গো তিনি লক্ষ্য করেছেন—পৃথিবীর আর সব সভ্যজাতি যেখানে বহুপাঠের মাধ্যমে কেবলি মনের চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, সেখানে বাঙালী হয়ে উঠছে আরব্য উপন্যাসের এক চোখা দৈত্য সম। অথচ মনের ভিতর আরো একটা ভুবন সৃষ্টি করে নিতে পারলে জাগতিক অনেক যন্ত্রণা এড়ানো যায়। এ ব্যাপারে লেখক বারট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গো একমত। এই মনোভুবন নির্মাণ করার একটাই উপায় বিভিন্ন বই পড়া বা দেশ ভ্রমণ করা। যেহেতু দেশ ভ্রমণ করা আর্থিক ও শারীরিক কারণে অনেক পক্ষেই সম্ভবপ হয় না তাই বোধ

হয় ওমর খৈয়াম তাঁর বৈহেশ্‌তের সরঞ্জাম—এর তালিকায় সর্বাগ্রে রেখেছিলেন তাঁর প্রিয় বইগুলি। বিভিন্ন ধর্মও (মুসলমান-হিন্দু বা খ্রীষ্টান) কলমের শক্তির কথা যুগে যুগে স্বকার করে এসেছে। সুতরাং বই না পড়লে মানুষ সর্বার্থেই ভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু সাধারণ বাঙালী ক্রমেই ভ্রষ্ট হচ্ছে কারণ জীবনের সবদিকে সে টাকা খরচ করতে পারলেও বই কেনার ব্যাপারে সে নিদারুণ কৃপণ। পাঠক এ ব্যাপারে প্রকাশককে দায়ী করেন প্রকাশকেরা আরো সস্তা দামে বই প্রকাশ করেন না। উল্টোদিকে প্রকাশকের বক্তব্য যথেষ্ট পরিমাণে বই বিক্রী না হ'লে বই-এর দাম কমানো যায় না। ফলে এক অচ্ছেদ্য চক্রে পড়ে বাঙালীর বই কেনা বা বই পড়া আর হয়ে ওঠে না। এ চক্র ছিন্ন করতে হবে পাঠককেই। কারণ প্রকাশক দেউলে হওয়ার ভয়ে ঝুঁকি নেবেন না। কিন্তু কেউ কখনো দেউলে হয় নি বলেছেন আলী সাহেব। বরং প্রতি মাসের বাজেটে বাঙালী বই কেনার খাতে কিছু টাকা যদি বরাদ্দ করে, তবু বই বেশি বিক্রী হওয়ার সুবাদে একদিকে যেমন বই-এর দাম কমবে ; তেমনি অন্যদিকে বাঙালী মনোরাজ্যে আরো সমৃদ্ধ হবে। লেখক তাই বাঙালী পাঠককে বই-এর নেশায় চুর হতে বলেছেন।

নিজের বই-এর প্রসঙ্গো এবং অপরের গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গো লেখক ব্যঙ্গো নিপুণ। তাই তিনি লিখেছেন "আমি একখানা বই produce করেছি কেউ কেনে না বলে আমি consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।" আবার মার্ক টুয়েন এং অধিকাংশ লোকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর অভিমত—এঁরা কিছু বই কেনে, আর কিছু বই বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করেন কিন্তু ফেরৎ দেন না। এভাবেই তাঁদের লাইব্রেরীতে বই স্তূপীকৃত হয়।

লেখকের মতে ধনীর ধনার্জনের চেয়ে জ্ঞানীর জ্ঞানার্জন অনেক কঠিন কাজ। তাই লেখক ধনীর চেয়ে জ্ঞানীকেই বেশি উচ্চাসন দিয়েছেন। কারণ ধনীর মেহনতের ফল টাকা, যা ধনী অপেক্ষা কোনো জ্ঞানী অনেক ভালো পথে ও উত্তম পদ্ধতিতে খরচ করতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানীর জ্ঞানচর্চার ফল পুস্তক, যা ধনীর কেনো কাজে লাগে না। তাই জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষ অকাতরে ধন ব্যয় করতে পারে। আবার উল্টোরকমের মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যাঁরা ঘর সাজাবার জন্য বই কেনেন। বই-এর প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স—এই মন্তব্য করেছেন লেখক। মানুষকে সম্মান জানাতে বা অপমান করতে ফরাসীরা বই-এর সাহায্য নিয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গো লেখক আঁদ্রে জিদের সম্পর্কে একটি মজাদার তথ্য সরবরাহ করেছেন। রাশিয়া থেকে ফিরে জিদ যখন রুশদের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন তখন প্যারিসের স্তালিনীয়রা জিদকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করেছিলেন। অথচ তখন জিদের লেখকবন্ধুরা জিদের পক্ষ নিয়ে কিছুই বলেন নি বা লেখেন নি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জিদ এঁদের শিক্ষা দিতে এঁদের স্বাক্ষর সহ যে সব বই জিদকে উপহার দিয়েছিলেন, কেবল সেগুলিকেই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিলামে চড়িয়েছিলেন। অপমানিক লেখকরা দ্বিগুণ তিনগুণ দাম দিয়ে নিজেদের লোক পাঠিয়ে ঐসব বই কিনে নিয়েছিলেন ; যাতে ব্যাপারটি কম জানাজানি হয়।—এভাবেই ফরাসীরা বই দিয়ে মানুষকে অপদস্ত করতেন।

বই কেনা ও বই পড়ার ব্যাপারে বাঙালীকে চেতনাসমৃদ্ধ করে তুলতে আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন এই রমরচনাকার। বই কেনার ব্যাপারে বাঙালীর অনীহা লক্ষ্য করে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। অথচ বাঙালীর যে ক্রয়ক্ষমতা নেই তা লেখক মানতে নারাজ, কারণ ফুটবল বা সিনেমার টিকিট কিনতে তিনি বাঙালীকে কার্পণ্য করতে দেখেন নি। পূজা বা নববর্ষে বাঙালী নতুন জামাকাপড় কেনায় বেশ দরাজ, কিন্তু বইমেলায় গিয়ে আজো অনেকে একটা বইও না কিনে খাবারের স্টলে 'কিউ' দেন। বাঙালীর এই বই-অপ্রীতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক আরবোপন্যাসের একটি গল্পের কথা মজাচ্ছলে লিখেছেন। কোনো এক হেকিমের একটি প্রিয় বই রাজা হস্তগত করেছিলেন হেকিমকে খুন করে। রাজা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে বইটি যখন পড়ছিলেন তখন বইটির জুড়ে যাওয়া পাতাগুলি উল্টাতে গিয়ে তাঁকে বারবার আঙুলে থুথু নিয়ে জোড়া পাতা ছাড়াতে হয়েছিল। প্রতিশোধপ্রবণ হেকিমের বইটির জুড়ে যাওয়া পাতায় পাতায় মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ, যা রাজার অজান্তে তাঁর মুখে যাচ্ছিল। প্রতিহিংসার এমন অভিব পন্থাটির কথাও হেকিম বইটির শেষ পাতায় জানিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই নিদারুণ তথ্যটি জানার সঙ্গো রাজা ঐ বিষের প্রভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। কৌতুকপ্রবণ আলীসাহেবের অনুমান—এই গল্পটি জেনে গিয়েই হয়তো বাঙালী আর বই কেনে না বা বই পড়ে না। বই পড়ে অকালে যমালয়ে যেতে ভীরু বাঙালী স্বভাবতই রাজী নয়—অন্তিম বাক্যের এই শ্লেষ আজো যদি বাঙালীকে বই মুখো করতে না পারে তবে বাঙালীর সত্যিই বড় দুর্দিন।

৪৬.৫ সারাংশ

সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা রম্যরচনার এক উল্লেখযোগ্য লেখক। তাঁর রচনায় হাসির উপাদানের পাশাপাশি ভ্রমণকাহিনী, রোমান্টিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী, গোয়েন্দাকাহিনী ছাড়াও ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা বিষয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনাও পাওয়া যায়।

তাঁর "বই কেনা" প্রবন্ধটি বাঙালিদের বই কেনা ও বই পড়ায় উৎসাহ বাড়াবার জন্যই লেখা, কারণ বাঙালিরা আর সব দিকে টাকা খরচ করলেও বই কেনার জন্য টাকা খরচ করতে চায় না। বরং তারা প্রকাশকদের আরো কম টাকায় বই বিক্রী করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু প্রকাশকরা তা করতে চায় না। তাই আলী সাহেবের পরামর্শ প্রতিমাসে যদি কিছু বই কেনা যায়, তাহলেও বাঙালিরা মনের দিক থেকে যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমনি বই বেশি বিক্রী হলে আস্তে আস্তে বই দামও কমে যাবে। তবে বাঙালির যে টাকা নেই তা নয়। এ প্রসঙ্গে লেখক আরব্য উপন্যাসের হেকিম ও রাজার গল্প বলেছেন। সেখানে রাজা হেকিমকে খুন করে তার প্রিয় বই হস্তগত করেছিলেন। কিন্তু হেকিম বইটির পাতায় পাতায় বিষ মাখিয়ে রেখেছিল। রাজা পাতা ওল্টাতে গিয়ে আঙুলে থুথু নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। বইটির শেষ পাতায় এসে রাজা যখন এ তথ্য জানতে পারলেন, তখন তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন, তাই আলী সাহেবের ধারণা বাঙালিরা হয়তো এই গল্পটি জেনে গিয়েই আর বই কেনে না।

৪৬.৬ অনুশীলনী

ক. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। মার্ক টুয়েনের কী দেখবার মত ছিল ?

২। 'আল্লামা বিল কলমি'—কথাটির অর্থ কী ?

৩। 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে'—কে, কাকে বলেছেন ?

৪। 'লেখকদের মতে বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্যের কারণ কী ?

৫। লেখক কী লিখবেন বলে কলম ধরেছিলেন ?

খ. প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্ব সংক্ষিপ্তভাবে তাৎপর্য লিখুন—

১। "যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।"

২। "তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র।"

৩। "কিন্তু লাইব্রেরীটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় জোগাড় করতে পারি নে।"

গ. ১। 'বই কেনা' নিবন্ধের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সৈয়দ মুজতবা আলীর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ও মজাদার রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করুন।

২। এই নিবন্ধে বাঙালিকে বই কেনায় অভ্যস্ত করে তুলতে প্রয়াসী আলী সাহেব নানা মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

৩। রম্য-রচনা হিসেবে 'বই কেনা'-র সার্থকতা বিচার করুন।

৪৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) শশিভূষণ দাশগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের একদিক।

২) সুনীল বন্দোপাধ্যায়—বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভূমিকা।

৩) সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী।

একক ৪৭ ❑ গণনাট্য আন্দোলন ঃ নবান্ন — বিজন ভট্টাচার্য

গঠন

৪৭.১ উদ্দেশ্য

৪৭.২ প্রস্তাবনা

৪৭.৩ বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

৪৭.৪ (ক) গণনাট্য আন্দোলন কি ও কেন?

(খ) গণনাট্য আন্দোলন এবং নবান্ন।

৪৭.৫ সারাংশ

৪৭.৬ অনুশীলনী ১

৪৭.৭ মূলপাঠ ১ : নবান্ন — প্রথম অঙ্ক

৪৭.৮ সারাংশ

৪৭.৯ মূলপাঠ ২ :. নবান্ন — দ্বিতীয় অঙ্ক

৪৭.১০ সারাংশ

৪৭.১১ মূলপাঠ ৩ :. নবান্ন — তৃতীয় অঙ্ক

৪৭.১২ সারাংশ

৪৭.১৩ মূলপাঠ ৪ : নবান্ন — চতুর্থ অঙ্ক

৪৭.১৪ সারাংশ

৪৭.১৫ অনুশীলনী ২

৪৭.১৬ উত্তর-সংকেত

৪৭.১৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৪৭.১ উদ্দেশ্য

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন নাটকটি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি নতুন ধারার সৃষ্টিকারী নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে জানবেন। এই এককটি পাঠ করলে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের যুগান্তর সৃষ্টিকারী 'নবান্ন' নাটকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

- পরিশেষে জানবেন, 'নবান্ন নাটক সৃষ্টির প্রেরণা ও অভিনয়ের উদ্যোগের উৎসটি।
- 'নবান্ন' নাটক ও তার উপস্থাপনা শুধুমাত্র নতুনতর আর্ট হিসেবেবেই প্রশংসনীয় ছিলনা, দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি বেদনা জাগাতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

- নবান্ন নাটকের মধ্য দিয়ে এটি উপলব্ধি করবেন, এটি কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক জীবনবৃত্ত নয়, যুগ পরিবেশজাত জীবনের কথা।
- 'নবান্ন' ব্যক্তি জীবনবৃত্ত থেকে গোষ্ঠী জীবনকথা হয়ে উঠতে পেরেছে বলেই এ নাটক গণনাট্য।
- এ নাটক ভারত তথা বাংলাদেশের এক বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত (১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন এবং মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনায় ১৬ অক্টোবর সাইক্লোন ও বন্যা)।
- এ নাটকের পটভূমিতে আছে সন ১৩৫০-এর কুখ্যাত মন্বন্তর জনিত সঙ্কট (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) এবং তা থেকে উত্তরণের দিশা।
- নবান্ন এদিক থেকে হয়ে উঠেছে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক। নবান্ন গণনাট্যের একটি বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ নাটক।

৪৭.২ প্রস্তাবনা

ইতোপূর্বে আপনি বাংলা নাটকের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং দুটি নাটক পাঠের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রেক্ষাপট বাংলার গ্রাম ও তার দরিদ্র অসহায় কৃষক সমাজ—তাদের জীবনযাপনে সমস্যা সঙ্কট, ইংরেজ কুঠিয়ালদের শাসনপীড়ন, তাদের নায়েব-গোমস্তা পাইকদের অত্যাতারের পরিচয় পেয়েছেন। নাটকটি বসু পরিবারের পারিবারিক সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়ায় কৃষকের সম্মিলিত শক্তি এখানে সংহত গণ আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। অতিনাটকীয় উপাদানে নাটকের শেষ পরিণতি ঘটেছে।

'রথের রশি' (১৩৩৯) নাটকে আমরা প্রথম জনজাগরণের আভাস পেয়েছি। দেখেছি সভ্যতার রথ জনতার হাতের টানে উঁচুনিচু পথকে সমান করে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে। রবীন্দ্রনাটকের রূপক সাংকেতিক নাটকের এই প্রগতি ধারণা পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘের বাস্তব ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণনাট্যের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য হোল : 'People' বা 'গণ' অর্থে সমাজের বৃহত্তর অংশ—শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের স্বাধীনতা, সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার গণতান্ত্রিক পরিবেশ। মানুষের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের কথা শিল্প সংস্কৃতি কর্মীরা তাঁদের নাটক গানে কবিতায় আলোচনা ও প্রচার করবার মঞ্চ হিসাবে গণনাট্য সংঘকে গড়ে তুলেছিলেন। 'নবান্ন', ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৪ গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে অভিনীত হয়। নাটকটি ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তদানীন্তনকালে দেশের শোষিত কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনের বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল। নাটকটির অভিনয় চতুর্দিকে সাড়া তুলেছিল।

আপনি এ হেন ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই নাটকটির পূর্ণাঙ্গরূপ বর্তমান এককে পড়বেন। নাটকটি সমগ্রত পড়ার পর, আপনি নাটকটির বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, উপস্থাপনা নিজেই মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৪৭.৩ বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

'নবান্ন'-র নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম ১৭ই জুলাই, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) খানখানপুর গ্রামে। পিতা ক্ষীরোদ বিহারী ভট্টাচার্য পেশায় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর আদর্শ জীবনযাত্রা, সাহিত্য ও সংগীতপ্রীতি এবং শেক্সপীয়র-চর্চায় অনুরাগ বিজন ভট্টাচার্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিতার সঙ্গে নানা স্থানে পরিভ্রমণ কালে গ্রামের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও তাঁদের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। এখানে যাত্রা, কথকতা ও মেলায় অংশগ্রহণ করায় বিজন ভট্টাচার্যের গ্রামজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অতিশয় সমৃদ্ধ। মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আশুতোষ কলেজে পরে রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩১-৩২-এ শরীর-চর্চা, জাতীয় আন্দোলন, পরে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অবসর সময়ে আলোচনা, ফিচার ও স্কেচ লিখতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'অরণি' পত্রিকায় যোগ দিয়ে গল্প ছাড়াও নানা বিষয়ে লিখতেন। রেবতী বর্মনের সাম্যবাদ সম্পর্কিত বই পড়ে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হন। অনিয়মিত জীবনযাপন ও অযত্নে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। ১৯৪২-এর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন, 'জনযুদ্ধ' নীতির প্রচার এবং ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ স্থাপন এবং সেখান থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্গ (IPTA) গঠন-এ তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন' (১৯৪৩)। বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী'র তিনি নাট্যরূপ দেন। এগুলি অভিনীত হয়। এরপর তাঁর নাটক 'জবানবন্দী' অরণি'তে প্রকাশিত হয় আর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেন 'নবান্ন'। এটি ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪-এ আই. পি. টি. এ. কর্তৃক শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত হয়। নাটকটিতে তিনি প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ইত্যবসরে ১৯৪৩-এ তিনি খ্যাতনামাকবি ও গল্পলেখক মনীষ ঘটকের কন্যা, লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীকে বিয়ে করেন, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য 'জীয়নবন্যা' লেখেন। 'মরাচাঁদ' নাটকে পবন বাউলের ভূমিকায় উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯৪৮-এ তিনি মতান্তরের কারণে গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে বোম্বাই চলে যান জীবিকার অন্বেষণে। সেখানে তিনি কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন এবং কয়েকটি চিত্রনাট্য রচনা করে দেন। ১৯৫০-এ কোলকাতায় ফিরে 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করে প্রায় ২০ বছর ধরে নাটক লিখে, অভিনয় করে, নাটক পরিচালনা করে জীবন ধারণ করেছেন। দেবী দুর্গার রূপকাশ্রয়ে জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষকের সম্মিলিত প্রতিরোধ রচনার জন্য 'দেবীগর্জন', দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 'কলঙ্ক', দেশবিভাগের দরুণ বাস্তুচ্যুত শিক্ষকের জীবন নিয়ে 'গোত্রান্তর' রচনা করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ছেড়ে 'কবচকুণ্ডল' নামে একটি নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানেও কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়েছে—যেমন, 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আজ বসন্ত' প্রভৃতি।

বিজন ভট্টাচার্য উৎপল দত্ত পরিচালিত লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'তিতাস একটি নদীর নাম', দিলীপ

রায় নির্দেশিত 'রাজদ্রোহী'-তে অভিনয় করা ছাড়াও 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'তথাপি', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। বস্তুত নাটক, গান, অভিনয় ছিল বিজন ভট্টাচার্যের জীবনের সঙ্গো গভীরভাবে ওতোপ্রোত। তথাপি, বিশৃঙ্খল জীবনযাপন ও হতাশা, তাঁর অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সফল সুন্দর জীবন উপকূলে পৌঁছে দিতে পারেনি।

৪৭.৪ (ক) গণনাট্য আন্দোলন কি ও কেন?
(খ) গণনাট্য আন্দোলন ও 'নবান্ন'।

(ক) ফরাসী চিন্তাবিদ ও ঔপন্যাসিক রম্যাঁ রল্যাঁ তাঁর থিয়েটার সংক্রান্ত ভাবনা কয়েকটি প্রবন্ধে লিপিবন্ধ করেন। সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হলো, ইংরেজিতে অনুবাদ হয়। অনূদিত গ্রন্থের নাম 'দি পিপ্‌লস্ থিয়েটার', এ দেশে নাম দেওয়া হয়েছে 'গণনাট্য'। বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকায় য়ুরোপে নাটক ও থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। চল্লিশের দশকে বৃটিশ-উপনিবেশ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এটি প্রায় অমোঘ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চল্লিশের এই গণনাট্য আন্দোলন বর্তমানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার।

রল্যাঁর মূল বক্তব্য হল প্রায়োগিক শিল্প বা পারফরমিং আর্টকে জনগণের কাছে যেতে হবে, তাঁদের জীবনকে তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ এ থিয়েটার হবে গনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত থিয়েটার। তিনি এখানেই থামেননি। তিনি একে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর আস্থা, তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতার কেন্দ্র জনগণ। তিনি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মত বুঝেছিলেন যে কোন সংকট উত্তীর্ণ হ'তে হলে প্রয়োজন ব্যাপক প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ একক প্রচেষ্টায় নয়, ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সম্ভব। তাই গণনাট্যের নাটক জীবনের জন্য, তার বিষয়বস্তু জনজীবন থেকে আহৃত। চরিত্র সমাবেশে থাকবে সাধারণ মানুষ, কোন বিশেষ ব্যক্তি চরিত্র নয়, সামগ্রিক অভিনয় দক্ষতার ওপর এই নাট্যাভিনয় নির্ভরশীল। সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করে, তাঁদের নতুন জীবন-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। ফলত এ নাটক বস্তুত উদ্দেশ্যমূলক। তবে এর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয় আনন্দময় পরিবেশে, জীবন সম্পর্কে রাজনৈতিক সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এ নাটকের মঞ্চ দৃশ্যসজ্জা হবে অতি সাধারণ, সাধারণ মানুষের জীবনানুগ-বাস্তব।

এখন নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে আন্দোলন শব্দটা সংযুক্তির তাৎপর্য বুঝে নেওয়ার দরকার। আন্দোলনের দুটি পক্ষ—আন্দোলনকারী ও যাঁর বা যাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়। এই প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে আর একটি প্রশ্ন, আন্দোলন কি জন্য? এবং কার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবস্থা যা গরিষ্ঠ জনজীবনের পরিপন্থী, তাকে ভেঙে নতুন কিছু গড়বার বা করবার জন্য আন্দোলন। কার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল এই যে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মানুষের বাইরে যে অগণিত জনগণ শহরে গ্রামে গঞ্জে ক্ষেতে খামারে কলে

কারখানায় নানান সাধারণ বৃত্তিতে নিযুক্ত আছে, সেই সব মানুষের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরবার জন্য এই প্রয়াস। সেই দায়িত্ব অবিসংবাদিতভবে এসে পড়ল। তিরিশের দশকের মানুষের কাঁধে। মাঝখানের সময়টাতে দর্শকমণ্ডলী এমন কোন নাটক পায়নি যার মধ্যে নিজের মানসিকতার দুর্গতির সাযুজ্য খুঁজে পেতে পারে—কোন চরিত্রের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গো নিজের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গো নিজের জীবন যন্ত্রণার সন্ধান পেতে পারে। বস্তুত নাটক জীবনের কাছে দায়বন্ধ। তথাপি একথা বুঝবার বা বোজাবার চেষ্টা হয়নি সমাজের কাছে, মানুষের কাছে, জীবনের কাছে—নতুনত্ব পিয়াসী জনগণের কাছে যে নাটকের দায় ও দায়িত্ব কতখানি। অথচ নাটকের কারবার তো কেবল মাত্র মানুষকে নিয়ে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গো সমাজের জীবনের সম্পর্ক নাটকের বিষয়। নাটক মানুষের কথা বলে, জীবন যন্ত্রণা বা জীবন সংগ্রামের ভাষ্যকার সে তাই তার বক্তব্য বিষয় বস্তুত যা নিয়ে তা হ'ল জীবনের সঙ্গো জীবিকার সম্পর্ক, জীবিকার সঙ্গে বঞ্চনার, বঞ্চনার সঙ্গো প্রতিরোধের, প্রতিরোধের সঙ্গো সংগ্রামের বাস্তবসম্মত নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে জীবনের ইতিবাচক দিকটিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা।

বাংলা নাটকের পেশাদার মঞ্চ এই সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করতে পারেনি। ফলত জীবনবিমুখতা পলায়নবাদিতা, গতানুগতিকতা আর রোমান্টিসিজমের ধূম্রজালের মধ্যে নিমজ্জিত থাকল সে। ইতিমধ্যে এসে গেল আর একটা মহাযুদ্ধ। শুরু হ'ল কালোবাজারী আর মুনাফাখোর মানুষের নৃত্য। কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত শোষিত হতে হতে নিঃশেষিত প্রায় হতে লাগল। একদিকে স্বাধীনতা পাবার উদগ্র কামনা, অন্যদিকে শোষণ আর পেষণ থেকে মুক্তির আকুতি দিকে দিকে রণিত হতে লাগল। শুরু হ'ল জীবনের সপক্ষে—শুধু মধ্যবিত্ত নয়, শ্রমজীবী মানুষের অনুকূলে, নাট্য আন্দোলন।

আন্দোলনের আরো সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, "আজ যে দেশের মধ্যে সর্বত্র নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে, তাহা এই নাট্য আন্দোলনের জন্য সম্ভব হইয়াছে। নাট্য-আন্দোলনে 'আন্দোলন' কথাটি লইয়া অনেকে আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু যখন সমাজের কোনো বৃহৎ অংশ একটি বিশেষ লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়, তখনই তো তাহাদের মধ্যে একটি আন্দোলন দেখা যায়। 'আন্দোলন' কথার অর্থই হইল প্রচলিত অবস্থার একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং কোন এক অপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য সক্রিয় সাধনা। ...... প্রাণবান নাটক মঞ্চজগৎ এবং আশ্বাসভরা এক আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে অদম্য সাধনাই ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্য আন্দোলন কথাটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্ব হইতেই সাধারণ নাট্যশালায় অবসাদ ও অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকটিত হইয়া উঠিতেছিল। ওই সব নাট্যশালাকে যে সব অসাধারণ অভিনেতা তাদের অদ্বিতীয় অভিনয়গুণে বাঁচাইয়া রাখিয়াচিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরলোকগমন করিলেন। কেহ কেহ বা রঙ্গামঞ্চ হইতে সাময়িকভাবে অবসর লইলেন। তাহাদের অভাবে রঙ্গামঞ্চের আকর্ষণ একেবারে কমিয়া গেল। মঞ্চপরিচালকরাও আলোক ও দৃশ্যপটের ব্যবহার এবং প্রয়োগরীতির দিক দিয়া তেমন কোন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই, সে জন্য নবাগত সিনেমা-নেশায় উন্মত্ত দর্শকগণ রঙ্গামঞ্চের অভিনয়ের প্রতি

এ সময় বিশেষ কোন আগ্রহ বোধ করেন নাই। সমাজের অবস্থাও দ্রুত পরিবর্তন হইতেছিল। থিয়েটারের নেশামত্ত জমিদার শ্রেণীর অবলোপ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং নূতন যে ব্যবসাদার শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছিল, তাহারা থিয়েটার অপেক্ষা চলচ্চিত্র শিল্প অধিকতর লাভজনক দেখিয়া সেদিকে ঝুঁকিলেন। নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে এমন কোনো বলিষ্ঠ ভাবাশ্রয়ী উদ্দীপনাজনক নাটকও তখন রচিত হইতেছিল না। এইসব নানা কারণে সাধারণ নাট্যশালার অবস্থা তখন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নাটক ও মঞ্চকে বাঁচাইবার জন্য সাধারণ নাট্যশালার বাইরে তখন নবজীবনবাদী ও অদম্য উৎসাহী একদল নাট্যামোদী যুবকের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলন গড়িয়া উঠিল।"

সমাজ সম্বন্ধে বিপ্লবী মতবাদ এবং নতুন জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী ভাবনা প্রথম দেখা গিয়েছিল গণনাট্য সঙ্ঘে। দীর্ঘদিন ধ'রে এই আন্দোলন চলে আসছে। পেশাদারী মঞ্চগুলিও পাশাপাশি পুরাতন ঐতিহ্যকে বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে এবং দর্শক আকর্ষণের নানান কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশের সুস্থ সংস্কৃতির ছিন্নপত্র সীমান্ত পেরিয়ে এসে বাংলার যুবমানসের ওপর যে তীব্র প্রভাব ফেলতে শুরু করে সেই সব নবলব্ধ চেতনা একে একে বিস্ফোরণ ঘটায়। কৃষক ও জমিদার-জোতদারের সংগ্রাম, শ্রমিক-মালিকের সংগ্রাম, শোষক ও অত্যাচারী মধ্যবিত্ত এবং খেটে খাওয়া নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের সংগ্রামকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে বাংলা নাটক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকল বাংলার মানুষের সঙ্গে। জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরে বাংলা নাটক বাংলার মানুষের প্রাণের বস্তু হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। নাট্যাভিনয়ই প্রধান অংশ ছিল এই গণনাট্য সংঘের। এই সংঘের ভাবনা চিন্তা পেশাদার কোন মঞ্চের ভাবনা চিন্তার অনুসারী ছিল না, তা সম্পূর্ণ আলাদা।

সংগঠিতভাবে 'গণনাট্য' আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক দিয়ে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে গণনাট্য সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে। তা' না হলে 'নবান্ন' নাটকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝা যাবেনা। 'নবান্ন' এবং 'গণনাট্য' সংঘ একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেশের ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্তরে মার্কসবাদী আদর্শ এবং সংগঠন বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রুশ বিপ্লবের পরেই এই প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেমন রাজনীতিতে তেমনই সংস্কৃতি আন্দোলনেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রয়োগ এদেশে শুরু হয়ে যায়। এরই ফলে ১৯৩৫ সালে প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়, যার মূল ঘোষণা ছিল 'ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা ক্ষুধা-দারিদ্র্য সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসম্মতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মীষ্ঠ শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে—তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।'

এই ঘোষণায় স্পষ্ট বলা আছে—'সাহিত্যেরবিষয় বস্তু কি হবে এবং যা আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে

যে কেবলমাত্র রসের বিচারের দ্বারা সাহিত্য বিচার হতে পারেনা। সেই শিল্পজাত রস আমাদের সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে কিনা সেও একটা মানদণ্ড যা তৎকালীন ভারতীয় শিল্পকলা বিচারে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ইতিপূর্বে বলা হয়নি।'

এই 'প্রগতি লেখক সংঘ' সারা ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলার প্রায় অনেকগুলি জেলায় শাখা বিস্তার করে। নাটক সাহিত্যের এমন একটি অঙ্গ যা নতুন ভাবাদর্শ প্রচারে সক্রিয় এবং অগ্রগামী ভূমিকাপালন করে। আর যেহেতু, অভিনয় যোগ্যতা নাটকের মৌল শর্ত, সেই হেতু দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে তা সহজেই ছাপ ফেলতে পারে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কিংবা 'নীলদর্পণ' আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে রায় দেবে। ফলে দেশের লেখকদের সামনে একটা নতুন ঢেউ এলো। গল্প কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ছাত্র, যুবক, অফিসের কেরানী প্রভৃতি শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিরা নাটক লেখা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে থাকলেন।

(খ) ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তার প্রথম বুলেটিনে 'Peoples Theatre Stars the People'— এই বাণী শিরোভূষণ করে যাত্রা শুরু করে। এই সংঘের লক্ষ্য ছিল স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলে তাকে প্রাণবন্ত করে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। প্রভাবে গণসংযোগের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে এভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এসেছে। গণনাট্যের নাটক তাই সাধারণ নাট্যভাবনা বা নাট্যতত্ত্ব দিয়ে বিচার করা ঠিক হবে না। জীবন্ত ও সচল জীবন ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে এ নাটককে বিচার করতে হবে সমসাময়িক দেশকাল ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুলি লেখা বলে, বিচারও করতে হবে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে। যেহেতু এর বিষয়বস্তু নতুন, চিন্তাধারাও স্বতন্ত্র, প্রয়োজনীয় সংঘবদ্ধ প্রয়াস, সর্বোপরি শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজনে মূল বক্তব্য উপস্থাপিত, এর বিচার প্রচলিত মানদণ্ডে হতে পারেনা।

প্রথম পর্বে Youth Cultural Institution (Y.C.I.) (১৯৪০), পরে গণনাট্য সংঘ যে নাটক ও গল্পের নাট্যরূপ অভিনয় করেছিল ; তা হল অঞ্জনগড় ও কেরাণী এবং ল্যাবরেটরী, আগুন, হোমিওপ্যাথী ও জবানবন্দী। এগুলিতে কৃষক-শ্রমিকের সঙ্গে অবহেলিত শেষিত সাধারণ মানুষ এবং নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সমাজের শোষণ বঞ্চনা তুলে ধরে, তাদের মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগঠনের মাধ্যমে বাঁচবার প্রেরণা সঞ্চার করা হয়েছে। এমনি পরিবেশ পরিস্থিতিতে 'নবান্নে'র জন্য।

নবান্নের পটভূমিতে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানী আক্রমণ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিম্নবঙ্গে ফসল নষ্ট, সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্দশা প্রতিকারহীন দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর—সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে ক্ষুধা মেটাতে লঙ্গারখানায় লাইনে দাঁড়িয়ে। ওদিকে লোভী জোতদার মজুতদার ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক খাদ্য গুদামজাত করছে, এদিকে অস্থিচর্মসার ক্ষুধার্ত নারী-পুরুষের নগ্নমূর্তির ছবি ও সেবাশ্রমের আড়ালে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা চলছে রমরমা।

এই ক্রান্তিকালে 'নবান্ন' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘ সমগ্র দেশে তো বটেই ইংল্যান্ডেও সাড়া ফেলেছিলো। দেশে বিদেশে সংবাদপত্রে এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হ'তে থাকে। ইংল্যান্ডের

জনগণ বাংলার এই দুর্ভিক্ষের খবর জানতে পারে। তাঁদের কেউ কেউ গণনাট্য সংঘকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যে উদ্যোগী হন।

People's Relief Committee (PRC)-র ব্যবস্থাপনায় গণনাট্য সংঘ মন্বন্তরে পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সার্বিক সহায়তা দান শুধু করেনি, আর্ত জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে দেশেরসামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছে।

৪৭.৫ সারাংশ

বর্তমান এককের সূচনায় নাটকের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এটি একটি অভিনব নাটক যার বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, চরিত্র পরিকল্পনা, দৃশ্যসমাবেশ আলো ও ধ্বনির সুষম বিন্যাসের সাহায্যে ব্যক্তিজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের, দুর্গতির ও প্রতিরোধের ছবি ফুটিয়ে তুলে গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

প্রস্তাবনায় জানানো হয়েছে 'নীলদর্পণ' ও 'রথের রশি'-র অবদানের পরিচয়। ইতিহাসের ধারায় নাটক ক্রমশ পুরাণ, ইতিহাসের সীমা থেকে সাধারণ মানুষের জীবনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। কালক্রমে এরই স্রোতোধারায় গণনাট্য আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'নবান্ন' নাটক।

বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা থেকে জানা যায়, তাঁর পরিবারে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। গ্রামীণ যাত্রা, কথকতা, মেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গ্রাম্য কথ্যভাষার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। জাতীয় আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন তাঁকে নাড়া দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। এ সময়েই সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে সর্বক্ষণের কর্মী হন। নানা কাজের মধ্যে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জনযুদ্ধনীতি প্রচার, ফ্যাসিস্ট বিরোধী থেকে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ ও গণনাট্য সংঘ স্থাপন। এই গণনাট্য সংঘের জন্য তাঁর 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' নাটক রচনা। শেষোক্ত নাটকটি তিনি শম্ভু মিত্রের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনা এবং অভিনয় করেন। শেষ জীবনে, অভিনয়ই তাঁর জীবনধারণের একমাত্র পাথেয় ছিল। হতাশা তাঁকে ঘিরে থাকায়, শেষদিকে তিনি ভগ্ন, রিক্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করেছেন।

পরিশেষে মূলপাঠ ১-এ গণনাট্য আন্দোলন ও নবান্ন সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। রম্যাঁ রল্যাঁর 'পিপল্স্ থিয়েটার'-এর ধারণা থেকে এ দেশে গণনাট্যের ধারণার সূচনা চল্লিশের দশকে। এই নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র পরিকল্পনা জনজীবন থেকে আহৃত, উপস্থাপনা সহজ, সরল অনাড়ম্বর। তাই সাধারণ নাট্যতত্ত্ব দিয়ে একে বিচার করা ঠিক হবেনা। সমসাময়িক দেশকালের প্রেক্ষাপটে সচল জীবন্ত চরিত্রগুলিকে সমাজ বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে।

১৯৪০-এর দশকে রচিত গণনাট্যের নাটকগুলি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগঠন ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচবার প্রেরণা জুগিয়েছে। 'নবান্ন' এই ক্রান্তিকালের সৃষ্টি।

৪৭.৬ অনুশীলনী ১

১। (ক) আপনার মতে 'নবান্ন' পাঠের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হল—

(খ) বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক—

(গ) নবান্ন নাটকের রচনা কাল—

২। (ক) 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়—

(খ) 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপটে আছে—

(গ) বিজন ভট্টাচার্য কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, যে কোন দুটি অভিনীত চিত্রের নাম করুন—

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ——— তে' প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর নাটক 'নবান্ন' —— ও ——— পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, অভিনীত হয় ——— মঞ্চে।

৪। (ক) গণনাট্য নামকরণের উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(খ) Y.C.I. এবং গণনাট্য সংঘ যে নাটকগুলি অভিনয় করেছিল তার যে কোন তিনটির নাম উল্লেখ করুন।

৫। প্রথম যুগের প্রগতি নাট্য আন্দোলনের বিষয়বস্তু ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪৭.৭ মূলপাঠ ☐ নবান্ন ঃ প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিবাবসানে চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্গত পল্লীর বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটি মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু-চারজন লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে, আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার এসে ঢুকল যেন আরও কারা। কী সব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামূর্তিগুলোর হাত-পা নাড়া ও কথা বলার বলিষ্ঠ ধরনে মনে হচ্ছে যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত চলছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল ; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি। আগুনের আভায় মালভূমির ওপরকার দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখের সামনে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে পৌঁছেছে ঃ আর একজনের বয়স কম—

গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠি—শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

প্রধান। (হাত তুলে রক্তিম পটভূমির দিকে ইঙ্গিত করে) তা এ সব কিছুর পর, সব কিছুর পর যে দিন আসবে, আমার শ্রীপতি-ভূপতি বলে গেছে রে কুঞ্জ, তার বরন হবে, ও কুঞ্জ তুই চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, ওই ওই রকম। ওই রকম সোন্দর, ওই রকম নিদারুণ সোন্দর। (অনুকম্পা ও তাচ্ছিল্যভরে হেসে) তিন মরাই ধান। তিন মরাই ধান তুই আমারে কী বলিস্ কুঞ্জ! ...... জীবনটা না দিতে পারলে যে শান্তি নেই তা তো তুই দেখছিস নে। কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেব। আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

[নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ]

কুঞ্জ। (ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে) চুপ। টুঁ শব্দ না। ঐ—

প্রধান। চল, চল্ কুঞ্জ আমরা এগিয়ে যাই।

কুঞ্জ। কী এগিয়ে যাই, পাগল না মাথাখারাপ!

প্রধান। মাথাখারাপ!

কুঞ্জ। মাথাখারাপ না তো কী বলব? (নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ) শুনছ ওদিকে, ঐ ঐ আবার—

প্রধান। আবার! আবার! ওরা ক'জনা?

কুঞ্জ। ক'জনা! কী করে বলব ক'জনা! চলো—

প্রধান। চল্ তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

[নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ]

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, তুমি—ঐ, ঐ আবার! চলো পালাই।

প্রধান। পালাব। পালাতে বলছিস তুই!

কুঞ্জ। আ—া—হা—া, তা খামখা জান্ দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো ঐ বনের ভেতরেই পালাই।

প্রধান। (বিলাপের সুরে) আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। (প্রধানকে হাতে ধরে টেনে) তোমারে নিয়ে হয়েছে আমার মহা জ্বালা, বুঝলে, মহা জ্বালা।

[উভয়ে দ্রুত প্রস্থান]

[ত্রস্ত পায়ে বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদিনী। (বিমূঢ়ভাবে) ওমা, এ কী বিপদ হলো, এখন যাই কোথায়।

[দ্রুত প্রস্থান]

[সন্ত্রস্তভাবে নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নিরঞ্জন। (খালি গায়ে ছুটতে ছুটতে) তাই তো—সাংঘাতিক।

[দ্রুত প্রস্থান]

[পঞ্চাননীর প্রবেশ]

পঞ্চাননী। (লাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদে) না, শরম-ইজ্জৎ আর থাকল না মেয়েমানষির, শরম-ইজ্জৎ আর থাকল না—

[দ্রুত প্রস্থান]

এলো চুলে উন্মাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে সোজা মঞ্চের ওপর দিয়ে রাধিকার দ্রুত প্রস্থান। সন্ধ্যার গোধুলি আলোর মতোই পটভূমির রক্তিম আভা বিষণ্ণ হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। দূরে শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রায়ান্ধকার মঞ্চের ওপর দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অনেকগুলো দ্রুত ধ্বনি দূরে মিলিয়ে গেল।

[কুঞ্জর প্রবেশ]

কুঞ্জ। (সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে ঢুকে) থাক্ চলে গেছে। এসো, এসো তোমরা সব।

[প্রধানের প্রবেশ]

প্রধান। (কব্জির ওপরে ক্ষতস্থানে হাত চেপে) চলে গেছে? চলে গেছে, আবার আসতে কতক্ষণ?

কুঞ্জ। ও কী, রক্ত? কাটল কিসে? দেখি!

প্রধান। (তাচ্ছিল্যভরে ক্ষোভের সুরে) হে, এ রক্তের আবার দাম? এ রক্তের জন্যে আবার মায়া। জন্তু জানোয়ারের মতো বনে জঙ্গলে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা—ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ তুই আমারে ছেড়ে দে।—আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। অন্তর কার জলেনি, আমার না?

প্রধান। (ক্ষুব্ধ স্বরে) জ্বলেছে তো এগুলি নি কেন যখন বল্লাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অন্তর যদি—আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ। শ্রীপতি-ভূপতির ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠা! তবে তুমি শুধু বারবার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শান্তি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরি, এই তফাৎ। তা মিথ্যে হা-হুতাশ আর—

[পঞ্চাননীর প্রবেশ]

পঞ্চাননী। (লাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদে) না এর এট্টা বিহিত করতে হয় কুঞ্জ, বুঝলে, এর এট্টা বিহিত করতে হয়। এ কী রকম ধারা কথা? মেয়েমানুষ, লজ্জাশরম খুইয়ে বনে-জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকবে পহরের পর পহর! কেন, বিত্তান্তটা কী! দেশে পুরুষ মানুষ নেই, হ্যাঁরা কুঞ্জ?

কুঞ্জ। জেঠিমা তুমি!

পঞ্চাননী। হ্যাঁ আমি, তুই জবাব দে আগে আমার কথার।

কুঞ্জ। বলো।

পঞ্চাননী। আবার বলবে কী? দেখছিস নে, না খেয়ে বসে আছিস চোখের মাথা! বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? মেয়েমানুষ কী পাপ করেছে, য়্যাঁ।

কুঞ্জ। কী বলব।

পঞ্চাননী। কী বলবি!

প্রধান। সহ্য করতে এয়েছ সহ্য করে যাও। মুখ বুজে সহ্য করে যাও, কোনো কথা কয়ো না। কোনো কথা কয়ো না, অধর্ম হবে। মুখ বুজে.......

পঞ্চননী। তার আর বলবে কী। আজ তিন দিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটি নি, বুঝলে! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোনো কথা না। কিন্তু শরম!! লজ্জা!! তোমাদের দেশের মেয়েমানুষের অঙ্গের ভূষণ!! যা নিয়ে তোমরা গর্ব কর!! আর তারপর সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়েমানুষের ইজ্জৎ!! কী, কথা বলিস না যে! চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁরা কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!! !! !!

কুঞ্জর দিকে স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে পঞ্চাননীর দ্রুত প্রস্থান

কুঞ্জ। (ক্ষোভের সুরে) ইজ্জৎ!! ইজ্জৎ দেখছে! জীবনটাই যেখানে বেইজ্জতের সেখানে আবার মেয়েমানুষের ইজ্জৎ! কিন্তু কিন্তু

[নিদারুণ অস্বস্তিতে যেন হাঁপিয়ে ওঠে কুঞ্জ]

প্রধান। ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু ; (হঠাৎ উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জর) ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবার, (মরিয়াভাবে) কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে (ধস্তাধস্তি) —

কুঞ্জ। জেঠা, জেঠা, কী হচ্ছে, কী কর? জেঠা! জেঠা!!

[কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান]

প্রধান। (হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে) য়্যা)!

কুঞ্জ। জেঠা!

প্রধান। আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর জ্বলে গেছে।

কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে প্রধান

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির। কুঞ্জ।

কুঞ্জ। (একটু লক্ষ্য করে) আপনি এলেন কবে!

যুধিষ্ঠির। এ অঞ্চলে দিনসাতেক হল এসেছি।

কুঞ্জ। জানতে পারিনি তো একেবারেই।

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, তোমরা জানতে পারোনি ঠিকই, তবে আমি এর মধ্যেই দু'বার ঘুরে গিয়েছি। দিন তিনেক আগে, এই তোমার গত বুধবার হতে, একজন কাবুলিওয়ালা ঘুরে য়ায়নি তোমাদের এখান দিয়ে।

কুঞ্জ। (মাথা চুলকে) কাবুলিওয়ালা। সকাল বেলার দিকে?

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, এই বেলা আন্দাজ নটা নাগাদ? (একুট হেসে) আমিই সেই কাবুলিওয়ালা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) আপনি সেই কাবুলিওয়ালা?

প্রধান। আপনি!

যুধিষ্ঠির। কাঠের একটা গুঁড়ির ওপর বসে তুমি আমাকে খাচ্ছিলে না।

কুঞ্জ। ঠিক তো।

যুধিষ্ঠির। এই, আর একদিন রাত্তিরে। রতনগঞ্জ থেকে সেদিন আমি ঘোড়ায় ফিরছিলাম।

কুঞ্জ ও প্রধান বিস্মিতের ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে যুধিষ্ঠিরের দিকে

তা যাক-গে, সে সব কথা জানবার দরকার নেই তোমাদের। সময় খুব সংক্ষেপ, দূ'চারটে জরুরি কথা বলেই চলে যেতে হবে আমাকে এখান থেকে। কথাটা হচ্ছে যে, যারাই আমাদের কর্তব্যের পথে সামান্যতম অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে চাইবে, তাদের বিরুদ্ধেও আমাদেরকে এখন থেকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। আমাদের আদর্শকে জয়যুক্ত করবার দিক থেকে যে-কোনো ব্যবস্থা, তা সে যতই নির্মম হোক না কেন, গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা করলে আমাদের চলবে না। আমি জানি, জয় পরিণামে হবে আমাদেরই, কিন্তু সেই বিজয় গৌরব অনায়াসলভ্য নয় কুঞ্জ, প্রতিটি পদক্ষেপ রক্তরেখায় রঞ্জিত করে জিতে নিয়ে আসতে হবে সেই বিজয়লক্ষ্মীকে।

প্রধান। (পৈশাচিক উল্লাসে) আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্, বেড়ি দিয়ে ফেলি গে ওদের ; তা কুঞ্জ শোনে না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—আজ যদি আমার শ্রীপতি-ভূপতি।

ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ে প্রধান

কুঞ্জ। (যুধিষ্ঠিরকে একান্তে) শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটে ছেলের শোকে।

যুধিষ্ঠির। না না পাগল নয় কুঞ্জ. প্রধান পাগল নয়। এই ঠিক। প্রয়োজন আছে আজ এই উন্মত্ততার।

এ পাগলামি নয়।

প্রধান। না না।

যুধিষ্ঠির। (কুঞ্জর প্রতি) তুমি বলছ পাগল, কিন্তু বলতে পারো কুঞ্জ, কোথা থেকে আসে এই পাগলামি? কেন এই উন্মত্ততা? ভুল—

ভুল কুঞ্জ, মহা ভুল প্রধান পাগল নয়।

কুঞ্জ। পাগল নয়?

প্রধান। (অস্ফুটস্বরে) না, না, না, না।

যুধিষ্ঠির। আমাদের অন্তরের সমস্ত খর্বতাকে আজ প্রধানের অর্ন্তদাহই পরিশুদ্ধ করতে পারে।

অভিভূত হয়ে গেছে কুঞ্জ। ভাববিহ্বল চিত্তে কী যেন ব্যক্ত করতে চায়, কিন্তু পারে না।

যুধিষ্ঠির। (কুঞ্জর বুক চাপড়ে) আমার সময় হয়ে গেছে কুঞ্জ। আমি চলি এখন। (প্রধানের প্রতি) আবার আসব প্রধান।

[প্রথানুযায়ী যুধিষ্ঠির ডান হাতটা বুকে ঠেকিয়ে উর্ধ্ববাহু করে তুলে ধরে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। কুঞ্জ ও প্রধান যুধিষ্ঠিরের অনুকরণ করে .... যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।]

হঠাৎ নেপথ্যে একটা হট্টগোল শোনা যায় এবং ক্রমে সেই গন্ডগোল বাড়তে থাকে। গভীর উত্তেজনায় কুঞ্জ চতুর্দিক লক্ষ্য করে। প্রধানও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ।

কুঞ্জ। জেঠা! জেঠা! ঐ! (হাত দিয়ে অনুসরণের ইঙ্গিত করে)

[কুঞ্জর দ্রুত প্রস্থান]

প্রধান। (পৈশাচিক উল্লাসে) ঐ, ঐ আবার! ও কুঞ্জ, কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ! কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব প্রাণ দেব প্রাণ দেব!

[দ্রুত প্রস্থান]

নেপথ্যে গন্ডগোল ভয়াল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই দেখা যায়, বৃদ্ধা পঞ্চাননী একটা জনতাকে পরিচালনা করে নিয়ে ঢুকছে।

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব! এগিয়ে যা।

জনতা সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে খানিকটা এগিয়ে আসে

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা!

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। জনতা একটু ইতস্তত করে

এগিয়ে যা, এগিয়ে চল তোরা সব! এগিয়ে যা।

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। জনতা থমকে দাঁড়ায়

জনৈক ব্যক্তি। (ঘা খেয়ে) আরে ব্বাস রে, বাপ রে বাপ।

সকলে সমবেত কণ্ঠে এই -ই-ই শব্দ করে পিছিয়ে যায়।

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা সব।........

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কপালে হাত চেপে ধরে এগিয়ে যা, এগিয়ে যা ....

মূহ্যমান হয়ে পড়ে পঞ্চাননী। সকলে মালভূমির ওপর দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যায়। দু একজন মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে

(ক্ষীণ কণ্ঠে) এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব ....

দুই একটা জ্বলন্ত মশাল মাটিতে পড়ে থাকে। হাতিয়ার সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গোলমাল ক্ষীণ হয়ে আসে। পঞ্চাননীর মুখে কথা সরে না, শুধু হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে—এগিয়ে যা, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব।

মঞ্চের উপর তিন-চারজন আহত লোক শুয়ে পড়ে ক্ষীণভাবে হাত-পা নাড়তে থাকে। পঞ্চাননীর কণ্ঠ নির্বাক হয়ে আসে। কিন্তু তখনও হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা। সুদূরের হট্টগোল ক্ষীণ হয়ে আসে । ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটা মশাল তখনও জ্বলছে।

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালি। একখানা দোচালা ঘরের দাওয়ার ওপর বসে আছে প্রধান, কুঞ্জ, কুঞ্জর ভাই নিরঞ্জন, আর কুঞ্জর ছেলে—নাম মাখন! জল ভরতি একটা মেটে কলসি কাঁখে নিয়ে কুঞ্জর স্ত্রী রাধিকা, ওরফে রাধি ঘরে গিয়ে উঠল। একটু পরেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়—রাধিকাকে—কাঁকালে পুরোনো একটা মেটে কলসি আর হাতে একখানা বস্তা। কলসিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে রাধিকা প্রথমে বস্তাটা উঠোনে বিছিয়ে দেয়, তারপর কলসির ধানগুলো চটের ওপর ঢেলে ফেলে পা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নেড়ে দেয়।

প্রধান। (পা দিয়ে ধান নাড়তে নাড়তে) নাও, এই কটাই সম্বল ছিল, কত করে রেখে দিছলাম, গেল।

কুঞ্জ। কেন, মাচাং-এর ওপরে সেই সে কালো জালার ভিতরি যে পুরোনো আউস কতকগুলো ছিল?

রাধি। (মুখ ঝামটা দিয়ে) হ্যাঁ, বসে রয়েছে এখনও তোমার জন্যে সেই ধান। রোজ ক'সের করে চাল লাগে হিসেব করে দেখেছ কোনো দিন?

কুঞ্জ। (রাগত ভাবে) না, হিসেব করে দেখিনি, এমনিই চলছে।

নিরঞ্জন। (বাধা দিয়ে) নাও, ও অভাব-অভিযোগ তো লেগেই আছে মাসের মধ্যে তিরিশ দিন সংসারে। তা বলে সকালবেলাই খামখা এট্রা অস্বরস কাণ্ড বাধিয়ে আর লাভ কী। চুপ করে যাও।

কুঞ্জ। না, তাই দ্যাখো একবার আচরণ। সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে। মোটে সহ্য করতে পারি নে। কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে, তার আবার—

রাধি। (রাগত ভাবে) হ্যাঁ, খেয়ে খেয়ে দ্যাখো না কেমন সোন্দর হাল হয়েছে শরীরের! (মুখ ভেংচে) আর বলো না, বুঝলে? পুরুষ মানুষের কিতিত্বের কথা আর বলো না। আমরা যে মেয়েমানুষ, আমাদের পর্যন্ত লজ্জা করে।

কুঞ্জ। ও—ে া —ে াঃ, লজ্জাবতী লতা রে আমার!

[পিঁচ কাটে]

রাধি। (কটাক্ষ করে) দু'চক্ষে পেড়ে দেখতে পারি নে।

[রাধিকার প্রস্থান]

প্রধান। (আফশোসের সুরে) হায় রে ধান, হুঁঃ। এই দুটো ধানের জন্যে—

নিরঞ্জন। (বাধা দিয়ে) ন্যাও, থামো তুমি। তোমার আফশোস শুনতে আর ভালো লাগে না। পচে গেল কান।

কুঞ্জ। হ্যাঁ, সব খুইয়ে এখন ঐ আফশোসই সার হয়েছে। ভালো কাণ্ডকারখানা।

প্রধান। (আনমনে) সে কি দু'চারটে ধান! তিন তিন মরাই ধান।

কুঞ্জ। (নিরঞ্জনের প্রতি) ন্যাও সামলাও এখন ঠেলা।

[প্রধান ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে]

নিরঞ্জন। (প্রধানের প্রতি) তা সে যা করেছে তা বুঝে শুনেই করেছে।

কুঞ্জ। বুঝে শুনে মানে, নিজে তো করেইছে, আর পাঁচ জনারে পর্যন্ত বাধ্য করেছে ধান নষ্ট করে ফেলতে।

প্রধান। জোর করে প্রধান কাউকেই কিছু বলেনি।

কুঞ্জ। জোর করে মানে কি আর তুমি নিজে হাতে করে অপরের গোলার ধান নষ্ট করেছ আমি বলছি? অনুরোধ উপরোধ করে বাধ্য করেছ। উপরোধে মানুষ বলে ঢেঁকি পর্যন্ত গেলে, তার আবার—

প্রধান। উপরোধও করিনি।

নিরঞ্জন। বেশ তো তাই হল, উপরোধও করিনি। কিন্তু আচরণ করে শিক্ষে দিয়েছ।

প্রধান। হ্যাঁ তা দিইছি।

নিরঞ্জন। বিবেচনা করেই দিয়েছ?

প্রধান। (রাগতভাবে) হ্যাঁ দিইছি, বিবেচনা করেই দিইছি। যা করবার তোরা কর আমারে। য়্যাঁ, নৌকো ছিল আমি আটকে রেখেছি। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে আমি মানষিরি সব দেশান্তরি করিছি। সব আমি করিছি। কর্ তোরা আমারে যা করবার কর।

[অস্থির হয়ে ওঠে প্রধান]

কুঞ্জ। (নিরঞ্জনকে চুপ করতে ইঙ্গিত করে) তোমাকে আবার কে কী করতে চাচ্ছে মাঝে মাঝে আপনা থেকে আফশোস কর বলেই তো এই সব কথা ওঠে। যা গিয়েছে—গিয়েছে, য়্যা। এই তো, ক'মাস পরেই আবার আমন ধান পাওয়া যাবে। তেমন একটা অঘটন যদি ঈশ্বরের ইচ্ছেয় না ঘটে তো ভাতের আবার ভাবনা! (স্ত্রী রাধিকার উদ্দেশ্যে) কই, গেলে কোথায়? (মাখনের প্রতি) ডাক দিকিন মাখ তোর মা-রে।

মাখন। মা এসে আবার কী করবে?

কুঞ্জ। (ধমকের সুরে) কী করবে তা বুঝবখন আমি। ব্যাদড়া ছেলে কাঁহাকা, ডাক শিগ্‌গির।

মাখন। যাচ্ছি।

[মাখনের প্রস্থান]

কুঞ্জ। মুখ থেকে দুধের গন্ধ গেল না, এর মধ্যেই তক্ক করতে শিখেছে মুখে মুখে। মা-টি আবার কেমন দেখতে হবে তো।

[রাধিকার প্রবেশ]

কী, খুব তো মেজাজ দেখিয়ে চলে গেলে তখন। বলি রাগ করে বসে থাকলে কি পেট ভরবেখন সকলের?

রাধি। ওমা, রাগ আবার করলাম কখন!

কুঞ্জ। না, পা থাবড়ে যে বড়ো ঘরে গিয়ে উঠলে, সেই কথা বলছি।

রাধি। তা উঠলামই বা। কারো তো কিছু এসে যাচ্ছে না তাতে!

কুঞ্জ। তা এসে যাচ্ছে বই-কি। শুধু শুধু আর কি হাত গুটিয়ে বসে আছি? নাও, দাও দিকিন এইবার তোমার সেই—

রাধি। (আঁচ করে একটু রেগে) কী দেবে?

কুঞ্জ। (চোখ বুঁজে) আরে কী যে বলে ওর নামটা—

রাধি। আ হা হা হা, মশকরা দেখলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে যায়।

কুঞ্জ। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, তোমার সেই—

রাধি। —মলজোড়া, এই তো?

কুঞ্জ। হ্যাঁ।

রাধি। তা সে কি আর আমি বুঝিনি! মনে তোমার অনেকক্ষণই পড়েছে শুধু আমার বাপের বাড়ির জিনিস বলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে একটু ভনিতে করলে। কিন্তু সে মল আমার মায়ের দেওয়া। তার কথা মনে করে তুলে রেখেছি। সে আমি কিছুতেই দেব না। আর সবই তো খেয়েছ। এখন সে মলজোড়ার ওপর টনক নড়ছে। হায় অদেষ্ট!

কুঞ্জ। না দিবি না দিবি, তা বলে হা অদেষ্ট হা অদেষ্ট করিস্‌নি, হ্যাঁ। কুঞ্জ সমাদ্দার এখনও বেঁচে আছে, মরেনি।

রাধি। বেশ তো, তারই প্রমাণ দিক্ ; সে আমার সৌভাগ্যি।

কুঞ্জ। হ্যাঁ, তাই তাই। নয়তো তুই যে ভাবছিস আমি মরে গিয়ে তোর উদোমে খাবার ব্যবস্থা করে দেব, সে গুড়ে বালি, বুঝলি, সে গুড়ে বালি।

[হঠাৎ ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে বাসন পত্তর সব টেনে বের করে আনে]

বাপের বাড়িওয়ালারা যে মস্ত বড়লোক, ঠ্যারেঠোরে ও শুধু আমারে সেই কথাই শোনায়। তোর দেমাক আর ঠেকারের নিকুচি করেছে!

[ঝনাৎ কর বাসনের পাঁজা নামায়। ত্বরিতপদে রাধিকার প্রস্থান]

নিরঞ্জন। তা ওগুলো নিয়ে আবার কোথায় চললে?

কুঞ্জ। দোকানে, আবার কোথায়? পেট তো ভরাতে হবে গুষ্টির!

[কাশতে কাশতে আর বক্ বক্ করতে করতে ঘরে প্রস্থান]

প্রধান। ও মাখন, মাখন।

নিরঞ্জন। দুত্তুর কলা নিকুচি করেছে তোর সংসারের। শালা আজই আমি চলে যাব।

[কলসি কাঁখে বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদিনী। কোথায় যাবে?

নিরঞ্জন। এই এলেন আবার আর এক সঙ্। যত সব হয়েছে।

বিনোদিনী। ওমা, আমি আবার কী করলাম?

নিরঞ্জন। কিচ্ছু করনি বাপু, কিচ্ছু করনি। যাও, এখান থেকে যাও। আর ভালো লাগে না। আমি আজই শালা চলে যাব।

বিনোদিনী। কোথায়?

নিরঞ্জন। কোথায় কি আর আমি ঠিক করে রেখেছি? যাব এমনিই, যেদিকে দু চোখ যায়।

বিনোদিনী। ওমা, সে কী কথা?

নিরঞ্জন। না দিনরাত তোমাদের এই সংসারের ভেতরে পড়ে ঝালা-পালা হই আর কী। আমি আজই চলে যাব।

বিনোদিনী। তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।

নিরঞ্জন। (ভেংচি কেটে) সঙ্গে নিয়ে চলো! তুমি যাবে কোথায়?—তুমি যাবে কোথায়? নিজেরই বলে দাঁড়াবার জায়গা নেই, তার আবার,—আগে রও, আমি তো যাই!—তারপর দেখি যদি একটা কাজটাজ জোটাতে পারি তো সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন তার কী?

বিনোদিনী। একা যাবে তুমি?

নিরঞ্জন। (ভেংচি কেটে) তো দোকা পাব কোথায়?

বিনোদিনী। কেন, নাও না আমায় তোমার সঙ্গে।

নিরঞ্জন। পাগল্ না মাথা খারাপ! আমিই বলে তাই এখন কোথায় যাই কী করি তার ঠিক নেই, ঘাঁটিয়ো না মিছে হ্যাঁ, ভালো লাগে না।

বিনোদিনী। আজই তো তাই বলে চলে যাচ্ছ না?

নিরঞ্জন। কেন, যদি বলি আজই, তো বাধা কিসের?—বাধাটা কিসের?

বিনোদিনী। বাধা মনে করলেই আছে, না করলেই নেই। আমি থাকব এখানে একলা পড়ে—

নিরঞ্জন। আহা বলি একলাটা কিসের হল? যত সব প্যান্-প্যানানি এই মেয়েমানুষের।

বিনোদিনী। তা মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি—

নিরঞ্জন। জন্মেছ তো বেশ করেছ। ও কোনো কথা আমি তোমার শুনতে চাইনে। আর পাঁচজনও থাকবে, তোমাকেও থাকতে হবে তাদের সঙ্গে। গোঁয়াতে পার ভালো, না পার—আমি তার কী করব? আমারে চলে যেতেই হবে,—আজ না হয় কাল।

[বিনোদিনী চোখ মোছে]

একেবারে তো অজলে অস্থলে ফেলে যাচ্ছি নে। দাদা থাকল, বৌদি থাকল, জেঠা থাকল, মাখন থাকল, আবার ভয়টা কিসের? পরলোক তো এরা কেউই নয়! দেখছ এই অবস্থা, নুন আনতে পান্তা ফুরাচ্ছে, এখন বুঝে শুনেও যদি তোমাদের আগলে বসে থাকি তো শেষকালে?—ভেবে দেখেছ কখনও পরিণামটা ? হুঁঃ, শুধু কাঁদলে হয় না। অবস্থা বিবেচনা করে দেখতে হয়। (ধরা গলায়) কাঁদছে, কাঁদতে অমন আমিও পারি। কিন্তু কী দাম আছে সেই চোখের জলের? কিছু না।

[পরিশ্রান্ত কুঞ্জর প্রবেশ]

কুঞ্জ। (উভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নিরঞ্জনের প্রতি) ফের মেরেছিস বুঝি? (নিরঞ্জন নিরুত্তর) বলি ফের্ আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের?

[সাশ্রুনয়নে বিনোদিনীর প্রস্থান]

(চেঁচিয়ে) বেরো, বেরো তুই এখনই আমার বাড়ি থেকে, বেরো। ছোটলোক, চামার! অভাবে পড়ে এর মধ্যেই স্বভাব নষ্ট করে বসেছিস—বেরো, বেরো তুই এখুনি। পশু কোথাকার!!

উন্মত্ত অবস্থায় সামনের একখানা কাঠ দিয়ে নিরঞ্জনের মাথায় আঘাত করে বসে।

মেয়েমানুষের গায়ে হাত ...... বেরো, বেরো তুই, বেরো !!

[আঘাতে নিরঞ্জনের মাথাটা ফেটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে বেরোয় রক্ত। নিরঞ্জনের প্রস্থান।]

কুঞ্জ। (বিমূঢ়ভাবে) য়্যা, রক্ত! রক্ত! খুন করে ফেললাম! খুন করে ফেললাম আমি নিরঞ্জনকে! নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!!

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

দাওয়ার ওপর বসে প্রধান আনমনে তামাক টেনে চলেছে, আর কুঞ্জ উঠোনে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। দেখলেই মনে হয় আগে থেকেই যেন কী একটা আলোচনা চলছিল ওদের মধ্যে।

প্রধান। (হুঁকোয় বিলম্বিত একটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে) তা হল থাকবে? কী, কথা বলিস না যে?

কুঞ্জ। কী বলব? জমি তোমার, দ্যাখো তুমি বিবেচনা করে।

প্রধান। হ্যাঁ তা সে তুই কী বলিস?

কুঞ্জ। আমি তো বলেছি আমার কথা।

প্রধান। কী?

কুঞ্জ। কাজ নেই কবালা করে।— মগরার বিলের জমি বেচে তো খেলে? ক'দিন গেল?— তো কী হবে খামখা জলের দামে জমি বিক্রি করে? ও সে যা করেছ তা করেছ। আর বেচে কাজ নেই। য়্যা-া-ঃ, আছেই আর ভারি বিঘে তিনেক!

প্রধান। তা হলে যা হয় এট্টা ঠিক করে বল খামখা—

কুঞ্জ। আবার ঠিক করে কী! বলছি তো থাক। বিশেষ ফসল যখন একবার হয়ে গেছে। রোওয়া। আর অভাব? সে তো আছেই । ও জমি বেচলেও থাকবে, না বেচলেও থাকবে। দ্যাখা যাক। দিন কি আর এমনিই যাবে!

[প্রতিবেশী দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। (গলা খাঁকারি দিয়ে প্রধানকে লক্ষ্য করে)। এই যে প্রধান।—বাড়িতেই আছো তা হলে দেখছি!

প্রধান। (চারিদিকে চেয়ে) হ্যাঁ, সকালবেলার থেকেই কেমন কেমন যেন একটু ঘোর ঘোর ভাব—

দয়াল। বিষ্টিই বোধ করি আসে।

প্রধান। তা বস। উঠে বস। তামাক খাও।

দয়াল। (বসতে বসতে) তামাক বা খাব কী?

প্রধান। কেন, যাচ্ছিলে নাকি কোথাও?

দয়াল। না এই।

প্রধান। (দয়ালকে হুঁকো এগিয়ে দিয়ে) ধরো।

কুঞ্জ। (উঠোনের এক কোণে বসে) দয়ালদা কী বল এ কথার?

দয়াল। কী বিষয়!

প্রধান। আর কি বিষয়!

দয়াল। তবু শুনি।

কুঞ্জ। বিষয়টা হচ্ছে যে জমি জায়গা বিক্রি করা নিয়ে।

দয়াল। বেশ।

কুঞ্জ। বিলের ধারে ঐ যে বিঘে তিনেক খামার জমি আছে না জেঠার? তাই বলছিল বিক্রি করে ফেলি।

দয়াল। তারপর?

কুঞ্জ। তা আমি বলি কী যে ও দুঃখ-কষ্ট যা কপালে আছে সে তো আছেই, মাঝখানে থেকে জমিটুকু খুইয়ে আর কী এমন সৌভাগ্য বাড়বে!

দয়াল। সে তো ঠিক কথাই। রুজি রোজগার না থাকলে জমি বেচে আর ক'দিন চলে।—আমি নাকি যে ভুল করেছি!

কুঞ্জ। বেচে ফেলেছ নাকি জমি তুমিও?

দয়াল। হ্যাঁ তা সে কিছু তো বেচে ফেলেইছি। কিন্তু সেই বেচেই বা হল কী? বীজ ধানগুলো পর্যন্ত রাখতে পারলাম না উঃ।

কুঞ্জ। তোমার তা হলে তো দেখি আরও সরেস অবস্থা! সব খুইয়ে বসে আছ?

দয়াল। সব, সব। কুঞ্জ, সব। একমুঠো চালের জন্যে তোর দয়ালদা তা না হলে কি আর আজ দোরে দোরে ঘুড়ে বেড়ায়! উঃ!

প্রধান।	ছোট ভুলের ক্ষমা আছে, বুঝলে দয়াল। কিন্তু বড়ো ভুলের আর চারা নেই। করতেই হবে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত। এইটাই বুঝলাম।
কুঞ্জ।	(দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) হ্যাঁ বুঝলে বটে, (দয়ালের প্রতি) তবে কি না বড্ড দেরি করে বুঝলে।
দয়াল।	(করুণ হেসে সঙ্গে সঙ্গে) এমন সময় বুঝলে যে শুধরে যে নেবে তার পর্যন্ত সময় থাকল না।
প্রধান।	(দয়ালের হাত থেকে হুঁকো নিয়ে) তা হলে থাক জমিটুকু।
দয়াল।	থাক্ থাক্, সম্বল থাক্, জমিজায়গা এমনিই বিক্রি করতে নেই, তার ওপর—
প্রধান।	থাকতে তো বলছ, কিন্তু এদিকে দিনপাত চলে কী করে বলো তো? বাঁচতে তো হবে?
দয়াল।	তা তোমাদেরও কি এইরকম অবস্থা নাকি?
প্রধান।	তো তুমি কী ভাবছ?
দয়াল।	কেন ধান তো তোমার ছিল প্রধান।
প্রধান।	হ্যাঁ সে যখন ছিল তখন ছিল। এখন কী আছে তাই বলো।
দয়াল।	এই রকম অবস্থা নাকি! আমি ভাবলাম যাই, প্রধানের ওখানে একবার যাই। যদি কিছু—
প্রধান।	হুঁ, সে কথার আর কী বলব বলো। এই তো দ্যাখো না, সকাল বেলার থেকে এই এতক্ষণ পর্যন্ত চেঁচামেচি খুনোখুনি করে, শেষ সম্বল দু'খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের-দুয়েক চাল নিয়ে এয়েছে কুঞ্জ ; পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক'টা?
দয়াল।	তা তো ঠিকই! কিন্তু আমার যে এদিকে সমস্যাই হল। ঘরে একদানা চাল নেই, প্রধান, আজ দু'দিন। রাঙার মা বলতে গেলে সে একরকম ধুঁকছে কাল বিকেল বেলা থেকে। কী করি বলো তো?
কুঞ্জ।	আর কী হয়েছেই এই!
দয়াল।	কুঞ্জ!
কুঞ্জ!	কী বলব বল এ কথার! রাঙার মা ধুঁকছে কাল বিকালবেলা থেকে, অমুকের মা ধুঁকছে কাল দুপুরবেলা থেকে, তমুকের মা ধুঁকছে আজ সকালবেলা থেকে, এই তো এখন শুনতে হবে। (ঘর থেকে চাল নিয়ে আসে কোঁচড়ে) ন্যাও ধরো, মুঠোখানেকের বেশি কিন্তু দিতে পারব না দয়ালদা। এই আমাদের শেষ সম্বল।
দয়াল।	(কোঁচড় পেতে) ঐ মুঠোখানেক হলেই চলবে বাপ আমার। জানটা তো আগে রক্ষে পাক।
কুঞ্জ।	কিন্তু এই রকম করে আর কদ্দিন?
দয়াল।	যদ্দিন যায়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এ তো থাকবেই।
প্রধান।	তা শুধু আশ দিয়ে তো আর পেট ভরবে না দয়াল, ব্যবস্থা এর এট্টা করতে হয়।

দয়াল। বলো কী ব্যবস্থা করবে। আমি তাতেই আছি।

প্রধান। চলো চলে যাই।

দয়াল। কোথায়?

প্রধান। কেন শহরে? অন্নকূট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা।

কুঞ্জ। থাক তোমার বাবুদের কথা আর শুনতে চাই নে।

দয়াল। হ্যাঁঃ, ও বাবুদের কথা আর বলো না।

কুঞ্জ। যার জন্যে করি চুরি শেষকালে সে-ই বলে কি না চোর!

প্রধান। ভদ্দরনোকের নামে মুখ করছ, কিন্তু এই ভদ্দরনোক ছাড়া আবার গতিও নেই আমাদের এখন। শত হোক, সেই ঘুরে ফিরে যেতেই হবে তোমার ভদ্দরনোকের দোরে। উপায় নেই।

কুঞ্জ। তা সে ভদ্দরনোকও আছে, ভদ্দরনোকও নেই। তা বলে ফর্সা জামা-কাপড় পরে ভালো বাংলায় হ্যানা করো ত্যানা করো বললেই ভদ্দরনোক বলে তার কথা মেনে নিতে হবে? থে-ে-েঃ!

প্রধান। না, তা কেন হবে?

কুঞ্জ। তো তবে?

দয়াল। যাকগে, সে যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন বর্তমানের কর্তব্য কী তাই—

প্রধান। তা সেই কথাই তো বলছি। বলি—

কুঞ্জ। বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের মতো আমাদেরও ঐ রাস্তার নেমে দাঁড়াতে হবে।

প্রধান। তা হলে যে আশংকা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হল।

দয়াল। আর হওয়া-হউইর তো কিছুই নেই। ঐ এক রাস্তাই খোলা আছে, ঐ এক পথেই যেতে হবে সকলকে।

প্রধান। তাই তো বলছি। বলি শহরে—

কুঞ্জ। তা সে তুমি শহরেই বলো আর নরকেই বলো, পথ ঐ এক। সরা হাতে করে গুষ্টিশুদ্ধু, পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে।

প্রধান। পথে নেমে দাঁড়াতে হবে? প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে দয়াল!

দয়াল। তাই তো বলছি—বলি শেষ পর্যন্ত এ-ও চোখ চেয়ে দেখতে হবে। অদেষ্ট, সব অদেষ্ট।

প্রধান। এই, তা যদি না হবে তো দ্যাখো জমিজমাই বা খোয়াতে যাব কেন আমি, আর আজ পথে নেমেই বা দাঁড়াতে হবে কেন আমায়? অদেষ্ট ছাড়া আর কী?

কুঞ্জ। নাও মিথ্যেমিথ্যি আর অদেষ্টর দোহাই পেড়ো না, হ্যাঁঃ। নিজে ইচ্ছে করে আগুনে হাত

দেবে, আর পুড়ে গেলে বলবে যে অদেষ্টর জন্যে এই দুর্ভোগ হল। .... তোমাদের এই ধরনের কথাবার্তার, সত্যি বলছি দয়ালদা, আমি কোনো মানে বুঝতে পারিনে, কোনো মানে বুঝতে পারিনে। তোমরা সব—

[ঝড়ের বেগে মাখনের প্রবেশ]

মাখন। তোমরা সব চালার ওপর ওঠো, চালার ওপর ওঠো! সাত-আট হাত উঁচু হয়ে বান আসছে, ভীষণ বান, হই—ই—ই—ঃ।

নেপথ্যে বানের ডাক—সোঁ সোঁ

কুঞ্জ। তাই তো! [মাখনের ঘরে প্রস্থান]

দয়াল। আমি চলি প্রধান তা হলে। সকালবেলার থেকেই আজ কেমন যেন ঘোর ঘোর ভাব, গরম গরম হাওয়া দিচ্ছিল কাল রাত থেকে। কী ব্যাপার!

বাতাসের দমকা ঝাপটা

আরে ব্বাসরে! [দয়ালের প্রস্থান]

কুঞ্জ। আরে বসে যাও দয়ালদা, এর ভেতর বেরিয়ো না।

[বাতাসের ঝাপটা]

এ যেন একেবারে ফেলে দিতে চায়!

নেপথ্যে একটা বড়ো গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ, মড় মড় মড়াৎ। প্রধান দাওয়ার ওপর থেকে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। চোখের ওপরে হাত দিয়ে দুরে বান লক্ষ্য করতে থাকে । চুলগুলো তার সব যেন নাচতে শুরু করে দিয়েছে মাথায়। কাঁচা পাতা, পল্লব, ডাল, সব ছিঁড়ে এসে পড়ে উঠোনে। দোচালাখানা নড়তে থাকে ঘন ঘন—যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে আর কী। বান আর ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে অব্যাহত—সাই-শোঁ-সন্। আলোটা অস্পষ্ট। একটু পরেই ওঠে হাহাকার আর আর্তকণ্ঠের উপায়বিহীন আক্ষেপ। কেউ হয় তো চাপা পড়েছে, কেউ হয়তো চাপা পড়ে বেরোতে পারছে না। সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকেও যেন সেই আক্ষেপ ঝড়ের গলা ধরে এসে প্রধানের দোচালার ওপর আছড়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে দোচালাখানা ভেঙে পড়ে প্রধানের।

প্রধান। (ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মাঝখানে উন্মত্ততায়) কুঞ্জ, মাখন, (চোখ-মুখের ওপর থেকে বৃষ্টির ছাঁট মুছে) এই যে এদিকে, মাখন! কুঞ্জ! মাখন!

[হন্তদন্ত হয়ে মাখনের প্রবেশ]

মাখন। এই যে দাদু। আমি, আমি এখানে।—বাবা কোথায়, বাবা? বাবা!

[রাধিকার প্রবেশ]

রাধিকা। (ছুটে এসে) মাখন! মাখন! মাখন কই! মাখন!

মাখন। এই যে আমি এই যে এখানে।

রাধিকা। কই, কোথায়! (মাখনকে জড়িয়ে ধরে) বাপ আমার!

প্রধান। কুঞ্জ কোথায়! কুঞ্জ!

কুঞ্জ। (চাপা গলায়) এই যে! এখানে। মাখন!

প্রধান। কোথায়! কুঞ্জ! মাখন! কোথায় তোর বাপ!

মাখন। এই যে দাদু! দাদু! উঁচু করে ধরো চালাটা, দাদু বেরোতে পাচ্ছে না ; ধরো তুলে ধরো!
(প্রধান ছুটে গিয়ে চালাটা উঁচু করে ধরে। রাধিকা কুঞ্জকে বেরিয়ে আসতে সাহায্যে করে।)

রাধিকা। লাগেনি তো কোথাও?

কুঞ্জ। না। মাখন কই! এই যে!

প্রধান। ঠিক আছে তো আর সবাই।

রাধিকা। (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) বিনো কোথায়?

কুঞ্জ। সে কী, দ্যাখো, দ্যাখো শীগ্‌গির। ওর নিচে চাপা পড়েনি তো? কী—ি—ি—ি।

মাখন। এই যে এখানে। বাবা।

(সকলে বিনোদিনীর দিকে এগিয়ে যায়। বিনোদিনী অচৈতন্য।
রাধিকা বিনোদিনীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।)

রাধিকা। ও মা, তোমার সব দ্যাখো গো ও বিনো, বিনো—
(কুঞ্জ, রাধিকা ও মাখন বিনোদিনীকে ধরাধরি করে সামনের ফাঁকা জায়গায় এনে শুইয়ে দেয়।)

কুঞ্জ। (বিনোদিনীর চোখ টেনে) চোখে লেগেছে বোধ হয় খুব জোর।

রাধিকা। বি নো। অ বি নো—

[বিনোদিনী ক্ষীণ আর্তনাদ করে ওঠে।]

প্রধান। বেঁচে আছে তো রে কুঞ্জ।

কুঞ্জ। আ—া হা—াঃ, থামো তো তুমি।

রাধিকা। (বিনোদিনীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) যত সব অলক্ষুণে কথাবার্তা। ও বিনো, বিনো। এখন এট্টু! — কী! — কোথায় লেগেছে?

কুঞ্জ। থাক্, উদ্ব্যস্ত করো না। থাক ঐ রকম।

[নেপথ্যে আর্তের হাহাকার।]

প্রধান। থাকবার মধ্যে ঘরখানাই ছিল, গেল। গেল! পথে নেমে দাঁড়াবারও তর সইল না রে কুঞ্জ, পথই ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল। ও কুঞ্জ তোর কথাই সত্যি, তোর কথাই সত্যি হল। প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে,—প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে। কুঞ্জ—তুই যে বলেছিলি—

নেপথ্যে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ ...... কুঞ্জ! .... কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (কোঁচড়ের চাল হাতে নিয়ে) এই যে কুঞ্জ, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) দয়ালদা! দয়ালদা!!

দয়াল! (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.... সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

(ঝড়ের শব্দ—সাঁই-সং)

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ দৃশ্য

জীর্ণ-গৃহ পরিবেশ। খসে খসে পড়েছে চালা। কোনো কোনো জায়গায় খড়টুকুও নেই, শুধু বাখারির কংকাল দেখা যাচ্ছে। পরিবারের প্রত্যেকটা লোকের চোখে মুখে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। উঠোনে বিনোদিনী উনুনের ধারে বসে কী যেন একটা সেদ্ধ করছে হাঁড়িতে আর জ্বাল ঠেলছে। দাওয়ার ওপর বসে আছে রুগ্ণ মাখন।

বিনোদিনী। (উনুনের মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে গিয়ে চোখে মুখে ধোঁয়া খেয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘুরে বসে) বাব্বা, এ কাঁচা পাতা কি ছাই জ্বলে? ধোঁয়া খেতে খেতে প্রাণ গেল। নাঃ, বসা যায় না!

মাখন। তা সে ওখানে বসে ধোঁয়া খেয়ে মরছ ক্যানো? মোটা একটা ডাল লাগিয়ে দিয়ে দাওয়ার ওপরে এসে বসো দিকিন্! সেদ্ধ হচ্ছে তো ভারি জগডুমুর—গরুতেও খায় না! সরে এসো একখানা ডাল লাগিয়ে দিয়ে! যে না আমার রান্না!

বিনো। নে, বসে বসে তুই আর সব সময় ফোঁপরদালালি করিস নে তো মাখন। চুপ করে থাক। এই রান্নারই বলে দাম দেয় কে, তার আবার—

মাখন। নিত্যি, ঐ এক ডুমুরের কলা সেদ্ধ, আর কচুর নতির ঝোল ও আজ আমি কিছুতেই খাব না।—

বিনো। ওঃ, না খাস তো আমার ভারি বয়েই গেল। আনলেই পারিস ভালোমন্দ দেব্য খুঁজে পেতে।

(জীর্ণ বসনে এক-পা কাদা নিয়ে প্রধানের প্রবেশ কোঁচড়ে একগাদা খুদে কাঁকড়া)

প্রধান। (হেসে) ভালোমন্দ দেব্য খুঁজে পেতে আনা কি সহজ কথা? (কোঁচড়ের কাঁকড়া নেড়ে) এই কটা তাই কত করে, —দেখি এট্টা পাত্তর টাওর—না, তাই বা আবার পাবো কোথায়।—এই কোনো এট্টা কিছু, ঢেলে দেব।

[বিনোদিনী প্রস্থানোদ্যত]

—যা হয় এট্টা নিয়ে এসো খপ্ করে।—ওঃ, গা-হাত-পা একেবারে চুলকে মলাম। পচা কাদা!

[বিনোদিনীর প্রস্থান]

মাখন। ধরলে কোত্থেকে, অনেকগুলো তো! সে দিনকারগুলো ছিল ছোট্ট ছোট্ট। আজকেরগুলো বেশ ডাগর ডাগর।

প্রধান। (হেসে) বড় হয়ে উঠেছে সব। জলেও টান ধরেছে, আর সব এখন খাল খন্দর ভেতরে গিয়ে সিঁদুচ্ছে। ধরা কি সহজ কথা?.....

[ভাঙা একটা চুবড়ি নিয়ে বিনোদিনীর প্রবেশ]

এনেছ, রাখো। (হাসতে হাসতে) নুন লঙ্কা দিয়ে খুব খটমটে করে ভেজে নিয়ে....মাখনরে দিয়ো যেন বৌমা দুটো খানি।

[কুঞ্জর প্রবেশ]

কুঞ্জ। মাখনরে আবার কী দেবে?..... কিচ্ছু দিয়ো না ওরে খেতে টেতে। জিতেনবাবু বারণ করে গেছেন পই পই করে।

মাখন। খাব তো না, এমনি এট্টুখানি চেখে দেখব।

কুঞ্জ। ওঃ, সুখ খায় গুড় দিয়ে মুড়ি। আর চোখে দ্যাখে না। চোখে দেখব! জিনিসটা কী শুনি?

মাখন। ক্যাঁকড়া।

কুঞ্জ। য়্যাঁ, ক্যাঁকড়া! ক্যাঁকড়া খাবি তুই?..... খবরদার ও যেন ক্যাঁকড়া ফ্যাঁকড়া না খায়। হ্যাঁ, এই বলে দিলাম সবাইকে।

প্রধান। তো শাসাচ্ছিস কারে তুই তাই বলে, য়্যাঁ! আ গেল যা। তিরিক্ষে হয়েই আছে মেজাজ দেখি সব সময়।

[এক বোঝা শাক পাতা নিয়ে রাধিকার প্রবেশ]

কুঞ্জ। (ক্ষোভে ও দুঃখে) ও, মেজাজ দেখলে! এর ভেতরও মেজাজ দেখলে? আমি বলে সারাটা দুপুর এই রোদ্দুরের ভেতরে পাতি পাতি করে সন্ধান করে জোগাড় করে নিয়ে এলাম

কাওনের চাল কটা, ডাক্তার বলে গেছে, আর এসে শুনি যে ছেলে আমার ক্যাঁকড়া খাবার জন্যে ব্যাগ ধরেছেন। তোর অপত্য স্নেহের নিকুচি করেছে......(গামছা থেকে কাওনের চালগুলো ছড়িয়ে দেয়) যাগ্‌গে, দরকার নেই কাওনের চালের, যাগ্‌গে।

রাধি। তা এত কষ্ট করে না আনলেই পারতে। এনে আবার ছড়িয়ে নষ্ট করার দরকার ছিল কী?

কুঞ্জ। (দুঃখে) আমার সব কষ্টের মূল্য তো চিরকালই এই রকম। এর বেশি আর কবে কোন দিন পেয়েছি?

[রাধি করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে]

প্রধান। (উঠে গিয়ে) দে, দেখেছ কাণ্ডবাণ্ড, দেখেছ? (হাত দিয়ে চালগুলো সাপটে) সারাটি দিন এই কষ্টের কষ্ট করে কাওনের চাল কটা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে এল, কী না কী বলেছি— অমনি দিলে তারে ছড়িয়ে মাড়িয়ে—

কুঞ্জ। কষ্ট যা তা তো হয়েছে আমার। তার জন্যে তো আর কাউকে আফ্‌শোস করতে হবে না।

প্রধান। (চাল সাপটাতে সাপটাতে) তাই যদি বুঝবি তুই তবে আর আমার দুঃখুটা কিসের?

কুঞ্জ। থাক, আর নাকি-কান্না কাঁদতে হবে না তোমার। .... যথেষ্ট হয়েছে। কত ছলনাই জানো?

প্রধান। (স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চেয়ে থাকে) কী, কী বললি তুই কুঞ্জ! ছলনা! নাকি-কান্না! আমার সহানুভূতি মিথ্যে তোর কাছে? অপমান করলি তুই আমারে! আমারে অপমান করলি তুই!! তুই আমারে অপমান করলি—

[কেঁদে ফেলে]

কুঞ্জ। আমার হয়েছে মহা জ্বালা। বুঝলে, মহা জ্বালা। অপমান আবার তোমারে করলাম কখন?

প্রধান। অপমান নয়? এর চাইতে আর কী-ভাবে তুই আমারে অপমান করতে চাস? কী-ভাবে আর অপমান করতে চাস্? তোর কাছে আমার দুঃখ, সহানুভূতি সব মিথ্যে, ছলনা! তার চাইতে তুই আমার মাথায় তুলে—

(সামনের একখানা কাঠ দিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করে বসে।
রাধিকা, মাখন চেঁচিয়ে ওঠে!)

কুঞ্জ। (ছুটে গিয়ে হাতখানা চেপে ধরে) কী হচ্ছে কী এ সব? জেঠা কী কর?

প্রধান। (ক্ষোভের সুরে) তুই আমারে খুন করে ফেল কুঞ্জ। আমার সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়ে যাক। আমার সব জ্বালা যন্ত্রণার—

[চাপা আর্তনাদ করতে থাকে]

কুঞ্জ। (কাঠ ফেলে দিয়ে) ছি ছি ছি ছি ছি ছি। রাগের মাথায় কী না কী বলেছি, অমনি—

নাঃ একেবারে ছেলেমানুষ, হচ্ছ তুমি দিন-কে-দিন।—কথার ভেতরে তো বলেছি যে অসুখে ভুগছে, আর তারপর ডাক্তারও বারণ করে গেছে, ক্যাঁকড়া ফ্যাঁকড়া যেন না দেওয়া হয় ওরে, তাতে করে এই অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধিয়ে বসবার কী দরকার ছিল? ছি ছি ছি ছি।

প্রধান। অসুখ! বলি অসুখটা কী রে ওর, য়্যাঁ—

কুঞ্জ। হাত-পা ফুলে গেছে, চোখ হলদে পানা, অসুখ না?

প্রধান। বুঝলাম, সব বুঝলাম। কিন্তু অসুখটা কি খাওয়ার জন্যে, না না-খাওয়ার জন্যে, সেই কথাটা জিজ্ঞেস করি।

[কুঞ্জ নিরুত্তর]

রাধি। আজ মাসখানেক হল ও তো একরকম না-খাওয়ার ওপরেই আছে। কী খায় ও?

কুঞ্জ। তা অসুখ হলে মানুষ আবার খায় কী?

প্রধান। অসুখ! অসুখ! হেঃ, অসুখ! কুঞ্জ, আমি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারব না, যে শুধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। শুব্ধু না খেতে পেয়ে ...

কুঞ্জ। না না, ওর ভীষণ অসুখ! ডাক্তার বলে গেছে জেঠা ওর ভয়ানক অসুখ। জেঠা তুমি জানো না ওর ....

মাখন। আমার খিদে। আমি খাব। আমায় খেতে দে। আমি খাব।

প্রধান। আমি ভুলতে পারবো, আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না যে শুব্ধু না খেতে পেয়ে ।

কুঞ্জ। জেঠা, ওর অসুখ। তুমি ভুল করছ ভেঠো, ওর ভয়ানক অসুখ। ডাক্তার বলছে ওর ভয়ানক অসুখ।

প্রধান। আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না। ডাক্তার যাই বলুক আমি ভুলব না, আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না—

কুঞ্জ। তুমি বুঝতে পারছ না জেঠা ওর ভয়ানক অসুখ—

প্রধান। আমি ভুলব না যে শুব্ধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা মরে গেল।—আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না—

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম দৃশ্য

(ঐ একই পরিবেশ। মহামড়কে উজাড় হয়ে যাচ্ছে সৃষ্টি। নেপথ্যে চলেছে 'বল হরি হরি-বোল' আর 'মাগো মাগো'—ধ্বনির বিরামহীন আবহ, আর্ত কণ্ঠধ্বনি। রাধিকার অসুখ। রুক্ষ এলোচুলে সে বসে আছে দাওয়ার ওপর অসুস্থ মাখনের শিয়রে। আর বিনোদিনী ঝাঁটা দিয়ে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে।)

বিনোদিনী। (ঝাঁটা হাতে সামনে ঝুঁকে পড়ে রাধিকাকে) আর এই ধ্বনির যেন বিরাম নেই। কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল দিবানিশি। উঃ, কি লোকটাই না মরছে!

রাধি। দেখছ কী, কিছু কি থাকল! হুঃ, উজোড় হয়ে গেল গাঁ। উত্তর পাড়ায় তো সে একেবারে, থাক আর না করব না, একেবারে ছেয়ে গেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, এক বিন্দু জল যে গালে দেবে তার পর্যন্ত কেউ নেই।—কী যে হবে সব!—এমন আকালও দেখিনি এমন মৃত্যুও দেখিনি কোনো দিন।

বিনো। (বসে পড়ে, রাধিকার প্রতি) এই রকম আকাল পড়িছিল নাকি আর একবার। অবিশ্যি, আমরা কেউই দেখিনি, মায়ের মুখ থেকে শোনা কথা বলছি। তা তিনিও আবার নিজের চোখে দেখেননি, ভাব ঠাকুরমার থেকে শুনেছেন। দিদি জানো?

রাধি। ন্-ও আ।

বিনো। (উঠে দাঁড়িয়ে) সে নাকি এর চাইতেও ভীষণ।

ঝাঁট দিতে আরম্ভ করে। রাধিকা মৃদু একটা মুখ ঝাপটা দিয়ে ঘাড় বাঁকায়।

নেপথ্যে হারু দত্তের গলা খাঁকারির আওয়াজ।

হারু দত্ত। (নেপথ্যে) ই-য়ে প্রধান?

[হারু দত্তের প্রবেশ]

—ই-য়ে গে, প্রধান আছো?

(হারু দত্তকে দেখে বিনোদিনী ঘোমটা টেনে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। রাধিকাও হারু দত্তের অলক্ষ্যে মাথায় কাপড় তুলে দিল)

রাধি। বাড়ি নেই কো।

হারু দত্ত। আরে এই যে মাখনের মা, তা প্রধান যে আমারে বলে এলে—

রাধি। (দাওয়ার ওপর একটা বস্তা পেতে দিয়ে) হ্যাঁ, বসতে বলে গেছে।

হারু দত্ত। বসতে বলে গেছে?

রাধি। হ্যাঁ, বললে বলে এই যাব আর আসব। এলে পরে বসতে দিয়ো।

হারু দত্ত। তা ফিরবে তো তাড়াতাড়ি, না কী?

রাধি। বলে তো গেছে।

হারু দত্ত। (বসতে বসতে) বসতে বলে বেরিয়ে গেল, উঁ.... তা ও শুয়ে কেডা?

রাধি। ঐ তো মাখন। আজ কদিন হয়ে গেল, এ ছেলের হাঁ না কোনো বাক্যি নেই মুখে। চোখ মুখ সব ফুলে পড়েছে। কী যে অদৃষ্টে আছে!

হারু দত্ত। উঁ—তা তোমারও কি অসুখ নাকি? বড্ড শুকনো শুকনো মন মনে হচ্ছে যেন।

রাধি। (মাথায় হাত দিয়ে) অসুখ, আজ কদিন হল একেজ্বরি হয়ে আছি। এ জ্বরের কিছুতেই বিরাম নেই।

হারু দত্ত। উঁ, তা ওযুধ-পত্তর খাচ্ছ?

রাধি। (নাকি সুরে) ওযুধ কোথায় পাব বাবা? সামান্য এট্টু পত্যি তাই বলে.....

হারু দত্ত। নিমছাল, নিমছাল। ওযুধ বলতে কি আমি আর অন্য কিছু বলছি, হেঃ। নিমছাল। বেশ করে ধুয়ে এট্টা হাঁড়ি করে না—সে তুমি আবার তা ঠিক পারবে না। কতকগুলো প্রক্রিয়া আছে। তা এখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দিলেই পারো কাউকে এট্টা শিশি দিয়ে।

রাধি। (বিনোদিনীর প্রতি) তা দাঁড়িয়ে রইলি কেন ঠায় পেছন ফিরে? বাবাঠাকুরের কাছে তোর আবার লজ্জা কিসের এত! আয় বোস!

হারু দত্ত। (হেসে) কেডা ও, নিরঞ্জনের বউ না? আরে দ্যাখো দ্যাখো কাণ্ড দ্যাখো। আমি ভাবলাম বলি আর কেউ বা হবে। আচ্ছা বল মাখনের মা, পথে ঘাটে চলতে ফিরতে আমার বাড়ি তোমার বাড়ি দু-বার ছেড়ে অমন দশবার করে দেখা হচ্ছে রোজ বউমার সঙ্গে, তবু এত লজ্জা! হেঃ হেঃ লজ্জা, তা ভালো, লজ্জা ভালো! বউ মানুষ কি না! তা ভালো।

রাধি। (বিনোদিনীর প্রতি কটাক্ষ করে) ঐ তো ভাবই ঐ রকম। অথচ আপনি দেখেননি (বিনোদিনীর দিকে ভেংচি কেটে দত্তের দিকে এমন মুখ করল যে বিনোদিনী কতই মুখরা) তা দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানো তল্লা বাঁশের মতো, বোস্ এখানে এসে। বাবাবাঠাকুর যে তোর বাপপিতেম'র সমতুল্য।

(চোখ দুটো মুহূর্তে চকচক করে জ্বলে ওঠে বিনোদিনীর। একটু ইতস্তত করে বিনোদিনীর দ্রুত প্রস্থান)

রাধি। (বিনোদিনীর প্রতি শ্লেষের ভঙ্গিতে দত্তকে) দেখলেন তো?

হারু দত্ত। হেঃ হেঃ ছেলেমানুষ কিনা!—তা দিয়ো যেন পাঠিয়ে এট্টা শিশি দিয়ে। একেজ্বরি হয়ে থাকা ভালো কথা না। দিনকাল বড়ো খারাপ, বড়ো খারাপ। এমনিই দেখছ তো সব চারদিকে—

রাধি। তা আর দেখছি নে! ভয়ে বলে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

হারু দত্ত। (চোখ কপালে তুলে) উঁ—

[প্রধানের প্রবেশ]

এই যে এয়েছো।

প্রধান। (একটু ঘাবড়ে গিয়ে) এই এট্টু দেরি হয়ে গেল. আর—তা এয়েছেন কতক্ষণ?

হারু দত্ত। তা-া অনেকক্ষণ হল। বসে আছি তোমার জন্যে।

প্রধান। (মাথা চুলকে) দেখুন দিনি। বসতে বলে গিছলাম কিন্তু।

হারু দত্ত। হ্যাঁ, তা শুনেছি। .... তারপর? কী ঠিক করলে?

প্রধান। ঠিক মানে .... বলব বা কী!

হারু দত্ত। ঠিক মানে....বলব বা কী!

হারু দত্ত। সে আবার কী। তা (হাত তুলে) বলি বিক্রি তো করবে, না কি! মনোগত অভিপ্রায়টা কী তাই খুলে বল। জোর করে তো আর আমি তোমারে জমি বেচে ফেলতে বলছি নে!

প্রধান। তো রন্ এট্টু বসুন, কুঞ্জ আসুক।

হারু দত্ত। কুঞ্জ আসবে!

প্রধান। হ্যাঁ, এই এল বলে।

হারু দত্ত। তা কুঞ্জরে দিয়ে আমি কী করব? তার সঙ্গে আমার তো কোনো দরকার নেই। আর আলাপ আলোচনা, আগে কি এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে তোমার কোনো কথাবার্তাই হয়নি?

প্রধান। কথাবার্তা—আর কী বা এমন বিশেষ, তবে হ্যাঁ বলিছি।

হারু দত্ত। বলেছ?

প্রধান। হ্যাঁ বললাম বলি জমি-জায়গা যখন—

হারু দত্ত। তা যাগ্‌গে সে তুমি বোঝোগে ; আমি আর সে কথা শুনে কী করব? তা.... কুঞ্জ কী বল্লে?

প্রধান। বললে .....

হারু দত্ত। বলো. বলো।

প্রধান। কুঞ্জ তো বারণ করে ; বলে যে না থাক দরকার নেই জমি বেচে ও দরে।

হারু দত্ত। বারণ করে, উ—উ—উ, তা তুমি কী বল?

প্রধান। আ—মি বলি, এখন কথা কী জানেন—

হারু দত্ত। দ্যাখো প্রধান, এট্টা কথা বলি। কারবার তোমার সঙ্গে আমি এই নতুন করছি নে। আর তুমিও তো জান আমারে না কী? এই যে মগরার বিলের জমি বিক্রি করলে সেদিন, হিসেব করে দ্যাখো, আর পাঁচজনই বা ঐরকম জমির কী দর দিয়েছে, আর আমিই বা তোমারে কী দর দিইছি! যাচাই করে দ্যাখো! আর এই যে কিনছি আমি, বলতে গেলে এ তো আমার একরকম লোকসান। মরলোক তো আর কিছুই আমার হাতে আসছে না। বলবে আবাদি জমি, কিন্তু এখন তো অনাবাদি-ই হয়ে রইল। হাল তো আর আমি ধরতে যাচ্ছি নে জমিতে! থাকল পড়ে এখন ঐ অবস্থায়! মাঝখান থেকে খামখা কতকগুলো টাকা আমার গাঁটগচ্চা চলে গেল। তো এর ওপর আমারে আর কত লোকসান দিতে বল তুমি?—এই যে সব সাহায্যের কথা শুনি, চাল দিচ্চে, ডাল দিচ্ছে, খিঁচুড়ি খাওয়াচ্ছে, বস্তুর দিচ্ছে সব ভদ্দরলোকেরা, সত্যি কথা বলতে গেলে এ-ও তো আমার একরকম সাহায্য ; মাটির বদলে টাকা দিচ্ছি। কী দাম আছে মাটির আজ বল তো? অবিশ্যি হ্যাঁ, ছাগল তোমার, এখন সে তুমি মাথার দিকেই কাটো, ন্যাজের দিকেই কাটো, আমি বলতে

যাব না। তবে ঐ, ওর বেশি আর আমি এখন এক আধলাও দিতে পারব না। অসম্ভব এট্টা কথা বললেই তো আর হয় না।

[কুঞ্জর প্রবেশ। মাথায় এক বোঝা ঘাস]

এই যে কুঞ্জ এয়েছো—তা ও ঘাস আনলে কোত্থেকে?

কুঞ্জ। এই পাঁচ জায়গা ঘুরে ঘুরে।

হারু দত্ত। উঁহু, এ যেন আমার ঢোলকলমি জলার ঘাস বলে মনে হচ্ছে! তা সে যা করছ করেছ, আর কেটো না। ঘাসের আজকাল বড্ড দর।

কুঞ্জ। না, এই তো দুগাছা নিইছি।

হারু দত্ত। তা সে ঐ দুগাছার দামই অতি কম এখন আটগণ্ডা পয়সা। আর কেটো না।—তা হলে আমাদের এদিকে কী হল প্রধান? কবালা করছ কবে তাই বলো। কাল সময় হয় না তোমার?

কুঞ্জ। (দত্তের দিকে কটাক্ষ করে) কিসের কবালা, ও জমি বিক্রি নেই।

হারু দত্ত। (হেসে) দ্যাখো দ্যাখো কী বলে পাগল। তা সে ঘাস জমি আমি তোরে দেবখন। জমিতে ঘাস ছাড়া এখন আর কী জন্মায় রে আহাম্মক? হেঃ, নিসকোন্ তুই ঘাস।

কুঞ্জ। না তা সে আপনি যাই বলুন, ও জমি বিক্রি নেই।

হারু দত্ত। বলি হ্যাঁ রে, জমি ধুয়ে খেয়ে কি পেট ভরবে, য়্যাঁ? য়্যাঁ-হ্যা—হ্যা—হ্যা জমি বিক্রি নেই।

কুঞ্জ। না, তা সে বললে কী হবে—

হারু দত্ত। (হেসে) তুই চুপ কর। ছেলেমানুষ তুই, জমির কী বুঝিস, রে।—তা হলে প্রধান ঐ কথাই থাকল, কী বল?

কুঞ্জ। তা ও জেঠা কী বলবে? বলছি বলি জমি বেচব না, তা আপনি সে একেবারে জোঁকের মতো লেগে আছেন সদাসর্বদা জেঠার পেছনে। ও জমি বিক্রি হবে না।

হারু দত্ত। হেঃ, হেঃ, হেঃ, তোমার ভাইপোটি, বুঝলে প্রধান, একেবারে মাথা খারাপ ; কোনো দিকে হুঁস নেই। —এই তো শুনলাম আজ কদিন থেকে ভুগছে অসুখে মাখনের মা। কেন, দু'পা এগিয়ে গিয়ে (কুঞ্জের প্রতি) আমার জ্বরঘ্ন পাঁচনটা নিয়ে আসতে তোমার কী হয়, কী হয়? যাবি বুঝলি, নয় তো আর কাউকে পাঠিয়ে দিস্ বলে গেলাম।

কুঞ্জ। অসুখ অনাহার, তা ওষুধ দিয়ে কী হবে?

হারু দত্ত। অসুখ অনাহার। হেঃ হেঃ, তোমার ভাইপোটি বুঝলে প্রধান, বড্ড রসিক তো! ভালো ভালো কথা বলে বেশ কুঞ্জ!.... তা হলে ঐ কথাই থাকল প্রধান।

[প্রস্থানোদ্যত]

প্রধান। না, থাক জমিটুকু বাবা, থাক। আর সবই তো গেছে, জমিটুকু আর বেচব না।

হারু দত্ত। আচ্ছা তো নিয়ো'খন পুরিয়েই।

প্রধান। না থাক্।

হারু দত্ত। আবার কী থাক্, পুরিয়েই নিয়ো’খন।

প্রধান। কুঞ্জ!

কুঞ্জ। টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।

প্রধান। তাই বলব—না, ও বেচব না বাবা থাক্।

হারু দত্ত। বেচব না!—কথার খেলাপ করো না হে প্রধান.....কথার খেলাপ করো না।

কুঞ্জ। বলি খেলাপের কথা ওঠে কিসে, হ্যাঁ গো মশায়? ওঠে কিসে খেলাপের কথা? দুঃস্থ অভাজনের ওপর অনাহক এরে বলে কী অত্যাচার। জমি যার সে বলছে বিক্রি করব না ; আর উনি শুধু বলছেন কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে।

প্রধান। (কুঞ্জকে বাধা দিয়ে) আ-হ-া, তুই চুপ কর, দিনি কুঞ্জ।

কুঞ্জ। (চেঁচিয়ে) কেন চুপ করার কী হয়েছে? চুপ করবে! এই চুপ করে থাকতে থাকতে একেবারে বোবা হয়ে যাবে, বোবা হয়ে যাবে এই বলে দিলাম, হ্যাঁ।

প্রধান। তা সে যাই যাব, তুই চুবো।

কুঞ্জ। কেন, কিসের জন্য। গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে, —চেঁচাও,—অন্তত আর পাঁচ জন মানুষ জানুক।

প্রধান। আ-হা-া, তুই চুপ করে দিনি কুঞ্জ।

কুঞ্জ। চুপ করবে!

হারু দত্ত। কথার যে বড় পাঁয়তাড়া দেখি, উঁ?

কুঞ্জ। তবে, এখনও ভয় করে চলতে হবে। এখনও ভয়?

হারু দত্ত। উঁ, তা সে আমারে ভয় না করে—

[ওপরে হাত তোলে]

কুঞ্জ। জানি, জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে ; ওতে আর ভয় করি নে।

হারু দত্ত। উঁ, সোজা শিরদাঁড়টা তা হলে এইবার তো দেখি এট্টুখানি বেঁকিয়ে দিতে হয় ; বেটা ছোটলোকের এত বড়ো আস্পর্ধা!

কুঞ্জ। এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।

[হারু দত্তের ছোট মেয়ে মাতির বেগে প্রবেশ]

হারু দত্ত। (মেয়েকে সামলে) ছোটলোক গালাগালি হল? বেটা হারামজাদার কথা শোনো ছোটলোক গালাগালি হল?

কুঞ্জ। এই মুখ সামলে কথা বলো কিন্তুক।

হারু দত্ত। দে-দ্যাখো একবার—

মাতি। (আর্তকণ্ঠে) বাবা!

হারু দত্ত। যা তো মাতি, ডেকে নিয়ে আয় তো তোর মামারে, আর চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে যারা যারা আছে। যা—

[মাতির দ্রুত প্রস্থান]

প্রধান। তা আপনি যান বাবা! এক তো জমি, তা সে আমি বিক্রি করব না ফুরিয়ে গেল!

হারু দত্ত। না অত সহজে ফুরিয়ে যায় না, অত সহজে ফুরিয়ে যেতে দেব না।

প্রধান। খামখা কথা বাড়াচ্ছেন বাবু আপনি?

হারু দত্ত। কথা বাড়াচ্ছি আমি, উঁু, বুড়ো হলেও তুমি তো দেখেছি একটি কম খচ্চর নও প্রধান।

কুঞ্জ। (আস্ফালন করে) হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—

কুঞ্জর বেগে প্রস্থান। মঞ্চের অপর দিক থেকে লাঠিসহ দু তিনজন বলিষ্ঠ লোকের প্রবেশ

হারু দত্ত। দে তো রে আচ্ছা করে ঘা দু-চ্চার

(লাঠি হাতে কুঞ্জর বেগে প্রবেশ। কুঞ্জর লাঠির ওপর লাঠির ঘা পড়ে। মাথায় ঘা খেয়ে কুঞ্জ মাটিতে বসে পড়ে। একজন প্রধানকে আগলে রাখে)

১ম ব্যক্তি। (কুঞ্জের প্রতি) শালা না খেয়ে মরতে বসেছ, এখনও তেলানি গেল না!

২য় ব্যক্তি। এই পায়ে ধরে মাফ চা। চা মাফ!

(কুঞ্জ বুকে হেঁটে হারু দত্তের পা ধরবার জন্যে এগিয়ে যায়।
হারু দত্ত দু-পা পিছিয়ে দাঁতে পিচ কাটে)

হারু দত্ত। পায়ে হাত দিস নে, পায়ে হাত দিস নে, য়্যাঁ ঃ।

(বিনোদিনীর প্রবেশ। বারান্দার ওপর অসুস্থ মাখন উত্তেজনায় উঠতে গিয়ে ঘুরে পড়ে যায়।
রাধিকা ও বিনোদিনী আর্তকণ্ঠে চেঁচাতে থাকে।)

হারু দত্ত। (কুঞ্জের মুখের ওপর লাঠি ঠুকে) বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যে—। (লাঠি ঠুকে) কেন, কার সঙ্গে কী কথা বলিস্ ঠিক থাকে না? উঁ, মনে থাকে না?

[অপমানাহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশুর মত]

প্রধান। মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।

২য় ব্যক্তি। এই ওপ্। (লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে)

(কুঞ্জর কান্না আরও জোরালো হয়ে ওঠে। রুগণ মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

রাধি। হায় হায় হায় হায়, আমার সব গেল গো, সব গেল। ও মাখন, মাখন—

প্রধান। (বিনোদিনীর প্রতি) এট্টু, জল, জল আন। জল—

রাধিকা। ও মাখন, মাখন রে—

[আর্তকণ্ঠে মাখন গাঁইগুঁই শব্দ করতে থাকে]

প্রধান। মাখন, মাখন রে ে - ে -ঃ, —কুঞ্জ দ্যাখ, মাখনরে একবার তুই দ্যাখ।

(রাধিকা কেঁদে ফেটে পড়ে। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখমুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।)

কুঞ্জ। (মুখ তুলে মাখনের দিকে) য়াঁ, মাখন, মাখন...

প্রধান। মাখন চলে গেলি!

(পটক্ষেপ)

৪৭.৮ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ প্রথম অঙ্ক)

'নবান্ন' নাটকটি চার অঙ্কে পনের দৃশ্য নিয়ে পরিকল্পিত হলেও অভিনয় কালে ১৪টি দৃশ্য ব্যবস্থা করা হোত। মূল নাটক প্রথম প্রকাশকালের পাঠ (অরণি), এর সঙ্গে সম্পাদিত অভিনয় কপি (Prompter কপি) ও মুদ্রিত বইয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। এ সম্পর্কে শ্রীসুধী প্রধান নানা প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য ও প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। তা সত্ত্বেও কাহিনীর তেমন কোন হেরফের হয়নি।

নাটকের ঘটনাস্থল আমিনপুর গ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাটি সামলিয়ে গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত মানুষ একটু আত্মস্থ হয়েছে যেই, অমনি নেমে আসে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সর্বগ্রাসী বন্যার তাণ্ডবে আর দুর্দান্ত ঝোড়ো হাওয়ায় গৃহস্থের মাথার উপরের চালটা যায় পড়ে। আমিনপুরের পায়ের নিচের শক্ত মাটিটা যায় সরে।—'থাকবার মধ্যে ঘরখানাই ছিল, গেল। গেল! পথে নেমে দাঁড়াবারও তর সইল না রে কুঞ্জ, পথই ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল। ও কুঞ্জ তোর কথাই সত্যি, তোর কথাই সত্যি হ'ল। প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে, —প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে। কুঞ্জ—তুই যে বলেছিলি—

[প্রধান ঃ প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

সমস্ত আমিনপুর সর্বনাশা বন্যার কবলে চলে গেছে। ভেসে গেছে ঘর বাড়ি, মানুষজন, —'প্রধান, সমুদ্দুর, চারিদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল....সমুদ্দুর উঠে এয়েচে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

[দয়াল ঃ প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

গোটা আমিনপুরের জীবনের শতরঞ্চিটা ছিড়ে শতছিন্ন হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্দশার একচ্ছত্র রাজত্ব হয়ে গেছে আমিনপুর।—জীর্ণ গৃহ-পরিবেশ। খসে খসে পড়ছে চালা। কোনো কোনো জায়গায়

খড়টুকুও নেই, শুধু বাখারির কংকালটুকু দেখা যাচ্ছে। পরিবারের প্রত্যেকটা লোকের চোখে মুখে দারিদ্রের ছাপ সুস্পষ্ট।'

[দৃশ্য বর্ণনা, প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]

আমিনপুরের গ্রামে এই দুর্দশাগ্রস্থ প্রধান সমাদ্দারের পরিবার বন্যার কবলে পড়ে যখন ধুঁকছিল, তবুও পড়েছিল আমিনপুরের মাটি কামড়িয়ে। কিন্তু গ্রামের পয়সাওয়ালা লোভী ধূর্ত হারু দত্ত ও তার লোকজন এসে এই অসহায় পরিবারটার ওপর চালায় নিষ্ঠুর অত্যাচার। শেষ সম্বল একটুখানি জমি অল্প দামে কিনে নেওয়ার জন্য এসে যখন কুঞ্জর কাছে বাধা পায়, তখন তার জমির লোভটা নেকড়ের আক্রোশে পরিণত হয়। লোকজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঞ্জর ওপর। —'মাথায় ঘা খেয়ে কুঞ্জ মাটিতে বসে পড়ে। ...... লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে। ..... কুঞ্জর কান্না আরো জোরাল হয়। বুগ্ন মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।'

[প্রথম অঙ্ক, 'পঞ্চম দৃশ্য]

কিন্তু কেউ বাঁচাতে পারে না মাখনকে। কুঞ্জ রাধিকার একমাত্র সন্তান, দস্যুর হাতে বাপ ঠাকুরদার ওপর অমানুষিক অত্যাচারের আতিশয্য সহ্য করতে না পেরে ভয়ে আতঙ্কে অনতিক্ষণ পরে প্রাণ হারায়। সমাদ্দার পরিবার তার একমাত্র বংশধরকে হারিয়ে হাহাকার করে ওঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। আর তখন, 'ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখ মুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।' এই ইঙ্গিতময় বিবরণটুকুর মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় সমাদ্দার পরিবারের ভবিষ্যৎ। গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথ বেয়ে বাঁচবার মরণান্তিক প্রয়াসের আভাসটুকু ফুটে ওঠে বিনোদিনীর ভাবনায়।

৪৭.৯ মূলপাঠ □ নবান্ন ঃ দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কালীধনের গদী। উঁচু একটা ফরাসের এক কোণে মোটা একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে কালীধন। মোটা কালো নাদুস-নুদুস চেহারা, গায়ে একটা ফতুয়া—গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার তাবিজ। মাথার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিকৃতি। নিচে দেওয়ালের গায়ে সিঁদুরের গোলা দিয়ে বিচিত্রিত শ্রীশ্রীকালীমাতার শ্রীচরণ ভরসায় এই বারবার করিতেছি।" পাশে লাল কাপড়ে বাঁধাই করা স্তূপীকৃত খাতাপত্র। ঘরের মাঝখানে বিরাট একটা দাঁড়িপাল্লা। আধমণ, দশসের, পাঁচসের, আড়াই সের ও এক সের ওজনের লোহার বাটখারাগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গুদাম ঘরের একপাশে কতকগুলো খালি বস্তা সাজানো। কুলি ও বাবু গোমস্তা এধার-ওধার ঘুর-ঘুর করছে। সামনে দিয়ে চলেছে সব ভারবাহী কুলিরা, পিঠে তাদের সব দু-মণি চালের বস্তা। মাল সব গুদোমের চোরকুঠুরিগুলোতে চালান করে দেওয়া হচ্ছে হরদম। ক্যাশ বাক্সের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কালীধন মাঝে

মাঝে কী সব হিসেবপত্তর করছে, আর বিড় বিড় করছে। সামনে ফরাসের এককোণে সপ্রতিভ হয়ে বসে আছে হারু দত্ত ; পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বিড়ি ফুঁকছে। বিড়ি ফুঁকছে আর কালীধনের দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে। কী একটা হিসেব কষা চলছে যেন সামনের খাতায় ; আর তারই প্রতিক্রিয়া নানা ভাবের সৃষ্টি করছে উভয়ের চোখেমুখে। ফরাসের ডানদিকের এককোণে মাছির মতো ডুবে আছে রাজীব, দোকানের বৃদ্ধ কর্মচারী, নথিপত্তরের মাঝখানে। এমন সময় একজন ছোকরা গোমস্তা, নিরঞ্জন ওরফে রাখহরি চাবির গোছা নাড়তে নাড়তে কালীধনের দিকে এগিয়ে এল।)

নিরঞ্জন। মাল সব গুদোমে উঠে গেছে।

কালীধন। ঠিক মতো তোলা হয়েছে তো?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ সে—

কালীধন। একেবারে—

[চোরকুঠুরির দিকে আঙুল তুলে খোঁচা মারলে]

নিরঞ্জন। তিন নম্বর কামরায়।

কালীধন। তিন নম্বর। ঠিক আছে।—এইবার তুমি দ্যাখো, দ্যাখো আবার ওদিকে দ্যাখো। দ্যাখো। (হিসেবের খাতায় মন দেয়) চাবিটা—

নিরঞ্জন। হ্যাঁ এই তালাটা দিয়ে আসি!

কালীধন। দিয়ে আসি! এখনও লাগাওনি! কতবার করে বলতে হবে—নাঃ, আর চলল না কারবার।

[নিরঞ্জন প্রস্থানোদ্যত]

এদিকে শোনো। বললাম আর চললে অমনি হড়বড় করে। ভালো করে টেনে দেখো তালা ; আর বেরিয়ে আসবার সময় দু'খানা বস্তা টেনে দিয়ো খাদের মুখে, বুঝতে পেরেছ? যাও।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান]

সব দেখে-শুনে করবে, এ সব কথা কি আর বার বার করে বলে দিতে হয়। ঝটপট সেরে এসে (নিরঞ্জনকে উদ্দেশ করে হারু দত্তের প্রতি) এদের নিয়ে কারবার চালাতে হয়। বলব কী তোমায় সে একেবারে ষাঁড়ের গোবর, কোনো কম্মেরই হোক! (নিম্নস্বরে) রেখেছি শুধু লোকটা বিশ্বাসী বলে। কেটে ফেলে দাও, এট্টা কথা তুমি বের করতে পারবে না মুখ দিয়ে।

হারু দত্ত। সে তো মস্ত গুণ।

কালীধন। রেখেছিও তো ঐ জন্যেই।

হারু দত্ত। আজকালকার দিনে একটা বিশ্বাসী লোক পাওয়া মানে—

কালীধন। (এক নজর তাকিয়ে ভু তুলে) নিশ্চয়। (সঙ্গে সঙ্গে হিসেবে মনোনিবেশ করে, ঠোঁট দু'খানা নড়তে থাকে) তা হলে তোমার হল গিয়ে একুনে—আচ্ছা একটু সবুর করো, আসুক রাখহরি। আরে কই রে....(হিসেবে মন দেয়) বিড়ি খাও।

হারু দত্ত। হ্যাঁ সে—(বিড়িতে টান মারে) আমার আবার ওদিকে একটা কাজ ছিল!

কালীধন। আরো এসো। (দেশলাই দেয়। হিসেব কষে একটু পরে) চাল কিন্তু তোমার এবার তেমন সরেস নয় দত্ত!

হারু দত্ত। আর সরেস, দুদিন বাদে আর চালই পাও কি না তাই দ্যাখো, তার আবার...। এই তাই যা অবস্থা হয়ে উঠেছে মফস্বলে.....একেবারে খুনোখুনি ব্যাপার। অ্যাঁ....

[প্যাটপ্যাট করে চেয়ে থাকে কালীধনের দিকে]

কালীধন। বুঝলাম, কিন্তু তোমার গিয়ে নন্দীদের ঘরে যে চাল দিচ্ছে সে কোত্থেকে! বেশ সরেস চাল! সে একটা চাল তুমি ভাঙা বা অন্য কিছু পাবে না।

হারু দত্ত। হ্যাঁ জানি, কিন্তু দর দিচ্ছে কত করে খবর রাখ!

কালীধন। কত!

হারু দত্ত। সাড়ে বাইশ। দেবে! দেবে!

কালীধন। সাড়ে বাইশ!

হারু দত্ত। তবে, বালাম কি আর মাঙনা হয়!

কালীধন। সাড়ে বাইশ অবিশ্যি বড্ড বেশি দর হয়ে যায়।

হারু দত্ত। তা ভালো জিনিশের ভালো দর দিতে হয়। নইলে হবে কেমন করে।—বলো তো দেখিএকবার চেষ্টা করে দু'দশ নৌকো যা পাই। তবে দর ঐ সাড়ে বাইশ, তেইশ, ওর এক আধলাও কিন্তু কম নয়। হয় তো বলো!

কালীধন। না ও দর দিতে পারব না। অনর্থক মার খেয়ে যাব।

হারু দত্ত। কী মার, লুফে নিয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ চল্লিশে। নন্দীরা কি লোকসান দিচ্ছে!

কালীধন। না সে নন্দীরা যাই করুক, আমি ও দর দিতে পারব না। বাজারের কথা এখন কিছু বলা যায় না দত্ত, মেঘ-রোদ্দুরের খেলা চলেছে। ওরে ব্বাপ্‌রে বাপ রে....

হারু দত্ত। (খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে) এই তো দ্যাখো, তোমরাই যদি এই রকম কথা বল তো আর সব কারবারিরা যায় কোথায়!

কালীধন। না না দত্ত তুমি বোঝ কী! নিদেনপক্ষে এখনও সওয়া লাখ টাকার মাল আমার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। অন্তত এই টাকাটা উশুল না হয়ে আসলে....

হারু দত্ত। তা সে উশুল হয়ে যাবে, হ্যাঁঃ।

কালীধন। সেই কি আর এট্টা কথা হল।—তুমি তো বলছ হয়ে যাবে, কিন্তু এই না হওয়া পর্যন্ত —রাত্তিরে ঘুমুতে পারি নে দত্ত, তুমি বল কী! খালি আজে বাজে কত কথা কত কী সে একেবারে ভীমরুলের চাকের মতো চারদিক থেকে এসে পাগল করে দেয়।

হারু দত্ত। বুঝতে পাচ্ছি ব্লাড প্রেসার হয়েছে।.... তা সে বড়ো বড়ো লোকের আবার ও সব না থাকলে চলে না।

কালীধন। (হেসে) তা যা বলেছ—

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

এই যে এয়োছো এতক্ষণে!

হারু দত্ত। হ্যাঁ তো ন্যাও এইবার এট্টু তাড়াতাড়ি করো। বড্ড দেরি হয়ে গেল আমার আবার ওদিকে।

কালীধন। সব টাকা কিন্তু আজ দিচ্ছি নে।

হারু দত্ত। সে কী—তো দ্যাও ; যা দেবে দ্যাও ; আমার আবার ওদিকে—

কালীধন। (হেসে) গুঁইবাবুদের ঘরে যাবে নাকি আজ! সে সব তো শুনলামই না। আর আসই একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে তার শুনব কখন! দু-দণ্ড বসে যে এট্টু বাজারের হালচাল সম্বন্ধে দুটো কথাবার্তা বলব—(নিরঞ্জনের প্রতি) কই, কী বললে, ক বস্তা হয়েছে!

নিরঞ্জন। ঐ পুরোপুরি 'সাতশ বস্তা।

কালীধন। সাতশ' বস্তা। এখন একগাড়ি—

হারু দত্ত। তুমি আগে আমারে যা দেবে তাও তো, তারপর সে তোমরা বসে সব হিসেব-পত্তর করোগে, হ্যাঁঃ।

কালীধন। (চাপা ধরা গলায়) আচ্ছা তা হলে তোমারেই আগে দিয়ে দেই। তোমারেই আগে দেই। ক্যাশবাক্সের ভেতর থেকে একতাড়া নোট বার করে হারু দত্তের হাতে গুনতি করে দেয়। গুণে ন্যাও।

হারু দত্ত। (গুনতি করতে করতে) আবার গুনতে হবে। পাঁচ-দশ পঞ্চাশ, পঞ্চাশ, পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার, আর.... এতে কত দিলে!

কালীধন। আর পাঁচশো —

হারু দত্ত। আর পাঁচশো। এই দিলে এখন।

কালীধন। হ্যাঁ, হিসেব সে এখন তোমার থাকল।

হারু দত্ত। (এস্তে) তো থাক, থাক, তোমার কাছে হিসেব থাকবে তাতে আর আচ্ছা আমি চললাম। (উঠতে উঠতে) বড্ড দেরি হয়ে গেল। বাজারেই বা যাব কখন, কেনাকাটারই বা কী করব! —তো চললাম, আর ও কথার কী বললে! দেখব নাকি বালাম!

কালীধন। বড্ড বেশি দর হয়ে যায়।

হারু দত্ত। রাখলে পারতে কিছু , জিনিস ভালো ছিল। আর হয় তো পাবেই না।

কালীধন। জিনিস ভালো, দরও তো ভালো। আর কথা কী জানো, ওতে তেমন কিছু থাকে না। তুমি আমার বরং এই চালটাই আরও কিছু—

হারু দত্ত। তা সে তো বলেই গেলাম, তবে এটাও কিছু রাখলে পারতে।—তা সে বোঝ গে তুমি, আমি কিছু বলতে চাইনে—আমার আবার এদিকে.........

কালীধন। তা বলছ যখন এত করে, দিয়ো কিছু।

হারু দত্ত। কত?

কালীধন। কত দেবে!

হারু দত্ত। (হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে) এই।

কালীধন। (বিস্মিত ভঙ্গিতে) অত!.... তা দিয়ো, দিয়ো।

হারু দত্ত। (প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ রেখে তো দ্যাও কিছু, তারপর এখন বোঝা না হয়, আচ্ছা আমি চলি তা হলে।

কালীধন। আচ্ছা—। (চেঁচিয়ে) আরে ইয়ে দত্ত। তারপর, ভালো কথা, আমার সেই জিনিসের কী করলে। আমার সেই জিনিস!

হারু দত্ত। কোন্ জিনিস বলো তো?

কালীধন। জিনিস, আবার বলতে হবে কোন জিনিস!

[সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে এগিয়ে আসে আবার হারু দত্ত]

হার দত্ত। (কৌতূহলী হেসে) কী বল দিনি, ও হো, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। তা সে হবে, হবে। ব্যবস্থা আমি সে ওদিকে একেবারে পাকাপাকি করে ফেলেছি। ঠিক হয়ে যাবে সব।

[প্রস্থানোদ্যত]

কালীধন। ঠিক তো—

হারু দত্ত। এই দেখবে হয় তো ফিরে পাকেই—

[ফিরে চেয়ে হাসল]

কালীধন। সত্যি, মাইরি

হারু দত্ত। তবে—

কালীধন। আচ্ছা-া-া-া

[হারু দত্তের প্রস্থান]

(ক্যাশবাক্সের ডালাটা তুলে ধরে কালীধন যেন কি সব নাড়াচাড়া করে, তারপর একটা

লম্বা চাবি বের করে একটু ফিরে শুয়ে পাশের লোহার সিন্দুকটা খুলে ক'তাড়া নোট ভেতরে চালান করে দেয়।)

রাজীব। (হাই তুলে তিন তুড়ি বাজিয়ে) রাধে গোবিন্দ বল মন।

কালীধন। সরকার মশাই।

রাজীব চশমার ফাঁক দিয়ে কালীধনের দিকে এক নজর তাকিয়েই নিজের কাজে মন দেয়।

ও সরকার মশাই।

রাজীব। কইয়্যা ফ্যালাও, শুনত্যাছি।

কালীধন। চালানটা পাঠিয়েছিলেন ও বেলা?

রাজীব। (একদৃষ্টে কালীধনের দিকে তাকিয়ে) বিপিনবাবুর নামে তো? চব্বিশ নম্বর!

কালীধন। (খাতা দেখে) হ্যাঁ।

রাজীব। হ হ দিছি, রাখহরিরে দিছি। তাইলেও একবার জিগাও, পাঠাইল কি না চালানটা।

কালীধন। এই তো দেখুন গণ্ডগোল বাধান।

রাজীব। গণ্ডগোলের আবার কী আছে ইয়ার মধ্যে ; হ্যাঁ হে মহে—আরে কী যে কয় ওয়ার নামটা, রাখহরি রাখহরি। রাখহরি, চালানটা নি পাঠাইছ বিপিনবাবুর?

নিরঞ্জন। (কাজ ফেলে এগিয়ে যায়) নম্বর কত চালানের?

[জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ]

কালীধন। নম্বর কত চালানের! এখন জিজ্ঞেস করছ নম্বর কত চালানের! নাঃ, কাজ-কারবার আর —(সহসা ভদ্রলোকের প্রতি) আপনি—

ভদ্রলোক। আমি—

কালীধন। ও বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। মণ্টুবাবুর বাড়ি থেকে আসছেন তো—তা একটুখানি বসতে হবে আপনাকে ; এই বেশিক্ষণ না, একটুখানি বসুন—

[আগন্তুক ভদ্রলোক পাশের চেয়ারে বোকার মতো বসে পড়লেন।]

(নিরঞ্জনের প্রতি) তা যাও, আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে এখন করবে কী। যা হবার তা তো হয়েইছে। কালও যায়নি, আজও গেল না চালানটা।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান]

(রাজীবের প্রতি) আর আপনিও তেমনি দিয়েই খালাস। দিলেন যখন তখন আর একবার খোঁজ করে দেখলেই পারতেন যে চালানটা ঠিক পাঠানো হল কি না। সবাই যদি এখন—

রাজীব। আরে দিয়া তো রাখছি সেই কোন সকালে, তা সে যে পাঠায় নাই এহনতরি—

কালীধন। আহা দিছলেন তো বুঝলাম সকালবেলাই, কিন্তু জিনিসটা ঠিক পাঠানো হল কি না, মাঝে একবার খোঁজ নিয়ে দেখলেই পারতেন, চুকে যেত।

রাজীব। অহন জট তো আর নাই আমার মাথায়—

কালীধন। জট থাকা না থাকার কোনো প্রশ্ন হচ্ছে না। যাগ্‌গে, খামখা আপনার সঙ্গে তর্ক করে আর—(ভদ্রলোকের প্রতি) এইবার বলুন কী বলছিলেন আপনি। ও হ্যাঁ, আরে ওহে, সকাল বেলা আজ অনন্তধাম থেকে কোনো লোক এসেছিল কি? সরকার মশাই খবর রাখেন?

রাজীব। অনন্তধাম থাইক্যা, হ্যাঁ আইছল তো চাউলে লাইগ্যা! তা পরিমাণের কথা—

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি হেসে) ক-মণের কথা বলেছিলেন যেন আপনি?

রাজীব। আচ্ছা রও দেখি একবার খাতটা, লিখা তো রাখছিলাম।

[খাতায় মনোনিবেশ করে]

ভদ্রলোক। আমি মানে, এই গিয়ে আপনার একজন সাধারণ গেরস্ত লোক মশাই, বড্ড দায়ে পড়ে এসেছি। অবিশ্যি, আপনি দর যা চাইবেন আমি তাই দেব। তবে—এই কিছু চাল আমার চাই-ই।

কালীধন। (হাত উলটে) চাল কোথায় মশাই! দশ-বিশ বছরের বাঁধা খদ্দের তাদেরই বলে চাল দিতে পাচ্ছি নে, তার আপনি তো—না মশাই ও সুবিধে হবে না। আপনি বরং অন্য জায়গা দেখুন—কী কাণ্ড!

ভদ্রলোক। দেখুন দাম আমি—

কালীধন। আহা দামের কথা তুলছেন কেন অনর্থক ; দামের জন্যে তো আটকাচ্ছে না, আসলে চালই নেই।

ভদ্রলোক। চাল নেই তা হলে—

কালীধন। তা হলে দেখুন, অন্য জায়গা দেখুন।

ভদ্রলোক। বলুন কোথায় দেখব। এর আগে দু-পাঁচ দোকান যা দেখলাম, তাতে সবাই তো ওই এক কথাই বলে—চাল নেই। এখন আমি কী করি বলুন তো। আপনি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছেন না আমার প্রয়োজনটা। গুচ্চার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মশাই শহরে বাস। ঘরে এক দানা চাল নেই। আপনি বুঝতে পারছেন!

কালীধন। বুঝলাম মশাই, সব বুঝলাম। কিন্তু আমি তার কী করতে পারি বলুন!

ভদ্রলোক। (করজোড়ে) যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন ; আপনি বাঙালি, আমিও বাঙালী।

কালীধন। তা দামের কথা বলছিলেন, কী দর দেবেন আপনি সেটা বলুন ; দেখি যদি অন্য কোনো দোকান থেকে বলে কয়ে জোগাড় করতে পারি।

ভদ্রলোক। দর—তা সে আপনি যা বলেন!

কালীধন। (হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে) দেখুন, দিতে পারবেন! হয় তো দেখি কারো ঘরে যদি চাল থাকে।

ভদ্রলোক। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) কত! প-ঞ্চা-শ টাকা।

রাজীব। (মুখ তুলে) অনর্থক কথা বাড়াও তুমি কালীধন। খ্যাদাইয়া দাও না, হুঁঃ।

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি) তবেই বুঝুন!

রাজীব। চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে। দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি) দেখুন, দাম শুনেই চমকে উঠলেন তো! তা সে তো আমি আপনাকে আগেই বলেছি, যে আপনি চাল নিতে পারবেন না।

ভদ্রলোক। তাই বলে মশাই পঞ্চাশ!

রাজীব। আরে ষাট টাকা দরে মশায় সাধাসাধি, বোচ্চেন সাধাসাধি। আপনে তো পঞ্চাশ টাকা শুন্নাই চম্‌কাইয়া ওঠলেন।

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি হেসে) চাল চান অথচ দেখুন—

ভদ্রলোক। আপনি হাসছেন!

রাজীব। তো কি কাঁদবে নাকি! কী আশ্চর্য!

ভদ্রলোক। আগে ত্রিশ টাকা দরে নিইছি, এখন নয় পঁয়ত্রিশ, জোর চল্লিশই নিন। সের পনেরো চাল অন্তত আমায় দিন যে করে হোক, বড্ড ঠেকে গেছি।

রাজীব। আরে দ্যাহ কয় কী, য়্যাঁ, কয় কী! মানুষের ব্যবহার দেইখ্যা, আর—

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি) মাফ্ করবেন আমি পারব না।

ভদ্রলোক। (হাত জোড় করে) সের পনেরো চাল আমায় অন্তত—

রাজীব। দে দ্যাখ্‌ছ, বসপ্যার দিলে শুইব্যার চায়। আরে কালীধন, এগুলো কী মানুষ।

ভদ্রলোক। (ক্ষুব্ধ স্বরে রাজীবের প্রতি) আপনি চুপ করুন। অনেকক্ষণ থেকে আমি দেখছি আপনি—

রাজীব। দে দ্যাখ—আবার চোখ ভ্যাট্‌কায়! দেচে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি। দেচে রাখহরি—

ভদ্রলোক। খুনে যেন কোথাকার। তোমায় আমি পুলিশে দেব, দাঁড়াও।

কালীধন। যান যান, আপনি বরং তাই ডেকে নিয়ে আসুন গিয়ে, যান যান।

ভদ্রলোক। (ক্ষোভের সুরে) অনন্তধাম থেকে লোক আসলে যত ইচ্ছে তত মণ চাল দিতে পারেন, কিন্তু

কালীধন। অনর্থক চেঁচাচ্ছেন। চাল নেই, চাল আপনি পাবেন না।

রাজীব। (খল হেসে) আরে এগুলা কি পাগল কি দ্যাখছ কালীধন, কয় বলে পুলিশ ডাকমু। (কালীধনকে উদ্দেশ করে ভদ্রলোককে) বলে পুলিশ ডাকমু। আরে কত জজ মেজিস্ট্রট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখ্‌প্যার পারে তা নি জানো। আহাম্মক কোহানকার, তুমি দ্যাখাও পুলিশের ভয়!

(নেপথ্যে 'মাগে' 'মাগো' ধ্বনি! কালীধন ভুঁড়ি নাচিয়ে শুধু খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসে।)

ভদ্রলোক। (রেগে) আচ্ছা, যাচ্ছি আমি, কিন্তু এর কোনো প্রতিকার হয় কিনা আমি একবার—(হঠাৎ অসহায়ভাবে ভেঙে পড়ে)

[কালীধন ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসে]

কিন্তু কী-ই বা করব!

[প্রস্থান]

রাজীব। (হিসেবের খাতাটার দিকে এক নজর তাকিয়ে) দুর্ভিক্ষের কাঙ্গালি যত সব, মরবার আইস্যা পড়ছে শহরে—দোকানের ফটকটা বন্ধ কইর‍্যা দেচে রাখহরি, বন্ধ কইর‍্যা দে।

[নেপথ্যে সঙ্গে সঙ্গে ফটকের কোলাপর্সিবল্ গেট বন্ধ করার শব্দ—
ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝট]

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটা পার্কের অংশ। কোণে একখানা বেঞ্চ পাতা। ভেতরে কুড়ি-পঁচিশ জন ভিক্ষুক ভিড় করে বসে আছে। কলকণ্ঠে মুখর হয়ে আছে পরিবেশ। ভিড়ের মাঝখানে প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা ও বিনোদিনীকে দেখা যাচ্ছে। প্রধান একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করছে। রাধিকা বসে বসে মাথার চুলে বিলি দিচ্ছে। কুঞ্জ গালে হাত দিয়ে বসে কী যেন ভাবছে। বিনোদিনীকে ফষ্টি নষ্টি করতে দেখা যাচ্ছে অন্য একজন ভিখারিনীর সঙ্গে। বস্তাবন্দী ঘর সংসার—মেটে হাঁড়ি, টিনের কৌটা—সব ছড়িয়ে পড়ে আছে ইতস্তত। বুড়ো-হাবড়া, জোয়ান, কিশোর শিশু—বিভিন্ন বয়সের নিঃস্ব জমায়েত হয়েছে এখানে, এদের ভেতরে কেউ কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে, কেউ বা তুমুল ঝগড়ায় মেতে উঠেছে। হৈ চৈ চেঁচামেচির মাঝখানে অডিটোরিামের ভেতর থেকে জনৈক সাহেবি পোশাক পরা প্রেস-ফটোগ্রাফার শিশু সন্তান কোলে জনৈক ভিখারিনীকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল।

১ম ফটোগ্রাফার। বাঃ, ফাইন মডেল। (বন্ধুকে উদ্দেশ করে) মিস্টার মুখার্জ্জি, আরে এসো এসো, ক'খানা ছবি তুলে ফেলি। আমাদের কাগজের জন্যে। এমন মডেল তুমি চট করে পাবে না হে, এসো এসো।

(আর একজন প্রেস-ফটোগ্রাফার এগিয়ে গেল স্টেজের দিকে অডিটোরিয়াম থেকে।)

২য় ফটোগ্রাফার। দি আইডিয়া, দাঁড়াও আসছি।—দারুণ স্ট্রাইক করেছে তো হে তোমার মাথায়। আমি ভাবতেই পারিনি। ওঃ—

(দুজনে স্টেজের ওপরে গিয়ে উঠল। প্রথম ফটোগ্রাফার মঞ্চের সামনের দিকের বাঁ কোণ থেকে ক্যামেরাটা তুলে ধরে তাক করতে লাগল নিঃস্বদের দিকে।)

তুললে? ক'খানা?

১ম ফটোগ্রাফার। তুললাম, খানা দুয়েক তুললাম কিন্তু এক্সপোজারটা তেমন যেমন ভালো হল না বলে মনে হচ্ছে।

২য় ফটোগ্রাফার। কেন, ঠিক হল না?

১ ম ফটোগ্রাফার। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আর শালী খালি নড়বে, খালি নড়বে, পোজিশন নিতেই দিলে না।

২য় ফটোগ্রাফার। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। (ভিখিরিদের দিকে একটু এগিয়ে যায়) আর রয়, অনর্থক 'মব'-এর ছবি তুলে খামখা ফিলম নষ্ট করে কী হবে! তুমি বরং মডেল দেখে দেখে তোলো, আমি ঠিক করে দিচ্চি, কেমন! হ্যাঁ, তাই করো, দ্যাটস্ রাইট। (কচি ছেলে কোলে জনৈক ভিখারিনীর প্রতি) ওহে, তোমরা সব খাবার পেয়েছ, খাবার! মানে গিয়ে এই খিচুড়ি! খিচুড়ি পাওনি সব তোমরা!

ভিখারিনী। না তো!

২য় ফটোগ্রাফার। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) সে কী!

(ভিখারিনী মুখখানা করুণ করে ফটোগ্রাফারের দিকে হাত পেতে ধরে।)

১ম ফটোগ্রাফার। (ক্যামেরা ডাক করতে করতে) মুখার্জি!

২য় ফটোগ্রাফার। য়্যাঁ।

১ম ফটোগ্রাফার। একটুখানি হাসি ফোটাতে পারো, হাসি জাস্ট এ বিট অব স্মাইল্। দ্যাখো না ভাই চেষ্টা করে।

২য় ফটোগ্রাফার। হাসি!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছবিখানার তাহলে নাম দিতে পারি 'বাংলার ম্যাডোনা'।

২য় ফটোগ্রাফার। দি আইডিয়া, কাগজের সারকুলেশন তা হলে তো কাল দ্বিগুণ হে। ওঃ, 'বস' যা খুশি হবে তোমার ওপর মাইরি।

১ম ফটোগ্রাফার। খুব চমৎকার আইডিয়া, না?

২য় ফটোগ্রাফার। তবে, মাথা কার আবার দেখতে হবে তো!—কিন্তু হাসি এ আমি ফোটাই কী করে বলো তো?

১ম ফটোগ্রাফার। দ্যাখো না দ্যাখো না একটু চেষ্টা করে, জাস্ট এ বিট অব স্মাইল, দু-চারটে পয়সা-টয়সা চায় তো দাও না।

[ক্যামেরা তাক করতে থাক, ২য় ফটোগ্রাফার ভিখারিনীর দিকে এগিয়ে যায়।]

ভিখারিনী। আমার জন্যে নয় বাবু, এই কচি ছেলেটা! দয়া করো বাবা।

২য় ফটোগ্রাফার। (দরদভরে) পয়সা নেবে, পয়সা! এই নাও।

[পয়সা দেয়। পয়সা পেয়ে ভিখারিণীর মুখটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে।]

২য় ফটোগ্রাফার। রয়!

১ম ফটোগ্রাফার। ও. কে!

২য় ফটোগ্রাফার। কী রকম, সাক্‌সেস্‌ফুল তো?

১ম ফটোগ্রাফার। মোস্ট লাইক্‌লি, দেখা যাক। (একটু এগিয়ে গিয়ে) তুমি যাও বাছা এইবার, যাও। যাও। পয়সা-টয়সা পেয়েছ তো। আচ্ছা যাও।

[ভিখারিনী সরে যায়।]

(করুণভাবে) রিয়েলি!—আচ্ছা মুখার্জি, দ্যাখো তো ভাই, এই ধরনের আর গোটা দুচ্চার মডেল—(হঠাৎ প্রধানকে দেখে) ইয়েস্ দ্যাট্ ওল্ড ম্যান, দাঁড় করাতে পারো ভাই ওকে একবার বলে কয়ে—দ্যাখোনা একটু চেষ্টা করে।

২য় ফটোগ্রাফার। কে, কাকে মীন করছ তুমি!

১ম ফটোগ্রাফার। আরো ঐ যে, বুড়ো লোকটা, জামা না কী সেলাই করছে বসে বসে!

২য় ফটোগ্রাফার। ও, দ্যাট্ গ্রেট্ প্যাট্রিয়ার্ক!

১ম ফটোগ্রাফার। বাঃ, বেড়ে নামকরণটি করেছ তো হে। গ্রেট প্যাট্রিয়ার্কই বটে। ফাইন নামকরণ হয়েছে। চল না দু একটা কথাবর্তা কয়ে দেখি বুড়োর সঙ্গে। (এগিয়ে গিয়ে প্রধানকে) হ্যাঁ হে, বলি বাড়ি কোথায় তোমার, বাড়ি!

প্রধান। জ্ঞেঁ-এ-এ বাড়ি! বাড়ি জ্ঞেঁ-এ-এ চিনতে পারবেন!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন পারব না!

প্রধান। তা হলে বলি। বাড়ি আপনার গিয়ে হুই-ই আমিনপুর।

[হে হে করে হেসে]

১ম ফটোগ্রাফার। আমিনপুর?

প্রধান। আঁজ্ঞে।

১ম ফটোগ্রাফার। তা এখানে এসে তোমাদের সব থাকবার খাবার বেশ সুবিধে হয়েছে তো!

প্রধান। সুবিধে! আমাদের বাবু সুবিধে আর অসুবিধে!

১ম ফটোগ্রাফার। কেন? আচ্ছা দ্যাখো বাপু, এই তুমি একটুখানি উঠে দাঁড়াতে পারো?

প্রধান। উঠে দাঁড়াব বলছেন!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটুখানি, মানে একটা ছবি তুলব কি না?

প্রধান। ছবি!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ ছবি, যেমন—

প্রধান। ছবি কিসের বাবু?

১ম ফটোগ্রাফার। (মুখার্জির প্রতি) ডীল উইথ্ হিম।

২য় ফটোগ্রাফার। (প্রধানের প্রতি) কেন তোমার! কেমন সুন্দর খবরের কাগজে বেরুবে। খবরের কাগজের লোক কিনা আমরা!

প্রধান। কাগজে বেরুবে। কাগজে বেরুবে। তা কী হবে তাতে করে।

২য় ফটোগ্রাফার। কী আবার হবে, লোকে দেখবে, জানবে দেশের অবস্থা!

প্রধান। দেশের অবস্থা! তা পাবে কোথায় তারা কাগজ!

২য় ফটোগ্রাফার। কেন কিনে পড়বে।

প্রধান। কিনে পড়বে?

২য় ফটোগ্রাফার হ্যাঁ।

প্রধান। আপনারা বিক্রি করবেন!

২য় ফটোগ্রাফার। বিক্রি—হ্যাঁ তা বিক্রি না করলে পাবে কোত্থেকে লোকে কাগজ!

প্রধান। ও, তাও তো বটে। তা ভালো, কঙ্কালের ছবির কারবার। কঙ্কালের ছবির ব্যবসা। তা ভালো, কিন্তু আমারে কী করতে হবে এখন?

১ম ফটোগ্রাফার। তোমাকে, এই একটুখানি উঠে দাঁড়াবে আর কী। একটুখানি উঠে—

প্রধান। এমনি উঠে দাঁড়াব!

২য় ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, অমনি একটু দাঁড়াবে আর কী। পয়সা দেবখ'ন তোমায়। পয়সা দেবখ'ন।

প্রধান। পয়সা দেবে। তা দিয়ো। আমারে তোমরা পয়সা দিয়ো। তা এই মাটির হাঁড়িটা হাতে করে দাঁড়াব বাবু। হাতে করে দাঁড়াব মাটির হাঁড়িটা! বেশ দেখতে হবেখ'ন। বেশ ভালো দেখতে হবে'খন।

২য় ফটোগ্রাফার। হাতে নেবে—হাঁড়িটা—(প্রথম ফটোগ্রাফারের ইঙ্গিতে) তা নাও, নাও।

প্রধান। (উঠতে উঠতে) হ্যাঁ তাই নেই, তাই নেই। হাতে করে দাঁড়াই হাঁড়িটা। হাতে করে দাঁড়াই—তো ন্যাও, তোলো এইবার, ছবি তোলো। কঙ্কালের ছবি তোলো—

২য় ফটোগ্রাফার। রয়! রয়! গেট রেডি।

প্রধান। তোলো, কঙ্কালের ছবি তোলো।

১ম ফটোগ্রাফার। (ছবি তুলে হাসতে হাসতে) ব্যস, এ তো কতক্ষণ আর!

প্রধান। হয়ে গেছে!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ দাদা, হয়ে গেছে। এক সেকেণ্ডের তো ব্যাপার। এই নাও, তোমায় পয়সা দেব বলেছিলাম, এই নাও।

প্রধান। হ্যাঁ, পয়সা দেবে বলেছিলে, পয়সা দাও।

১ম ফটোগ্রাফার। (পয়সা দিয়ে) কেমন, খুশি তো! আচ্ছা!—দি গ্রেট প্যাটরিয়ার্ক।

[পয়সা দিয়ে ফটোগ্রাফারের প্রস্থান।]

প্রধান। যাও বেচোগে, কঙ্কালের ছবি বেচোগে। যাও যাও।

(আবার সেলাই করতে বসে।
নেপথ্যে ট্যাঁড়া পেটার শব্দ—কী একটা যেন ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে।
একটু পরেই ঢোল শহরৎ করতে করতে জনৈক ডোমের প্রবেশ।)

ডোম। (ঢোলে তিনটি ঘা মেরে) আরে বাজারখোলামে খিচড়ি দেওয়া হোবে। ভিখারি লোগোঁ সব বাজারখোলা চলা যাও।

[ডুম, ডুম, ডুম—ঢোলে আবার তিনটি ঘা মারে।]

জনৈক ভিখারি। (কৌতুহলী হয়ে) কোথায় বাবা, কোথায় খিচুড়ি দেবে!

ডোম। বাজারখোলা বাজারখোলা। (ঢোলে তিন ঘা মেরে) বাজারখোলামে খিচুড়ি দেওয়া হোবে ভিখারি লোগোঁ সব বাজারখোলা চলা যাও। (তিন ঘা)

[ঘোষণা শুনে ভিখারিদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। নিজের নিজের তল্পিতল্পা গুটিয়ে সকলেই বাজারখোলার উদ্দেশ্য রওনা হয় তাড়তাড়ি।]

রাধিকা। (চিৎকার করে ডাকে) ও বিনো, বিনো রে। (কুঞ্জকে) ওগো বিনো কোথায় গেল গো! য়্যাঁ, ও বিনো—দ্যাখো গে সে হয়ত আগে ভাগে গিয়েই বসে আছে, যত সব— ওমা, তা বলে তো যাবে, কী কাণ্ড—

[দু-একজন ভিখিরি ও প্রধান ছাড়া কুঞ্জ রাধিকা প্রভৃতির দ্রুত প্রস্থান। প্রধান কাঁধের ওপর ছেঁড়া কাঁথা, জামা আর বিশ্বের আবর্জনা চাপিয়ে মুখ নিয়ে ডোমের কথার অনুকরণ করতে থাকে।]

প্রধান। বাজারখোলা খিচুড়ি দেওয়া হবে, সব বাজারখোলা চলে যাও। ডুম্, ডুম্, ডুম্। সব বাজারখোলা চলে যাও। ডুম্, ডুম্, ডুম্, ডুম্।

[অন্য ভিখারিদের পিছুপিছু প্রধানের প্রস্থান। জনৈক টাউটের প্রবেশ। লিকলিকে চেহারা। জুলজুলে দৃষ্টি। ঢুকেই পার্কের বেঞ্চের এককোণে বসে বিড়ি টানতে টানতে চারিদিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বিনোদিনী প্রবেশ করল।]

বিনো। ওমা, এরা সব গেল কোথায় গো!

[টাউট মুচকি মুচকি হাসে।]

কী ক্করি এখন। ওগা বাবু, বলতে পারো এরা সব গেল কোথায়? আমি বাবু একটু ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলাম। এসে দেখি—এখন কোন দিকে যাই আমি—

টাউট। বলা-তো মুশকিল এখন কোন্ দিকে গেছে ওরা! তা—

বিনো। হায় হায় হায় হায়, কী করি এখন আমি!

টাউট। সঙ্গে কে ছিল তোমার!

বিনো। কী বললেন বাবু?

টাউট। না বলছি বলি সঙ্গে আপনার জন তোমার কারা ছিল?

[বিনোদিনী নিরুত্তর।]

স্বামী আছে তোমার?

বিনো। ছিল, ফেলে চলে গেছে।

টাউট। ফেলে চলে গেল। এই সোনার পারা মুখ তোমার বাছা, ফেলে চলে গেল এমন একলাটি। ভারি অন্যায় কথা। এখন এই শহর-বাজার, মন্দলোকের অভাব নেই—মুশকিলের কথা।

বিনো। (করুণ ভাবে) কী করি এখন বাবু আমি?

টাউট। মেয়েমানুষ তুমি বাছা, কিই বা করতে বলব তোমায়—

বিনো। আপনি বাবু এট্টু সন্ধান করি দিন, বাপ আমার।

টাউট। সন্ধান আমি এখন কোথায় করি বলো তো চট করে। কত লোকই তো এসেছে শহরে! আর তাদের মুখ চিনলেও বা কথা ছিল। সন্ধান করলেই কি আর সন্ধান মিলবে! সে অসম্ভব— আচ্ছা দ্যাখো বাছা, আমি তোমার জন্যে যেটুকু করতে পারি বলি। দ্যাখো, এখানে আমার জানা-শোনা এক ভদ্দরলোকের বাড়ি আছে। বলে কয়ে আমি হয়তো সেখানে তোমার খাবার থাকবার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। এই আর কি টুকিটাকি কাজকর্ম করলে সংসারের, আর দুটি দুটি খেলে, বাড়ির বাবু খুব লোক ভালো, একেবারে শিবতুল্য— এখন কথা কী, যে আপাতত সেখানেই না হয় ক'দিন থাকলে, তারপর এদিকে আমিও খোঁজ পত্তর করে দেখলাম......কী বল?

বিনো। আপনি আমার মা-বাপ বাবু।

[টাউট উঠে দাঁড়ায়।]

টাউট। খাবার থাকবার সেখানে তোমার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়, তবে বড়লোক মানুষ, অগাধ টাকা পয়সা, মাঝে মাঝে একুট আদটু আবদার-টাবদার হয়তো করবে, এই। তা ছাড়া একেবারেই মাটির মানুষ, মন জুগিয়ে চলতে পারলে দেখবে সে তোমার একেবারে........তো নাও, এসো এসো। তোমার ভাগ্যি ভালো বুঝলে, যে, হে হে কী আর বলি, এসো এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যাচ্ছে সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সারবন্দী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বজলি বাতির আলো চুঁইয়ে পড়ছে। অন্দরমহল থেকে সানাই এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে— আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুন—বসুন।' তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই

গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিন—অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তুপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না। ডাস্টবিনের আশপাশ থেকে মাঝে মাঝে ক্ষুধ কুকুরের গোঙানি স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। প্রধানকে খানিকটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ফটক থেকে খানিকটা দুরে দাঁড়িয়ে বড়োবাড়ির দিকে হাত তুলে কাতর আবেদন জানাচ্ছে সে দুটি ভাতের জন্য। একটু পরে রাধিকাকেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মুখে তারও দুটি অন্নের কাতর প্রার্থনা। হঠাৎ ডাস্টবিনের কাছটার একটা কুকুর গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জও চেঁচিয়ে ওঠে পাশব আক্রোশে। মুহূর্তকাল পরেই দেখা যায় কুঞ্জকে—ক্ষত বিক্ষত হাতটা তুলে ধরে আলোর দিকে এগিয়ে আসছে। দংশন ক্ষত হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে। (খন্ডদৃশ্য দুটি দেখাবার জন্য স্পটলাইটের সাহায্য নেওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়)।

বড়োকর্তা। (জনৈক ভদ্রবেশী আগন্তুককে একটা ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা করে) এই যে আসুন, আসুন (মুখে হাসি) হেঃ হেঃ আসুন।

[প্রতিনমস্কার জানিয়ে ১নম্বর ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন সরাসরি। গল্প করতে দুই ও তিন নম্বর ভদ্রলোকের প্রবেশ।]

২য় ভদ্রলোক। আসল কথা কী জান ভাই, টাকা, টাকা। টাকায় সব করে। আমাদের বাঙালি বিজনেসম্যানদের টাকা কোথায়! যাও বম্বে, আমেদাবাদ, দেখবে—

[বড়োকর্তাকে দেখে একগাল হেসে]

আরে, লেট করে ফেল্‌লাম নাকি?

বড়োকর্তা। (হেসে) আরে এসো এসো, ভায়া এসো, ভায়া এসো। তারপর মুখুজ্জ্যে কোথায়? নির্মলবাবু এলেন না?

২য় ভদ্রলোক। (হাত তুলে) আসছে, আসছে সবাই আসছে। (পেছনে তাকিয়ে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) আরে, কৈ হে, আবার পেছনে পড়লে ক্যানো! বলি, হ্যাঁ হে মুখুজ্জে।

২য় ভদ্রলোক। তারপর, বড়োবাবু যে একেবারে দেখি—উঃ—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।

[নেপথ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি। নির্মলবাবুর প্রবেশ।]

নির্মলবাবু। (এগিয়ে এসে) এই যে দাদা।

২য় ভদ্রলোক। আরে এসো এসো। নির্মলবাবু এসো।

৩য় ভদ্রলোক। ব্ল্যাক আউটের বাজারে চলাফেরা করাই দায়, আর.........

বড়োকর্তা। আর বোলো না ভায়া। একে ব্ল্যাক আউট, তারপর আবার এই ওয়েদার। আমারই দুরদৃষ্ট আর কী! এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা—

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঁ, তারপর কতজনকে নেমন্তন্ন করলে?

বড়োকর্তা। তা-ভাই হাজার খানেক হবে। ছেঁটে কেটে ওর চেয়ে আর কমতি করা গেল না।

৩য় ভদ্রলোক। পুরোপুরি এক হাজার? বল কী হে, পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজার! ভারতরক্ষাবিধানে লটকে যাবে যে বাবা।

বড়োকর্তা। হ্যাঁ ও বিধান আছে, আইন আছে, আবার আইনের ফাঁকও আছে (হাসি) আর কী করেই বা কম করি বল? এই তো ফ্রেন্ডস্ এন্ড রিলেশন্ যা এখানে রয়ে গেছে, তাঁদের সংখ্যাই তো তোমার শ' পাঁচেকের কম নয়। তারপর—

[নেপথ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি।]

২য় ভদ্রলোক। তা তো বটেই। তা আর হবে না। এ আর একটা বেশি কথা কী হল। এই তো তোমার গিয়ে গত এপ্রেলে, আমার নাতির অন্নপ্রাশনের সময়, বিয়ে-সাদির মতন সে তো আর তেমন একটা বিরাট কাযি্য নয়, তবু ছেঁটে কেটে শ আষ্টেকের কম কিছুতেই করতে পারলাম না। আর এ তো তোমার গিয়ে রীতিমত একটা বিয়ের ব্যাপার।

নির্মলবাবু। তা হলে তো রাজসিক ব্যাপার করে ফেলেছ হে দেখছি রায় মশাই, য়্যাঁ! হাজার খানেক লোক খাচ্ছে, এই বাজারে, চাড্ডিখানি কথা নয়।

১য় ভদ্রলোক। তবে!

নির্মলবাবু। তা জিনিসপত্তর ঠিক মতো জোগাড় করতে পাল্লে তো? কোনো অসুবিধে হয়নি।

বড়োকর্তা। অসুবিধে মানে, চোরাবাজার। চোরাবাজার। চোরাবাজার যদ্দিন আছে ততদিন—

২য় ভদ্রলোক। তার আর কী করবে কী করবে ভাই। সত্যি কথা বলতে গেলে এই চোরাবাজারটি ছিল বলে তাই এখনও কিছুতে আটকাচ্ছে না, নইলে—করবে কী লোকে বল? ব্ল্যাক মার্কেটের সুবিধে না নিয়ে উপায় কী? বেশি কী কথা এই ধরো না সামান্য চিনির ব্যাপারটাই! সংসারে গিন্নি বলেন মাসে অতি কম দেড় মন চিনি তাঁর চা-ই নইলে মানে ওদিকে সে একেবারে বুঝতেই পারছ, ডেডলক, কমপ্লিট ডেডলক। তা এখন কোথায় পাবে তুমি এই চিনি। ওপ্‌ন মার্কেটে যাও, নেই নেই নেই নেই, হাত উলটেই বসে আছে সব দোকানিরা। কোথাও পাবে না তুমি এই চিনি। কী করবে? তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। করব কী বল, পয়সা তো আর সঙ্গে যাবে না।

নির্মলবাবু। সে পয়সা যাদের আছে তারা বলতে পারে এ কথা! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার নেই কি-না?

২য় ভদ্রলোক। দ্যাখো নির্মলবাবু, অত কথা ভাবতে পারব না বুঝলে, অত কথা ভাবতে পারব না। সংসারে অন্যায় অবিচার দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর লাখো লাখো ঘটছে। এখন

সব কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম তো দেখি সব বন্ধ করে দিতে হয়।

নির্মলবাবু। তা দিতে হয় দেবে। তা বলে—যেটা অন্যায় তাকে প্রশয় দিতে হবে?

২য় ভদ্রলোক। দেব! ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ করে দেব! (সহাস্যে) খুব রসিকতা করতে পারো যা হোক তুমি নির্মলবাবু।

[বড়োকর্তা, তৃতীয়ভদ্রলোক সবাই হো হো করে হাসেন।]

বড়োকর্তা। চলো যাই চলো; ভেতরে চলো।

[ভদ্রলোকদের প্রস্থান।]

সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনের কাছে স্পটলাইটটা জ্বলে ওঠে।
কুকুরটা গর্জে উঠে যেন কাউকে কামড়ে দিলে মনে হয় আর্তনাদ শুনে।
দেখা যায় কুঞ্জ তার ক্ষতবিক্ষত হাতখানা তুলে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রধান। (অন্ধকারের ভেতর থেকে) দুটো খেতে দাও বাবু। ও বাবারা........

রাধিকা। (সভয়ে) ওমা—একেবারে কামড়ে খেলে গো।

[রাধিকা কুঞ্জর দিকে ছুটে যায় ডাস্টবিনের কাছ থেকে।]

(কুকুরের প্রতি) ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা! (কুকুরকে) দুর হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো। ছাই খা, ছাই খা। দূর—থু থু—

[আক্রোশে থুথু ছিটোতে থাকে। নেপথ্যে কুকুরের গোঙানি শোনা যায়।]

ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো। ইস্—স্—স্।

[ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে একফালি ন্যাকড়া বার করে বেঁধে দেয় কুঞ্জের হাতে।]

প্রধান। (নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড়ো বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচাচ্ছে) আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্য। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু! ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটাকে এক মুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু। বাবু—তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু! ও বাবারা, বাবু—ও বাবারা—

[প্রস্থান]

রাধিকা। (কুঞ্জের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে) খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?

কুঞ্জ। না।

কুঞ্জ তাকিয়ে থাকে রাধিকার দিকে সাশ্রুচোখে। রাধিকাও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে ফ্যাল ফ্যাল করে কুঞ্জর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে তারও জল ভরে আসে সব কিছু স্মরণ করে। গভীর মমতায় রাধিকা শুধু কুঞ্জর কপালের ওপর থেকে বিস্রস্ত চুলগুলো সরিয়ে দেয়। হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে ; তারপর বাঁ হাতখানা দেয় রাধিকার মাথার ওপর।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ দৃশ্য

(হারু দত্তের বাড়ি। দুপুরবেলা সামনের-বারান্দায় জলচৌকির ওপর উবু হয়ে বসে তামাক টানছে হারু দত্ত। খানিকটা দুরে বারান্দার এক কোণে জনতিনেক অল্প বয়সী গেঁয়ো স্ত্রীলোক গায়ে কাপড় জড়িয়ে বসে আছে। তাদের মধ্যে দুজন পেছন ফিরে বসে আছে। আর একজন, নাম খুকীর মা—বাল্য বিধবা, হারু দত্তের মুখোমুখি বসে বেশ সপ্রগলভ ভাবেই কথা বলে যাচ্ছে। আর একজন প্রৌঢ় গেঁয়ো লোক উঠোনে বসে আছে।)

হারু দত্ত। (হুঁকোয় বিলম্বিত টান মেরে) গাঁয়ের জন্যে আমি কী করেছি আর না করেছি তা জানে রাজ্যের লোক আর (ওপর তাকিয়ে) ভগবান। বেশি কী বলব। নিজের প্রশংসা নিজে করার তো অভ্যাস নেই কোনোদিন!

খুকীর না। সে আর আপনি কী বলবেন বাবা। আমরা তো জানি। (প্রৌঢ় ব্যক্তিকে) এই তো তোমার গিয়ে সেবার খুকীর অসুখের সময়। কবেকার কথা বলছি, এই গত কার্তিক মাসের কথা। ঐ যে , যে-বার ঝাড়ের দশটা বাঁশ বিক্রি করে ফেললাম তোমারে দিয়ে হরোর বাপ্!

চন্দর। (চিন্তিত মুখে) দশটা না আটটা!

খুকীর মা। দশটা। না, সে এখনও আবার সঠিক মনে রয়েছে! দশটা বাঁশ আমি তোমারে বেচলাম। তিন টাকা দু আনা দাম হয়, তা তুমি তখন আমারে দিলে তিন টাকা, আর খুচরো ছিল না বলে দু আনা আর দিলে না। তারপর সেই দুআনা আবার কাটান্ গেল তোমার গিয়ে পাঁচ পালি ধানে।—মনে পড়ছে?

চন্দর। (ঈষৎ হেসে মাথা নেড়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই ভুল হইছিল বটে, ঠিক ঠিক।

হারু দত্ত। (হুঁকো থেকে মুখ তুলে) মোক্তার হলে পারতিস তুই খুকী মা জজ-কোর্টের।

খুকীর মা। (হেসে) তা আজকালকার মেয়েরা তো বাবা আপনিই বলেনযে, লেখাপড়া শিখে পুরুষ মানুষের সঙ্গো সব পাল্লা দিয়ে আপিস্ কাছারি করছে! তা সে রকম শিক্ষে দীত্রে পেলে বাবাঠাকুর আপনার আর্শীবাদে আমি জজকোর্টের উকিল মোক্তারদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে আসতাম।

হারু দত্ত। (খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে) তা তুই পারতিস খুকীর মা, তুই যা মেয়ে (স্নেহভরে দূর থেকে চড় তুলে) তোকে একেবারে........বড্ড দুষ্টু তুই!

খুকীর মা। তা সে যাগ গে, যে কথা বলছিলাম, হ্যাঁ সেই খুকীর অসুখের সময়। পনেরো দিনের দিন মেয়ের তো ঐ অবস্থা! কী করি! গেলাম ছুটে রমানাথ ডাক্তারের কাছে। কত করে বললাম, বলি—চলুন একটুখানি, মেয়েটাকে একবার শেষ দেখা দেখে আসুন ডাক্তারবাবু, ব্যাজ্ঞাতা করি, পায়ে পড়ি! নাঃ, বললে টাকা ফেল তারপর! কী ধম্মডাকাতে লোক গো! কত করে বল্লাম, আজ দিতে পারছি নে টাকা বাবা, দুদিন পরে নেবেন। কিছুতেই না। তারপর কোথায় যাই কী করি, মনে পড়ল বাবাঠাকুর-এর কথা, ছুটে গেলাম। সামনা সামনি বলছি বলে তোমরা হয়তো ভাববে যে বড়ো বাড়িয়ে বলছে মাগী, কিন্তু বাবাঠাকুরের চরণ ছুঁয়ে আমি বলছি—যে এর ভেতরে একরত্তি মিথ্যে নাই।—সে জানেন আমার অন্তর্যামী। (চোখ বোজে) তা সে কী বলব, আমার মুখ দেখেই বাবাঠাকুর জানতে পারলেন। কিছু বলতে হল না। গেলেন; ওষুধ দিলেন, তিন দিনের দিন মরা মেয়ে আমার ঝাড়া দিয়ে উঠল। এমন কী খুকী যে দিন অন্নপত্যি করবে সে দিন নিজে বাড়ি বয়ে এনে চাল পর্যন্ত দিয়ে গেলেন। বল্লেন খুকীর মা, সে রকম পুরোনো চাল তো তোর ঘরে নেই—রাখ এই কটা, খুকীরে দিস। তাও কম করে তোমার সের দুয়েকের কম নয়। —এই রকম দায়ে পড়ে যখনই গিয়েছি, না-বাক্যি কখনও শুনিনি বাবাঠাকুরের মুখে। আর শুধু কি তোমার আমার বেলায়, যে এয়েছে, যে এয়েছে—। তা সে আপনি কী করেছেন আর না করেছেন তা জানি আমরা, আপনি কী বলবেন।

হারু দত্ত। (হুকো থেকে মুখ তুলে) কিছু না, কিছু না। আমি দেখব তোমার আপদে, তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেন!—কী বল চন্দর?

চন্দর। না, তা, সে তো যথার্থই। এর আর কথা কী!

হারু দত্ত। এই যে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের সব, এ কেন। কেন কী দরকার আমার নিয়ে যাবার উদ্যোগ করে! দু-চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তো! না হলে এতে করে আমার কী স্বার্থ আছে বল, য়্যাঁ! গাঁটের পয়সা খরচ করে, এরে ধরে, তারে ধরে কেন কী দরকার আমার? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবার দরকার কী! অবিশ্যি হ্যাঁ বলতে পার যে না করলেই পার তুমি—

চন্দর। না—তাই আর একটা কথা হল!

হারু দত্ত। না—এই কথার কথা বলছি। বলি মানুষ তো আর সকলেই তোমার আমার মতো না, মন্দলোকও তো আছে সংসারে, না কী! বলতে পারে—মানুষের মুখ চন্দর তুমি এখন ঠেকাবে কী দিয়ে? আজ্ঞে না, বলে, আস্তে আস্তে ন্যাজ নাড়ে, ঐ বাঘেই তো মানুষ মারে, হুঁ হুঁ—বলতে পারে যে, না করলেই পার তুমি এই পরোপকার। বলে কে তোমারে করতে! কী উত্তর দেবে তুমি এ কথার! অথচ দ্যাখো বোঝে না যে, সব মানুষগুলোই

যদি তাদের মতো হত তো কবে উচ্ছন্নে চলে যেত এই সমাজ সংসার, ধ্বংস হয়ে যেত সব।

চন্দর। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে হারু দত্তর চোখে চোখ রেখে) ধ্বংস হয়ে যেত সব!

হারু দত্ত। তা যেত না? (খুকীর মায়ের দিকে তাকায়)

খুকীর মা। হুঁ হুঁ। (হাসে আর মাথা নাড়ে)

হারু দত্ত। তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। (জোর দিয়ে) তারাই তো চালাচ্ছে এই জগৎটা। অনেক চন্দর, এখনও অনেক জানবার বোঝাবার আছে এই জগতে—তো ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো।

চন্দর । আবার টিপ সই দিতে হবে?

হারু দত্ত। ওরে বাবারে—তা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাই—কথা এই বললে, ফুরিয়ে গেল! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মত এট্টা ইয়ে হয়ে থাকল! তো নাও এসো এসো। আমার আবার ওদিকে—ওরে কই রে।

[চন্দর উঠে এসে হারু দত্তের সামনের কাগজে একটি টিপ সই দেয়।]

চেপে দ্যাও আঙ্গুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঃ। যাগগে, ও ঠিক হয়েছে। ওতে কিছু এসে যাবে না। (টিপ-সইটা কাগজ তুলে দেখে) এই তো, দিলে—ফুরিয়ে গেল!

চন্দর। (আবেগ ভরে) বাবা, দেখো আমার মেয়েটা য্যানো—

[কণ্ঠরোধ হয়ে আসে চন্দরের।]

হারু দত্ত। কিচ্ছু বলতে হবে না, কিচ্ছু বলতে হবে না। সে দায়িত্ব যখন নিইছি আমি—

চন্দর। না, তাই বলছি বাবা, তিন বছর বয়সে মা মারা গেছে, তারপর থেকে বলতে গেলে এক রকম নিজে হাতে করেই—(চোখ মোছে) তা আর আমার গর্বের কিছু থাকল না। (কেঁদে ফেলে)

হারু দত্ত। (কৃত্রিম অভিমানের সুরে জোরে) ফের্ আবার তুই মেয়ের জন্যে দুঃখ করছিস! মেয়ে তোর, মেয়ে আমার না!

খুকীর মা। (চন্দরের প্রতি) দুঃখু কর কেন? মেয়ে তোমার ভালোই থাকবে।

হারু দত্ত। য়্যাঁ—আরে কইরে!

[নেপথ্যে 'যাই বাবু'।]

দুত্তুরি তোর নিকুচি করেছে যাই বাবুর! বলি ঘাটে নৌকা এয়েছে?

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। (সপ্রতিভভাবে) তুলে ফেলব বাবু জিনিসপত্তর সব নৌকায়।

হারু দত্ত। তুলে ফেলব—এতক্ষণ কী করছিলি? গিয়েছিস তো সেই কবে।

ভৃত্য। নৌকা আনতে গিছলাম বাবু ঘাটে।

হারু দত্ত। ওঃ গিছলে তো একেবারে উদ্ধার করেছ আমাদের। ব্যাটা হারামজাদা কোথাকার! নৌকা আনতে কতক্ষণ লাগে! ক'দিনের পথ এখান থেকে? আবার মুখে মুখে তক্ক করছে দাঁড়িয়ে! চোখ নামা, চোখ নামা, ব্যাটা ছুঁচো কোথাকার চোখ নামা!—দিনে দিনে পৌঁছুতে না পারি তো দেখিস'খন তখন।

ভৃত্য। তা ভাটা পড়েছে টেনে যাব'খন।

হারু দত্ত। যাবে তো আর এখানে দাঁড়িয়ে রুপে দেখাচ্ছ কাকে, যাও!

[ভৃত্য প্রস্থানোদ্যত]

আর শোন, তিন দাঁড় করতে বলবি।

ভৃত্য। ভাটা পড়ছে, দু দাঁড়েই মেরে দেব'খন.......

হারু দত্ত। না, আর মেরে দিতে হবে না। তিন দাঁড় করতে বল-গে, এ হে-হে-হে। ভৃত্যের প্রস্থান।

[হুঁকোটি হাতে নিয়ে মেয়েদের প্রতি]

তো এগোও, এগোও তোমরা সব আস্তে আস্তে। নে যা খুকীর মা এদের সব।

[মেয়েদের প্রস্থান।]

তা হলে চন্দর, তোমার হল গিয়ে—(ট্যাঁকে কাপড়ের পুঁটলি থেকে নোট বার করে গুনে দেয়) নাও ধর—

[দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভরা চন্দর কুণ্ঠিত হাতে টাকা নেয়]

এখন এই নাও; তারপর ঘুরে আসি আমি—যা দিয়ে যা হয়—(তামাক টানে)

চন্দর। মেয়ে বিক্রি করলাম আমি! মাতিরে আমি বেঁচে ফেললাম। (কেঁদে ফেলে) মাতি, আমার মা, মাতঙ্গিনী—

[চন্দরের প্রস্থান।]

(হারু দত্ত তিন মাথা এক করে জলচৌকির উপর উবু হয়ে বসে টর টর শব্দে তামাক টানে আর চন্দরের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে।)

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম দৃশ্য

সেবাশ্রমের একটি কক্ষ। বিনোদিনী জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে; আর নিরঞ্জন ঘরের মাঝখানটার মাটির দিকে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে

যেন আক্রোশে ফুঁসছে কার ওপর। নিদারুণ একটা প্রতিহিংসা চক্ চক্ করছে নিরঞ্জনের চোখে মুখে।

বিনোদিনীর পরনে মোটামুটি একখানা আধময়লা শাড়ি। নিরঞ্জনের গায়ে ছোট ঝুলের একটা ছিটের হাফ শার্ট, পরনে ন-হাতি একখানা আধময়লা ধুতি। খালি পা, অসংস্কৃত হাবভাবের দরুণ পরিবেশের সঙ্গে মোটেই খাপ খাচ্ছে না যেন কাউকেই।

বিনোদিনী। (হঠাৎ বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে) শুধু কি এই! সে নির্যাতনের কথা মুখে বলে বোঝানো যায় না।

নিরঞ্জন। (হাতের তালুতে ঘুষি চেপে) এর প্রতিশোধ আমি—(অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে) আচ্ছাঃ।

বিনোদিনী। (ভাঙা গলায়) মাখন মরণাপন্ন, দিদির অসুখ, মাঠে মাঠে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার দাদা—

নিরঞ্জন। (স্বগত) দাদা!

বিনোদিনী। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার দাদা, কোথায় একটু ওষুধ, কোথায় একটু পত্যি,— আর তোমার জ্যেঠা, তার কথা তো বলবারই না— দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা কেবল শ্রীপতি-ভূপতির কথা। ঘুর-ঘুট্টি অন্ধকার, চারদিকে সাপখোপের ভয়, মড়কের দেবতা বাতাসের কাঁধে ভর করে কেঁদে বেড়াচ্ছে আগানে বাগানে সাঁই সোঁ—ঘরের বাইরে বেরুতে সাহস করে না মানুষ—কে কার কথা শোনে, বুড়ো অমনি চল্ল বন-বাদাড় ভেঙে, বলে এট্টু খোঁজ করে আসি আমি শ্রীপতি-ভূপতির। সে দেখাও যায় না, সওয়াও যায় না। আর এই অবস্থার ওপর দত্তর সে কী অত্যাচার! জীবনে আমি কোনোদিন সে-সব কথা ভুলব না!

নিরঞ্জন। গাঁয়ে কী কেউ মানুষ ছিল না যে তার প্রতিবাদ করে!

বিনোদিনী। ছিল, কিন্তু দত্তর ওপর কথা বলে কে? জীবন না তার চলে যাবে অপঘাতে।

নিরঞ্জন। (আক্রোশে) অপঘাতে! তো দেখি আজ কোথায় গিয়ে পড়ে সেই অপঘাত, দেখি (পায়চারি করে)

[রাজীবের প্রবেশ]

রাজীব। (নিরঞ্জনকে লক্ষ করে) আরে পাঁয়তারা ভাঁজিস নাকি রে রাখ—(হঠাৎ বিনোদিনীকে দেখে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) এইডা কী! রাখহরি! (বিনোদিনীকে) তুমি এইহানো আইছ ক্যান! বলি এইহানো তোমার কী প্রয়োজনটা, য়্যাঁ। আচ্ছা বলতো দেখি বাবু দ্যাখলে কী কইতো। যাও ভিতর যাও। যাও কইত্যাছি আমি তোমারে ভিতরে যাও। যাও।

[নতমুখে বিনোদিনীর প্রস্থান।]

রাখহরি! সুট সুট কইর‍্যা ঘরে ঢুইক্যা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ চুপ কইর‍্যা আছস্ অহন, কথা যে কস্ না বড়!

নিরঞ্জন। কী সুট সুট করে ঘরে ঢুকে!

রাজীব। কী তা জানস্ ভালো তুই, আমারে জিগাস করে আহাম্মক। কইত্যাছিলা কি তুই ওয়ারে! ভাবস্ বুইড়্যা কিছু ঠাহর পায় না, না......বেটা প্রেমালাপ করনের আর জায়গা পাইলা না!

নিরঞ্জন। চেঁচাবেন না আপনি শুকনের মতো। আমরা অন্য কথা বলছিলাম।

রাজীব। (দুটো কাঁধ একটু তুলে) কী, কী কইলি! শকুন, আমি চেঁচাই শকুনের মতো, নাকি! খারা তোর ত্যারা ত্যারা কথা আমি ছুটাইয়া দিত্যাছি; খারা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) সিংহের মুখের খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিচ্ছিস তাইতো! বাবু তোরে আজ করে কী দেহিসনে........বেটা ছুটলোক আস্পর্ধা পাইলে কী আর রক্ষা আছে না!

[বেগে কালীধনের প্রবেশ]

কালীধন। সরকার মশাই যাবেন না দাঁড়ান আপনি। (নিরঞ্জনকে) দাঁড়াও তুমি। (রাজীবের প্রতি) জ্ঞানদার কাছ থেকে আমি কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি। ব্যাপার কী আমায় খুলে বলুন সরকার মশাই। বলুন, গোপন করবার দরকার নেই আমার কাছে বলুন!

রাজীব। (মাথা চুলকে) কবা বা কী! কী রে রাখহরি, কথা যে কস্ না অহন, জবাব দে!

কালীধন। (নিরঞ্জনের প্রতি) তুমি জানো এটা সেবাশ্রম!

রাজীব। আমি তো তোমারে বরাবরই কইয়্যা আসত্যাছি কালীধন যে এই ছুটলোকগুলোরে তুমি কখনই প্রশ্রয় দিবা না। তা তো শুনবা না; তা তোমার শোননের জো নাই। আরে এগুলা কি মানুষ!

[নিরঞ্জন রাজীবের প্রতি কটাক্ষ করে।]

কালীধন। (নিরঞ্জনের প্রতি) বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে। তোমার মত কর্মচারী আমার কোনো দরকার নেই। (প্রচণ্ড ধমকের সুরে) বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান। বেগে বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদিনী। আমি যাব, আমাকে ছেড়ে দাও। দাও, আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাব।

রাজীব। (বাধা দিয়ে) আরে এইডা কী কর! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দর মহলে। বাইরে যাবা ক্যান। যাও ভিতরে যাও।—কী আশ্চর্য!

বিনোদিনী। ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি যাব।—যেতে দাও আমাকে।

কালীধন। জ্ঞানদা!

[জ্ঞানদার প্রবেশ।]

(ইঙ্গিত করে) ভেতরে নিয়ে যাও ওকে।

জ্ঞানদা। (বিনোদিনীর হাত ধরে) চ, আহা ও রকম করতে নেই চ, আ—য়!

[বিনোদিনীর হাত ধরে জ্ঞানদার প্রস্থান। রাজীব গমনোদ্যত]

কালীধন। সরকার মশাই! আপনি ওর পাওনা-গণ্ডা যা হয় মিটিয়ে দিন এক্ষুনি যেমন করে হোক। ওকে আর এখানে রাখা চলবে না—ঘরের লোক যদি বিশ্বাসঘাতক হয় তো—

রাজীব। আরে আমিও তো তাই কই। বলে এই ছুটলোকগুলোরে তুমি প্রশ্রয় দিবা না। কিন্তু তা তো শুনবা না, তোমার যত কারবার হইল এই সব ছুটলোকগুলার সঙ্গে। আরে এগুলো কি মানুষ!

কালীধন। আচ্ছা সে আপনাকে দেখতে হবে না, যান, যা বললাম তাই করুন গিয়ে, যান।

রাজীব। আরে যাইতেছি, আমার লাইগ্যা কি? আমি তো যাইয়াই আছি, হ-অ-অ—

[প্রস্থান।]

কালীধন। হ্যাঁ, তাই যান এখন।.........আচ্ছা কারবার যা হোক। ধীরে সুস্থে যে একটু গুছিয়ে বসব আর কাকেই বা কী বলি; হয়েছেই যত সব।

[একটা বড়ো কুশান চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।]

এই কে আছিস্!

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। (সেলাম করে) বাবু।

কালীধন। আচ্ছা কী করিস তোরা সব ওখানে বসে বসে বলত, ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না!

ভৃত্য। আজ্ঞে সঙ্গে সঙ্গেই তো এসে পড়েছি!

কালীধন। সঙ্গে সঙ্গেই?

ভৃত্য। আজ্ঞে—

কালীধন। চুপ চুপ। বিকেলবেলা কে ছিল, গেটে?

ভৃত্য। বিকেলবেলা, আজ্ঞে আমিই ছিলাম।

কালীধন। রাখহরি এখানে এসেছিল কখন?

ভৃত্য। আজ্ঞে সে তিনি তো এয়েছেন সেই দিনমানে।

কালীধন। দিনমানে!

ভৃত্য। আজ্ঞে।

কালীধন। হুঁ, কিন্তু আর কখনও যেন ওকে সেবাশ্রমে ঢুকতে দেওয়া না হয়!

ভৃত্য। ঢুকতে দেব না!

কালীধন। না, তবে আর বলছি কী, ঢুকতে দিবি নি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে।

কালীধন। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে নি।

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীধন। হ্যাঁ, ঠিক থাকে যেন।

ভৃত্য। আজ্ঞে।

কালীধন। আর রামরতনবাবু এলেই আমাকে একবার—

[নেপথ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ ; বাইরে তাকিয়ে ভৃত্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।]

কী দেখছিস ও দিকে!

ভৃত্য। আজ্ঞে ঘোড়ার গাড়ি করে কারা যেন এলেন মনে হচ্ছে।

কালীধন। ঘোড়ার গাড়ি করে!

ভৃত্য। (একটু লক্ষ করে) আজ্ঞে ঠিক চিনতে পাচ্ছি নে। তবে তিন চারদিন আগে এই দুপুরবেলার দিকে কোট পরা একজন বাবু মতো লোক এইছিলেন, দেখতে অনেকটা তাঁরই মতো— সঙ্গে আবার দু'জন (ভালো করে তাক করে) হ্যাঁ দুজনাই তো, মেয়ে-নোকও রয়েছে দুজনা।

কালীধন। মেয়ে লোকও আছেন! (উঠতে উঠতে) ঘোড়ার গাড়ি করে মেয়ে লোক! কে আবার এল চল্ চল্ তো দেখি।

[ভৃত্যসহ কালীধনের প্রস্থান ত্রস্তে নিরঞ্জন ও বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদিনী। (চাপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে) কারা?

নিরঞ্জন। (ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে) চুপ। দত্ত। সেই হারু দত্ত।

বিনোদিনী। হারু দত্ত!

নিরঞ্জন। (শব্দ করে) স্-স্-স্! এই বাবু ওর মহাজন কি না! তাই মাঝে মাঝে আসে এখানে। কিন্তু মেয়ে দুটো—

[বিস্মিতের ভঙ্গিতে তাকায়।]

বিনোদিনী। কারা ওরা?

নিরঞ্জন। ঠিক ঠাওর করতে পারছিনে, তবে দুরে থেকে মুখের আদলটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি। ঠিক স্মরণে আসছে না। তবে দত্তর সঙ্গে যখন এয়েছে তখন ও আমাদের গাঁয়ের মেয়ে না হয়ে যায় না। উঃ শালা—যাক ঠিক আছে এইবার সব কটাকে এক সঙ্গে পেঁচিয়ে —দাঁড়াও।

বিনোদিনী। (অপ্রস্তুত ভাবে) কী করবে কী?

নিরঞ্জন। কিছু না, তুই চুবো। শোন, একেবারে ভেতরে চলে যাবি, ভেতরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবি, বুঝলি? কারো সঙ্গে কোনো কথা কি অন্য কিছু বলবার দরকার নেই। একেবারে চুপ। আমি চল্লাম।—

[গমনোদ্যত]

বিনোদিনী। আচ্ছা......কিন্তু তুমি চললে কোথায় তুমি?

নিরঞ্জন। সে বলব'খন পরে, কিন্তু ঐ যা বললাম, যা পালা শিগগির—

[নিরঞ্জনের দ্রুত প্রস্থান]

[জ্ঞানদার প্রবেশ।]

জ্ঞানদা। ওমা আমার কী হবে গো! তুই এখানে এমন একলাটি দাঁড়িয়ে কেন লা। যা ভেতরে যা, ভেতরে যা। ভদ্দরলোকেরা আসবে এখন, যা ভেতরে যা!

[বিনোদিনীর প্রস্থান।]

(বাইরে তাকিয়ে বড়ো বড়ে চোখ করে) আবার কে এল গা, কারা? (একটু দেখে ঠাওর করতে না পেরে) যাগ্‌গে বাবা, অত কথায় কাজ কী আমার, য়্যাঃ।

[হাত-ধরাধরি করে হারু দত্ত ও কালীধনের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা টেনে ত্রস্ত পায়ে জ্ঞানদার প্রস্থান।]

কালীধন। (হাসতে হাসতে) তাই আমি ভাবি, যে সেই যে গেল দত্ত—এ দত্তর চিঠি নেই পত্তর নেই। ওরে তামাক দে রে।

হারু দত্ত। (হেসে) আরে ভাই সে ঝামেলার কথা আর বল কেন! এই দেব দিচ্ছি করতে করতেই সকাল থেকে রাত এগারটা অবধি নিঃশ্বেস ফেলবার সময় পেইছি কোনোদিন! ওদিকে মহাজনের তাগিদ, কন্ট্রাক্টরের চাহিদা, তারপর আবার তোমার গিয়ে এই—(হেসে) একেবারে ব্যতিব্যস্ত সদা সর্বদা।

কালীধন। মহাপুরষ তুমি হারু দত্ত। এতগুলো তাল তুমি সামলাও কী করে এক হাতে। চাড্ডিখানি কথা নয়।

হারু দত্ত। সামলাতে হয় ভাই ; সামলাতে হয়। না সামলে উপায় কী বলো! খেটে যখন খেতে হবেই তখন..........

কালীধন। (সহাস্যে) উ—ঃ—ঃ বড্ড জোর বলেছ হে য়্যাঁ, আরে তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথায়!

হারু দত্ত। (কালীধনের উরুতে ঠেলা মেরে) যাঃ, কী যে বল মাইরি.......

কালীধন। তা বেশ তো হল, এইবার শহরে একখানা বাড়ি-টাড়ি, বল তো দেখি—সস্তায়-মস্তায় করে দি। লোক আছে আমার হাতে।

[আন্তরিকতার আধিক্য হেতু হারু দত্তের গলার ঘামাচি মেরে কালীধন দত্তর মুখের দিকে চেয়ে রইল।]

হারু দত্ত। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) কী, শহরে বসবাস! না বাবা, ও আমার ধাতে সইবে না। আরে ভাই আমরা হচ্ছি তোমার যাকে বলে গিয়ে জাত গেঁয়ো লোক, ও শহরে চালচলন বরদাস্ত হবে না আমাদের ধাতে।

[ভৃত্য তামাক দিয়ে গেল।]

কালীধন। (হারু দত্তর গায়ে ঠেলা মেরে) গেঁয়ো চালচনটা কী রকম! (খ্যাক খ্যাক্ করে হাসি) গেঁয়ো চালটা শহরে চালের চেয়ে কী কম বাবা—(আরও হাসি) উ-রি বাবারি বাবারি; আশ্চর্য করে দিলে তুমি আমায়—

[সহসা মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল।]

[দারোগা ও জনকয়েক কনস্টেবল সহ নিরঞ্জন এবং কতিপয় ভদ্রব্যক্তির প্রবেশ।]

দারোগা। আপনার নাম কালীধন ধাড়া?

কালীধন। (দারোগার দিকে তাকিয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু—

[হারু দত্তের দিকে তাকায়।]

দারোগা। আশ্চর্য হলে নাকি!

কালীধন, হারু দত্ত অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। হারু দত্তর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে শঙ্কায়।

কালীধন। তা আপনারা এখানে...

দারোগা। হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পারছেন না, (হারু দত্তকে) আপনার নাম কী?

হারু দত্ত। এই সেরেছে, (দারোগার দিকে ঘুরে অপ্রতিভভাবে) আমার নাম বলছেন?

দারোগা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কী নাম আপনার—

হারু দত্ত। আমার নাম হারানচন্দ্র দত্ত।

১ম ভদ্রলোক। হারানচন্দ্র দত্ত! কেষ্ট ঠাকুরের শত নাম।

দারোগা। পুরানচন্দ্র দত্ত হারু দত্ত, কেমন?

হারু দত্ত। (থতমত খেয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। হুঁ, (কালীধন ও হারু দত্তর প্রতি) মেয়েদের কোথায় রেখেছেন?

কালীধন। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) মেয়েদের? কী বলছেন স্যার! এটা সেবাশ্রম।

দারোগা। হ্যাঁ, তা সেবাশ্রমে মেয়ে থাকবে না?—বিশেষ উদ্যোগী যখন আপনারা, য়্যাঁঃ! বলুন বলুন চট্ করে বলুন, নইলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে বলে দিচ্ছি। বলুন।

১ম ভদ্রলোক। ধান চালের কারবারের সঙ্গে সঙ্গে সবার সাত রকম ব্যবসা ফেঁদে বসেছে দেখছি। সাংঘাতিক খুনে তো।

দারোগা। বলুন! (রাখহরির প্রতি) কই, যাও তো তুমি কনস্টেবলদের নিয়ে ভেতরে গিয়ে বার করে নিয়ে এসো সব মেয়েদের।

নিরঞ্জন। এসো তোমরা সব আমার সঙ্গে।

[কনস্টেবলগণ ও নিরঞ্জনের প্রস্থান।]

ভদ্রলোক। উঃ, একেবারে চারদিক থেকে লক্ষ্মীলাভের ব্যবস্থা আর কী। ধানচালের কারবারের সঙ্গে সঙ্গে সবার... এই লোকটাই তো সেদিন মশাই আমাকে চাল দেয়নি। অথচ গুদামজাত করে রেখেছে যে কত হাজার মণ চাল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু চান, দেখবেন অমনি হাত উলটে বলবে—নেই। ঠগ কোথাকার!

[দারোগা সব নোট করে নেয়।]

কালীধন। বলুন, বলে নিন। আমাদের কথার যখন কোনো মূল্যই নেই তখন—

ভদ্রলোক। মূল্য নেই, মূল্য রেখেছ? খুনে কোথাকার! (দারোগার প্রতি) দেখুন না মশাই, মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখায় যেন সাধু পুরুষ সব, যত অন্যায় অত্যাচার করছি আমরা ওদের ওপর। উঃ, সার্থক জোচ্চোর তোমরা বাবা। ভিটেয় ঘুঘু চরাতে তোমরাই পারো।

দারোগা। (ভদ্রালোকের প্রতি) আঃ!

[নিরঞ্জন, চন্দরের দুই মেয়ে, বিনোদিনী, জ্ঞানদা, রাজীব, কনস্টেবলদ্বয় ও ভৃত্যের প্রবেশ। এই সমস্ত লট!]

নিরঞ্জন। না, (চন্দরের দুই মেয়েকে দেখিয়ে) এই এঁরা দুজন হচ্ছেন আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, ঐ দত্ত এদের চুরি করে নিয়ে এসেছে।

হারু দত্ত। চুরি করে আনেনি দত্ত।

দারোগা। আপনি চুপ করুন। (নিরঞ্জনকে) হ্যাঁ তারপর বল।

নিরঞ্জন। (বিনোদিনীকে দেখিয়ে) আর উনি হচ্ছেন আমার ইস্ত্রী। পেটের দায়ে শহরে এসে উঠলে পরে ঐ বাবুর লোকদের চোখে পড়ে এখানে এসে ওঠে।—আমি এখানে ঐ বাবুর দোকানেই একজন গোমস্তা—তাই হঠাৎ একদিন সাক্ষাৎ হয়ে যেতেই আমি বল্লাম বলি তুমি এখানে তা বললে—

দারোগা। যাক সে উপন্যাস পরে শোনা যাবে। আপাতত তুমি বলছ যে উনি তোমার স্ত্রী কেমন?

নিরঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মকথা। (বিনোদিনীকে) কী গো বল না!

[বিনোদিনী নড়ে চড়ে দাঁড়ায়।]

দারোগা। (হেসে) যাকগে, তারপর, তুমি এই বাবুর গোমস্তার কাজ করতে?

নিরঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, চালের গুদোমে কাজ করতাম।

দারোগা। গুদোমে মানে দোকানে।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ তা, মানে আমি গুদোমেই কাজ করতাম কিনা।

দারোগা। গুদোমে, তা কী পরিমাণ চাল আছে এখনও সেখানে?

[হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা যায় কালীধনের চোখে-মুখে]

নিরঞ্জন। তা সে বিস্তর মণ।

ভদ্রলোক। বিস্তর মণ মানে আন্দাজ কত মণ।

নিরঞ্জন। তা সে আপনার গিয়ে সওয়া লাঘ মণটাক হবে।

দারোগা। স-ও-য়া লা-খ মণ!

নিরঞ্জন। (থতমত খেয়ে) মানে আমি এট্টা আন্দাজে বললাম কম বেশিও হতে পারে।

দারোগা। দ্যাট্স্ অল্ রাইট। (রাজীবকে লক্ষ্য করে, নিরঞ্জনকে) উনি কে?

নিরঞ্জন। উনি ঐ বাবুর ডান হাত, সরকার মশাই।

ভদ্রলোক। (শ্লেষভরে) উনি নাকি আবার জজ ম্যাজিস্ট্রেট সব ট্যাঁকে রাখেন বলেন।

দারোগা। আচ্ছা!

রাজীব। এই আমি ঐ কথা কই নাই।

দারোগা। চুপ করুন আপনি। (কনস্টেবলগণকে) এই তিনোকো হাতকড়ি লাগাও।

(কনস্টেবলগণ কালীধন, হারু দত্ত ও রাজীবকে হাতকড়ি পরিয়ে দিল।
হারু দত্ত ও কালীধন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আকারে ইঙ্গিতে
এমন ভঙ্গি করল যেন হাতকড়ি ছাড়িয়ে আসতে তাদের কোনোই অসুবিধে হবে না।)

৪৭.১০ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ দ্বিতীয় অঙ্ক)

যুদ্ধ বন্যা মহামারী আর এরই কোলে স্বচ্ছন্দ বর্ধিত, কালনাগ রূপ হারু দত্তের অত্যাচারে অতঃপর প্রধান সমাদ্দার হয় ঘর ছাড়া, গ্রাম ছাড়া। গোটা পরিবারটা অসহায়তার সমুদ্র সাঁতরে এসে ওঠে শহরের এক পার্কে। অসংখ্য ভিখিরিদের ভিড়ে আত্মসম্মান বোধটুকু বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল সকলে একসঙ্গে মিলে। সেখানেও অশমি সম্পাত ঘটে গেল। এই অশনি সম্পাতে গোটা পরিবারটা বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল দুটি টুকরোয়। বাজার খোলায় খিচুড়ি দেওয়া হবে, অন্যান্য ভিখিরিদের সঙ্গে সেই দিকে যায় কুঞ্জ, রাধিকা। আর ঘটনার অভিঘাতে মস্তিষ্কের ভারসাম্যবিহীন সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বয়স্ক প্রধান সমাদ্দারও অন্যান্য ভিখিরিদের পিছু পিছু সেও কোথায় যায়। ক্ষুধার আতিসহ্য দুর করবার আত্যন্তিক আগ্রহে তারা সকলেই বিস্মৃত হয়ে গেছে বিনোদিনীর কথা। বিনোদিনীকে তাই পিছনে ফেলে চলে গেল তারা। 'এমন সময় হন্দদন্ত হয়ে বিনোদিনী প্রবেশ করল।' কুঞ্জ, রাধিকা, প্রধানকে না দেখে অবাক হ'ল। 'ওমা এরা সব গেল কোথায় গো।'

[দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

অতঃপর বিনোদিনী গিয়ে পড়ল টাউটের পাল্লায়। সে অসহায় বিনোদিনীকে খাবার থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবার নাম করে নিয়ে এসে তুলে দিল কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রমে।

কালীধন ধাড়া একজন চালের চোরাকারবারী। সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধের অবদান। অল্প পয়সায় চাল কিনে গুদামজাত করে সে বেশি পয়সায় বিক্রি করে গুপ্তপথে। তার গুদোমে চালের যোগান দেয় দালাল হারু দত্ত। সেও টাকার লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে ধান চাল সংগ্রহ করে সবিশেষ কম দামে, অভাবের সুযোগে লোককে ঠকায় আবার সুযোগমত জমি ধরে টান মারে। নিজের জন্যে মোটা মুনাফা রেখে কালীধনের গুদামে তুলে দেয় বস্তা বস্তা চাল। কালীধন তার ওপর লাভের মোটা অঙ্ক চাপিয়ে দাম বাঁধে আকাশছোঁয়া, সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় চাল। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। কেবলমাত্র সস্তা হয়ে যায় মানুষের জীবন। গরীব দুঃস্থ বাবার অবিবাহিত মেয়ে বা অভাবগ্রস্ত স্বামীর অল্পবয়সী বৌ অতি সস্তায় চলে আসে কালীধনের সেবাশ্রমে। হারু দত্ত চালের চোরাকারবারের সঙ্গে এ কারবারটাও করে গুছিয়ে। সেও চালের সঙ্গে অল্পবয়সী মেয়েদের কিনে নিয়ে কালীধনের সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে।

কালীধনের এই সেবাশ্রমে হারু দত্তছাড়া মেয়ে সরবরাহ করবার জন্য অনেক দালালচক্র শহরের অলিগলিতে, পথে পার্কে ঘোরাফেরা করে। এমনি এক দালাল সমাদ্দার পরিবার থেকে বিশ্লিষ্ট বিনোদিনীকে পার্ক থেকে তুলে এলে কালীধনের সেবাশ্রমে বিক্রি করে দিয়ে যায়! এখানে বিনোদিনী অতর্কিতভাবে মিলিত হয় তার স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

নিরঞ্জন প্রধান সমাদ্দারের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র। সে সমাদ্দার পরিবারে বিপর্যয়ের পূর্বে স্ত্রী এবং অন্যান্যদের ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল উপার্জনের আশায়। বাড়ি থেকে চলে এসে কাজ নিয়েছিল কালীধন

ধাড়ার চালের গুদামে। হঠাৎ একদিন চালের গুদাম থেকে এসে উঠেছিল কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রমে। এখানেই সে মিলিত হয় বিনোদিনীর সঙ্গে।

বিনোদিনীর কাছে সেবাশ্রমের অবৈধ এবং ন্যক্কারজনক বিবরণ শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়। ফন্দি আঁটে বিনোদিনীর সঙ্গে। থানাতে গিয়ে সেবাশ্রমের সমস্ত নোংরা বিবরণ, কালীধনের গুদোমে গুদামজাত চালের পরিমাণ এবং কালো বাজারে সেই চাল বেশি দামে বিক্রির বিবরণ পেশ করে। সেই সঙ্গে চাল ও মেয়ে সরবরাহকারী হারু দত্তের নামও উল্লেখ করে। ঘটনাচক্রে সেই ব্যক্তিটিও থানায় এসে পড়ে, যে কালীধনের চালের দোকানে চাল কিনতে গিয়ে কালীধনের চাহিদামত অর্থ দিতে পারেনি বলে একদিন বিতাড়িত হয়েছিল।

সমস্ত বিবরণ শুনে দারোগা সাক্ষীসহ নিরঞ্জনকে নিয়ে অতর্কিতে কালীধনের গুদামে হানা দেয়। সেইদিনই হারু দত্ত দুটি কিশোরীকে তার অভাবী বাবার কাছ থেকে অল্প টাকায় কিনে এনে তুলেছিল কালীধনের সেবাশ্রমে। দারোগা বামালসমেত কালীধন এবং হারু দত্তকে ধরে ফেলে। হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

নিরঞ্জন বিনোদিনী তারপরে চলে আসে তাদের গ্রামে, আমিনপুরে। বন্যা এবং দুর্যোগ তখন কেটে গেছে। গ্রামে ফিরে তারা তাদের ভাঙা ঘরখানা জুড়ে তেয়ে "আবার বাসোপযোগী করে নিয়েছে।" গ্রামে থাকা বা ফিরে আসা চাষীদের সঙ্গে মিলেমিশে মাঠে চাষ করে। ফসল কেটে ঝেড়ে ধান গোলায় তোলে।

অপরদিকে, প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা পার্ক থেকে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে লোকের বাড়ি উচ্ছিষ্ট ও ফ্যান ভিক্ষে করতে করতে এসে পড়ে এক বড়লোকের বিরাট বাড়ির সামনে। সেদিন সে বাড়িতে বিবাহের বিরাট উৎসবের আয়োজন। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে একমুঠো ভাতের জন্য অনেক চিৎকার করে। কাতর প্রার্থনা জানায় একটু খাবারের জন্য। প্রধান নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড়ো বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচাতে থাকে, 'আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু! ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটারে একমুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু! বাবু—তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু! ও বাবারা, বাবু—ও বাবারা... ' কিন্তু বিবাহের উৎসবে মত্ত মানুষদের কানে সে কাতর প্রার্থনা পৌঁছয় না।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

বাড়ির বড়ো কর্তা এবং তার বড়লোক বন্ধুরা তখন পারস্পরিক বৈভব আর প্রাচুর্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত। ভিখিরিদের প্রতি একটু করুণা বিতরণের সহৃদয় অন্তঃকরণটা চোরাপথে উপার্জিত তাদের ঐশ্বর্যের চাপে বিকৃত বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। এখান থেকে একরাশ নৈরাশ্য আর হতাশা বুকে নিয়ে পেটভর্তি ক্ষুধায় কাতরাতে কাতরাতে কুঞ্জ আর রাধিকা এসে ওঠে এক লঙ্গারখানায়। এখানে আসবার আগে প্রধান মানসিক চাপে, অনেকটা ভারসাম্য হারিয়ে দলছুট হয়ে গিয়েছিল।

৪৭.১১ মূলপাঠ □ নবান্ন ঃ তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(নিখরচার লঙ্গরখানা। ম্যারাপের থামে পোস্টার লটকানো—ফ্রি-কিচেন। মঞ্চের গভীরে বহু নিঃস্ব নিরন্ন ভিড় করে বসে আছে। চুপ করে নেই কিন্তু কেউ-ই। কথায় বার্তায় ভাবভঙ্গিতে সবাই মুখর করে তুলেছে পরিবেশ। সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে কুঞ্জ ও রাধিকাকে। হঠাৎ নেপথ্যে থেকে জনৈক ভিখারিনীর তীব্র আর্তকণ্ঠ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে অঝানা শঙ্কায়। কারো কারো চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে মুখটা ফাঁকা হয়ে যায়। জনৈক রোগশীর্ণ বৃন্ধ ভিখারী তিন মাথা এক করে বসে কাশে, কাশে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে বিশ্ব সংসারের পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত চেয়ে দেখে।)

১ম ভিখারিনী। (নেপথ্যের চিৎকার ক্ষীণতর হয়ে এলে) দ্যাখো দিনি কাণ্ড হুঁঃ (আশেপাশের পাঁচ জনের প্রতি) আচ্ছা, নিবি তো সব একসঙ্গে করে ধরে নিয়ে যা না বাপু, য্যাঁ. সেই না কথা! তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কী রকম ধারা বে আক্কেলে কাণ্ড! (চেঁচিয়ে মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এট্টা প্রাণে এট্টা কথা বলল না!

১ম ভিখারি। (উৎকর্ণ হয়ে) তা চেঁচাচ্ছে কেন, ওরকম করে?

১ম ভিখারিনী। ওমা, ধরে নিয়ে যাচ্ছে তা চেঁচাবে না। কী বলে!... ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে সব ইনজিশন দিয়ে দিচ্ছে। আমি জানি।

জনৈক বৃন্ধ ভিখারি। (কাশতে কাশতে) ও সব ধরে নিয়ে যাবে। কেউ থাকবে না। এইবার যে যেখানে পারো পালাও! পালিয়ে যাও সব। নইলে যে ভাবছ নঙ্গারখানার ভিতরি আছ বলে তোমাদের সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, হে হে হে হে (হেসে) সে ভেবো না মনে। ও সব ধরে নিয়ে যাবে। পালিয়ে যাও এইবার। সময় থাকতে চলে যাও! সময় থাকতে চলে যাও সব।

কুঞ্জ। যাচ্ছে নিয়ে কোথায় সব নরি ভরতি করে!

২য় ভিখারি। কী জানি! কেউ বলছে ধরে ধরে নাকি সব যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ বলছে সমত্থ চাষী লোক যারা তাদের সব দেশ ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে!

১ম ভিখারিনী। ইনজিশন্ দিয়ে আবার মেরেও ফেলছে অনেক।

কুঞ্জ। দূর ও মিথ্যে কথা।

২য় ভিখারি। না তা বলা যায় না, হতে পারে।

কুঞ্জ। পাগল, না মাথা খারাপ। আরে যে ইনজিশনে মানুষ মরে, প্রাণঘাতী হলেও তো

তার নিজস্ব এট্টা দাম আছে। আর তোমার আমার জীবন—কী দাম আছে এ জীবননের? কিছু না। এমনিই বলে তাই উজোড় হয়ো গেল, য্যাঁঃ।

২য় ভিখারি। তো নরি ভরতি করে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় সব ধরে-ধরে?

৩য় ভিখারি। শুনি তো অনেক কথাই। কেউ বলে ধান নাকি এবার এত হয়েছে যে কাটবার পর্যন্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চাষী লোকদের সব গেরামে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আবার শুনছি—

কুঞ্জ। তার চাইতে ও নিজের থেকে হেঁটে চলে যাওয়াই ভালো, একেবারে পায়দলে। কাজ কী গিয়ে মিছে অত হাঙ্গামায়।

২য় ভিখারি। হ্যাঁ, ও নরিতে করে আবার কেডা কোন্‌দিকে নিয়ে যায় তার ঠিক নেই!

কুঞ্জ। (হাত তুলে) হ্যাঁ এই বাগে একেবারে সিধে গিয়ে ওঠ উত্তরে, নেই কোনো ঝামেলা।

২য় ভিখারি। কোন্ দিকে বললে?

কুঞ্জ। (হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে) কেন সোজা এই উত্তরে।

২য় ভিখারি। তোমাদের উত্তরে? আমাদের দক্ষিণে। পাঁচ মহল্লার নাম শুনছ!

কুঞ্জ। পাঁচ মহল্লা।

২য় ভিখারি। হ্যাঁ, তা দূর আছে এখান থেকে।

বৃদ্ধ ভিখারি। সেই কথাই তো ভাবি, যে নড়ে বসতে পারিনে, অথচ এতটা পথ এ আমি কেমন করে পাড়ি দেব? কী গতি হবে আমার? (কাশতে কাশতে) না শেষ পর্যন্ত রেখে যেতে হবে হাড় কখানা এখানেই—(আর্তকণ্ঠে) তোমরা সব চলে যাও। আমারে ছেড়ে চলে যাও, ভুলে যাও আমারে। ভোল আমারে—

[নেপথ্যে ঘন্টাধ্বনি।]

২য় ভিখারি। হোই আবার ঘন্টা দেছে, আবার ঘন্টা দেছে।

১ম ভিখারিনী। বেজেছে এতক্ষণে—বাব্বা, ঘন্টা দিতে একেবারে বেলা হেলিয়ে দেছে আজ। চ, চ। [কুঞ্জ, রাধিকা ও বৃদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন অন্য সকলের মেটে হাঁড়িকুড়ি সহ ত্বরিতপদে প্রস্থান।]

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে) আমার সময় হবে না, তোমরা সব চলে যাও। (একটু সুরে) গাঁয়ে ফিরে যাও।

কুঞ্জ। (রাধিকার প্রতি) গাঁয়ে ফিরে যাব কথাটা মনে করলে সে বুকের ভেতরটা একেবারে আমার, এই দ্যাখ না, হাত দিয়ে দ্যাখ বুকে, দ্যাখ— (রাধিকার হাতখানা নিজের বুকে চেপে ধরে) দেখিছিস—!

রাধিকা। (চিন্তান্বিতা মুখে) সত্যিই তো।

কুঞ্জ। (করুণ হেসে) হেঃ, কী যে আনন্দ হয় বউ আমার, সে আমি তোরে—চল্ বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।

রাধিকা। চল না, আমার কি অসাধ। গাঁয়ে ফিরে যাব, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব? (কেঁদে ফেলে) সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—(কাঁদে)

কুঞ্জ। ও সব হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে। চল চল, বউ আমরা ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির শহরে আর থাকব না।

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে সুর করে) মিথ্যে বসে আঁকড়ে থাকা, তোমরা সব চলে যাও। তোমরা সব চলে যাও।

কুঞ্জ। বউ!

[রাধিকা কুঞ্জর দিকে জলভরা চোখে তাকায়।]

রাধিকা। কী।

কুঞ্জ। ওঠ, চল।

রাধিকা চল।

[কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।]

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে সুর করে) দুরুস্তরের পথে আঁকা বাঁকা, তোমরা চলে যাও। তোমরা সব চলে যাও। তোমরা চলে যাও।

[কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।]

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিকিৎসাকেন্দ্র। দরদালানের মতো লম্বা একখানা ঘরের দু-পাশ দিয়ে সারবন্দী ভাবে সব খাটিয়া পাতা রয়েছে। সবগুলি বেডেই রোগী ভরতি। ঘরের মাঝখানটায় একজন নার্স একখানা চেয়ারে বসে আছে মাথায় হাত রেখে, কনুই দুটো তার সামনের টেবিলটা ছুঁয়ে আছে। টেবিলটার ওপর ওষুধপত্রের বোতল, চিকিৎসার সরঞ্জাম, খাতা-পত্র ঠাসা। দুজন রোগী শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত শব্দ করে আর্তনাদ করছে। নার্সটি থেকে থেকে রোগীদের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাচ্ছে।

হল-ঘরের সামনে ডানদিক স্বতন্ত্র একটু স্বল্প-পরিসর বারান্দা। বারান্দার মাঝখানে ছোট্ট একটা টেবিল; দুখানা চেয়ার ও একখানা বেঞ্চ। দেওয়ালে কাঠের র‍্যাকে কোট ঝুলছে দেখা যাচ্ছে। একজন যুবক ডাক্তারকে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে ‘আউটডোরের’ রোগীদের নিয়ে। বারান্দা থেকে নিচে

নেমে যাবার সিঁড়ির ওপর নিঃস্ব রোগীরা ভিড় করে বসে আছে। একজন কম্পাউণ্ডারকে ওযুধের টেবিলের কাছে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক রোগীরা সব বসে আছেন ডাক্তারের টেবিলের সামনের দিকে বেঞ্চের ওপর—হাতে সব শিশি। চিকিৎসাপ্রার্থী জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে রয়েছে মাথা মুখ ব্যাণ্ডেজ করা দশ বারো বছরের একটা ছেলে।

পায়ে পট্টি জড়ানো, মাথায় পাগড়ি আর গায়ে কোট পরা জনৈক জমাদার গোছের লোক খবরদারি করছে জনতাকে।

হল-ঘরের পেছন দিককার বেড়ের এক নম্বর রোগীর কাতর আর্তকণ্ঠ শুনে নার্স উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল, তুলিতে করে কী একটা ওযুধ নিয়ে। একটু পরেই আবার ফিরে এসে টেবিলের কাছে একখানা খাতায় কী যেন লিখছে, এমন সময় রোগীরা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। নার্স। (রোগীদের দিকে মুখ করে ধমকের সুরে) কী হচ্ছে, কী!

ধমক খেয়ে আঁই-আঁও শব্দ করতে করতে এক নম্বর রোগী চুপ করে যেতে নার্স অন্য রোগীদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘড়ি মিলিয়ে নাড়ি দেখতে থাকে। হল-ঘরের ভেতরে ক্ষণকালের জন্য নেমে আসে কবরের প্রশান্তি। একেবারে চুপচাপ, একটু পরেই আবার অন্যদিক থেকে দু-নম্বর রোগী ওঁ ওঁ শব্দে আর্তনাদ করে উঠে চুপ করে গেল। নার্স একনজর তাকিয়ে নাড়ি দেখে চলে—সব রোগীদের এক এক করে। এই গেল হল-ঘরের ভিতরের অবস্থা। আর বাইরের বারান্দায় সাহেবি পোশাক পরা যুবক ডাক্তারটি রোগীদের বুকে এক এক করে স্টেথস্‌কোপ লাগিয়ে চোখ টেনে পিট বুকে আঙুল ঠুকে “নিঃশ্বাস নাও” “নিঃশ্বাস নাও” বলে পরীক্ষা করে চলে আর প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দেয়। প্রেস্‌ক্রিপশন হাতে করে রোগীরা আবার কিউ-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ওযুধ নেবে বলে। ধুতি সার শার্ট পরা কম্পাউণ্ডারটিকে ওযুধের টেবিলের কাছে ভীষণ ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। পেট মোটা লাল, নীল সাদা ওযুধের বড়ো বড়ো বোতল থেকে তাকে হরদম ওযুধ ঢেলে দিতে দেখা যাচ্ছে রোগীদের শিশিতে।

কম্পাউণ্ডার। (একজনকে ওযুধের শিশি এগিয়ে দিয়ে অন্য একজন রোগীকে) তোমার!

ডাক্তার। (জনৈক দুঃস্থ রোগীকে পরীক্ষা করে) কাশতে লাগে, বুকে?

আট নম্বর রোগী। হ্যাঁ বাবু, বড্ড যন্তন্না!

ডাক্তার। যন্তন্না হয়! কী রকম যন্তন্না?

আট নম্বর রোগী। কী রকম যন্তন্না। যন্তনা—(প্রকাশ করতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে)

ডাক্তার। জিভ্ দেখি, জিভ্!

[রোগী জিভ দেখাল।]

বড়ো করে বড়ো করে—

উঁ! (প্রেস্‌ক্রিপশন লিখতে লিখতে) রাত্রে ঘুম হয়?

[রোগী ঘাড় নেড়ে ‘না’ বলে।]

হয় না!

আট নম্বর রোগী। আজ্ঞে না।

ডাক্তার। (প্রেস্‌ক্রিপশনটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে রোগীর হাতে দিয়ে) আচ্ছা ঐ ওষুধটাই আরো হপ্তাখানেক চলুক, বুঝলে?

আট নম্বর রোগী। আজ্ঞে আজ যে ওষুধটা পাল্‌টে দেবেন বলেছিলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। পাল্‌টে দেব বলেছিলাম নাকি! আচ্ছা, এ হপ্তাটা ঐ চলুক তো!

আট নম্বর রোগী। কিন্তু জ্বর যে কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না!

ডাক্তার। হবে হবে, খেয়ে যাও ওষুধ। একটা কিছু হবার সময় যত তাড়াতাড়ি হয়, সারবার সময় কি আর তত তাড়াতাড়ি সারে? অস্থির হলে চলবে কী করে। (অন্য রোগীর প্রতি) হ্যাঁ তারপর—। (আট নম্বর রোগীর প্রতি) আচ্ছা যাও তুমি তা হলে।

আট নম্বর রোগী। জ্বরটা যে ডাক্তারবাবু কিছুতেই—। এট্টুখানি ভালো ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি।

ডাক্তার। আরে বাবা ভালো ওষুধ কি আমি গড়াব? যা ভালো, ঐ তো দিইছি যা দেবার।

আট নম্বর রোগী। এ ওষুধ তো এক মাস ধরেই খাচ্ছি; জ্বর তো কিছুতেই যায় না। আর এই পা ফোলাও তেমনি আছে।

ডাক্তার। ও জ্বর-টর সব ওতেই যাবে।

আট নম্বর রোগী। যাবে?

ডাক্তার। হ্যাঁ যাবে, যাও—আমার এখনও অনেক রোগী দেখতে হবে।

আট নম্বর রোগী। তবে যাই, তাই যাই।

[কিউ-এ গিয়ে দাঁড়ায়।]

ভদ্রলোক রোগী। (ডাক্তারের টেবিলের সামনে যিনি বসেছিলেন) সবই ম্যারেলিয়া কেস্, না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। মোস্ট্‌লি তবে—এই দেখুন না, নট ওনলি ম্যালেরিয়া, শোথ হয়েছে লোকটার। প্রায় মাসাধিক কাল ভুগছে। এদিকে ওষুধ নেই, পত্তর নেই, বলুন তো কী দিয়ে কী চিকিৎসা করি।

ভদ্রলোক রোগী। তা জানান না কেন এ সব কথা ওপরে।

ডাক্তার। লিখে লিখে হয়রান মশাই, বলি যে ওষুধ-পত্তরই যদি সাপ্লাই করতে না পারো তো দরকার কী এই 'শ্যাম শো'-ব, বন্ধ করে দাও হাসপাতাল। হা, না—কোনো জবাব নেই তার। এখন বলুন, এ অবস্থায় আমরাই বা কতটুকুখানি কী করতে পারি। ভালো করে দেখে শুনে বিধি-ব্যবস্থা করতে দু-ঘন্টার জায়গায় নয় দশ

ঘন্টাই আমরা খাটলাম, দশখানার জায়গায় নয় দু'শখানা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখলাম, কিন্তু ওষুধ যদি না পাওয়া যায় তো কী হবে তাতে করে বলুন!

ভদ্রলোক রোগী। তা তো বটেই।

ডাক্তার। আন্তরিকতা থাকতেও সে আন্তরিকতার কোনো মূল্য নেই। ট্রাজিডিই তো আমাদের এই। যাগ্‌গে সে সব কথা—(অন্য রোগীর প্রতি) কই দেখি তোমার কী?

[হঠাৎ হল-ঘরের ভেতর থেকে একটা রোগীর আর্তকণ্ঠ শোনা যায় আঁ-া-া
নার্স একবার ত্রস্ত পায়ে রোগীর দিকে এগিয়ে যায়।
তারপর রোগীকে একনজর দেখেই ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে।]

নার্স। (ত্রস্তে) ডাঃ মুখার্জি

ডাক্তার। য়্যাঁ।

নার্স। পাঁচ নম্বর পেশেন্টের, 'হেমপ্‌টিসিস' হচ্ছে।

ডাক্তার। হেমপ্‌টিসিস্‌! কারণ?

নার্স। কারণ, আপনি একবার দেখবেন চলুন।

ডাক্তার। চলুন, চলুন।

[ডাক্তার ও নার্সের হল-ঘরে প্রস্থান।
ওদিকে চলমান 'কিউ' সরে সরে যাচ্ছে।
যে যার মতো ওষুধ-পত্তর নিয়ে চলে যাচ্ছে।]

(কয়েক মুহূর্ত রোগীর দিকে তাকিয়ে) চার্টটা দেখি।

[নার্স চার্ট এনে দেয়।]

(চার্ট দেখে) উঁ, টেম্পারেচারটা তো দেখছি বেশ 'রাইজ' করেছে আবার। সেই পাউডারটা দেয়া হয়েছিল?

নার্স। হ্যাঁ।

ডাক্তার। একটু বরফ আনতে বল জমাদারকে, চট করে।

[ডাক্তার নাড়ি পরীক্ষা করতে শুরু করে!]

নার্স। (বাইরের দিকে এগিয়ে গিয়ে) জমাদার!—জমাদার!

[জমাদারের প্রবেশ।]

থোড়াসে বরফ লাও।

জমাদার। লাতা হুঁ।

ডাক্তার। নেই একটা ওষুধ, নেই একটা কিছু; ধেত—

নার্স। (এগিয়ে এসে) ইনজেক্‌শন্‌ দেবেন নাকি একটা, গ্লুকোস!

ডাক্তার। গ্লুকোস ইনজেশন নেই।—নেই ইনজেকশন, নেই ওষুধ , আছে শুধু ঘর ভরতি রোগী—ন‌ন্‌সেন্স কারবার।

[হঠাৎ পাঁচ নম্বর রোগীর খিঁচুনি আরম্ভ হয়।
নার্স ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে ঘরে রোগীর দিকে।]

নার্স। ডাক্তার মুখার্জি, পেশেন্ট—

ডাক্তার। আই য্যাম হেল্পলেস্‌। কিচ্ছু করবার নেই।

নার্স। (নাড়ি দেখে) কিন্তু পেশেন্ট যে সিঙ্ক্‌ করছে ডক্টর—

ডাক্তার। (চেঁচিয়ে) ও হো, আই নো রেবা হি উইল ডাই। হি, এন্ড দি হোল লট অব দেম। দি ফিউচার ইজ বিয়িং মার্ডার্ড, ডেলিবারেটলি, মার্ডার্ড বাই থিভস্‌ অ্যান্ড বাংলার্স।

ডাক্তারের চিৎকার শুনে সমস্ত রোগী বিছানার উপর আধশোয়া হয়ে উঠে বসে আতঙ্কে

[আ আ আঁই শব্দ করতে থাকে।
কম্পাউন্ডার একবার উঁকি মেরে দেখে যায়।]

(নিজেকে সামলে নিয়ে) শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো তোমরা সব। কিছু হয়নি তোমরা শোও, শুয়ে পড়ো। শোও, হ্যাঁ শোও।

[রোগীরা সব পূর্বের মতো আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।
আর নার্স মৃত পাঁচ নম্বর রোগীর খাটিয়া ঘিরে একটা সাদা পর্দা টাঙিয়ে দিল।
আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দায় ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়ায়।
রোগীদের কিউ পরিষ্কার হয়ে গেছে এতক্ষণে।
বাইরের ওষুধের টেবিলের কাছে শুধু কম্পাউন্ডারকে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।
স্টেচারসহ দুজন ধাঙ্গরের প্রবেশ।]

নার্স। (বাহকদ্বয়ের প্রতি) পাঁচ নম্বর।

জনৈক বাহক। জি।

[মৃতদেহটিকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে বাহকদ্বয়ের প্রস্থান।]

ডাক্তার। (নিজ টেবিলে কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ নার্সের দিকে মুখ তুলে করুণ হেসে) কী দেখে আশা করেছিলে যে লোকটা বাঁচবে, রেবা!

নার্স। আশা? না আশা আর কী!

[ডাক্তার কাজে মনোনিবেশ করে। প্রধানের প্রবেশ।]

(হঠাৎ নার্স দেখতে পায় যে দরজার কাছে আলু থালু বেশে বুড়ো মতো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা পাগলের মতো। বগলে নোংরা কতকগুলো কাগজ-পত্তর,

হাতে একটা হাঁড়ি। আর কাঁধে কতকগুলো নোংরা শতচ্ছিন্ন জামা কাপড়, ছেঁড়া কম্বল।) —কী, তোমার আবার কী?

ডাক্তার। (মুখ তুলে) কে!

নার্স। কী চাই তোমার?

প্রধান। আমার, আমার এট্টু ওষুধের দরকার মাঠান।

নার্স। ওষুধ।

[কাঁচুমাচু মুখ করে প্রধান মাথা নাড়ে।]

কিসের ওষুধ?

ডাক্তার। কী বলছে কী! কে দেখি!

নার্স। দেখুন তো!

ডাক্তার। (উঠে) কি হয়েছে কী! কী বলছ তুমি।

প্রধান। (এগিয়ে এসে) আমার এট্টু ওষুধ বাবা, (পায়ের দিকে লক্ষ করে) বড্ড ব্যথা।

ডাক্তার। বড্ড ব্যথা! কোথায়, দেখি! (হাতের আবর্জনাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে) ওগুলো কী?

প্রধান। এই, আছে।

ডাক্তার। এমনিই আছে?

প্রধান। (অপ্রতিভ হেসে) হ্যাঁ—এমনিই আছে।

ডাক্তার। ফেলে দাও না ওগুলো! কী হবে ও দিয়ে!

প্রধান। এগুলো ফেলে দিলে আর কী থাকবে! ওগুলো কি ফেলে দেওয়া যায়। এ সব হল—

ডাক্তার। অমূল্য রতন। ফেলে দেওয়া যায় না, না?

প্রধান। না (হাসে)

ডাক্তার। (নার্সকে) বুঝতে পেরেছেন, অসুখ!

নার্স। (মুখ টিপে হেসে) একটু একটু।

ডাক্তার। এ রকম যে কত হয়েছে—হবেই কিনা!

প্রধান। (না বুঝে) নিশ্চয় হবে, কেন হবে না (হঠাৎ ব্যথা অনুভব করে) উ-হু-হু-হু, বড্ড ব্যথা।

ডাক্তার। কোথায়, দেখি ব্যথা কোথায়!

প্রধান। (হাত তুলে) এই এখানে। (হাত দিয়ে দেখিয়ে) এইখানে ব্যথা।

ডাক্তার। (পা টিপে) কই ব্যথা কই! লাগে টিপলে?

প্রধান। না।

ডাক্তার। তবে, ব্যথা কোথায়?

প্রধান। (মৃদু হেসে) ঐতো, ঐখানেই ছিল।

ডাক্তার। ঐখানেই ছিল, আরে।

প্রধান। হ্যাঁ ঐখানেই ছিল। তারপর পালিয়ে গেল। এক দৌড়ে পালিয়ে গেল—

[নার্স মুখ টিপে হাসে।]

ডাক্তার। পালিয়ে গেল দৌড়ে?

[প্রধান হাত তুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে।]

কোথায় গেল?

প্রধান। (বলিষ্ঠ আকার ইঙ্গিতে) ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেল; একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখন্দ পেরিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—

(হঠাৎ শরীরের কোনো অংশে ব্যথা লেগে চাপা গলায় আ-া-া শব্দ করে বুকে হাত চেপে আধবসা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার নার্সের দিকে তাকায় আর প্রধান দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব্যথার অভিব্যক্তি জানাতে থাকে।)

ডাক্তার। (ক্ষীণ হেসে) আবার ব্যথা করছে তো?

প্রধান। (গম্ভীর ভাবে) হ্যাঁ, আবার ব্যথা করছে। এ ভয়ানক ব্যথা দারুণ যন্ত্রণা। এ ব্যথা এই আছে, এই নেই। কালবোশেখির মেঘের মতো আছে এ ব্যথা একেবারে হু হু করে উঠে আসে আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে—তারপর এই যে মাতন লাগে আরে ব্বাস রে বাপ্ সে একেবারে ঘর বাড়ি ভেঙে্ চুরে—

ডাক্তার। (ধমকের সুরে) থামো।

প্রধান। (সবিনয়ে) থামতে বলছেন!

ডাক্তার। হ্যাঁ থামতে বলছি—ও ব্যথা ট্যথা তোমার সব বাজে কথা, মিথ্যে।

প্রধান। (ক্ষোভের সুরে) মিথ্যে।

ডাক্তার। হ্যাঁ মিথ্যে। একদম মিথ্যে।—ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। তোমার ব্যথা নেই।

প্রধান। (বোকার মতো) ব্যথা নেই?

ডাক্তার। না ব্যথা নেই, কিছু নেই! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা।

প্রধান। (হঠাৎ নোংরা জামা-কাপড় আর আবর্জনাগুলো জোরে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে

দাঁড়ায়) তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।

[নিজের আবেগে কথা বলতে বলতে প্রধানের প্রস্থান।
ডাক্তার ও নার্স বিস্মিতের ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে প্রধানের দিকে।]

(পটক্ষেপ)

৪৭.১২ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ তৃতীয় অঙ্ক)

কুঞ্জ আর রাধিকা এই লঙ্গারখানায় এসে জানতে পারে রাস্তার থেকে পুরুষ মানুষদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধে। 'কেউ' বলছে ধরে ধরে নাকি সব যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। [২য় ভিখিরি] আর সোমত্থ মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে অন্যত্র, ...নিবি তো সব একসঙ্গে ধরে নিয়ে যা না বাপু, য়্যাঁ, সেই না কথা! তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কীরকম ধারা বেআক্কেলে কাণ্ড! (চেঁচিয়ে) মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এটা প্রাণে এট্টা কথা বলল না!' [১ম ভিখারিনী] সব মিলিয়ে মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। তাই কুঞ্জ বলে, 'আর তোমার আমার জীবন—কী দাম আছে এ জীবনের? কিছু না। এমনিই বলে তাই উজোড় হয়ে গেল, য়্যাঁ।' [৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য] এখান থেকে তারা আবার এও জানতে পারে,—সমথ চাষীলোক যারা তাদের সব দেশ ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে।' কেন না. 'কেউ বলে ধান নাকি এবার এত হয়েছে যে কাটবার পর্যন্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চাষী লোকদের সব গেরামে পাঠিয়ে দিচ্ছে।' [৩য় ভিখিরি]

কুঞ্জ আর রাধিকার সমস্ত অন্তরটা আমিনপুরের জন্য কেঁদে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রাণ আনচান করে ওঠে। ত্বরিতে কুঞ্জ রাধিকাকে প্রস্তাব দেয়, 'চল বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।' [৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য] রাধিকা এই প্রস্তাবে রাজি হয়। চল না, আমার কি অসাধ । গাঁয়ে ফিরে যাব, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব?—সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—' [ঐ]

বন্যা, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানুষের বুকে গভীর দুঃখ আর হতাশা। কিন্তু 'নবান্নে' শুধু দুঃখ আর হতাশার কাহিনী নেই। তা যদি থাকত তাহলে এই নাটক নাট্য আন্দোলনের হাতিয়ার হতে পারত না, পারত না গণনাটকের মর্যাদা অর্জন করতে। 'নবান্নে' দুঃখ জর্জরিত একদল মানুষের ক্রন্দন আছে, দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানুষের হতাশাচ্ছন্ন হাহাকার আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আশাবাদের ইঙ্গিত, 'ও সব হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে!' 'নবান্ন' নাটকের মূল্য এখানেই। 'সব হবে' এই আশাবাদই 'নবান্ন' নাটকের আসল ঐশ্বর্য। দুঃখের অমানিশা কাটবে প্রভাতের অরুণালোয় জীবন আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এই আশা ও আলো কুঞ্জর চোখে ঝলমল করে ওঠে। 'কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।' [ঐ] এ হল প্রথম দৃশ্যের বিষয়বস্তু।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র। দরদালানের মত একটি লম্বা ঘরের দু'পাশের সারবন্দী খাটিয়ায় রোগী ভর্তি। তাদের কেউ কেউ তীব্র আর্তনাদ করছে। বারান্দায় চেয়ার টেবিল পেতে ডাক্তারবাবু বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন। তিনি রোগী দেখে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখেছেন। কম্পাউণ্ডার লাল নীল বোতল থেকে ওষুধ রোগীদের শিশিতে ঢেলে দেন।

অপুষ্টিজনিত কারণে নানা ধরনের রোগ। চিকিৎসা কেন্দ্রে উপযুক্ত ওষুধ নেই—রুগীর অভিযোনও অন্তহীন। ডাক্তারবাবু নিষ্ঠাভরে রোগী দেখেও তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারায় অসহায় বোধ করেন। অনুভব করেন, "আন্তরিকতার কোন মূল্য নেই"। বলেন, 'আই অ্যাম হেল্পলেস্‌'।

এমনি সময় আকস্মিক দুর্যোগে মানসিক ভারসাম্যহীন অনাহারক্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার নোংরা জামা কাপড় ও স্তূপাকৃতি আবর্জনা নিয়ে ঢুকে পড়ে। সে যে ব্যথার কথা বলে তার সঙ্গে সেই কালবোশেখির যোগ দেখা যায়। সবমিলিয়ে অঙ্কটি যেন হাতাশা ও আশার দোলায় আন্দোলিত জীবনের একটি বাস্তব ছবি।

৪৭.১৩ মূলপাঠ ৪ — নবান্ন ঃ চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শহর থেকে ফিরে ভাঙা ঘরখানা জুড়েতেড়ে নিরঞ্জন আবার বাসোপযোগী করে নিয়েছে। পর্দা সরে যেতেই প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন গেরস্থ চাষীকে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ির স্বল্প পরিসর উঠোনটার মাঝখানে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত দেখা যাচ্ছে। জনতার ভেতর তিনটে গ্রুপ। প্রত্যেক গ্রুপে তিন চারজন করে লোক বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা গ্রুপের আলোচ্য বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের নিজস্ব একটা ঢং আছে। বাকি লোক সব উঠোনে বসে এ ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। তবে বসে আছে যারা তাদের আলোচনাটা তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে ঐ তিনটে গ্রুপ। তবে বৈশিষ্ট্য এখানেও যে যখন যে গ্রুপটা কথা বলছে কখনও কখনও বাকি দুটো গ্রুপের আলোচনায় ভাটা পড়ছে অভিনয়ের খাতিরে। মঞ্চের ডানদিকে দাঁড়িয়ে প্রথম গ্রুপ ফকির, সুজন ও ভজনের মধ্যে পর্দা সরে যেতেই আলোচনা শুরু হয়। মঞ্চের মাঝখানে ও বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আর দুটো গ্রুপ তখন নিচু গলায়, আকারে ইঙ্গিতে আলোচনা চালাতে থাকে। দাওয়ার ওপর দয়াল মণ্ডল, নিরঞ্জন প্রভৃতি বসে, আলাপ আলোচনা করছিল এতক্ষণ। সখীচরণ কথা শেষ করতেই বরকত সভা আহ্বান করে।

ফকির। (সুজনের প্রতি) বাপের দেনা ঘাড়ে নিয়ে জগতে জন্মেছি আবার মরবার সময় নিজের দেনাটা যথারীতি ছেলের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে চলে যাব, এই তো হয়ে আসছে দেখি চিরটাকাল., জন্ম-জন্মান্তর। তা এ আর এটা কথা কী এমন বিশেষ।

ভজন। না এ যা বলছ তা খাঁটি কথাই বলেছ।

সুজন। সেই কি আর এটাটা কথা হল।—চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত করবে না, কী রকম ধারা কথা।

ফকির। উপায় কী বল!

সুজন। উপায়—করে নিতে হবে উপায়।

ফকির। তা য়্যাদ্দিন হয়নি কেন—এ তো আর তোমার আজকের সমস্যা না।

সুজন। য়্যাদ্দিন হয়নি কেন—কী রকম যে তুমি কথা বল মামু তা বুঝে উঠতে পরিনে। আরে সমস্যা যদি মেনেই নিতে তো উপায় খুঁজে বের করবার দরকারটা পড়ে কিসে! সব্বার আগে ওটা যে এট্টা সমস্যা, এই বুঝটা তো অন্তত থাকা দরকার, না কী?

ফকির। না তা তো—

সুজন। তো তবে।

(সুজনের কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান গ্রুপের আলোচনাটা নিস্তেজ হয়ে আসতেই মঞ্চের মাঝখানটায় দ্বিতীয় গ্রুপটা মুখর হয়ে ওঠে। প্রথম গ্রুপের আলোচনাটা তখন বাহ্যত দু-একটা কথাবার্তা কানাঘুসো ও ভাবে-ভঙ্গিতেই ব্যক্ত হতে থাকে। দ্বিতীয় গ্রুপের রহিম বরকত ও গোলাম নবীর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। বরকত তার কচি মেয়েটাকে সাজিয়ে কাঁধে করে নিয়ে এনেছে।)

রহিম। কিন্তু তা যেন না হয় দিলাম, কিন্তু পীরের দরগায় খাসি! সেটা তো দিতেই হয়।

বরকত। কেন!

রহিম। মানত রয়েছে যে।

বরকত। তোর দেখছি শতেক দেনা!

গোলাম নবী। মানত আছে পরে দিও খাসি। তাতে কোনো দোষ নেই। আসলে দেওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা। দুদিন পেছিয়ে দিলে আর তুমি জাহান্নামে যাবে?

রহিম। কিন্তু মওলানা যে আমারে তা হলে একেবারে সেরে ফেলে দেবে'খন! এই বলে তাই—

বরকত। বললেই হল আর কী মওলানা। সুবিধে-অসুবিধে নেই মানুষের! ও তুমি দেবার হয় পরে দিও। ...খোদাতালার চোখ তোমার গে ঐ মওলানার কটা চোখের মত ছোটো না. একথা মনে করে রেখো।

বরকতের কথার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গ্রুপের আলোচনায় ভাটা নামে। আরম্ভ হয় তখন তৃতীয় গ্রুপের কথা বার্তা। দিগম্বর, সখীচরণ প্রমুখ চারজন লোক আলোচনা আরম্ভ করে।

দিগম্বর। আরে পাওনাদার তো আমরা সকলেই। তার জন্যে আর কী, হ্যাঃ! জীবন-ভর খালি দেনাই করে গেলাম, পেলাম না আর কোনো কিছু কারো ঠেঙে।

সখীচরণ।	ফসলডা যদি একবার মরে-পিটে তুলতে পারি তো দেখি একবার।

দিগম্বর।	এখন বলেছ বটে! কিন্তু পেট ভরবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে যে আবার দয়াবান হয়ে উঠেছ। তখন তার শত্রু-মিত্র জ্ঞান থাকবে না—এই রোগেই তো মরলে চাষী, —দিল করে রেখেছ সব রাজার নাগাল অথচ সঙ্গতি নেই এক আধলার।

সখীচরণ।	না এবার আর—

[দাওয়ার উপর দয়াল মণ্ডল, নিরঞ্জন প্রভৃতি আলাপ আলোচনা করছিল এতক্ষণ। সখীচরণ কথা শেষ-করতেই বরকত সভা আহ্বান করে।]

বরকত।	তা হলে এইবার আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে, কী বল মণ্ডল! এসে তো গেছে সকলেই একরকম।

দয়াল।	হ্যাঁ আর দেরি কী?

নিরঞ্জন।	না, আর দেরি কী, এইবার শুরু করে দেওয়া যাক।

বরকত।	হ্যাঁ শুরু করে দাও।

দিগম্বর।	আর সকলেই তো একরকম উপস্থিত হয়ে গেছে, এইবার—

সখীচরণ।	আরম্ভ কর।

[নেপথ্যে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

বরকত।	দয়ালদা শুরু কর।

[নিরঞ্জনের কানে কানে যেন কী কথা বলল।]

নিরঞ্জন।	হ্যাঁ। (মাথা নেড়ে হাসতে লাগল)

দয়াল।	আমিই করব, তার চাইতে বরং—

নিরঞ্জন।	না তুমিই কর, শুরু করে দাও তারপর—

বরকত।	হ্যাঁ আরম্ভডা তো করে দাও তারপর সকলে মিলে সেডারে

দয়াল।	(একটু হেসে) আচ্ছা, আচ্ছা!

[সহসা একটা ঋজুতা ও কাঠিন্যের ছাপ ফুটে উঠে দয়ালের মুখে।]

দয়াল।	(মাটিতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে তার হঠাৎ মুখ তুলে তুলে) মানে কথা হচ্ছে যে, আমরা, যারা আজ এখানে উপস্থিত হইছি, তারা বেশ ভালো করেই সমস্যার কথা জানি। কী যে সমস্যা, না সে সমস্যা খুবই গুরুতর সমস্যা জীবন-মরণ সমস্যা—ফসল কাটা, ঝাড়া, তোলা তারপর আবার তোমার সেই ফসল রক্ষে করার সমস্যা। এখন প্রকৃত অবস্থা যা, তাতে করে সত্যি কথা বলতে গেলে, এই যে আমরা আজ এখানে দশজন বসে ভেবে-চিন্তে এটা উপায় বের করব বলে স্থির করেছি, এই সময়ডাও পর্যন্ত আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়।

নিরঞ্জন। ঠিক, অতি ঠিক।

[নেপথ্যে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

দয়াল। আমি বলছিনে যে এ আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন নেই। আছে, খুবই আছে। সে কথা না, তবে অবস্থার গুরুত্বডা যাতে করে আমাদের কারো কাছে এক মুহূর্তের জন্যেও কম মনে না হয়, সেই কারণেই ঐ কথাডা উত্থাপন করলাম। সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপারডা দাঁড়ায় এই যে, এখনই এই মুহূর্তে আমরা যদি ফসল রক্ষে করার একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারি, তা হলে মিত্যু ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না। সব ঘরে পড়ে মরতে হবে আমাদের। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[সকলে নড়ে চড়ে বসে ও পরস্পররের কানে কানে যেন কী সব বলা কওয়া করে। একটা কলগুঞ্জন ওঠে।]

সংক্ষেপে সমস্যার কথা আমি বললাম, এইবার সকলে মিলে তোমরা কওয়া বলা কর, কী হলে কী হয়, কোন পথে এর এট্টা মীমাংসা হয়—বরকত বল।

বরকত। (নড়ে চড়ে) বলব বা কী আমি।

দয়াল। (কল্‌কে দিয়ে) আহা এ সম্বন্ধে তো যা-হোক কিছু ভেবেছ, তো সেই কথাই বল। সমস্যা সকলের—(তামাক টানে)

[নেপথে— 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

বরকত। না সে তো ঠিক কথা।—

নিরঞ্জন। তুমি যা ভেবেছ তাই বল।

[নেপথে খুব জোরে— 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

নিরঞ্জন। আরে ও মারা গেল কেডা।

[নেপথ্য থেকে উত্তর আসে— 'ত্রিলোচন বিশ্বাস'।]

দিগম্বর। ত্রিলোচন মানে যে আমাদের নারানের বাপ। য়্যাঁ আরে সে দিনও তো কত গল্প করলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত্রিলোচনের সঙ্গে। কী আশ্চর্য।

সখীচরণ। হইছিল কী?

নিরঞ্জন। আবার হতে হয় নাকি কিছু।

বরকত। মরা তো হয়েছে হাতের পাঁচ। গেলেই হল।

দয়াল। য়্যাঁ-া-া-া।—হয়েছেই এই অরাজক অবস্থা—তা সে যে গেল তার দায়িত্ব তো ফুরিয়েই গেল এখন থাকল যারা তাদের নিয়েই হচ্ছে কথা। ধান যে ওদিক সব পেকে ঝড়ে পড়ে গেল, সেই অপমিত্যু ঠেকাবে কী দিয়ে এখন সেই কথাই ভাবো।

ফকির। তারপর বরকত বল কী বলছিলে।

বরকত। কীই বা বলব।

দিগম্বর। যা ভেবেছ, তাই বলবে। ঠিকই যে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তবে দেখবে যে এই আলাপ-আলোচনা করতে করতেই পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে, এই, বল, বল না।

সখীচরণ। হ্যাঁ পাঁচজনে মিলে আলোচনা এর ভেতর আবার এট্টা কথা কী!

বরকত। মানে কথা হচ্ছে যে ভাবিনি যে এ বিষয়ে কিছুই একেবারে তা নয়; ভেবেছি। তবে বিষয়ডা তো সহজ নয় তেমন, মুশকিল আসানের পথ এখনও ভেবে বার করতে পারিনি। তারপর শুধু শুধু ভেবেই বা কী করব বল? না পাওয়া যায় এট্টা লোক যে বাতে সঙ্গে এট্টু জোগান দেবে। খাওয়া পরা বাদে দু-তিন টাকা রোজ দিয়েও লোক মেলে না। এখন এত ফসল কেটে তুলি কী করে, বলদিনি। অথচ এদিকে আবার এমনিই অবস্থা— মাতব্বর অবশ্য বলেছে সে-কথা যে, দুইচার দিনের ভেতর এই ফসল কাটা হল তো হল, আর নয় তো বিলকূল পয়মাল হয়ে গেল। এই তো অবস্থা। ভাবিনি বলছ, ভেবেছি কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বিশখানা কাস্তের জায়গায় আমার এই এতটুকুখানি একফালি কাস্তে এ কতডা কী করতে পারে বল তো? তো কী বলব বল এ কথার।

দয়াল। এ তো তোমার গিয়ে সেই সমস্যার কথাই দাঁড়াল।

বরকত। হ্যাঁ, তা তাই তো হল। তা ছাড়া আর কী। ভেবে চিন্তে যখন খেই-ই পাচ্ছি নে কিছুতেই এর তখন—দুই চোখ এক করতে পারিনে রাতে মণ্ডল, খালি ভাবনা আর চিন্তে, ভোর বেলা উঠে দেখি মুখখানা একেবারে পচে তেতো বিষ হয়ে আছে। হাতে পায়ে বল পাই নে—

দিগম্বর। আর এই অসুখ বিসুখ; একেবারে জেরবার করে ফেল্লে মনে প্রাণে। সাওস, উদ্যম, যে না এটা করতেই হবে আমার তা সে মরি আর বাঁচি এ আসবে কোত্থেকে। মানুষ কি আর মানুষ আছে? না!

দয়াল। বুঝলাম, সব বুঝলাম; কিন্তু এই মানুষই তো আবার বাঁচতে চাইবে দিগম্বর। সহায় নেই সঙ্গাতি নেই, মন্বন্তরে একেবারে জ্বলে পুড়ে গেছে সব ঘর-সংসার, তবুও তো দেখ আবার এই সভা হয়। তাও আবার কোথায়? নিরঞ্জনের বাড়ির ওপর, উঁ নিরঞ্জনই হল গিয়ে তার জোগাড়ে। তা এ তুমি ঠেকাবে কেমন করে। মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ই'য়ে এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচতে চাইবেই।

[ক্ষণকালের জন্য সকলেই চুপচাপ। একটু পরে নিরঞ্জন গলাখাঁকারি দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে যেমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে হাবভাবে মনে হয় যেন সে কিছু বলতে চাইছে।]

বরকত। নিরঞ্জন কিছু বলবে নাকি? তা বল না, জোরেই বল।

দয়াল। কী নিরঞ্জন কিছু বলতে চাও? তো বল না বল;

নিরঞ্জন। না এই বলছিলাম কী!

দয়াল। উঁ।

নিরঞ্জন। এই যে বরকত চাচা আর দিগম্বর যা বলছিল, অসুখ বিসুখ আর দুঃখ-কষ্টের কথা, তা সে কথা বলতে গেলে ওতো আমাদের জীবনের একরকম চিরসাথী হয়ে গেছে। এমন না, দু'দণ্ড বসে ঐ নিয়ে পাঁচজনে আলাপ-আলোচনা করলে তার উপশম হবে'খন।

দয়াল। ঠিক।

নিরঞ্জন। তা এখন যদি কিছু করতে হয় তো এই অবস্থার ভেতরে থেকেই যা হয় এট্টা কিছু করতে হবে।

দিগম্বর। তা তো বুঝেছে সকলেই। কিন্তু সেই 'যা হয় এটা কিছু' করা নিয়েই তো মুশকিল বেঁধেছে। কী সেডা?

বরকত। আদত কথাই তো তাই।—আচ্ছা—া-া—

দয়াল। বল কী বলছিলে।

বরকত। বলছিলাম বলি জমিদার বাবুরা, জমিদার বাবুরা যদি এই গে তোমার গত ক'সনের খাজনা—

দয়াল। মুকুব করে—

বরকত। হ্যাঁ।

দয়াল। বেশ তো আবেদন-নিবেদন করতে থাকো না কেন, বারণ করছে কে! খাজনা-পত্তর চাই, মুকুব চাই, বীজধান চাই, কৃষিঋণ চাই, এ সব তো আছেই। তবে আমার কথা হচ্ছে যে; প্রথম থেকেই একেবারে ওপরওয়ালাদের ওপর নির্ভর করে না থেকে নিজেরা কতটুকুখানি কী করতে পার তাই ভাবো—যা দিয়ে যা হবে।

দিগম্বর। হ্যাঁ প্রথম থেকেই একেবারে চাতকপাখির নাগাল হা-পিত্যেশে ওপরের দিকে চেয়ে থাকা, ওতে কোনো কাজ হবে না।

সখীচরণ। হ্যাঁ।

মানিক। না ও মিথ্যে। অনাহক—

দয়াল। আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়।

[উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সকলে।]

বিষয়ডা অবশ্য ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে হবে সকলে মিলে।

ধ্বনি ওঠে—কী বিষয়, কী বলতে চাও তুমি' ইত্যাদি।

বলছি বলি সকলে মিলে গাঁতায় খাটলে কেমন হয়।

বরকত। গাঁতায় খাটলে!

দয়াল। হ্যাঁ। ধর এই আমিনপুর গ্রামের কথাই বলি। কমপক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর গেরস্তের এখানে বাস। এখন কাজের সময় আমরা যে ঠিক এই পঞ্চাশ ষাট ঘর গেরস্তেরই সাহায্য পাব, এমন কথা বলিনে। কারণ অসুখ আছে, বিসুখ আছে, রোগ, শোক ইত্যাদি আরও পাঁচটা দৈব দুর্ঘটনা আছে, এ আছে। তবু এখন কথা হচ্ছে যে, এই পঞ্চাশ জনার অর্ধেক অতিকম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি আমরা পাই এবং প্রত্যেকের জমিতে আমরা যদি সকলে মিলে গাঁতায় খাটব বলে পিতিজ্ঞে করি, তা হলে আমার খুব বিশ্বেস যে, একদানা ফসলও কারো জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে অনায়াসে এ ফসল আমরা গোলায় তুলে ফেলতে পারব।

[প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে হাবভাবে আকারে ইঙ্গিতে কথাবার্তায় সমর্থন করে দয়াল মণ্ডলের যুক্তি।]

দিগম্বর। (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ তা হতে পারে।

সখীচরণ। না এ তো যথার্থ কথাই।

সুজন। তা মনে প্রাণে গাঁতায় খাটলে পরে ও একরকম করে ফসল—

গোলাম নবী। না এ লেজ্য কথা—

ফকির। ফসল না হয় তোলা গেল কিন্তু—

দয়াল। সেইটেই কি কম কথা হল বলে তুমি মনে কর মিঞা?

ফকির। না সে তো ঠিকই, তবে সমস্যা তো তোমার সেখানেই শেষ হল না। রক্ষে করবে কী করে তুমি এ ফসল। জমিদার আছে, মহাজন আছে, পাইকার আছে—

দয়াল। আসছে, পরে আসছে সে সব সমস্যার কথা।

সুজন। হ্যাঁ খাজনা সব বকেয়া পড়ে আছে জমিদারের ঘরে, তারপর মহাজনও পাবে থোবে অনেক কিছু। এখন ফসলটা উঠলেই পরেই তো সব চারদিক থেকে একেবারে শকুনের নাগাল উড়ে পড়বে'খন দ্যাও দ্যাও করে।

দয়াল। তা সে বুখতে হবে যে করেই হোক। এখন যারে নিয়ে খাজনা, সে তো আগে বাঁচবে না কী।

সুজন। তা সে কথা বোঝে কে!

দয়াল। বোঝে কে, বোঝাতে হবে। গায়ে জল দে বসে থাকলে হয়।

বরকত। হ্যাঁ সে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করে চলতে হবে। এখন আগে থাকতেই মীমাংসা কর কী করে তুমি সব কিছুর?

দয়াল। এই। আসল কথা হল ফসল, সেটা যাতে নষ্ট না হয় তার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে সব্বার আগে।

সুজন। না সে কথা তো একশ বার।

দয়াল। তো তবে! এক এক করে এসো।

দিগম্বর। না সে গাঁতায় খাটলে পরে—তা কী বল তোমরা সব? স্বীকার আছ তো খাটতে গাঁতায়? সাদা মনে বলবে কিন্তুক।

[সকলে সমস্বরে 'নিশ্চয় খাটব', 'খাটব গাঁতায়' ধ্বনি করে।]

বরকত। হ্যাঁ ফসলটা তো আগে উঠে যাক ঘরে। তারপর মাঝপথে যে সব বাধাবিপত্তি আসবে, তা সে তুমি বলতে পার না এখুনি কী করব। তবে আমার মনে হয় যে একসঙ্গে মিলে মিশে চললে পরে—

দয়াল। (সঙ্গে সঙ্গে) মুশকিল আসানের পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

দিগম্বর। আসল কথা হচ্ছে এখন ফসল—(আনন্দে) তা সে যা হোক ধান যদি একবার তুলতে পারি সব, তো আমি আমার জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্থ ভাইদের জন্যে দিয়ে দেব।

বুধে। (বোকা গোছের একজন চাষী) আমি সব দিয়ে দেব। চার বিঘে জমির এট্টা ফসলও আমি নেব না।

দয়াল। (হেসে) সব দিয়ে দিলে তুই কী খেয়ে বাঁচবি রে আহাম্মক। দুস!

[সকলে হেসে ওঠে।]

ফকির। কার ফসল কেডা দেয়!—আরে জমি সে তো বেচে বসে আছে ও আগে থাকতেই; তার ধান দেবে কী রকম! ধান কি ওর! তারপর—

গোলাম নবী। এডা লেজ্য কথা বলেছে।

বরকত। হ্যাঁ তা আছে এ সব সমস্যা। আচ্ছা তা হলে এখন এই পর্যন্তই থাকল, তারপর সন্ধ্যের পর আবার দয়াল মণ্ডলের ওখানে বসে—যেও কিন্তু তোমরা সব সময়মতো।

দয়াল। (উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ সে সমস্যা এখনও আছে পরেও থাকবে, তবে বর্তমানে আমার কথা হচ্ছে কী যে কাল সকালবেলা থেকেই ধান কাটা শুরু করে দিতে হবে আর কী। আর বিলম্ব করলে চলবে না।

[সকলে গামছা ও দোলাই ঝেড়ে ঝুড়ে কাঁধের ওপর ফেলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে দু-একজন করে ডানদিক ও বাঁদিক দিয়ে প্রস্থান করে।]

দয়াল। (উঠোনে নেমে বরকতের মেয়েকে লক্ষ্য করে সহাস্য মুখে এগিয়ে গিয়ে) ওডা কেডা রে। কেডা ও য়্যাঁ।

নিরঞ্জন। (হাসিমুখে) বরকত চাচার মেয়ে। বড্ড নজ্জা।

দয়াল। তাই নাকি! (এগিয়ে গিয়ে) হ্যাঁ রে, লজ্জা নাকি তোর খুব। (বরকতের মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে) তা লজ্জা হবে না। আমার যে ওর সঙ্গে নিকে হয়েছে সেদিন, না রে!

বরকতের মেয়ে। যা! (মুখ লুকোয় বরকতের কোলের মধ্যে)

দয়াল। আচ্ছা দ্যাখ তো আমারে তোর পছন্দ হয় কি না, এই। আমারে বিয়ে করবি? (মেয়েটা চট্ করে দয়াল মণ্ডলের দাড়ি মুঠো করে ধরে। উ-হু-হু-হু, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। (ছাড়িয়ে নিয়ে। কী ডাকাতে বউ-রে বাব্বা, কী ডাকাতে বউ।

[সকলে হাসে, মেয়েটিও খিল খিল করে হাসে।]

[ফকির, নিরঞ্জন ও সকন্যা বরকত বাদে সকলের প্রস্থান।]

ফকির। হুঁঃ, গাঁতায় খাটলে।—গাঁতায় খাটলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। গাঁতায় খাটলে!—ধরো যে সমস্ত জমি কবালা হয়ে গেছে, কী করে সেইসব জমিতে গাঁতায় খেটে! আর তারপর ধান বন্ধকি রেখে দাদন খেয়েছে যারা, তাদের জমিতেই বা গাঁতায় খেটে কী হবে আমাদের। ধান তো যাবে জোতদার মহাজনের ঘরে—তারপর।

বরকত। আ-হা তা আছে সে সমস্যার কথা। এ তো আর কেউ অস্বীকার—

ফকির। তো তবে, ফলডা কী হবে এতে করে।

বরকত। তা বলি চেষ্টাডা' ত করতে হবে, না কী, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব সব!

ফকির। ভালো, দ্যাখো—কর চেষ্টা।

[ফকিরের প্রস্থান।]

বরকত। ফ'করেডা যেন একেবারে কী রকম ধারা মানুষ!

নিরঞ্জন। (দাওয়ার ওপর বসে তামাক সাজতে সাজতে) তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন বরকত চাচা, বস; উঠে বস।

বরকত। হ্যাঁ বসি, বসি। (উঠে বসে)

নিরঞ্জন। (কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে) মানুষ, এ মানুষের হুঁ। কখনও কি ভাবতে পেয়েছি বরকত চাচা যে আবার ভিটেয় ফিরে আসব, আবার ঘর বাঁধব, নতুন করে আবার—

[বরকতের দিকে চেয়ে থাকে।]

বরকত। (তামাক খেতে খেতে) এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই।

নিরঞ্জন। (ঘাড় নাড়ে) ঠিক ঠিক!—এক এক সময় মনে হয় বরকত চাচা, যে এ নৌকো বুঝি আর চললে না, থাকল আটকে পড়ে চোরাবালিতে ঐ মাঝ ডাঙায়। কিন্তু তারপরই দেখি যে না, আবার চলতে আরম্ভ করেছে নৌকো তর্ তর্ করে, টল টল করছে জল দরিয়ার। কোথায় চোরাবালি! অদ্ভুত, অদ্ভুত!

বরকত। সংসারের ধারাই তো এই। (দুজনে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ) রাত হয়ে গেল নিরঞ্জন, আমি তা হলে উঠি এখন। (উঠে পড়ে)

নিরঞ্জন। আচ্ছা যাচ্ছ তো তা হলে মণ্ডলের বাড়ি?

বরকত। হ্যাঁ, তুমিও যেয়ো যেন।

[গমনোদ্যত।]

নিরঞ্জন। (পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে) হ্যাঁ নিশ্চয় যাব।

[বরকতের প্রস্থান।]

(নিরঞ্জন ফিরে গিয়ে দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। নিরঞ্জনের বউ বিনোদিনী দাওয়ার ওপর কেরোসিনের একটা ডিবরি জ্বালিয়ে রেখে উঠোনের একধারে চুলো ধরিয়ে ভাত চড়িয়ে দেয় মাটির হাঁড়িতে। আবছা, অন্ধকারে মেটে হাঁড়িটা পরিবেষ্টন করে আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে। নিরঞ্জন শুয়ে পড়ে গান ধরে।)

(গান)

বড় জ্বালা বিষম জ্বালায়
পুড়ে পুড়ে হব সোনা,
সে কথা তো মিথ্যে হল
হলাম অনুপায়।
দুখের দাহন সুখের আসন
বিজ্ঞজনের হক্ কথা,
শুনে এলাম এই তথ্য।
চলতি পথের একতারায়।
হলাম নিরুপায়।।

[গান শেষে কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ।]

কুঞ্জ। (ক্লান্ত স্বরে) এও য্যানো আবার কার বাড়ি এসে উঠলাম। (দীর্ঘশ্বাস) হায় ভগবান!

রাধিকা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) আর ঠাওরই করা যায় না অন্ধকারে।

নিরঞ্জন। (ধড়মড়িয়ে উঠে বসে) কেডা ও।—আরে কথা বলে কেডা ওখানে!

কুঞ্জ। (থতমত খেয়ে) এই—এই আমরা?

নিরঞ্জন। (উঠে দাঁড়ায়) আমরা! আমরা, কেডা তোমরা! বলতে পার!

কুঞ্জ। আমরা—আচ্ছা এখানে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ি কোথায়?

নিরঞ্জন। প্রধান সমাদ্দার—(দুই তিন পা এগিয়ে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) হ্যাঁ প্রধান সমাদ্দার, কিন্তু তাই কী, কেডা তোমরা!

কুঞ্জ। আমরা! (রাধিকার দিকে তাকিয়ে) নিরঞ্জন, নিরঞ্জনের মতন—

নিরঞ্জন। কথা বলে না। আলোটা নিয়ে আয় দিনি বউ।

[বিনোদিনী কেরোসিনের ডিবরিটা হাতে করে এগিয়ে আসে। লাল আলোতে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে বিস্মিতের ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে এক মুহূর্ত।]

দাদা দাদা তুমি!

[বিনোদিনী রাধিকাকে বাহুবেষ্টনে আঁকড়ে ধরে।]

কুঞ্জ। (ভাঙা গলায়) সেই নিরঞ্জন বউ আমাদের। সেই নিরঞ্জন। (হঠাৎ ত্রস্তে) দেখি দেখি, তো দেখি, তো সেই যে আমি তোরে মেরেছিলাম মাথায় দেখি তো—(নিরঞ্জনের কপালে হাত বুলিয়ে) এখন আর ব্যথা নেই, না!

নিরঞ্জন। (অভিভূত হয়ে) না।

[উভয়ে আলিঙ্গন করে।]

কুঞ্জ। আমাদের নিরঞ্জন বউ।

কুঞ্জ নিরঞ্জনের মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুঞ্জর গৃহপ্রাঙ্গণ। সদ্য কাটা ফসলে ভরে গিয়েছে উঠোনটা। উঠোনের একধারে নিরঞ্জন মাথায় গামছার একটা ফেটা বেঁধে ধোপার পাটের মত উঁচু একটা বাঁশের ফ্রেমের ওপর ধান ঝাড়ছে, আর তার নিচে বহু ধান জমে আছে দেখা যাচ্ছে। রাধিকাকে ধামা ভরতি করে সেই ধান সংগ্রহ করতে দেখা যাচ্ছে। উঠোনের বাঁদিকে একটা নতুন ধানের মরাইয়ের সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। মাথায় গামছার ফেটা বাঁধা একটা লোক সদ্য কাটা ফসলের বোঝা থেকে আঁটি আঁটি ধান নিরঞ্জনের হাতের কাছে জোগান দিয়ে চলেছে। নিরঞ্জনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আর একজন লোক ধান ঝাড়ছে। আর বিনোদিনী কূলো করে ধান উড়োচ্ছে। কুঞ্জ হুঁকো হাতে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সব খবরদারি করে বেড়াচ্ছে। উজ্জ্বল দিবালোকে কর্মব্যস্ত মানুষগুলোকে এতদিনে বেশ জীবন্ত মনে হচ্ছে দূর থেকে। অর্ধেক ধামা ধান ভরতি করে রাধিকার দিকে চেয়ে কি একটা রসিকতা করে বিনোদিনী হাসতে হাসতে ধানের ওপর প্রায় লুটোপুটি খাচ্ছে। রাধিকা দু'হাত কূলো ভরতি ধান মাথার ওপর তুলে ধরে হাসছে মুখ টিপে আর ধান ওড়াচ্ছে। নিরঞ্জন কয়েক আঁটি ধান উপর্যুপরি কয়েক বার ফ্রেমের উপর আছড়ে বাঁদিকের খড়ের গাদায় ফেলে দিয়ে হাঁপাতে থাকে। আর হাত দিয়ে কপালের ধান মুছে ফেলে হঠাৎ বিনোদিনীর দিকে নজর করে।

নিরঞ্জন। (হাস্যময়ী বিনোদিনীর প্রতি) দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো কাণ্ড দ্যাখো! ওমা, দ্যাখো গলে পড়ল! খুব ধান তুলছিস যাহোক! এই রকম কাজ করলেই হয়েছে আর কী!

বিনোদিনীর হাসি আরও বেড়ে যায়। হাসতে হাসতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধানের ওপর

ওমা, দে-দেখছ কাণ্ড! (কৃত্রিম রোষে) বউদি, তুমি বলছ না কিছু ওরে, আ গেল যা। কথা শুনে হাসতে হাসতে রাধিকার হাত থেকেও যেন কুলো পড়ে যাবার উপক্রম হয় হয়।

ওমা, তোমরা সকলেই তা হলে। কী হয়েছে কী বলদিনি তোমাদের সব?

বিনোদিনী। (হাসি সামলে) হাতির পা দেখিছি। (হাসতে থাকে)

[রাধিকাও হাসে।]

নিরঞ্জন। (কয়েক আঁটি নতুন ফসল নিয়ে) সেই রকমই মনে হচ্ছে বটে।

[ধান ঝাড়তে থাকে।]

রাধিকা। (হাসি থামিয়ে এক কুলো ধান তুলে বিনোদিনীর প্রতি) নে, কাজ কর কাজ কর। বেশি হাসি ভালো না। (হেসে নিরঞ্জনের দিকে ইঙ্গিত করে) যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্না, জানলি!

নিরঞ্জন। (রাধিকার প্রতি) ঐ যে আসছে রামসন্না, দেখাবে'খন হাসি। (রাধিকা কাজে মন দেয়। বিনোদিনী মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে ধান তুলতে থাকে। হাসো, এইবার হাসো!

[ধান তুলতে থাকে।]

কুঞ্জ। (রাধিকার দিকে এগিয়ে) কী, এগারো কাঠার মতো হয়েছে! তো তুলে দাও। (প্রসন্ন হেসে) আমার ধানডাই আগে পড়ুক।

রাধিকা। এগারো কাঠা কেন, দশ কাঠা বল।

নিরঞ্জন। দশ কাঠাই তো। তাই ঠিক হল না মণ্ডলদার বাড়ি বসে।

কুঞ্জ। দশ কাঠা। আচ্ছা তো আর এক কাঠা নয় আমি বেশিই দিলাম নিজের থেকে। এগারো কাঠা দাও। বেরিয়ে গেল যখন একবার মুখ থেকে—

নিরঞ্জন। (প্রসন্ন মুখে) তা সে বোঝো তুমি। মন চায় দ্যাও। ধর্মগোলায়ই তো যাবে, দ্যাও।

[দয়ালের প্রবেশ।]

দয়াল। কী ধর্মগোলায় যাবে?

[রাধিকা ও বিনোদিনী ঘোমটা টেনে দেয়।]

কুঞ্জ। এই যে, মণ্ডল এয়েছে।—না এই ধানের কথা হচ্ছে। বলছি বলি দাও তা হলে আমার ভাগডাই আগে দেই ধর্মগোলায়।

দয়াল। (হেসে টাকে হাতে বুলিয়ে) ভালো ভালো। তা উঠে গেছে তো সব ধান।

কুঞ্জ। হ্যাঁ তা প্রায় গেছে।

দয়াল। যাক্ (রাধিকার প্রতি হেসে) এইবার একদিন নতুন চালের পিঠে খাইয়ে দিও যেন বউমা।

কুঞ্জ। (হেসে) তা সে তো খাওয়াতেই হবে। নবান্ন আসছে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা মণ্ডলদা, এবার নবান্ন উৎসব হবে না!

দয়াল। নবান্নের উৎসব, হ্যাঁ, কেন হবে না! নিশ্চয় হবে।

নিরঞ্জন। (হেসে) প্রতি বছর যে রকম হয় এবারও একেবারে সেই রকম ধূমধাম করে। লাঠা-টাঠি খেলা হবে।

দয়াল। হ্যাঁ।—আচ্ছা এবার আমি তোর সঙ্গে লড়ব, তৈরি হয়ে থাকিস।

নিরঞ্জন। (হেসে) আমার সঙ্গে, আচ্ছা! আচ্ছা!

দয়াল। (স্মিত মুখে) হাতলাঠি কিন্তুক।

নিরঞ্জন। আচ্ছা তাই।

দয়াল। হ্যাঁ; আর যদি না পারিস?

নিরঞ্জন। (উৎফুল্লভাবে) না পারি তো এক সের জিলিপি।

দয়াল। (কুঞ্জ ও আর সকলের প্রতি) শুনলে কিন্তু তোমরা সব। এক সের জিলিপি খাওয়াবে নিরঞ্জন আমারে হেরে গেলে পরে। (নিরঞ্জনের প্রতি) আবার দেখিস।

[গমনোদ্যত।]

নিরঞ্জন। (হেসে) হ্যাঁ সে আমি দেখিছি, দেব এক সের তা কী হয়েছে।

[দয়াল গমনোদ্যত।]

কুঞ্জ। মণ্ডলদা চললে নাকি?

দয়াল। হ্যাঁ মাঠের থেকে ঘুরে যাই একবার।... আজ তো বরকতের পালা, নাকি?

কুঞ্জ। হ্যাঁ, আচ্ছা তো এগোও তুমি আমি যাচ্ছি।

[দয়ালের প্রস্থান।]

নিরঞ্জন। (গদগদ হেসে) উ-উ-উঃ, মণ্ডলদা যে সে একেবারে—

রাধিকা। (ঘোমটা খুলে) বুড়ো হলেও মণ্ডলদার তো এখন বেশ শখ আছে দেখি।

বিনোদিনী। (হেসে) মণ্ডলদা কিন্তু বেশ ভালো লাঠি খেলা জানে, হ্যাঁ। কথা তো দিলে, শেষ কালে দশজনের সামনে বুড়োর কাছে আবার অপদস্থ না হও। তা হলে আর—

নিরঞ্জন। ওগো হ্যাঁ, রাখদিনি তুমি! কত মাতব্বর মণ্ডল দেখে এলাম!

রাধিকা। (ঠাট্টার সুরে হেসে) ও এক সের জিলিপি তোমার গেছে যাই বল!

কুঞ্জ। ন্যাও কী হল, হয়নি এগারো কাঠার মতো এখনও! না, হাসবে আর শুদ্ধু মস্করা করবে তার কাজ হবে কী করে!

রাধিকা। (কৃত্রিম রোষে) ওমা, তা তুলবে তো তোলো না ধান ধর্মগোলায়, আমি কি বারণ করছি। আ গেল যা! একেবারে খেয়ে ফেললে কানের মাথা এগারো কাঠা এগারো কাঠা করে।

নিরঞ্জন। তা হয়ে তো গেছে, এইবার তুলে ফ্যালো না।

রাধিকা। ভর লো বিনো ধান কাঠায়।

কুঞ্জ। ধর্মগোলায় ধান দিবি কালো মুখ করে যেন দিসনি বউ। স্মরণ করে দ্যাখ, এই ধান—

রাধিকা। ওমা, কালো মুখ করব ক্যানো। ধর্মগোলায় ধান উঠবে তার আবার—ন্যাও ধরো।

(কূলো নামিয়ে রেখে রাধিকা বিনোদিনীর কাছ থেকে ধামা ভরতি করে ধান নিয়ে কুঞ্জর হাতে দেয় তার কুঞ্জ গোলার বন্ধ পথে ধান চালতে থাকে। নিরঞ্জন যেমন তেমনই ধান ঝাড়তে থাকে। বিনোদিনী আর একটা ধামার ধান ভরতি করতে থাকে।)

কুঞ্জ। (গোলায় ধান ঢালতে ঢালতে) কার ধান—আর কে দেয়! এই জমি বিক্রি করা নিয়েই বা কত, হুঁঃ! সংসার, সংসার—আসবার সময় দেখাড়া পর্যন্ত হল না। কোথায় যে গেল! হয়তো মরেই গেছে য়্যাদ্দিন—যাগ্‌গে আমার কাজ আমি করে যাই।

রাধিকা। (দ্বিতীয় ধামা ভরতি ধান নিয়ে) কই গো ধর।

কুঞ্জ। ও, এই যে, ন্যাও এই—

[খালি ধামাটা কুঞ্জর হাত থেকে রাধিকা বিনোদিনীর হাতে দিল।]

রাধিকা। নে লো।

[গায়ে ঢিলে আলখাল্লা পরা জনৈক ফকিরের প্রবেশ।
হাতের সাদা চামর দুলিয়ে গাইতে লাগল।]

পেছনে দুজন ফকিরের দোহার, ধুয়া ধরে চলে—'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম'।

ফকির। (ডাক ছেড়ে বিড় বিড় করে কী সব বলতে লাগল) ও-ো-ো (বিড় বিড় করতে লাগল)

আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান।
হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।।
এ ছাড়া আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।
আজও যদি শিক্ষা না হয় শিক্ষা হবে কবে।।
(এখন) বুঝে শুনে যেবা জন পৃথক হয়ে রয়।
ছয় মাসের মধ্যে তার এন্তেকাল ফরমায়।।
খলিলপুরের জব্বর মিঞার দুঃখের কথা জানো।
প্রতিবেশী পতিত পাবন বৈরী যে কারণ।।
কালান্ত আকালে এমন কত চাষী ভাই।
অকালে যে প্রাণ হারাইল লেখা জোখা নাই।।
গরু বাছুর মরল কত হিসাব কে তার রাখে।

নারী শিশু প্রাণ হারাইল কত লাখে লাখে।।
ঘরের বউ বাউরা হইয়া উধাও হইয়া যায়।
এ নহে জঘন্য বৃত্তি জীবনের দায়।।
বালবাচ্চা কচি শিশু দুধ না পাইয়া মরে।
জননী প্রেতিনী হইল বুকে রক্ত ঝরে।।
কোমরে কাপড় নাই বস্ত্র অনটন।
গৃহস্থের হইল দায় লজ্জা নিবারণ।।
কলসকাঠির এরশাদের বউ বললে কেঁদে ডেকে।
কবর খুঁড়ে কাপড় নিয়ে তবে লজ্জা ঢাকে
বাঁচিয়া মরিয়া আছে গৃহস্থ সজ্জন।
ঘরে ঘরে অপমৃত্যু কারণ অনশন।।
মাঠে ঝরে পাকা ধান আর চোখে পানি।
শক্ত করে ধরো হাল হালে পাবে পানি।।
এ জীবনের প্রহসনে কী বা বল ফল।
বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল।।
আমন ফসল শুভ-লক্ষণ প্রতি ঘরে ঘরে।
গাঁতায় খাটিয়া তোলো মিলি পরস্পরে।।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্বার্থ সিদ্ধি গৃহস্থের নয়।
ছোট মুখে বড় কথার এই মর্ম হয়।।

পূর্ণ ধুয়া— আপনি বাঁচলে তো...দোস্তালি পাতান।।

ফকির। মা...গায়েন ফকিরকে মুশকিল হইতে আসান করবেন।

রাধিকা ছোট একটা বেতের সাজিতে ভরে ফকিরের ঝুলিতে ধান ঢেলে দেয়।

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা। সূর্য ডোবে ডোবে। গোধুলি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে চরাচর। আজ নবান্ন-উৎসব। গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা তাই ভিড় করছে এই মরা গাঙের ধারে। স্বাস্থ্যহীন শরীরগুলোতে আজও বিগত আকালের কলঙ্কছাপ সুস্পষ্ট। তবু আজ এই স্বর্ণসন্ধ্যায়, এই মরা গাঙের ধারে চলেছে নবান্নের উৎসব। অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে সব কৃষান-কৃষানীরা। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে সমস্ত চরিত্রগুলো সভায় যোগদান করেছিল বিভিন্ন বেশে এই উৎসবে আজ তারা সকলেই সমুপস্থিত। সকলেই গৃহস্থ চাষী। বেশির ভাগ লোকেরই খালি গা, সঙ্গে একখানা গামছা—মাথায়, কোমরে বা কাঁধে।

নেপথ্য থেকে মাঝে মাঝে গরুর ডাক শোনা যাচ্ছে। আর থেকে থেকে গরুর গলার ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঢোলের শব্দ দু'চারবার পাওয়া যাচ্ছে প্রথম দিকেই।

পর্দা সরে যেতেই দেখা যাচ্ছে স্টেজের একদম পেছন দিকে Shadow play দেখবার জন্যে চার ফুট উঁচু একটা প্রাচীরের সামনে চাষী মেয়েরা সব দলে দলে পা ছড়িয়ে ব'সে গান করছে আর পান খাচ্ছে। কপালগুলো তাদের সব তৈলাধিক্যে চকচক করছে। কলহাস্যে মুখর পরিবেশ।

আর সামনে খালি গায়ে চাষীরা লড়ায়ে মোরগ কোলে করে বসে আছে। মোরগদের পায়ে সুতো বাঁধা, মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটে শব্দ করে উঠছে। চাষী রমণীদের গান শেষ হতেই মোরগের লড়াই শুরু হল। ভিড় করে দাঁড়াল সব দর্শকরা। জোড়ায় জোড়ায় লড়াই। যে বাজী জিতল তাকে নতুন একখানা গামছা আর একখানা কাস্তে দিয়ে সম্মানিত করা হল।

মোরগের লড়াই শেষ হতেই চাষীদের একটা গান শুরু হল, আর সেই গান ছাপিয়ে নেপথ্যে উঠল ধাবমান গরুর ক্ষুরের শব্দ—গরু-দৌড় হচ্ছে। এই দৃশ্যটি Shadow play করে দেখাতে হবে। পিচবোর্ডের গরু বা বড়ো পুতুলের সাহায্যেও এটা দেখানো যেতে পারে। এই সময় গরুর গলার ঘন্টাগুলো সব একসঙ্গে জোরে ঝম ঝম করে বাজতে থাকবে আর নেপথ্যে হুড় হুড় দুড় দুড় শব্দ হবে। অনুসন্ধান করে যার গরু বাজি জিতবে জানা যাবে তাকে একখানা নতুন কাপড়, একখানা গামছা আর একখানা নতুন লাঙল উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হবে।

গরু দৌড় শেষ হতে সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হল তুমুল ঢোল আর কাঁসর বাজনা। এইবার লাঠিখেলা। ঢোলের সঙ্গে তাল রেখে বেতের ঢাল আর হাতলাঠি নিয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ শুরু হল নৃত্যছন্দে। দু-একটা লড়াই হয়ে যাবার পর তৃতীয় রাউণ্ডের জোর একটা লড়াই-এর শুরুতে প্রধান এসে হাজির হল।

[(কৃষকরমণীদের গান)]

নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি
ডুরে শাড়ি পাছাপাড় আর হার সাতনলি।
ক'নে দেখা আলো মেখে আসবে বঁধু আল বেয়ে
দেখে হেসে সরে যাবি কথা না কয়ে।।

চারজন চারজন আটজন লোক ঝুঁটিওয়ালা আটটা মোরগ কোলে করে বসে আছে। প্রত্যেকটি মোরগের পায়ের সঙ্গে সুতো বেঁধে বাঁহাতের তর্জনীর সঙ্গে পেঁচিয়ে বাধা আছে; উড়লেও উড়ে যেতে পারবে না। সকলেই যে যার মোরগের তারিফ করছে মাথায় হাত বুলিয়ে। গান শেষ হতেই কথাবার্তা শুরু হল।

১ম সারির ১ম ব্যক্তি। (মোরগ উড়ে যাবার চেষ্টা করতেই ধরে) আরে র-র-বেটা-র। বাজি জিতবে বলে একেবারে তর সইছে না, য়্যাঁ!

২য় সারির ৪র্থ ব্যক্তি। (মোরগ ডানা ঝাপটাতেই)। বাপুরে, বাপুরে বাপুরে তেজ। মেজাজ চড়ে গেছে বাবুর কথাবার্তা শুনে। দ্যাখো না, একেবারে ডগমগ করছে চোখ! লড়বা, লড়বা, সবুর।

২য় সারির ৩য় ব্যক্তি। (মোরগ কোলে করে) আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সঙ্গো সঙ্গো উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়ে! (মোরগকে লক্ষ করে) সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এডারেই! এট্টু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এর! হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এর!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (১ম সারির ২য় ব্যক্তির প্রতি) তা ও বাচ্চাডারে ধরে এনেছ কেন মিঞা? সব ডাঁটো ডাঁটো মোরগ এক বাজির তালও সামলাতে পারবে না ঐ বাচ্চা।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (একটু মুখ টিপে হেসে হেসে) কোন বাচ্চা!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। তোমার কোলের মোরগের কথা বলছি। বলছি বলি আনলে যখন তখন ভালো দেখে একটা খাসি আনলেই পারতে!

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (একটু উপেক্ষার হাসি হেসে) বলতে পার!

১ম সারির ৩য় ব্যক্তি। (২য় সারির ১ম ব্যক্তির প্রতি) বলি খুব তো লম্বাই চওড়াই বাত বলছ। ও মোরগ কোথাকার জানো?

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (থতমত খেয়ে) কোথাকার!

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (১ম সারির ৩য় ব্যক্তির প্রতি) আরে চুপ করে যাও; কান আছে শুনে যাই।

১ম সারির ৩য় ব্যক্তি। হুঃ চ'রে মোরগ। ওর জাতই ঐ, দেখতে ছোটো। কিন্তু একেবারে বিচ্ছু।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। কত বড়ো বড়ো পালা খাসি বলে তিন ঝাপ্পড়ে লটকে ফেলে ভুঁই-এ! বিষটা তো জানো না এর; তাই বাচ্চা বলছ।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (১ম সারির ২য় ব্যক্তির মোরগের ঠোঁটে হাত দিয়ে) ঠোঁটটাই দ্যাখো না, শক্ত যেন একেবারে ল্য। ব্যাটা ঠোকরায় তো না যেন ছুরি চালায়।

[হাতের টিপ খেয়ে মোরগটা ডেকে উঠল।]

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (হতাশ হয়ে) আমার পালা খাসি।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। ও দেখেই বুঝিছি, আবার বলবা কী। ভাত খেগো তো!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ।

[১ম সারির ২য় ব্যক্তি অশ্রদ্ধার ঘাড় বেঁকিয়ে বসল। দয়ালের প্রবেশ।]

দয়াল। কী বসে আছ যে তোমরা সব মোরগ কোলে করে। এইবার শুরু করে দাও।

১ম সারির ১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ তো জজেরা এলেই এবার আরম্ভ হতে পারে লড়াই।

দয়াল। জজেরা, তা এসে গেছে তো সব জজেরা। (হাঁক দেয়) বলি ও কুঞ্জ, আর বরকত মিঞারে সঙ্গো নিয়ে এদিকে এসো। মোরগের লড়াইডা হয়ে যাক। (প্রতিযোগীদের

প্রতি) তো ন্যাও শুরু করে দাও এইবার। (মোরগগুলো দেখে) জবর জবর মোরগ এয়েছে তো দেখে এবার।

(প্রথম ও দ্বিতীয় সারির পিছনে জজেরা ও জনতা ভিড় করে দাঁড়ায়। মাঝখানে জোড়ায় জোড়ায় লড়াই শুরু হয়। দর্শকেরা লড়াইয়ে রত মোরগদের তারিফ করে—বারে বেটা, আহা, াহা, মার প্যাঁচ ঝাপটা মার মার ঝাপটা, বেশ, বেশ ইত্যাদি।

নেপথ্যে ঘুঙুরের বোল সহ মেয়েদের গান আবার শোনা যায়। মিনিট দুই তিনেক সময়ের মধ্যেই মোরগের লড়াই শেষ হয়। দ্বিতীয় সারির চতুর্থ ব্যক্তির মোরগ বাজি জেতে। তখন তাকে সবাই মিলে উঁচু করে তুলে ধরা হয় সর্বজন সমক্ষে!)

কুঞ্জ। (সহাস্য মুখে ঘোষণা করে) ফেকু মিঞা, মোরগের লড়াইয়ে বাজি জেতার জন্যে ফেকু মিঞারে উপহার দেওয়া হল—এই একখানা গামছা আর একখান কাস্তে। ফেকু মিঞা হাসি মুখে দু'হাত পেতে উপহার নিল। সকলে তখন আবার তুমুল হর্ষধ্বনি করে ফেকু মিঞাকে সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরল।

ফেকু মিঞা। (সহাস্য মুখে) আরে দ্যাখো কী করে, পড়ে যাব পড়ে যাব।

সকলের গান

(আহা) ফেকু মিঞার মোরগ জিতেছে।
দেমাকে মিঞার দাড়ি ফুলে উঠেছে।
(আহা) ফেকু মিঞার মোরগ জিতেছে।

দুই চার ফেরতা গাওয়ার পর সামনের জনতা পাতলা হয়ে যায়। ত্রস্ত গতিতে সব পেছন দিকে ছুটে চলে। এই সময় নেপথ্যে ধাবমান গরুর ক্ষুরের শব্দ উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে রিনটিন টুং টাং ঝমা ঝম্ ঝম্ ঘন্টার আওয়াজ হতে থাকবে। Shadow play-র সাহায্যে দু'চারটে গোরু বৃহদাকারে দেখানো যেতে পারে একদম পেছনের সাদা পর্দায়। পর্দার গায় ছায়াছবিতে গোটা দুয়েক গোরুর ঊর্ধ্ব পুচ্ছ দেখিয়েও গতিবেগটা বোঝানো যেতে পারে। নেপথ্যে এই সময় চলতে থাকবে অবিরাম দ্রুত হুড় হুড় হুড় হুড় আওয়াজ। হট্টগোলের মাঝখানে দু একবার হাম্বা রবও শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে একজন চাষীকে কাঁধে করে জনতা হর্ষধ্বনি করতে করতে ঢুকল।

নেপথ্যে থেকে শোনা যায়, আরে গোরু জিতল কার? মঞ্চের উপর ভিড়ের ভেতর থেকেই উত্তর হল, রহমৎউল্লার। রহমৎউল্লাকে ঘাড়ে করে চাষীরা নাচছে।

কুঞ্জ। (গন্ডগোলের ফাঁকে ফাঁকে জোর গলায় ঘোষণা করে) প্রতি বছর, প্রতি বছর যে রকম গোরু আসে এমন দিনে, এবার তেমন মোটেই আসেনি। কারণ বলদ যা ছিল, প্রায়ই সব মরে গেছে, আর যে-গুলো এখনও টিঁকে আছে ঝড়-ঝাপটার পর, সে-গুলিও খুব কাহিল। প্রথমত গোরু-দৌড় এবার বন্ধই রাখা হবে বলে সাবস্ত্য হইছিল। তারপর অবশ্য

মণ্ডলের কথায়, গোরু দৌড় হবে ঠিক হল। মণ্ডল বলিছিল, গোরুই আমাদের এ উৎসবের প্রাণ সুতরাং কাহিল হোক আর যাই হোক গোরু দৌড় এবারেও হবে। বলদগুলোর শরীরে তাকত নেই, তাই গোরু-দৌড় এবার তেমন জুত্সই হল না। তা সে যা হোক, আসেনি কারও তেমন জুতসই বলদের সংখ্যা এবারে একেবারে কম হয়নি। আর যে দৌড় হল, তাতে করে রহমৎউল্লার গোরু বাজি জিতেছে। তাই উপহার হিসেবে রহমৎ ভাইকে এবার একখানা নতুন কাপড় আর একখানা লাঙল দেওয়া হবে। লাঙলখানা দিয়েছেন আমাদের দয়াল মণ্ডল।

(জনতা রহমৎউল্লাকে তুমুল হর্ষধ্বনি করে আবার একবার সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরে নামিয়ে দেয়। রহমৎউল্লাকে পেছন দিক থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দেওয়া হল। দয়াল মণ্ডল সহাস্য মুখে রহমৎউল্লার হাতে একখানা নতুন কাপড় ও একখানা লাঙল তুলে দেয়।)

দয়াল। আসছে বারে ভালো বলদ আনা চাই।

[রহমৎ গদগদ হয়ে হাসে আর জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করতে থাকে।]

কুঞ্জ। জোরসে হাল চালাবা এবার আর কী!

সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে শুরু হয় তুমুল ঢোল কাঁসির আওয়াজ। ছন্দ যেন দুলে দুলে উঠছে থেকে থেকে। এবার লাঠিখেলা। বাজিয়েরা মঞ্চের উপর নেচে নেচে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জনতা লাল কৌপিনপরা দুজন লাঠিয়ালকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়াল। লাঠিয়ালদের বাঁহাতে বেতের ঢাল, আর ডানহাতে হাতলাঠি (নড়ি)। বাজনার তালে তালে পা ফেলে লাঠি খেলতে লাগল। প্রথম রাউণ্ড শেষ হতেই ঢোলের আওয়াজ সাময়িকভাবে তিনবার দুনে বেজে বন্ধ হতে না হতেই দ্বিতীয় রাউণ্ডের দুজন লেঠেলের মল্লভূমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল দুনে নৃত্যছন্দে। এবারকার লেঠেলরা খুব কায়দা করে খেলা দেখাল। দ্বিতীয় রাউণ্ডের বিরতির পর বৃদ্ধ দুইজন লাঠিয়ালের খেলা শুরু হল। প্রথম দিকে টিমে তালে খেলা শুরু হবার একটু পরেই দেখা গেল দূরে ঢোলের ছন্দ পায়ে তুলে প্রধান আসছে নাচতে নাচতে। নেপথ্যে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি।

১ম দর্শক। উত্তরে মেঘ হয়েছে, এট্টু তাড়াতাড়ি নাও।

কেউ শুনল না। বাজনার তালে তালে পুর্ণোদ্যমে শুরু হল লাঠিখেলা। দুলে উঠতে লাগল ঢোলের বাজনা আর কাঁসির শব্দ থেকে থেকে। হঠাৎ লাঠিখেলার মাঝখানে দু চারজন দর্শকের দৃষ্টি গিয়েপড়ল প্রধানের ওপর। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তাকাতে লাগল তারা প্রধানের দিকে—যেন কিছুতেই চিনে উঠতে পারছে না লোকটাকে। প্রধান গাঁই-গুঁই শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ জনৈক দর্শক চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে। গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি।

২য় দর্শক। (খুব জোরে চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে) মোড়ল, মোড়ল এয়েছে! মোড়ল!

(আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে প্রধান এগিয়ে আসে মাথা নাড়তে নাড়তে আর হাসে।

সকলের দৃষ্টি প্রধানের ওপর গিয়ে নিবদ্ধ হয়। জনতা এক পাশে সরে দাঁড়ায়। ঢোল থেমে যায়।)

প্রধান। আমি এইছি, এসে পড়েছি আমি।

(জনতার মাঝখানে বীর লাঠিয়ালের বেশে লাল কৌপিন পরে দাঁড়িয়ে আছে দয়াল। চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে গেছে তার অপূর্ব এক আনন্দে। কিন্তু কথা বলতে পারছে না। কুঞ্জ, নিরঞ্জনও নির্বাক হয়ে গেছে।)

আমি এসে পড়েছি। এসে পড়েছি আমি।

কালো একখানা মেঘ উঠে আসে ধীরে ধীরে উৎসবের মাথার উপর।

দয়াল। (বিশ্বাস যেন হয় না, তাই নিম্ন স্বরে) প্রধান, প্রধান এলে! প্রধান!

কুঞ্জ। (চিৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে প্রধানকে) জেঠা! জেঠা! জেঠা!

প্রধান। (স্মরণে আসে কি আসে না তাই দ্বিধা) য়্যাঁ, য়্যাঁ, কুঞ্জ আমার কুঞ্জ!

[কুঞ্জর মুখটা দু-হাতে ধরে দেখতে লাগল!]

কুঞ্জ, কুঞ্জ!(গরু গরু মেঘের ধ্বনি)

দয়াল। (এগিয়ে এসে) প্রধান চিনতে পারো এই বুড়োরে য়্যাঁ, চিনতে পারো!

(এক গাল দাড়ি মাথার চুলের জট থেকে মুখের ওপর এসে পড়েছে প্রধানের! সেই বিকৃতদর্শন মুখখানার ওপর যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল শাণিত দৃষ্টিটা।)

প্রধান। (তর্জনী তুলে) তুমি, তুমি বাবুরালি—(পাথরের মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দয়াল) য়্যাঁ, য়্যাঁ তুমি, কৃপনাথ।

[দয়াল কোনো সাড়া দেয় না!]

তুমি, তুমি, কেডা তুমি? (কৌতূহলী করুণ হেসে) দয়াল! দয়াল! তুমি দয়াল!

দয়াল। য়্যাঁ, স্মরণে আসে, প্রধান?

প্রধান। (হেসে তর্জনী তুলে) হ্যাঁ, আসে স্মরণে আসে। দয়াল! দয়াল! তুমি দয়াল।

(দু-ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে প্রধানের। গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি।)

দয়াল। আজ আমাদের নবান্নের উৎসব প্রধান।

প্রধান। নবান্নের উৎসব! ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো। সুদিন পড়েছে সব! দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন। আর আসবে না।

দয়াল। যদি আসেই, তো ডর কিসের!

প্রধান। ডর নেই! দুখেরে ডরাও না; য়্যাঁ, ডরাও না দুখেরে! বেশ, বেশ, বেশ ভলো। ভালো। ভালো।

দয়াল। ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরা! আমরা তো বেঁচেই আছি। এই যে তোমার কুঞ্জ, নিরঞ্জন, এই যে বরকত, সখীচরণ। চেনে তো সব এদের? কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।

প্রধান। মরনি, মরনি মন্বন্তরে, ভালো। ভালো। ভালো। কিন্তু দয়াল, মন্বন্তর যদি আবার আসে! আবার যদি আসে সেই মন্বন্তর!

(গুরুগুরু মেঘের আওয়াজ। জলভরা কালো মেঘের একটা অংশ উঠে এল উৎসব অঙ্গনের এক চতুর্থাংশের ওপর কালো ছায়া ফেলে।)

(মেঘের দিকে লক্ষ্য করে) এই দ্যাখো নিচে এই উৎসব, কত আহ্লাদ, কত আনন্দ, কিন্তু আবার ঐ ঐখানে, ঐ ওপরে, দ্যাখো কত বড়ো একটা গোলযোগ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। কত বড়ো একটা গোলযোগ! কত বড়ো একটা—

[বিকৃত মুখে মাথা নাড়তে লাগল।]

দয়াল। জানি প্রধান, মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন; আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!

প্রধান। (জোরে চীৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে দয়ালকে) দয়াল!

যবনিকা

৪৭.১৪ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ চতুর্থ অঙ্ক)

আবার সেই আমিনপুর। কিন্তু এ যেন এক নতুন গ্রাম। হকচকিয়ে যায় তারা। এখানে বাড়ি উঠেছে। তাই কুঞ্জ বলে, এও য্যানো আবার কার বাড়ি এসে উঠলাম।' রাধিকা ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করে, 'আর ঠাওরই করা যায় না অন্ধকারে। তাদের কণ্ঠস্বর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নিরঞ্জন। তারপর দুই ভাই আর দুই বৌ-এর মিলন হয়—এক বিষাদঘন মমতামেদুর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে।

[৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য]

অপরদিকে। প্রধান, কুঞ্জ আর রাধিকাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে এক হাসপাতালে। প্রায় উন্মাদগ্রস্ত প্রধানের চোখ দিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যাপারে নিদারুণ দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। **[৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য]** তারপর ওখান থেকে প্রধান ঘুরতে ঘুরতে ফিরে আসে গ্রামে। আমিনপুরে সে যখন ফিরে আসে তখন গোটা আমিনপুরের চালচিত্রটাই গেছে বদলিয়ে। দুর্ভিক্ষ আর হাহাকারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে আমিনপুর। ফিরে পেয়েছে তার পূর্বেকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। নবান্নের উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছে সমস্ত গ্রামটা। নবান্নের উৎসবমুখর আনন্দঘন দিনে আমিনপুরের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীবৃন্দ তাদের প্রাণের প্রধানকে ফিরে পেয়ে আত্মহারা হয়ে ওঠে। দয়াল জানায়—'আজ আমাদের নবান্নের উৎসব প্রধান।' **[৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]** শোষণমুক্ত সমাজের

স্বপ্ন নিয়ে তার আনন্দ, তার উৎসবের আয়োজনে দৃঢ়সংকল্প ঘোষণায় নাটকের পরিসমাপ্তি। 'নবান্ন' নাটকে এটি আর একটি নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ইঙ্গিত, এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। গণচেতনা বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টা 'নবান্ন' নাটকের উজ্জ্বলতম দিক। যে মানুষ একসময়ে প্রাণঘাতী দাঙ্গার সামিল হয়ে পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হয়, সেই মানুষেরাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উৎসবের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি রচনা করেছে।

প্রধানও সেই আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনার ঘনঘটায় সে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। ঘটনার সুস্থিরতায় হৃত ভারসাম্য পুনঃ অর্জিত হয়। স্বাভাবিকভাবে সে নবান্নের উৎসবে যোগ দেয়। 'নবান্নের উৎসব! ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো! সুদিন পড়েছে সব! দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন।' কিন্তু তবুও মনের তলায় তির তির করে বয়ে চলে সংশয়ের স্রোত। তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আর আসবে না'

প্রধানের আশঙ্কার উত্তর দেয় দয়াল বলিষ্ঠ বিশ্বাসভরা দৃঢ় সংলাপে—'জানি প্রধান মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু একথাও জেনো প্রধান, যে গতবারর মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে, আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব...ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের।...কিছুতেই না। এদের নিতে হলে...এট্টা ব্যবস্থার ওলট পালট করে ফেলে দিতে হবে, তবে যদি পারে। জোর জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।

[৪র্থ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য]

নবান্নের উৎসব মুখর দিনে দয়ালের প্রত্যয় দৃপ্ত শপথের মধ্যে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে। কাহিনীর সমাপ্তি সংলাপ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে এই নাটক প্রতিরোধের নাটক। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মন্তব্য খুবই যুক্তিগ্রাহ্য হবে যে গতানুগতিকতা বর্জিত 'নবান্ন' বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র সংযোজন, একটি অনন্য আস্বাদ, একটি অনাবিষ্কৃত দিগন্তের বার্তাবাহী।

৪৭.১৫ অনুশীলনী ২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) তা ও বেঁচে থাক বাবা....................... , বেঁচে থাক আমার...................... , না হয় .... পয়সা নেবে, জিনিষটি তো ঠিক পাওয়া যাবে।

(খ) থাকবার মধ্যে................ ছিল, গেল। গেল। পথে নেমে দাঁড়াবারও .... সইল নারে কুতুও, ... ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব .... হয়ে গেল।

(গ) আপনি বাঁচলে তো .... মিথ্যা সে .... । .... যতেক চাষী .... পাতনি।

২। (ক) "কুঞ্জ ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।" —প্রসঙ্গটি কী? বক্তা কে? কাকে বলেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন।

(খ) "আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।" —প্রসঙ্গটি কী? বক্তা কে? মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

(গ) " মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ইয়ে, এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচিতে চাইবেই।"—কোন পটভূমিকায় কে এই কথাগুলি বলেছেন? কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

(ঘ) "এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই।" কোন্ প্রসঙ্গে কে কাকে এ কথা বলেছেন?

৩। শব্দার্থ লিখুন ঃ

লোভানি, খেলাপ, শরম, ইজ্জৎ, অনাহক, গাঁতা, ' ব্যাদরা ছেলে' আহাম্মক।

৪৭.১৬ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী—১

১। উদ্দেশ্য পর্যায়ে ৮ টি উদ্দেশ্যের পরিচয় দেওয়া আছে। এ থেকে যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

২। (ক) আগুন (১৯৪৩), খ) ১৯৪৪, গ) ২য় বিশ্বযুদ্ধ। ভারত ছাড়ো ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, জনযুদ্ধ নীতি।

(খ) মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো।

৩। 'অরণি,দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের, শ্রীরঙ্গাম।

৪। (ক) ৬.৪ -এ মূলপাঠ ১-এর ক) অংশ ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

(খ) অঞ্জনগড়, কেরানী, ল্যবরেটরী, আগুন, হোমিওপ্যাথী ও জবানবন্দী—এর যে কোন তিনটির নাম উল্লেখ করুন।

৫। এই পর্বের নাটকের বিষয়বস্তু সমাজের কৃষক, শ্রমিক অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্তের শোষণ-বঞ্চনা। লক্ষছিল এই মানুষগুলির মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগঠনের মাধ্যমে নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচবার প্রেরণা সঞ্চার করা।

অনুশীলনী—২

১। (ক) ব্ল্যাক মার্কেট, মজুতদার, চতুর্গুণই।

(খ) খরখানাই, তর, পথই, একাকার।

(গ) বাপের নাম, বয়ান, হিন্দু, মুসলিম, দোস্তালি।

২। (ক) ৪২-এর আন্দোলনে অংশ নিয়ে প্রধান সমাদ্দারের দুই পুত্র শ্রীপতি, ভূপতি শহীদ হয়েছে। এই শূণ্যতা বোধ থেকে প্রধান কুঞ্জকে চিত্ত বিহ্বলতা জনিত কারণে এই উক্তি করেছেন।

(খ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পুলিশী অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত বাংলার গ্রামবাসীরা যখন ঘরবাড়ী ছেড়ে বনে বাদাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে তখন এ দৃশ্য দেখে পঞ্চাননী ক্ষোভে দুঃখে কুঞ্জকে একথা বলেছেন।

(গ) চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে 'দয়াল' এই কথাগুলি বলেছেন। যুদ্ধ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, মন্বন্তরে-এ যে মানুষগুলি গাঁ ছাড়া হয়েছিল, দুর্যোগের অবসানে তার একে একে গ্রামে ফিরেছে। নতুন করে ঘর বেঁধে, জীবনযাত্রা শুরু করার কালে একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। দিগম্বরের কথায় সামান্য হতাশার সুর বাজতেই বললেন, মানুষতো বাঁচতেই চায়। এটাইতো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মন্বন্তরে সর্বহারা নিরঞ্জন দেখ না নতুন করে ঘর বেঁধে সকলকে নিয়ে সভা করে , আগামী দিনের সংকট উত্তরণের কথা বলছে। এটা স্বাভাবিক। নিরঞ্জন বলে দুঃখ-কষ্টের কথা তো স্বাভাবিক, সে তো মানুষের চিরসাথী, দু-দণ্ড বসে আলাপ আলোচনা করলে খানিকটা উপশম হতে পারে। সকলে এত সম্মতি দেয়। উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে দিয়ে এই ইতিবাচক সিদ্ধান্তই তাৎপর্য হিসাবে প্রতিপন্ন।

(ঘ) চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে গ্রামের মানুষজন এক একে ফিরে এসে নিজেদের পারস্পরিকঅভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে নিরঞ্জন বরকত একথা বলেছেন।
ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি সারাই করে নিজেবাই নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। কখনও দুর্যোগ যেমন আসে, তার অবসানও হয়—মানুষের জীবনযাত্রা কখনই নিস্তরঙ্গ নয়, তার উত্থান-পতন আছে। ধৈর্য্য ধরে তাকে মোকাবিলা করতে হয়। ইতিহাসে এর সাক্ষ্য মিলবে। প্রধান বরকত তার অভিজ্ঞতা থেকে নিরঞ্জনকে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

৩। লোক দেখান, কথা না রাখা / প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরা, লজ্জা, সম্মান, অন্যায়/ অসঙ্গত, যৌথ খামার, দুষ্টু/বেয়ারা ছেলে, বোকা।

৪৭.১৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বিজন ভট্টাচার্য — নবান্ন (প্রথম সংস্করণ)।
২। দর্শন চৌধুরি — গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়।
৩। দিলীপকুমার নন্দী ও নবকুমার মণ্ডল ঃ প্রসঙ্গ নবান্ন (লিপিকা)
৪। মন্দিরা রায় — বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত।
৫। সুধী প্রধান — নবান্ন ঃ প্রযোজনা ও প্রভাব।

একক ৪৮ ❑ নবান্ন নাটকের আলোচনা

৪৮.১ উদ্দেশ্য
৪৮.২ প্রস্তাবনা
৪৮.৩ নবান্ন—রচনা, দেশকাল ও নামকরণ
৪৮.৪ নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
৪৮.৫ সারাংশ
৪৮.৬ অনুশীলনী ১
৪৮.৭ নবান্ন নাটকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা
৪৮.৮ নবান্ন নাটকের গঠন
৪৮.৯ সারাংশ
৪৮.১০ অনুশীলনী ২
৪৮.১১ নবান্ন নাটকের চরিত্র আলোচনা
৪৮.১২ নবান্ন নাটকের সংলাপ ও গান
৪৮.১৩ সারাংশ
৪৮.১৪ অনুশীলনী ৩
৪৮.১৫ 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান
৪৮.১৬ 'নবান্নে'র শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য
৪৮.১৭ সারাংশ
৪৮.১৮ অনুশীলনী ৪
৪৮.১৯ উত্তর-সংকেত
৪৮.২০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৪৮.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককটিতে আপনি বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি সম্পূর্ণই পড়েছেন। নাটক পাঠ সূত্রে আপনি একদিকে যেমন লেখক বিজন ভট্টাচার্যের সৃষ্টিকর্মের সাধারণ পরিচয় পেয়েছেন, সেইসঙ্গে গণনাট্য আন্দোলন ও প্রসঙ্গত নবান্ন নাটকের ভূমিকাটিও দেখেছেন।

বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনি নাটকটির সাহিত্যিক মূল্য ও সেইসঙ্গে সংলাপ ও মঞ্চ পরিচালনার সম্পর্কে জানবেন।

- জানবেন কোন দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটির রচনা ও অভিনয়।
- নাটকের 'নবান্ন' নামকরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন।
- নাটকের নয়া ভাবনা ও চরিত্র পরিকল্পনার অভিনবত্ব লক্ষ করুন।
- নাটকটিতে কয়েকটি গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানগুলির প্রয়োগ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝতে পারবেন।

৪৮.২ প্রস্তাবনা

ভাববাদী শিল্পী দার্শনিকরা মনে করেন, দৈবানুগ্রহে তাদের অনুভবে, মননে, নতুনতর ভাবোদয় হলে, সেটি ব্যক্ত না করা পর্যন্ত, তাঁদের নিস্তার নেই। কিন্তু যাঁরা বস্তুবাদী চিন্তা ও ভাবাদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা বস্তুবিশ্বের সার্বিক কল্যাণ ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। 'নবান্ন' নাটক রচনার পেছনে তাই সক্রিয় দেখা যায় সেই সময়ের সমাজমনস্ক ইতিহাস রাজনীতি সচেতন কিছু মানুষ তাঁদের উন্নত চেতনা নিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলন গানে,গল্পে, নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশে উদ্যত হলেন। গণনাট্য আন্দোলন তাঁরই ফলশ্রুতি।

তাই এঁদের নাট্য প্রযোজনায় বাংলা নাট্যধারায় নতুন প্রাণের জোয়ার দেখা গেল। নাটকে কৃষক শ্রমিকের মধ্যবিত্ত মানুষের কথা এলো। ব্যক্তি চরিত্র থেকে সমষ্টি চরিত্রের প্রাধান্য দেখা গেল। বস্তুতান্ত্রিক জীবনভাবনা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, আবেগের চেয়ে বুদ্ধি-যুক্তির প্রাধান্য, শ্রেণী চেতনাসূত্রে সমাজে শোষক-শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র নাটকে দেখা দিল। ধনী জমিদার এবং শাসনযন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ আর মমত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশ পেল অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষগুলিরজন্য। মঞ্চ ও প্রয়োগ কলায় সমন্বয়, সৃষ্টি করে নানা বৈচিত্র্য আনা হল। এই প্রেক্ষপটে নবান্ন নাটক রচনাও তার ব্যাপক মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন, গণনাট্য সংঘের পতাকা তলে। 'নবান্ন' তাই গণনাট্যের নাটক, গণআন্দোলনের নাটক। আর এখানেই তার সিদ্ধি, তার সাফল্য আর ব্যর্থতা। নবান্ন' পাঠ ও আলোচনায় এই কথাগুলি স্মরণ রাখতে হবে।

৪৮.৩ রচনা, দেশকাল ও নামকরণ

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে 'অরণি' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৪৪- এ (দ্বিতীয় ১৯৪৫ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৫)। প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গমে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪। প্রসঙ্গত স্মরণীয় কোনো শিল্পসৃষ্টি দেশকালের সীমার উর্ধ্বে নয়। কালোত্তীর্ণ হতে পারে যে রচনা, তাই চিরন্তনের মর্যাদা পায়।

'নবান্ন' যে দেশকালের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে সেটি ছিল বড় দুর্যোগের, এক ক্রান্তিকালের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ১৯৩৯ -এ। ভারতের বিদেশী শাসক রাজশক্তি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। একদিকে হিটলারের জার্মানি, মুসোলিনীর ইটালী, ফ্রাঙ্কের স্পেন, তোজোর জাপান ও গ্রীসের ফ্যাসিস্ট শক্তি, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, তার দোসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। ওদিকে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী সংগঠিত হতে প্রয়াসী হয়েছে রমাঁ রলাঁ, গোর্কি, রাসেল, শ প্রভৃতি প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা যুক্ত মঞ্চ তৈরি করে, পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। কোলকাতাতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হল 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজিম এণ্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় কমিটি। এই রাজনৈতিক বাতাবরণে ১৯৪৪ -এ বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকের প্রকাশ নতুন বার্তা নিয়ে এসেছে। নাটকটি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের নাট্যবিভাগ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গমে, ২৪ শে অক্টোবর, ১৯৪৪ নাট্য পরিচালক ঃ বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভুনাথ মিত্র। শ্রীরঙ্গমে সাতবার অভিনয়ের পর ,শিয়ালদা রেলওয়ে ম্যানসন, শ্রী ও কালিকা থিয়েটার, প্রত্যেকটিতে সাতদিন করে নবান্নের অভিনয় হয়। এই নাটকের মধ্যেদিয়ে অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষের জীবন, লড়াই, সংগঠন ও সংগ্রামের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ ও চিন্তাশীল দর্শক সমাজ মতুন করে বাঁচবার একটি পথের নিশানা খুঁজে পেয়েছে।

নাট্যকার স্বয়ং নাটকের পটভূমিকায় পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এটি রচিত। সে পরিচয় প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী-পুত্রের আত্মবিসর্জনের ঘটনায় প্রতিফলিত। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি যে সামাজিক- প্রাকৃতিক ঘটনা এ নাটকে ফুটে উঠেছে তা হল ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ই অক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার একাংশে ঘটে যাওয়া সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যয়ের ইতিহাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণিত হল—বাংলা সন১৩৫০-এর মন্বন্তর। আর এই মন্বন্তর গ্রাম গঞ্জের চাষী-ক্ষেতমজুরকে ক্ষুধার অন্নের সন্ধানে নিয়ে এসেছে শহরের ফুটপাতে, লঙ্গারখানায়। ক্ষুধার জ্বালাতেই প্রধান দোরে দোরে ঘোরে দু-মুঠো ভাতের জন্য, কুঞ্জ ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করতে করতে গিয়ে কুকুরের সঙ্গো লড়াই করে। ওদিকে মন্বন্তরের সুযোগ নিয়ে কালীধন অতিরিক্ত মুনাফার জন্য চাল গুদামজাত করে কালোবাজারী করে। সেবাশ্রমের আড়ালে নারী দেহের ব্যবসায় লিপ্ত হয়। হারু দত্ত নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্বিচারে শোষন করতে দ্বিধা করেনা। অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা গেল, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। দেশকালের এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে গ্রাম বাংলা যখন শ্মশানভূমিতে পরিণত, সেই সর্বস্ব হারানো গ্রামের বাস্তব চিত্র এই 'নবান্ন'।

'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য :

সমাপ্তি দৃশ্যের অভ্যন্তরে নিহিত আছে 'নবান্ন' নামকরণের তাৎপর্য। নবান্ন শব্দটির অর্থ হল নতুন অন্ন। নবান্ন শব্দটি ভাঙলে তাই দাঁড়ায়। নব অন্ন—নবান্ন। নতুন অন্ন এখানে বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত। নবান্ন হল নতুন চালের পায়সান্ন। গ্রাম বাংলার কৃষকের নতুন ধান কেটে ঘরে তুলে সেই নতুন ধানের নতুন চালে পায়সান্ন তৈরি করতো। শুধু পায়সান্নই নয় পিঠেপুলিও হত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে তা আনন্দের সঙ্গো খেত। সমস্ত গ্রাম বাংলায় এটি ছিল একটি বিশেষ উৎসব। এই নির্দিষ্ট দিনটিতে খেলাধূলো, এবং প্রত্যেক অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। মানুষ সমবেত হয়ে সেই অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা দেখতো এবং উপভোগ করতো। অবিভক্ত গ্রাম বাংলার বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে এই নবান্ন উৎসবে

আড়ম্বর ছিল সর্বাধিক। গ্রামের বৌ-ঝিদের এই উৎসবে ছিল এক বিশেষ ভূমিকা। এই উৎসবের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অধুনা, সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বহু ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম্য সংস্কৃতির মতো নবান্ন উৎসবও আজ বিলুপ্তপ্রায়। তবে এখনো দুই বাংলার গ্রামের প্রান্ত প্রদেশে এই দিনটিতে প্রবেশ করলে নবান্ন উৎসবে গান বাজনার ভগ্নবিশিষ্টের নিদর্শন পাওয়া যাবে। এখনো মাঝবেলায় কোনো কোনো গ্রাম্যবধূ নতুন বস্ত্র পরিধান করে পবিত্র দেহ মন নিয়ে নবান্ন রন্ধনে ব্যস্ত থাকে। এখনো কোনো বাড়ির আনাচে কানাচে নাক রাখলে রুপশাল অথবা কামিনীর নবান্নের সুবাস এসে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। কোথাও কোথাও গৃহ বধূর আলতা পরা পায়ের আঘাত পড়ে ঢেঁকির পাড়ে, চাল সেই আঘাতে গুঁড়ো হয়ে পিঠে পুলির উপকরণে পরিণত হতে দেখাযায়। অবশ্য এটি অতি বিরল দৃশ্য। যন্ত্রযুগে এটি অতিবিরল দৃশ্য। যন্ত্রযুগে ঢেঁকি উঠে গেছে, এসেছে যন্ত্র। সভ্যতা সমাজকে এগিয়ে এনেছে ঠিক , কিন্তু প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসব গুলো আজ তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলান্ত তিমিরে। আজ গ্রাম্য সংস্কৃতি হয়ে গেছে প্রায় বিলীন।

'নবান্ন' নাটক আমাদের মনে স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে তুলে আনে নবান্ন উৎসবের ছবি । বন্যা, মহাযুদ্ধ-মহামারী আমিনপুরের গ্রাম্যজীবনের সুস্নিগ্ধ দিন যাপন পদ্ধতির বুকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। মানুষ হয়েপড়েছিল জন্তুপ্রায়। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মান-সম্ভ্রমহীন ভিখিরীতে রুপান্তরিত হয়ে মানুষ ভুলতে বসেছিল আপন অস্তিত্ব। এই রকম এক ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগ পূর্ণ দিনে যেখানে অস্তিত্বের প্রশ্নটা ছিল সবচাইতে বড় প্রশ্ন, সেখানে নবান্নের উৎসবের কথা ভাবাই যায়না। কিন্তু এত ঝড় ঝাপটায় সেই মানুষ মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি তার স্মৃতিকে। তাই যখন আবার ঘরছাড়া মানুষগুলো ফিরে এসেছে গ্রামে, নতুন ধান তুলেছে ঘরে , তখন নবান্ন উৎসবের কথা জেগে উঠেছে । নবান্ন উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তারা। তাই বিগত দিনগুলোর বিভীষিকা মন থেকে মুছে ফেলে আয়োজন করেছে নবান্ন উৎসবের। এই নবান্ন উৎসব শুধুমাত্র উৎসব নয় ,এর ভেতর একটা মিলনের ইঙ্গিত আছে। পূর্বেই আমরা বলেছি, এই উৎসব প্রত্যেক বাড়িতে হত, তবুও প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দে অংশগ্রহন করতো। তারপর সমবেত হত কোনো প্রান্তরে, গ্রাম্য সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানে যোগদিয়ে সম্মিলিতভাবে উপভোগ করত সেই আনন্দ। 'নবান্ন' নাটকের শেষে আমরা দেখি সেই রকম এক পরিবেশ। নবান্নের উৎসবে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমবেত হয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। যে হিন্দু মুসলমান অতীতে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ে একে অপরকে সন্দেহ করেছে, সেই হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়েছে নবান্ন উৎসবের চাঁদোয়ার নিচে। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন,একটা বিরাট ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে যাঁরা পারস্পরিক হনন লিপ্সায় মেতে ওঠে তাঁরাই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দিশার প্রীতি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে দ্বিধা করেনা। কিন্তু কালোরাত্রির মতো সেই ভ্রান্তিটা একদিন কেটে গিয়ে আবার রচিত হয় মিলনের ক্ষেত্র। নবান্ন উৎসব প্রাঙ্গনে তাই দেখা গেল হিন্দু মুসলমান সকলে এসে জড় হয়েছে। শুধু জড় নয়, এই উৎসব ক্ষেত্র থেকে সকলে শপথ গ্রহন করছে আকালের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিরোধের । সুতরাং 'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য এদিক থেকে যথেষ্ট। নবান্ন উৎসব 'নবান্ন' নাটকে শুধু উৎসব থাকেনি,

হিন্দু মুসলমানের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গণনাটকের যেটি উৎসব প্রধান উদ্দেশ্য—চেতনার বৃদ্ধি ঘটিয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে এক আদর্শের পতাকাতলে এনে ফেলা,— নাট্যকার সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাটকের শেষ দৃশ্যে নবান্নের উৎসবের আয়োজন করেছেন। নাট্যকার তার চরিত্রগুলোকে বহু ঝড় ঝাপটা বহু বিসর্পিল পথ ঘুরিয়ে পুনরায় অতি পরিচিত নবান্ন উৎসবের অনাবিল আনন্দের মধ্যে এনে জীবনের একটি ইতিবাচক ইঙ্গিতের দ্যোতনা করেছেন।

৪৮.৪ নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

'নবান্ন' চার অঙ্কের নাটক। প্রথম অঙ্কে দৃশ্য সংখ্যা পাঁচ। দ্বিতীয়ে পাঁচ, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙেক দুই ও তিনটি দৃশ্য আছে । অর্থাৎ মোট পনেরোটি দৃশ্য সমাবেশের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার গ্রাম ও শহর জীবনের শঙ্কা ও সঙ্কটের চিত্র তুলে ধরে সমস্যার একটি ইতিহাচক সমাধানসূত্র তুলে ধরেছেন।

রাতের অন্ধ্রকারে মালভূমির মত উঁচু জায়গায় কতকগুলি ছায়ামূর্তির আনাগোনা দিয়ে নাট্যদৃশ্যের সূচনা। পটভূমিতে আগুনের আভা, বাইরে বাঁশের গাঁট ফাটার মধ্য দিয়ে মেসিনগানের আওয়াজ বোঝানো হয়েছে। পরিবেশের মধ্যে বেশ একটি সন্ত্রস্ত ভাব। আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে গাঁয়ের মধ্যে একটি সদা সন্ত্রস্তভাব বিরাজ করছে। বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার আগষ্ট আন্দোলনের কর্মী তাঁর দুই ছেলেকে হারিয়ে বিলাপ করছে। তার স্ত্রী পঞ্চাননীও মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে দেখে এবং স্বদেশের টানে নিজে আন্দোলনে যোগ দিয়ে, পিছিয়ে পড়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়ার আবেদন জানাচ্ছে। পথেই পুলিশের গুলিতে সে মৃত্যু বরণ করে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কুঞ্জ,প্রধান, নিরঞ্জনের সঙ্গো রাধিকা,বিনোদিনীর পারস্পারিক সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্তমান সংকটের দিনে অভাবী সংসারের সরল মানুষগুলির পারস্পরিক কলহ উত্তাপের ছবি ফুটে উঠেছে। সংসারের ভার বহনে যখন পুরুষরা অসহায় ও হীনমন্যতায় ভুগছে তখন নারীদের অসহায়তা ও সেইসঙ্গো অসহিষ্মুতা বোধ আরও বেশি হবে ,এতে বিস্ময়ের কিছু নেই । এর পরিচয় পাওয়া যায় কুঞ্জ রাধিকা ও নিরঞ্জন-বিনোদিনীর কথোপকথনে।

তৃতীয় দৃশ্যে সংকটের আরও ঘনীভূত রুপ দেখা যায় প্রধানের জমি বিক্রি করবার উদ্যোগের মধ্যে অন্নাভাবগ্রস্ত মানুষের এই দুর্দশার সুযোগ নেয়, হারাধনের মত পোদ্দাররা। অপর কৃষক দয়াল এ-ভাবেই সব হারিয়েছে, এমন কি বীজধান পর্যন্ত। অবশেষে তাকে প্রতিবেশী সমাদ্দার বাড়ি চালের সন্ধানে যেতে হয়েছে। স্ত্রী রাঙার মা "ধুঁকছে কাল বিকেল থেকে"। এই দৃশ্যেরই শেষে আকস্মিকভাবে ঝড় ওঠে, সাইক্লোনে প্রধানের দোচালা বিনোদিনীর মাথার ওপর ভেঙে পড়ে—সে অচৈতন্য হয়ে যায়। ওদিকে বন্যায় সব ভেসে যায়। দয়াল বাড়ি গিয়ে দেখে রাঙা, রাঙার মা বন্যায় ভেসে গেছে।

চতুর্থ দৃশ্যে এরই পরিণতিতে ভয়াবহ অভাব ও অন্নসংকট। "নিত্যি ঐ এক ডুমুরের কলা সেদ্ধ, আর কচুর নতির ঝোল"— এর বিরুদ্ধে কুঞ্জের ছেলে মাখন বিদ্রোহ করে।*

পঞ্চম দৃশ্যে ওদিকে হারু দত্তের লোভ প্রধানের জমির জন্য। প্রধান সব বোঝে। তার সঙ্গে জমি বিক্রি নিয়ে কথা হয়। প্রধান রাজি না হওয়ায় সে নতুন ভাবে চাপ দেয়। কুঞ্জ উপলব্ধি করে "টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দাও।" হারুর লোকজন কুঞ্জ ও প্রধানকে মারে। মাখন এ দৃশ্য দেখে মাথা ঘুড়ে পড়ে যায়। তার মৃত্যু সমস্ত পরিবারকে বিচলিত করে।

দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু শহরে। কোলকাতার চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকানে নিরঞ্জন রাখহরি নাম নিয়ে মজুরের কাজ করে। হারু দত্ত গ্রাম থেকে চাল ও মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে কালীধনকে সরবরাহ করে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মজুরদারী ও কালোবাজারী যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় যে জেঁকে বসেছে তার ছায়া এই দুটি চরিত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। এরা বিবেকহীন ও হৃদয়হীন ও অমানবিক বাণিজ্যিকতার জাল সমাজের সর্বত্র বিস্তৃত করে রাখে—সে পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যায়ভাবে চড়া দামে চাল বিক্রির প্রতিবাদ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে বশংবদ কর্মচারী ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বলে "কত জন ম্যাজিস্ট্রেট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখবার পারে তা নি জানো।" এদেরই চক্রান্তে ও রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষণায় 'মনুষ্যসৃষ্টি দুর্ভিক্ষ' লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।

অপর দৃশ্যে দেখা যায় সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরের পার্কে আশ্রয় নিয়েছে দুমুঠো খাবার আশায়। এরই মধ্যে বিচিত্র ধরনের সুযোগ সন্ধানীরা নানা রূপে ও বেশে জীর্ণশীর্ণ বস্ত্রহীন এই নিরন্ন কঙ্কালসার মানুষগুলোকে নিয়ে নির্লজ্জভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়। এদের কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ বা টাউট। প্রথমোক্তরা প্রধানের ভাষায় 'কঙ্কালের ছবির ব্যবসাদার,' তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা রাজপথের খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমোক্ত জন বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে পারছে না, আর অপরজন ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কুকুরে-মানুষে লড়াই করছে। এ দৃশ্য বড় মর্মান্তিক। ওদিকে বড়লোকের বাড়ি পানভোজনের সমারোহ, কিন্তু সামান্য উদ্বৃত্তটুকুও দুর্গত মানুষের কল্যাণে দিতে এদের হাত ,সরেনা। ওদিকে দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে হারু একদিকে বিপন্ন মানুষের জমি বাড়ি সস্তায় কিনে নেয়, অপরদিকে গ্রামের দুঃস্থ মা-বাপকে ভুল বুঝিয়ে মেয়ে কেনে, শহরে চালান দেয়। কালীধনের সেবাশ্রম সেবা-নামের আড়ালে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

অকস্মাৎ কালীধনের দোকানে দারোগা পুলিশের আবির্ভাব—চালক্রেতা ভদ্রলোক তাদের নিয়ে এসেছেন। নিরঞ্জন ইতোমধ্যে সেবাশ্রমে বিনোদিনীর সাক্ষাৎ পেয়েছে। নিরঞ্জন চালের গুদাম ও সেবাশ্রমের ব্যবসার সব পরিচয় তুলে ধরলে পুলিশ ওদের হাতকড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের উভয়ের দৃষ্টিতে এমন একটি ভাব ধরা পড়ে যে তাদের ছাড়া পেতেও অসুবিধে হবে না।

তৃতীয় অঙ্ক সংক্ষিপ্ত—দুটি দৃশ্য, একটি লঙ্গারখানার, অপরটি চিকিৎসা কেন্দ্রের। প্রথমটিতে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল। এরই মধ্যে উপস্থিত কুঞ্জ রাধিকা ও অন্যান্য গ্রামের মানুষ। এদের কথাবার্তায় প্লাবনশেষে

---

*"About 50 per cent of the people are dying from starvation at present and about 40 per cent are living in semi-starvation, subsisting on herbs vegetables, and other inedible and undigestable food. People are also dying of cholera." (Quoted from 'Biplabi,' July 29, 1943–a weekly published from underground in and around Tamluk–Sutahata, Midnapur. Edited and Compiled by B.Chakraborty).

ফসলের প্রাচর্যের নানা গল্পকথা। একজন বৃদ্ধ ভিখারী শহর জীবনের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা থেকে সকলকে গ্রামে ফিরে যেতে বলে। কুঞ্জ রাধিকাও পোড়ামাটির শহর ছেড়ে স্বগ্রামে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প নেয়। আর দ্বিতীয় দৃশ্য চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রধানকে দেখা যায়। এই চিকিৎসা কেন্দ্রে কোন সাধারণ চিকিৎসারও আয়োজন নেই, চিকিৎসার নামে একরকম প্রহসন চলছে। এখানে প্রধানকে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় দেখা যায়। দৃশ্যের শেষে বলা তার কথাটি "ভুলে যাও তোমার ব্যথার কথা" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য, প্রথমটি বেশ বড়। ঘটনাস্থল আমিনপুর। শহর থেকে ঘরে ফিরে আসা মানুষরা নিজ নিজ বাড়িতে উপস্থিত। নিরঞ্জনের উদ্যোগে, দয়ালের পরামর্শে প্রধানের বাড়িতে সকলে সমবেত হয়ে আগামী দিনের সম্ভাব্য সঙ্কট উত্তরণের জন্য পরামর্শে নিযুক্ত। নানা ধরনের কথাবার্তার শেষে সকলে সমবেত ভাবে খাটার সঙ্কল্পে নিজেদের সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর মিলনের সুখময় পরিবেশ—ভাইয়ে ভাইয়ে পুনর্মিলনের আবেগময় দৃশ্য রচনা করে। দ্বিতীয় দৃশ্যে তারই সম্প্রসারিত রূপ—খেটে ফসল তুলে, ঝাড়াই-এর পর ধর্ম গোলায় কুঞ্জ হিসেবের বেশি ধান প্রথম জমা দেয়। ঠিক করে এবার নবান্ন উৎসব ধুমধাম করে করা হবে। সমাদ্দার পরিবারের বারবার মনে পড়ে প্রধানের কথা।

শেষ দৃশ্যে 'নবান্ন' এর উৎসব চলছে। গ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সকাল সমবেত হয়েছে। চলছে কৃষক রমণীর গান নাচ আর মোরগের লড়াই, গরুর দৌড়—জয় হল ফেকু মিঞার মোরগের আর রহমত উল্লার গরুর। অকস্মাৎ এই আনন্দোৎসবে প্রধানের আবির্ভাব। সে অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ হলেও সব বুঝতে পারে। সকলে মিলে জোর প্রতিরোধের সঙ্কল্প নেয়। এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

৪৮.৫ সারাংশ

'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'নবান্ন প্রকাশের পর ১৯৪৪-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। (১৯৩৯-৪৫)। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এসময়ের মধ্যে আগস্ট আন্দোলন হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নেতা-নেত্রী কারান্তরালে। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত মেদিনীপুরে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে চলছে সমস্ত দেশব্যাপী বিশেষ করে মেদিনীপুর অঞ্চলে শাসক ইংরেজদের সীমাহীন পীড়ন। জাপানী আক্রমণের ভয়ে দেশের ভিতর 'পোড়ামাটি নীতি' ঘোষিত হয়েছে। এই ৪২ আক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার একাংশ সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যায় বিপর্যস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেশবাসীর জীবনে নিয়ে এসেছে মন্বন্তর। বাঙলাদেশের ১৫ লক্ষ মানুষ এসময় অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। জোতদার-মজুতদার এর সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচার শোষণ করে; 'নবান্ন' সমাজের সেই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।

'নবান্ন' এর বিষয়বস্তু গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষকের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত কৃষক জীবনের কথাই এর মূল প্রতিপাদ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশীয় জোতদার-মজুতদারের ভয়ঙ্করতম শোষণ ও সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ—সব মিলিয়ে একটা সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশ এ নাটকের প্রেক্ষাপট।

এদিক থেকে 'নবান্ন'-এর বিষয়বস্তু অভিনব। মন্বন্তর তো শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, মারী-হাহাকার তার নিত্যসঙ্গী।

এই দুঃখ দুর্দশায় আমিনপুরের সমাদ্দার পরিবার তথা বাংলার বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ কৃষক পরিবার প্রাণধারণের প্রয়োজনে নিজ বাসগৃহ ছেড়ে শহুর কোলকাতার রুক্ষ পাষাণ প্রান্তরে আছড়ে পড়েছে। নাটকে তাদেরই জীবনবৃত্ত রূপায়িত হয়েছে। শহরের সম্পন্ন গৃহস্থ এই দুঃস্থ মানুষগুলির প্রতি যে নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছে, তা উভয়ের শ্রেণীগত ভিন্নতার পরিচয় দেয়। এর প্রতিকার কামনায় বিপর্যস্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলি সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নিয়ে গাঁতায় চাষ ও ধর্মগোলার ব্যবস্থা করেছে। তারা জোটবদ্ধতার শপথ নেয়। এভাবেই নবান্ন হয়ে উঠেছে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।

৪৮.৬ অনুশীলনী ১

১। 'নবান্ন' নাটকের অভিনবত্ব সম্পর্কে অন্তত দুটি উদাহরণ দিন।

২। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয়ের তারিখ লিখুন।

৩। বাংলার কৃষক জীবন নিয়ে রচিত তিনটি নাটক ও তার নাট্যকারের নাম লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫।'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪৮.৭ 'নবান্ন' নাটকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আগস্ট আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কঠোর দমনপীড়নের বর্ণনা। এই সময় প্রধান হারাল তার সংগঠক স্ত্রী পঞ্চাননীকে। বন্যায় এবং হারু দত্তের অত্যাচারে হারাল নাতি মাখন এবং আমিনপুরকে। সমস্ত ঘর-গেরস্থালী ছেড়ে সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পার্কে ভিখারীর জীবন যাপন করতে থাকল। এখান থেকেই বিনোদিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল মূল দল থেকে। তারপর সরে গেল কুঞ্জ, রাধিকা; সকলকে হারিয়ে শহরের গোলোকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে প্রধানের পুনরায় প্রত্যাবর্তন ঘটল গ্রামে। এটাই নবান্ন নাটকের মূল ধারা। কিন্তু এই মূল ঘটনাবলী বর্তুল-আকারে ও প্রায় সংঘাতবিহীন ভাবে ঘটেছে। এর মধ্যে কারুণ্য থাকলেও কোনো দ্বন্দ্ব নেই এমনকি বৈচিত্র্য নেই বললেও চলে। অথচ মূল ধারা থেকে প্রথম যে শাখাটি বেরিয়ে এসেছে—বিনোদিনী যে অংশের প্রধান—স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে (মিলনটা অতর্কিত) যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে সেটা কিছুটা চমকপ্রদ। হারু দত্ত দুষ্ট প্রকৃতির, অত্যাচারী, তার অত্যাচারে প্রধান পরিবার গৃহহারা, দেশছাড়া। ধান চালের চোরাচালানকারী, মুনাফাখোর অসৎ চরিত্র, মেয়ে পাচারকারী, এক কথায় ভিলেন বা খল চরিত্র। কালীধন চালের ব্যবসাদার। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে ও যুদ্ধের বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মুনাফার ফাঁপানো ব্যবসা চালাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে সেবাশ্রমের ব্যবসাকেও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিয়েছে। এরা সবাই মুনাফা লুটছে, রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়া, বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ফুলে, ফেঁপে একশা হয়ে গেছে। নাটকটি যদি এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাটক হত তাহলে দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তিতে নাটকের সমাপ্তি ঘটত। কেন না, এই অঙ্কের শেষে হারু দত্ত কালীধন স্বরূপে প্রকাশ হয়ে গেছে। বিনোদিনী নিরঞ্জনের সক্রিয় চেষ্টায় পুলিশের

হাতে ধরা পড়েছে। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে হারু দত্ত যে অত্যাচার চালিয়ে দর্শকমনে উষ্মার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল, দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে তাদের হাতে হাতকড়ি পরাতে পেরে নিরঞ্জন বিনোদিনী খুব তৃপ্তি পেয়েছে, সেই সঙ্গে দর্শকও খুশি হয়েছে এবং নিরঞ্জন বিনোদিনীর আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অত্যাচারিত হয়েছে যারা, প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যারা সেই কুঞ্জ রাধিকা, প্রধান এ সবের বাইরে থাকল। তারা এ সবের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারল না। তার ফলে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা গুরুত্ব হারিয়ে 'নবান্ন' নাটকের ঘটনাংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল মাত্র। সাধারণত, প্রতিবাদ প্রতিরোধের নাটকে ঘটনাক্রম অগ্রবর্তী হয় এই রকমভাবে—অত্যাচারীর অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তারপর তাকে ধ্বংস করে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হয়। শেষে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং উদ্বোধিত শক্তির আঘাতে অত্যাচারীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তারপর আর নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। নাটকের গঠনশৈলী তাহলে শিথিল হয়ে পড়বে। ঘনসন্নিবদ্ধ রূপটা নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 'নবান্ন' নাটক তারপরও এগিয়েছে এবং জনচিত্তে আলোড়ন তুলে জমজমাটি রূপটা পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশম্ভু মিত্রের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ। তিনি বলেন— 'নবান্ন' এর আগে আমাদের সব ট্রাজেডিই ডোমেস্টিক ট্রাজেডি। 'নবান্ন'-এ এল এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। এ নাটকে প্রধানের সংসার সেন্ট্রাল নয়। এর মধ্যে ছিল পোয়েট্রি অব মোমেন্টস। আমরা দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্য জুড়েছিলাম ওয়েলিং দিয়ে। হার্ট-রেনডিং 'ফ্যান দাও চিৎকার দিয়ে। র' রুডনেস থেকে পোয়েট্রি উঠে আসত। একটা দৃশ্যে কুঞ্জকে কুকুরে কামড়েছে। শোভা কুকুরকে লক্ষ্য করে ওয়াইলডলি শাউট করে তারপরই সফটলি বলে : জল খাবে? তেষ্টা পেয়েছে? মহর্ষি এই দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, 'এটা শাশ্বত'।

আর এক জায়গায় বলেছেন—নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেকটার আছে। সম্পাদনায় একটু গোছানো হলেও, একটু সংহত হলেও সে কারেকটার বজায় রাখা ছিল। সম্পাদনায় দৃশ্যগুলি এমন ভাবে রাখা হয়েছিল, যাতে এক একটি এপিসোডের এক একটি ক্লাইম্যাকস প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আসে। প্রযোজনায় এই ক্লাইম্যাকসকে তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা ছিল। কলকাতায় আসার পর থেকে দুই দৃশ্যের মাঝখানে 'ফ্যান দাও', 'একটু ফ্যান দাও' এই আর্ত কোরাস নেপথ্যে শোনা যেত। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত পথেঘাটে এই আর্ত চীৎকার ভীষণভাবে শোনা যেত। দর্শকের কানে এটা টাটকা ছিল, দারুণ জীবন্ত ছিল।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর 'নবান্ন' নাটক ক্রমঅগ্রবর্তী হওয়ার পক্ষে শ্রীশম্ভু মিত্রের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তাঁর বক্তব্যে প্রয়োগচাতুর্যের দিকটা গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। আমরা তাঁর বক্তব্য স্মরণে রেখে 'নবান্ন' নাটকের ঘটনাবলীকে একটু বিশ্লেষণ করে অন্য কিছুর হদিস পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করব।

নাট্যকার হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়াকে প্রত্যক্ষত জনশত্রু হিসেবে ধরেছেন ঠিক। কিন্তু তিনি তাদেরকেই বড় করে দেখাতে চাননি, মানে একমাত্র নেগেটিভ ফোর্স হিসেবে দেখিয়ে তাদের ধ্বংস করাটাই বড় কাজ বলে মনে করেননি। তিনি এদেরকে একটি ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সামান্য শত্রু বলে ধরে নিয়ে তাদের জন্য সৈন্যবাহিনীর একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ নিয়োজিত করে পরাজিত করতে চেয়েছেন। ঘটনাটা যেমন ভাবে ঘটেছে

তাতে এরকমটা মনে করবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান । কিন্তু তাহলে একটি প্রশ্ন থেকে যায়; নাটকের প্রধান প্রতিপক্ষ কে? নাটক মানেই সংঘাত। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সংঘাতের ক্ষেত্র রচিত হয়। আর তার ফলে নাটকে এসে পড়ে একটি অনিবার্য গতিবেগ, তরতর করে নাটক ছুটে চলে। কিন্তু কালীধন, হারুদত্তের মতো প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষের পতনের পর নাট্যকার কাকে প্রতিপক্ষ করে পরবর্তী দুটি অঙ্ক পর্যন্ত নাটকে টেনে নিয়ে গেলেন—এ প্রশ্ন স্বভাবত না জেগে পারে না। নাট্যকার পৌঁছতে চান নবান্নের উৎসব দিনে, যে দিনটিতে সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং সকলের মিলনে উৎসব হয়ে উঠবে প্রাণ অপূর্ব রসে সঞ্জীবিত। এই উৎসব মুখর দিনে সকলে শপথ নেবে প্রতিরোধের, আকালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শপথ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রধান প্রতিপক্ষ কালীধন হারু দত্ত নয়, প্রধান প্রতিপক্ষ আকাল। এখন এই আকাল ব্যাপারটি কি একটু জানা দরকার। আকাল -এর আভিধানিক অর্থ দুঃসময়। যা মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব সমাজব্যবস্থায় 'নবান্ন' রচনাকালে চলছিল এক চরম সঙ্কট। একদল মানুষের অর্থগৃধ্নুতা, শক্তির দম্ভ এবং প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অশুভ বাসনা টেনে এনেছিল যে বিশ্বযুদ্ধ, তার ফলে বিশ্বের কতিপয় দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষেও নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সংকট। জনজীবন হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। গ্রামের সুস্নিগ্ধ জীবন প্রবাহে ঘটে গিয়েছিল অবাঞ্ছিত ছন্দপতন। দ্বিতীয়ত, দেশীয় সমাজব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খলা করে তোলবার জন্য শোষক সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রমূলক অভিসন্ধির ফলে এসে গেল আন্দোলন। তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়— তার ফলে দেশে দেখা দিল ভয়াবহ বন্যা। এই বন্যার দুর্বিপাকে মানুষ হয়ে পড়ল একান্ত অসহায়। মানুষের খাদ্যশস্য রাতের অন্ধকারে চলে যেতে লাগল ব্যবসায়ীর গুদামে। কৃত্রিমভাবে দুর্ভিক্ষকে তীব্রতর ও দীর্ঘতর করে তোলবার প্রয়াস পেলেন অসাধু ব্যক্তিবর্গ, তারা খাদ্যশস্যের অহেতুক অপচয় ঘটাতে লাগলেন নানা উপায়ে। এমন কি বস্তা বস্তা খাদ্যদ্রব্য গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়ার খবরও পাওয়া যেতে লাগল। এ সব কিছুর একটাই উদ্দেশ্য কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা। সব মিলিয়ে দেখা গেল দেশের বুকে একটা চরম দুঃসময় বিরাজমান অর্থাৎ আকাল এসে মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিতে লাগল। নাট্যকার সেই বিষয়গুলিকে একে একে তুলে ধরেছেন নাট্যাঙ্গিকে। এবং উপরি-উল্লিখিত বিষয়গুলির সম্মিলিত দুশ্চেষ্টায় জনজীবনে এসে পড়া আকালকে প্রতিপক্ষ করে তার বিরুদ্ধে প্রতি রোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন নাট্যকার। এই যে বিরাট শত্রু বা দৃশ্য নয় অথচ যার জঘন্য আত্মপ্রকাশ ঘটছে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবার জন্য, মানুষের সংসারের শান্তি, জীবনের সুখকে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। যে শত্রু প্রত্যক্ষ এবং নাগালের মধ্যে তাকে শায়েস্তা করা যায় সহজে। তাই কালীধন, হারু দত্তেরা অতি সহজে ধরা পড়ে। তারা এতো সহজে এবং এতো সত্বর ধরা পড়ায় অনেকে আশ্চর্য হতে পারেন, কিন্তু নাট্যকার অতি সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ শত্রুকে পরাস্ত করবার ব্যবস্থা করে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে প্রত্যক্ষ শত্রুকে পরাস্ত করা যায়। কিন্তু যে শত্রু অপ্রত্যক্ষে থেকে সমাজের ক্ষতি করে যায়, প্রথমে তাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে। তাই এই আকালে সর্বস্ব হারিয়ে এই গ্রাম্য জনতা এটুকু বুঝেছে যে আর একটা আকালের প্রবেশের পথ বন্ধ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য বিরাট প্রতিরোধ বাহিনী গড়বার দরকার আছে। তাই নাট্যকার একে একে আকাল সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তির

স্বরুপ উদঘাটন করে গেছেন প্রথম পর্যায়ে। তিনি দেখিয়েছেন কালোবাজারী, চোরাকারবারীদের চরিত্র, তিনি দেখিয়েছেন বস্ত্রহীন, শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড়ের টুকরো পরিহিত ক্ষুধার্ত নগ্ন নরনারীর ছবি তুলে একদল অসৎ সংবাদজীবী এবং ফটোগ্রাফাররা পয়সার লোভে বিদেশের খবরের কাগজে তা বিক্রি করেছে, বিনিময়ে আর্ত জনতার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে দু-চার আনা পয়সা। নাট্যকার দেখিয়েছেন, যে যুদ্ধের ব্যাপক জনতার কোনো সম্পর্ক নেই সেই যুদ্ধ কার মঙ্গালের জন্য ? যুদ্ধ কিসের জন্য এ বোধ যাদের নেই সেই সব মানুষদের ধরে ধরে যুদ্ধে সাপ্লাই করছে একদল অর্থলোভী কন্ট্রাকটর। তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের লালসা মেটাবার জন্য অসহায় ফুটপাত বাসী সোমথ নারীদের ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মায়ের বুক খালি করে। তিনি দেখিয়েছেন হাসপাতালের শোচনীয় ক্রিয়াকাণ্ড। সব মিলিয়ে দেশের একটা ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এসব দেখাবার উদ্দেশ্য মানুষকে সচেতন করে তোলা। শুধু সচেতন নয় একটা প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলবার পজিটিভ ইঙ্গিতেও তিনি রেখেছেন তার নাটকে। আগামী দিনে আবার যদি আকাল আসে তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। নাট্যকার সে কথা ব্যক্ত করেছেন দয়ালের মুখ দিয়ে, 'কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, সে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন ; আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার ! জোর প্রতিরোধ !—এ প্রতিরোধ আকালের বিরুদ্ধে। প্রতিরোধ মূলক নাটকে তাই স্থান কাল পাত্রের সুসঙ্গাতি, ঘটনার যুক্তিসঙ্গাত বিন্যাস, ঘাত-প্রতিঘাতের টানাপোড়েন এবং তীব্র নাটকীয় দ্বন্দ্ব সব সময় সঠিকভাবে পাওয়া যাবেই এমন কথা বলা যায়না। 'নবান্ন' নাটকে সে হিসেবে গঠনগত দিক থেকে অল্পস্বল্প ত্রুটি থেকে গেছে। নাট্য সমালোচকের চোখে সে ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা সহজেই পড়ে যাবে। কিন্তু 'নবান্ন' নাটকের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে অন্য রকম ভাবে। গতানুগতিক নাটক আর গণচেতনা বৃদ্ধির জন্য গণমঞ্চের নাটকের একটা স্পষ্টরেখ পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যসূত্রে নাটকে একটা বিপ্লবাত্মক বক্তব্য এসে পড়েই এবং আকস্মিকতার একটা সঙ্গাতিবিহীন চমক না থেকে যায়না। এ গুলিকে সমালোচনার খাতিরে শৈল্পিক ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন বিভিন্ন দৃশ্য পারস্পর্যবিহীন এক একটি চিত্র ফুটে উঠতে দেখা গেছে। এই সব চিত্রগুলি যদি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হত তাহলে খুব ভাল হতো। নাটকের ঘটনাবলী একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলবে এবং প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখে একটা সংঘাত সৃষ্টি করে পরিণতি প্রাপ্ত হবে এটাই বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা পূর্বের কথার জের টেনেও বলতে পারি গণনাটকের বিচার বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতেই করতে হয়। প্রসঙ্গাক্রমে 'নীলদর্পণ'-এর কথাটা এসে পড়ে, আর নীলদর্পণে একটা প্রচারের দিক থাকা সত্ত্বেও নাটকটি অনেক বেশি নাট্যগুণসম্পন্ন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু ভাববার দরকার আছে। কেন না, 'নীলদর্পণ' প্রথমত গণনাটক নয়। দ্বিতীয়ত, কৃষকদের কথাই এই নাটকের একমাত্র বক্তব্য বটে তবে তারাই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, তা যদি হত নবীন মাধব নায়ক আর তার পরিবারের বিষাদময় পরিণতিতে নাটকের সমাপ্তি এটা হতে পারত না। শিথিল অর্থে নাটকের মধ্যে যেটুকু ট্রজেডির চেহারা দেখা গেছে, তা গোলোক বসুর পরিবারের ট্রজেডি

হয়ে গেছে। সমস্ত কৃষক পরিবারের ট্রজেডি হয়ে উঠতে পারেনি।

তাহলে প্রশ্ন, 'নবান্ন' নাটকে কি সেই ট্রাজেডির কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে? বিষয়টা একটু ভেবে দেখে যেতে পারে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবার এই নাটকের কেন্দ্রীয় পরিবার। এই পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই বেশি। নাটকে দৃশ্যত উদ্বাস্তু হয়েছে এই পরিবারটিই, এই গ্রাম্য পরিবারটির একটা বিপ্লবাত্বক ভূমিকাও আছে। প্রথম দৃশ্যে কুঞ্জ আর প্রধানের সংলাপ ,পরে প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননীর প্রতিরোধমূলক ভূমিকা, আর তা করতে গিয়ে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এই পরিবারের বৈপ্লবিক ভূমিকাটি তুলে ধরা হয়েছে। তারপর এই পরিবারটিই ভিখিরিতে পরিণত হল, এবং সমাপ্তি পর্বে আবার মিলনের বিন্দুতে সংস্থিত হল, সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই সমাদ্দার পরিবারটিই 'নবান্ন' নাটকের একটা ট্রাজিক বাতাবরণ তৈরি করেছে। আবার প্রধান সমাদ্দারের দিকে লক্ষ্য রেখে একথা ভাববার একটুখানি সুযোগ থেকে যায় যে ব্যক্তি ট্রাজেডির একটি বুদবুদ। কিন্তু ব্যক্তির ট্র্যাজেডি হতে গেলে সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিটিকে যে দৃঢ়ভূমির ওপর দাঁড় করান দরকার নাট্যকার তা করতে পারেননি। অপরপক্ষে চরিত্রটি গভীর থেকে গভীরতর তলদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। বিষাদের ঘণীভূত রুপটা তার মধ্যে দেখা যায়নি। ফলে দর্শকমনে একযোগে ভয় ও করুণা জাগেনা। বরং পাগলামোর একটা হালকা আবরণ জড়িয়ে এবং কখনো কখনো আকস্মিকতা দোষে দুষ্ট করে চরিত্রটা তরল করে ফেলা হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা অসংগত অবাস্তব পাগলামো প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও প্রধান অনেকটা 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের অতিনাটকীয় ভূমিকার শিকার। অনেকদিক থেকে উভয়ের মিল থাকলেও আসল কথা এই যে 'নবান্ন' নাটকের প্রধান পরিবার বা প্রধান চরিত্রটি সেন্ট্রাল নয়। গোটা সমাজের ছবিটা ফুটিয়ে তোলাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। ডোমেস্টিক বা পারিবারিক ট্রজেডি সৃষ্টির কোনো ইচ্ছা নাট্যকারের এখানে ছিলনা। আগষ্ট আন্দোলন বন্যা-বিশ্বযুদ্ধ— এই তিন বস্তুর সমবায়ে আগত আকালের কবলিত হয়ে কৃষক সাধারণের জীবনে যে ছন্দপতন ঘটে গেছে, যে ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখদুর্দশা নেমে এসেছে তাতে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম্যজীবনের চালচিত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-স্বপ্নের ওপর আকস্মিক আঘাত এসে গোটা সমাজের চেহারাটা দিয়েছে বদলিয়ে কোনো ব্যক্তি নয়, কোনো বিশেষ পরিবার নয়, সমস্ত কৃষক সমাজ সমস্ত গ্রাম্যজনতার জীবন দুঃখ, দুর্দশা হাহাকারে ভরে গেছে। শুধুমাত্র প্রধান সমাদ্দার বা তার পরিবারটাই ছিন্নমূল হয়ে শহরের পথে ছেঁড়া কাপড় আর একপেট বুভুক্ষা নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি। সমস্ত কৃষক সমজই হয়েছে ক্ষতিগ্রত, তাই এই সব দিকে তাকিয়ে ব্যাপক অর্থে আমরা 'নবান্ন' নাটককে সামাজিক ট্রাজিডি মনে করতে পারি। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল যে সঠিক অর্থে ট্রাজেডি লক্ষণাক্রান্ত নাটক বাংলায় বিরল। না থাকবার কারণটাও অবিদিত নয়। দ্রুত পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থায় ট্রাজেডি হতে পারেনা। আবার ব্যক্তির ট্রাজেডির জন্য যে ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের দরকার তেমন পুরুষ বিরল। এসব দিক বিচার করলে বলা যায় 'নবান্ন' নাটক ট্রাজেডির নাটক নয়। 'নবান্ন' ছোট ছোট ঘটনার, ছোট ছোট চিত্রের নাটক। 'নবান্ন' প্রতিবার প্রতিরোধের নাটক।

এই নাটক সম্পর্কে আরো একটু বলবার কথা এই যে, নাটকীয় চমক সৃষ্টির দিকে নাট্যকার অতিরিক্ত মনোনিবেশ করেছিলেন। নতুন বক্তব্য, জীবনবোধ নিয়ে ভিন্ন ধরনের দর্শক আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রযোজনা, সেক্ষেত্রে এ ঘটনা কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। তার ফলে যে বিষয়-পরম্পরায় গোটা নাটকের

সন্ধিগুলো অগ্রগামী হয়ে নাটকের সুষম সমাপ্তি ঘটে, সে নিয়ম পরম্পরা সব সময় বজায় থাকেনি। বস্তুত নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য চমক বিশিষ্ট। প্রত্যেকটা দৃশ্যের শেষে অতর্কিত চমকসৃষ্টির একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাতে দর্শক সাধারণের উপভোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে যায় ঠিক কিন্তু তাতে গোট নাটকে যে উৎকণ্ঠা বজায় থাকবার কথা সেটি থাকেন। কালীধন ধাড়া হারু দত্ত পর্যন্ত একটা Dramatic Suspense বজায় ছিল। কিন্তু তাদের হাতে হাতকড়ি পড়বার পর নাটকে সে উৎকণ্ঠা আর বজায় থাকেনি। ফলত নাটকে গতিপ্রবাহের তীব্রতা সৃষ্টির পরিবর্তে কেবলমাত্র কয়েকটি সমাজচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টার প্রতি একাগ্রতা লক্ষ্য করা গেছে।

৪৮.৮ 'নবান্ন' নাটকের গঠন

কোনো কাহিনীকে নাটক করে তুলতে গেলে গোটা কাহিনীকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নিতে হয়। সাধারণত পাঁচটি ভাগে এই স্তর বিন্যাস হয়ে থাকে । নাটকের পরিভাষায় একে বলা হয় পঞ্চসন্ধি। একটি পূর্ণাঙ্গ বড় নাটকে এই পাঁচ স্তর বা পঞ্চসন্ধির কড়াকড়ি নিয়ম নিয়ে কাহিনীকে নাটক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সর্বাধুনিক বাংলা নাটকের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মে নাটক গ্রন্থিবদ্ধ হত। কিন্তু আধুনিক নাটকে এই নিয়মের কড়াকড়ি থাকল না। নাটক আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে আসবার ফলে আধুনিক নাট্যকারগণ গোটা নাটকটিকে তিনটিকে স্তরে ভাগ করে নিলেন। এই স্তর বিন্যাসের সংক্ষিপ্তকরণের কারণটা অনুসন্ধানটা করা যেতে পারে। শুধুমাত্র আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে যাওয়াটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়। গ্রীক নাটকে গুরুত্ব পেত বিষয়বস্তু। তাই গ্রীক নাটককে বিষয় প্রধান বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকে বিষয়টা প্রধান হলনা। প্রধান হল চরিত্র। এই ধারা বয়ে চলল দীর্ঘদিন। বাংলা নাটকের যে যুগটাকে স্বর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-শিশির-অহীন্দ্র যুগ পর্যন্ত নাটকে প্রধান হয়ে দেখা দিল চরিত্র। যার জন্য প্রায় প্রত্যেকটা নাটকে এমন একজন চরিত্র অঙ্কিত করা হতে থাকল যাতে অভিনয় করবেন কোনো প্রতিষ্ঠিত নট বা নটী। তাদের অভিনয় সাফল্যের সঙ্গে নাটকের সাফল্য ছিল নির্ভরশীল।

আধুনিক কালের বাংলা নাটক দুটি ধারায় বয়ে চলে। একটিতে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য পুরোপুরি বজায় থাকে। অপর ধারাটি গণনাটকের খাত বেয়ে গণচেতনা বৃদ্ধি, যে গণচেতনা সমাজ পরিবর্তনের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করবে— সেই দিকে এগিয়ে যায়। গণনাটকে তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রিত রুপেই পরিবর্তন ঘটে গেল। নাটকে এসে গেল শোষক শোষিতের সংঘাত মুখর সম্বন্ধ। অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব। তাই ব্যক্তিরই হোক বা মনস্তত্ত্বেরই হোক একক প্রাধান্য বজায় থাকল না। প্রধান হয়ে উঠলো গোটা সমাজ। সমাজে একক ব্যক্তির ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। তাই ব্যক্তি প্রধান্যের স্থলে সমষ্টি প্রাধান্য সাব্যস্ত হল। সমষ্টি বলতে এখানে বলা হচ্ছে শোষিত গোষ্ঠী। শোষিত গোষ্ঠীর সংখ্যা বিপুল, তাই বিপুল সংখ্যক মানুষের কথা বলবার জন্য গণনাটক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। তাই গণনাটকে আমরা দেখলাম প্রতিরোধ আর সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। তাই এই ধরনের নাটককে বলা হয় প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest।

'নবান্ন' নাটক Drama of Acceptance বা Interjection অথবা Discomfort নয়, অথবা Frustration কিংবা Drama of Chaos অথবা Absured- ও নয়। 'নবান্ন' প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের

নাটক,Drama of Protest বা Drama of Revolt বলা যেতে পারে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মনোভাবটাই এই নাটকের মূল সেন্টিমেন্ট। সুতরাং এই নাটকে ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের বক্রগামী রেখাচিত্রের শিল্পসম্মত রূপায়ণ মূল লক্ষ্য নয়, জনগণের দুঃখ দুর্দশার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলে জনগণকে প্রতিবাদের স্তরে নিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আর তারপর প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত মুক্তির শীর্ষবিন্দুটি স্পর্শ করবার পজিটিভ ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে নাটকটির অভীষ্ট পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। 'নবান্ন' নাটক এই ধ্যানধারণার সরিক।

সুতরাং এই ধরনের নাটকের স্তর-বিন্যাসেও অনিবার্য ভাবে এসে যায় কিছু অদল বদল। নাটকের গতানুগতিক ঠিকুজি-কুষ্ঠিটা ছিঁড়ে যায়। নাটক যেহেতু প্রত্যক্ষ জীবনের রণক্ষেত্র থেকে উঠে আসে, তাই তার সুরটা হয় চড়া। চড়া সুরকে দীর্ঘতর করলে অনুচিত ফলের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তাই নাট্যকার পাঁচটি স্তরের পরিবর্তে কেউ তিনটি,কেউ চারটি স্তরে সমস্ত নাটকটি বিন্যস্ত করেন। একেবারে ছোট নাটক তিনটি স্তরে। একটু বড় নাটককে চারটি স্তরে ভাগ করে নিয়ে নাটক গড়ে তোলবার আধুনিক ইচ্ছাটাই অধিক কার্যকরী হয়ে উঠতে দেখা যায়। 'নবান্ন' নাটক বড় নাটক, তাই এই নাটকটি চারটি স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের উৎসমুখ উৎসারিত হয়েছে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। প্রথম অঙ্গের প্রথম দৃশ্যে দেখান হয়েছে স্বাধীনতার আন্দোলন আর তার ফলস্বরূপ আমিনপুর গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি। তারপর দেখান হয়েছে প্রধান পরিবারের সাংসারিক জীবনযাত্রা এবং অনতিবিলম্বে বন্যার ভয়াবহ আক্রমণে গোটা আমিনপুরের সাধারণ মানুষের জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র। সেই সঙ্গে মহামারীর ব্যাপক আক্রমণে সহায়সম্বলহীন মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে, খাদ্যাভাবের সংগ্রামের চিত্র। এরই সঙ্গে অসৎ ধনীর অর্থগৃধ্নুতা, লোলুপতার নগ্ন চিত্র অঙ্কিত হয়ে উঠতে থাকল বীভৎসভাবে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা; ঘর বাড়ি মানুষজন জীব জন্তুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সমস্ত আমিনপুরকে সমুদ্রে পরিণত করে ফেলেছে। ....সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা! তার পরের দৃশ্যে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে খাদ্যাভাবে এবং রোগ অসুখের চিত্র অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত। তারপরের দৃশ্যে পয়সাওয়ালা মানুষের জমি আত্মসাতের অপকৌশলের, লোলুপ দৃষ্টির অবলেহনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই দৃশ্যে সমাদ্দার পরিবার, হারু দত্ত ও তার লোকজনদের নির্মম অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে শহরে। এই দৃশ্যেই ঘটেছে মাখনের মৃত্যু।

নাটক এরপর উঠতে থাকে ওপরে। দ্রুতগতিতে রাইজিং এ্যাকসনের স্তর ছেড়ে ক্লাইমেক্স-এর স্তরে পৌঁছতে চায় নাটক। প্রথম দৃশ্যে নারীর ইজ্জত রক্ষা দেশে সঙ্কটত্রাণ সাম্রাজ্যবাদীর পাশবিক শক্তির ব্রিটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বস্তুত কেড়ে নিল পঞ্চাননীকে। তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা নিল প্রধানের প্রতিবেশী দয়ালের স্ত্রী এবং তার একমাত্র সন্তানকে রাঙা, রাঙার মা। কিন্তু তবুও আমিনপুরের মনোবলটা ভেঙে পড়েনি। তবুও উনানের ধোঁয়া উড়ল। শাকপাতা সেদ্ধ করে মানুষগুলো বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে লাগল আপন বাস্তুভিটার মাটিটুকু আঁকড়ে। তবে খেত-খামার খাল-বিলের শাকপাতা জগডুমুর আর কুচো কাঁকড় দিয়ে কদিনেই বা চলে, আর ওই বস্তুগুলো অত অপর্যাপ্তই বা কোথায়! তাছাড়া ঘাসেরও দাম বেড়ে গেছে

দুর্ভিক্ষের বাজারে। ‘এ যেন আমার ঢোলকলমি জলার ঘাস বলে মনে হচ্ছে! তা সে যা করেছ করেছ, আর কেটো না। ঘাসের আজকাল বড্ড দর।’[হারু দত্ত : ১ম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য] প্রধান ঠিক করে জমি বিক্রি করবে। হারু দত্তের সঙ্গে কথা পাকা করে ফেলেছে শুনে বাধা দেয় কুঞ্জ। তার কাছে বাধা পেয়ে প্রধান মত বদলিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যেই চালের চোরাচালানদার হারু দত্ত এসে পড়ে ঘটনার কেন্দ্রে। কুঞ্জর সঙ্গে শুরু হল ঘাত-প্রতিঘাত। কুঞ্জকে প্রধান প্রতিবাদী হিসেবে ঘরে নিয়ে তাকে নিষ্ঠুরের মতো লাঠিপেটা করল। প্রধান বাধা দিতে গিয়েছিল, তাকেও রেহাই দিলনা। সমাদ্দার পরিবারের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে বেরিয়ে গেল দস্যু হারু দত্ত তার দলবল নিয়ে। হারু দত্তের অতর্কিত আক্রমণের অভিঘাতে বালক মাখনের মৃত্যু ঘটল। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখেমুখে নেমে আসল ‘একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া’।

‘নবান্ন’ নাটকের মুখ্য ঘটনা এটাই। এরপরই সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পাড়ি দেয়। অলি-গলিতে পথে পার্কে ঘুরে ঘুরে ভিখিরির জীবনযাপন করতে থাকে। প্রধান সমাদ্দার হয়ে যায় উন্মাদপ্রায়। এরপর কাহিনী কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে। একদিকে অঙ্কিত হয়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মর্মান্তিক জীবনযাত্রার ছবি। তুলে ধরা হয়েছে সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রে সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারদের অর্থ উপার্জনের নোংরা পথ অবলম্বনের চিত্র। তুলে ধরা হয়েছে অসহায় অভাবগ্রস্ত যুবতী মেয়েদের কেনাবেচার চিত্র। পথে পার্কে অসহায় মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার বিবরণ রাখা হয়েছে এই নাটকে।

বিনোদিনীকে এমনিভাবে কাজের লোভ দেখিয়ে এক দালাল তুলে এনে কালীধনের কাছে বিক্রি করে দেয়। এখানে বিনোদিনী মিলিত হয় নিরঞ্জনের সঙ্গে। কালীধন অসৎ উদ্দেশ্যে মেয়ে সংগ্রহ করে অল্প পয়সার বিনিময়ে। ‘সেবাশ্রম’ নামক একটা জায়গায় তাদের লুকিয়ে রাখে। কালীধনের আরো একটি কারবার আছে। সে চলের মজুতদার। অল্প মূল্যে চাল কিনে গুদামজাত করে রাখে বেশি পয়সায় বিক্রি করবে বলে। তার গুদামে চাল এবং সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে হারু দত্ত ও টাউটের মত ঘৃণ্য মানুষজন. নাট্যকার কালীধন-হারু দত্ত নিরঞ্জন-বিনোদিনীকে নিয়ে একটি এপিসোড তৈরি করেছেন। এই অংশের পরিণতি ঘটিয়েছেন এইরকম ভাবে যে, সেবাশ্রমে আশ্রিত বিনোদিনী নিরঞ্জনের সঙ্গে আকস্মিকভাবে মিলিত হয়। সেবাশ্রমের সমস্ত গুপ্ত বিবরণ সে তাকে দেয়। নিরঞ্জন সমস্ত শুনে থানায় যায়। কালীধনের চালের গুদামের বিবরণ এবং সেবাশ্রমের বে-আইনী ব্যবসার কথা ফাঁস করে দিয়ে দারোগাকে ডেকে আনে। দারোগা বামালসমেত কালীধন, রাজীব ও হারু দত্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর নিরঞ্জন বিনোদিনী গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। পুনরায় আমিনপুরের পরিচিত মাটির কোলে ফিরে আসে, নিজেদের বাস্তুভিটেতে আবার নতুন করে ঘর তোলে।

কুঞ্জ রাধিকা প্রধান তখনও শহরের পথে ভিখিরি জীবনযাপন করতে থাকে। নাট্যকার শহরের অলিগলিতে ঘুরিয়ে শেষে তাদের নিয়ে আসে এক বড়লোকের বাড়ির সামনে। উদ্দেশ্য একটা বৈপরীত্যপূর্ণ ছবি তুলে ধরা। অর্থাৎ একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষের অ-মানুষিক জীবনযাত্রার ছবি অঙ্কন করা আর তার পাশাপাশি ধনী মানুষের বিলাস-বৈভবের চিত্র, অকারণ অপচয়ের চিত্র তুলে ধরা। সেই সঙ্গে

কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত দেশের শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের চরিত্র উদঘাটন এবং এ সমস্তের পাশাপাশি ধনের সঙ্গে ধনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে নিরন্ন গরিব মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক কত আন্তরিক, হৃদ্যতাপূর্ণ, প্রেমপ্রীতির বন্ধন কত নিবিড় তা দেখান হয়েছে। মানুষ যে অবস্থার ফেরে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থানে রত, জন্তুর জীবনযাপনে বাধ্য, কিন্তু তবুও তাদের অন্তঃকরণ মানবিক গুণসমৃদ্ধ সে দৃশ্য দেখিয়ে নাট্যকার কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন অন্যদিকে।

এই দৃশ্যের পর সমাদ্দার পরিবার আবার দুটি টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে যায় কুঞ্জ রাধিকা, আর একদিকে যায় প্রধান সমাদ্দার। কুঞ্জ রাধিকা এসে পড়ে শহরের এক লঙ্গরখানায়। এখানে এসে তার সমবেত ভিখিরিদের কথাবার্তার মধ্যে আমিনপুরের ফিরে যাওয়ার প্রেরণা পায়। অতঃপর আমিনপুরের পথে পা বাড়ায়, ‘কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।’ অপর দিকে দল থেকে বিশ্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে একটা হাসপাতালে। তার চোখ দিয়ে নাট্যকার হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থার চরম দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। এর পরে প্রধান কোনো দুর্জ্ঞেয় প্রেরণাবশে আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন করে নাটকের শেষাংশে।

অতঃপর নাটক চলে আসে পুনরায় আমিনপুরে। নবান্নের উৎসবে সকলে মিলিত হয়।

উপরোক্ত কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, ‘নবান্ন’ নাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ, সেই সঙ্গে আছে আকর্ষণীয় নাটকীয় উৎকণ্ঠা। প্রতি দৃশ্যে চমক, চমকের পর চমকে নাটকটি জমজমাটি। নাটকটির চারটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কেও পাঁচটি, তৃতীয় অঙ্কে দুটি এবং চতুর্থ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। অতএব চারটি অঙ্কে মোট দৃশ্য সংখ্যা পনেরটি। প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে আমিনপুর গ্রাম। দ্বিতীয় তৃতীয় অঙ্কের সাতটি দৃশ্য শহর। চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য পুনরায় আমিনপুর। সব মিলিয়ে আমিনপুর গ্রাম পেয়েছে আটটি দৃশ্য, শহর পেয়েছে সাতটি দৃশ্য। এদিক থেকে মোটামুটি ভারসাম্য বজায় থেকেছে বলা যেতে পারে। আট আর সাতে পনেরটি দৃশ্যের স্তরে স্তরে নাট্যকার সঞ্চারিত করে দিয়েছেন অপর্যাপ্ত নাট্যরস। যে রস দর্শক সাধারণকে জমিয়ে রাখবার জন্যে যথেষ্ট। শম্ভু মিত্র এই নাটকের সম্পাদনা, অভিনয় এবং পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন ‘নবান্ন’ এ ছিল একটা এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেক্টার আছে। দৃশ্যগুলি এমনভাবে বাঁধা যে, এক একটি ক্লাইম্যাক্স, প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আছে। সুতরাং নাটকটি যে খুব জমজমাট সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে প্লট গঠনে শৈথিল্য খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়।

৪৮.৯ সারাংশ

বাংলা নাটক ও মঞ্চের ইতিহাসে ‘নবান্ন’ রচনা, প্রকাশ ও অভিনয় একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। এর পেছনে সক্রিয় ছিল একটি নতুন ভাবনা, বাংলা সহিত্য সংস্কৃতি জগতে অপেক্ষাকৃত নতুনতর রাজনৈতিক দর্শন। মানুষের কথা, মানুষের কাছে, তাদের ভাষায়, তাদের বোধের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্কল্প থেকে

'নবান্ন' নাটকের সৃষ্টি। এই নাটকে সমকাল ও ক্রান্তিকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

সামগ্রিক বিচারে কিছু অসঙ্গতি সত্ত্বেও 'নবান্ন' নাটককে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক হিসাবে গণ্য করা হয়। এ নাটকের মূলধারার আবর্তন ঘটেছে প্রধান সমাদ্দার-এর পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেখানে প্রধান পুত্রদ্বয় শহীদ শ্রীপতি-ভূপতি, পত্নী পঞ্চাননী, বড় ভাইপো কুঞ্জ ও তার স্ত্রী রাধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বিনোদিনী ও তার স্বামী নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র। অথচ এই দুটি চরিত্রই নাটকের দুষ্টের দমন— এই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে—চোরাচালান, মেয়ে পাচারকারী হারাধন ও মজুতদার ও নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধনকে ধরিয়ে দিয়ে সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করেছে। Suffering and Struggle-এর মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তির এটি যদি কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক বিধান হয় প্রধান-কুঞ্জ সেক্ষেত্রে অনেকটাই অতি সাধারণ দুর্বল চরিত্র মাত্র। যদিও এ নাটকে সমস্ত ধরনের প্রতিকূলতার তারা শিকার, তাদের জীবন যন্ত্রণাই সর্বাধিক প্রতিফলিত। কিন্তু এদের বাঁচবার আকাঙ্খাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। সম্ভবত এই শেষোক্ত কারণেই—শত হতাশার মধ্যেও বাঁচবার আকুলতা মানুষের জীবনে গভীরতর সত্য বলে বিষয়বস্তু অভিনয় নৈপুণ্য ও সংলাপ নাটকটিকে সেদিন জনপ্রিয় করে তুলেছিল। নবান্ন গণনাট্য হিসেবে সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। কারণ নাটক দেশকালের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে গণচেতনার সঞ্চারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের চতুর্দশ-পঞ্চদশ দৃশ্যে, পরিশেষে আমিনপুরের হিন্দু-মুসলমান চাষী জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ভুলে সকলে মিলেমিশে ফসল একই খামারে তোলা, ঝাড়াই-এর পর তার একটি অংশ অনাগত ভবিষ্যৎ দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধর্মগোলায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা যেমন করেছে, তেমনি প্রথা অনুযায়ী মরা গঙ্গার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করেছে।

নাটকের সামগ্রিক পর্যালোচনা শেষে স্মরণ করতে হয়, নাটকের গঠন বিন্যাস প্রসঙ্গটিও। নাটক সাধারণত পঞ্চসন্ধি সমন্বিত। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক সাধারণত পাঁচটি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথমে নাটকীয় ঘটনার প্রস্তাবনা বা সূচনা বা এক্সপোজিশন, দ্বিতীয়ে তার ক্রমবির্বতনের প্রথম ধাপ আরোহপর্ব বা রাইজিং অ্যাকশন, পরে নাটকের চূড়ান্ত সঙ্কট মুহূর্ত (crisis) বা ক্লাইম্যাক্স-এর পর একটি পরিণতির দিকে অবরোহ, অবনমন বা ফলিং অ্যাকশন এবংনাটকের পরিণতি পর্ব বা ক্যাটাসট্রফি/ ডেনোমেন্ট—পূর্ণাঙ্গ বড় নাটক এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে সমাপ্ত হয়। কিন্তু আধুনিক নাটক যুগ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বিষয় ও চরিত্র প্রাধান্য সূত্রে নাট্যাভিনয় ও নাটকের গঠন বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাহিনী নির্ভর চরিত্র নাটক, নাটকের ভরকেন্দ্র পরিবর্তন করেছে। সেক্সপীয়রীয় নাটকে চরিত্র বিকাশের জন্য যে গঠন প্রয়োজন ছিল, গিরিশ-অর্ধেন্দু-দানীবাবু-অহীন্দ্র যুগে আবেগপ্রবণ চরিত্রাভিনয়ে যে দর্শককে আবেগতাড়িত করবার জন্য নাটকের বিস্তার প্রয়োজন ছিল, পরবর্তীকালে যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশের জন্য দ্বন্দ্বসঙ্কুল মূহূর্ত ফুটিয়ে তুলতে সেই পরিসরের প্রয়োজন নেই, তাই পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত আবেগসর্বস্ব চরিত্রাভিনয়ে ভাটা পড়ায় আধুনিক নাটক ক্রমশ তিন অঙ্ক থেকে একাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এ যুগের প্রধান চরিত্রগুলি ক্রমশ হয়ে উঠেছিল মনস্তত্ত্ব নির্ভর এবং সমস্ত নাটকে ঘটছিল মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য। ঠিক এরই পাশাপাশি আরও একটি ধারা যুক্ত

হল চারের দশকে, গণনাট্যের সূচনাপর্ব থেকে। এ নাটকে ব্যক্তি নয়, ব্যষ্টি বা সমষ্টির প্রাধান্য। আর এই সমষ্টি ভাবনার জন্যই গণচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নাটক ব্যবহার করা হয়। গণনাটকে তাই ব্যক্তি ও সমষ্টির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজ মনস্তত্ত্বের যোগ দেখা যায়। গণনাটকে শোষকদের সঙ্গে শোষিতের সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। এই সংঘাত থেকেই নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। নবান্নে বহু মানুষের সমর্থনে দাঁড়িয়ে নাট্যকার শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের, সংগ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন।

উচ্চকণ্ঠ হয়ে এই বক্তব্য দীর্ঘ সময় জুড়ে বলা যায়না। তাই নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কের পরিবর্তে চার অঙ্কে মোট পনের দৃশ্যে তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। অকুস্থল মেদিনীপুর, আমিনপুর একটি কল্পিত গ্রাম হলেও, সমকালীন বহু বিচিত্র ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ নাটক রচিত। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মেদিনীপুরের সংগ্রামী ইতিহাস, মন্বন্তর-মহামারী, মড়ক—এরই মধ্যে কিছু মানুষের বাঁচার সংগ্রাম। দুঃখ, দুর্যোগের অবসানে, সকলে মিলে সব দুঃখ সয়েও, অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্কট উত্তরণের জন্য ধর্মগোলার সঙ্কল্প নিয়ে।

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। নাটকের চরম মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স বলে যদি কোনো কিছু কল্পনা করা হয় তবে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যটিকে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কে গ্রামসমাজের অত্যাচার অনাচারের নায়কদের শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থার পর তৃতীয় অঙ্কের সামান্য দুটি দৃশ্যে লঙ্গরখানা ও চিকিৎসাকেন্দ্রের অব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে দ্রুত নাটকের উপসংহার টানা হয়েছে চতুর্থ অঙ্কে। নবান্নের কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, এনাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। এটি জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। এর প্রায় প্রতিদৃশ্যে আছে চমক। পনের দৃশ্যের মধ্যে আটটি দৃশ্যে আমিনপুরে, আর সাতটি শহরে সংঘটিত। গ্রাম-শহরের দৃশ্য সমাবেশ করে নাট্যকার ভারসাম্য রক্ষা করে স্তরে স্তরে নাট্যরস সঞ্চারিত করেছেন। প্রথম পর্বের অন্যতম নাটক পরিচালক ও অভিনেতা শম্ভূ মিত্র। নবান্ন নাটকের মহাকাব্যিক (এপিক) ব্যাপ্তি এপিসোডিক ক্যারেকটার পরিচয় লক্ষ্য করেছেন। ফলত নাটকটি যে অভিনয়ে খুবই জমে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৪৮.১০ অনুশীলনী ২

১। নিচের সংলাপগুলি পড়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন :

(ক) প্রধান। চলো চলে যাই।
দয়াল। কোথায়?
প্রধান। কোন শহরে? অন্নকুট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা।
—বক্তা কেনে পরিস্থিতিতে, কেন এবং কোথায় যাওয়ার কথা বলেছেন? 'অন্নকূট' শব্দটির বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থ বুঝিয়ে দিন।

(খ) "চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।"

—বক্ত কে? কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(গ) "আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—" —বক্তা কে? কুঞ্জকে একথা বলার কারণ কী?

(ঘ) "আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।"—বক্তা কে? কাদের বলেছেন? আমিনপুরের কলঙ্ক বলবার কারণ কী? বক্তার চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। "নবান্ন' নাটকের গঠনগত বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৩। 'নবান্ন একই সঙ্গে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।'—মন্তব্যটির সারবত্তা স্থির করুন।

৪। বিষয়বস্তু, উপস্থাপক ও চরিত্র পরিকল্পনায় 'নবান্ন' অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।— মন্তব্যটি কতদূর যথার্থ আলোচনা করুন।

৫। 'নবান্ন' সমকালীন সমাজ ও নাট্য আন্দোলনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করলেও, শিল্পসৃষ্টি হিসেবে দুর্বল। — এ সম্পর্কে আপনার অভিমত যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করুন।

৪৮.১১ 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র আলোচনা

একটি নাটকের জন্য কাহিনী, সংলাপের সঙ্গে চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যাবে না। নাটকে চরিত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমানে নাটকে চরিত্র সংখ্যা খুবই সীমিত। একটি বা দুটি চরিত্র দিয়ে একটি নাটকের সাবলীল গঠনকার্য সমাধা হতে পারে।

বাংলা অপেশাদার গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম মঞ্চসফল নাটক 'নবান্ন' কিন্তু এদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'নবান্ন' নাটকে ছোট বড় চরিত্র মিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশটা চরিত্র। আমরা এখানে 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপিটা তুলে দিলাম :

প্রধান সমাদ্দার	আমিনপুরের বৃদ্ধচাষী	বিজন ভট্টাচার্য
কুঞ্জ সমাদ্দার	প্রধানের ভাইপো	সুধী প্রধান
নিরঞ্জন সমাদ্দার	কুঞ্জের সহোদর	জলধর চট্টোপাধ্যায়
মাখন	কুঞ্জর ছেলে	মণিকা ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)
দয়াল মণ্ডল	প্রতিবেশী	শম্ভু মিত্র
হারু দত্ত	স্থানীয় পোদ্দার	গঙ্গাপদ বসু
কালীধন ধাড়া	চাল ব্যবসায়ী	চারুপ্রকাশ ঘোষ
রাজীব	কালীধনের সরকার	সজল রায়চৌধুরী
চন্দর	জনৈক চাষী	রঞ্জিত বসু
যুধিষ্ঠির	আন্দোলনকারী	নীহার দাশগুপ্ত
ফটোগ্রাফারদ্বয়	সংবাদপত্রের প্রতিনিধি	অমল ভট্টাঃ, রবীন মজুমদার
প্রথম ভদ্রলোক	চাল খরিদ্দার	মনোরঞ্জন বড়াল

বরকর্তা	বড়কর্তা	চিত্ত হোড়
বৃন্ধ ভিখারি	—	গোপাল হালদার
ডোম	—	শম্ভু হালদার
দারোগা	—	বিমলেন্দু ঘোষ
ডাক্তার	—	সমর রায়চৌধুরী
দিগম্বর	—	অজিত মিত্র
ফকির	—	সত্যজীবন ভট্টাচার্য
পঞ্চাননী	প্রধানের স্ত্রী	মণিকুন্তলা সেন
রাধিকা	কুঞ্জর স্ত্রী	শোভা সেন
বিনোদিনী	নিরঞ্জনের স্ত্রী	তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র)
খুকির মা	হারু দত্তের মা	
ভিখারিণী	—	বিভা সেন
বাংলার ম্যাডোনা	—	ললিতা বিশ্বাস

ভদ্রলোক, নির্মলবাবু, টাউট, ভিখারী, হারু দত্তের শালা, কনেস্টবল, রোগী, ভৃত্য, চন্দরের মেয়ে, বরকত, কৃষক, নিরন্নের দল, জনতা ইত্যাদি।

চরিত্রলিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা অনেক। এতো চরিত্র সংখ্যার পিছনের কারণটা অবশ্য এই নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা। বিষয় বৈচিত্র্য, সময়দীর্ঘতা এবং প্রেক্ষাপটের বিস্তীর্ণতা প্রভৃতি হেতু নবান্ন নাটকের চরিত্রলিপিও বিরাট হয়ে গেছে। একই সঙ্গে আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হয়েছে নাটকে। গ্রাম ও শহরের চিত্র, সমাজব্যবস্থার চরম দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি তুলে ধরে একটা প্রতিরোধমূলক মুহূর্ত সৃষ্টি করতে গেলে যেমন নাটককে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বিছিয়ে দিতে হয়, সেইরকম সর্বস্তরের সুচারু নাট্য রূপায়ণ করতে গেলে চরিত্র সংখ্যাবৃদ্ধির অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমানে, নাটকে জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট ও ব্যপকত্বের পরিবর্তে ছোট ছোট ছবি তুলে ধরবার প্রয়াসটা লক্ষিত হয় বেশি।

'নবান্ন' নাটকে বড় চরিত্রগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দেওয়া গেল। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ সমাদ্দার, নিরঞ্জন সমাদ্দার, দয়াল মণ্ডল, হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া, রাজীব। স্ত্রী চরিত্রগুলি যথাক্রমে রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী। একটিমাত্র শিশু চরিত্র মাখন। নাটকে এদেরই ভূমিকাংশ বেশি। এরাই নাটকের প্রধান চালিকাশক্তি। এদেরই অভিনয় নৈপুণ্যের দৌলতে নাটক দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র নাটকে সুবিস্তৃত। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ ও নিরঞ্জন সমাদ্দার, রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী এবং মাখন এক পরিবারভুক্ত। দয়াল প্রতিবেশী, হারু দত্ত, কালীধন চোরাকারবারী ও চোরাচালানদার। রাজীব কালীধনের সরকার। মূলত এই চরিত্রগুলোকে বিকশিত করবার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য, পরিণতি প্রদর্শনের জন্য নাটকের অপরাপর চরিত্রগুলো রূপায়িত

হয়েছে।

নাটকে সাধারণত তিন ধাঁচের চরিত্র দেখা যায়। ফ্লাট চরিত্র, রাউণ্ড চরিত্র, টাইপ চরিত্র। ফ্লাট চরিত্র বড় কিন্তু আগাগোড়া একঢালা। একই রকমভাবে চলতে থাকে। অন্তর জগতের উত্থান-পতন, ভাঙাগড়া, দ্বন্দ্ব-সংঘাত—ইত্যাদির গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত আকুলতা ব্যাকুলতার টানাপোড়েনের রেখচিত্র অঙ্কিত না করে সরলরৈখিক ভাবে চলতে থাকে। এ ধরনের চরিত্র প্রধান সমাদ্দার। রাউণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং বহির্দ্বন্দ্বে বিশেষভাবে আন্দোলিত। নাটকে সাধারণত নায়ক চরিত্র এই শ্রেণীতে পড়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয় এই ধরনের চরিত্র। নবান্ন নাটকে কুঞ্জ এই রাউণ্ড চরিত্রের মধ্যে পড়ে।

প্রধান সমাদ্দার নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে যখন উপস্থিত হয় তখনই তার বার্ধক্য অবস্থা। কিন্তু সেই বয়সেই তার ভেতরে একটা আগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার দুটি পুত্র ছিল, শ্রীপতি ভূপতি। বৃদ্ধা স্ত্রী পঞ্চাননীর পুত্র এই দুটি মৃত। মৃত পুত্রের শোক বুকে নিয়ে প্রধান সমাদ্দার হত্যা ও সন্ত্রাসবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সে দুর্দান্ত আবেগে ভরপুর। এরই মাঝে সে অঙ্কন করেছে অনাগত দিনের রক্তিম চিত্র। কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন এক উদ্‌ভ্রান্তি তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে। ভ্রাতুষ্পুত্র কুঞ্জর চোখে সেটা এড়িয়ে যায়নি। অসংলগ্ন কথাবার্তা, অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের অসংযত পরিকল্পনা কখনো কখনো প্রাণ দেওয়ার পাগলামো ব্যাকুল কথাবার্তায় কুঞ্জ ঠিকই ধরেছে 'শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটো ছেলের শোকে।' পুত্রদুটিকে হারিয়ে বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকি জীবনটা কাটাতে পারত, কিন্তু সর্বব্যাপক আন্দোলন ও তাকে দমন করবার জন্য সর্বনাশা অত্যাচার ও নির্যাতনে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হওয়াতে সে সম্বলটুকু চলে গেল। সর্বনাশা ঘাত-প্রতিঘাত কেড়ে নিল দুই পুত্র। তিন মরাই ধান নষ্ট হয়ে গেল। পঞ্চাননী প্রাণ দিল। এরই মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসার এবং নাতি মাখনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল যেটুকু জমি জায়গা আছে তার ওপর ভর করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর এবং সর্বনাশা বন্যা এসে স্বপ্নের শেষাংশটুকু কেড়ে নিয়ে গেল। তারপর এলো চোরাচালানদার হারু দত্তের আক্রমণ। অপদস্থ হল গ্রামের মাতব্বর গোছের প্রধান সমাদ্দার। এরই ভেতর ঘটল মাখনের মৃত্যু। ছাড়তে হল গ্রাম। শহরের পার্ক ও ফুটপাতকে আশ্রয় করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হল তাকে। একের পর এক এবম্বিধ দুর্ঘটনায় প্রধান সমাদ্দার মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

গ্রামের এই সরল সাদাসিধে মানুষটি যার অভ্যন্তরে এক প্রতিরোধপরায়ণ প্রতিস্পর্ধী সাহসিকতার অপর্যাপ্ত সঞ্চয় ছিল,যা তার মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত লাভা স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছে, 'চল্‌তো গাও বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।' কিন্তু তারপর থেকে চরিত্রটা কেমন এক অহেতুক অসহায়তার কবলে আত্মসমর্পণ করে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পরিবর্তে অসংযত পাগলামোর খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হল। এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে প্রথম অঙ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম দৃশ্যে। হারু দত্তের লোকজন যখন কুঞ্জকে লাঠিপেটা করছে তখন প্রধানের বুকের ভেতর স্তুপীকৃত বারুদের বিস্ফোরণ ঘটবার পরিবর্তে আত্মরক্ষার অসহায়তা ফুটে উঠেছে, 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' প্রথম দৃশ্যের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দর্পিত বীরত্বের একটুখানিও যদি দেখা যেত

তাহলেও চরিত্রটা সঙ্গাতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারতো। আর তার পরের পরিবর্তনটাকে আমরা এইভাবে মেনে নিতে পারতাম যে বিপর্যয়ের আতিশয্যবশত চরিত্রটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রথম অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে তার চরিত্রে কখনো কখনো দেখা গেছে তীব্র সচেতনতা, 'কী কী বললি তুই কুঞ্জ! ছলনা! নাকী কান্না! আমার সহানুভুতি মিথ্যে তোর কাছে? অপমান করলি তুই আমারে! আমারে অপমান করলি তুই! তুই আমারে অপমান করলি —'[১ম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য] কিংবা, 'ছোট ভুলের ক্ষমা আছে, বুঝলে দয়াল! কিন্তু বড়ে ভুলের আর চারা নেই। করতেই হবে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত।' অথবা, 'ভদ্দরনোকের নামে মুখ করছ, কিন্তু এই ভদ্দরনোক ছাড়া আবার গতিও নেই আমাদের এখন। শত হোক, সেই ঘুরে ফিরে যেতেই হবে তোমার ভদ্দরনোকের দোরে। উপায় নেই।'[১ম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য] সংলাপগুলো চরিত্রটার সচেতনতার দিকটি তুলে ধরে, গভীরতর উপলব্ধির ত লদেশ থেকে উঠে এসেছে বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু তাৎক্ষণিক। পরের পর্বেই দেখা গেছে চরিত্রটি গতিপথ পরিবর্তন করেছে। আর গ্রাম থেকে শহরে এসে পড়বার পর চরিত্রটি হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয়। পাগলামির ভাব বজায় আছে বটে এবং কখনো কখনো পাগলামো অবস্থায় কিছু কিছু প্রতীকধর্মী সংলাপ উচ্চারণ করে দর্শক মনে দাগ টানবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ঠিক, কিন্তু মনের জগতে যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিচ্ছবি সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে উঠে এসে বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে চরিত্রটি যাতে রাউণ্ড হয়ে ওঠে, তার এমন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফলে চরিত্রটি এক ঢালা হয়ে অসংযত চিন্তা ভাবনার খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। কোনো ভাবেই কখনোই গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। অথচ চরিত্রটার প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু এই যত্ন সম্ভবত একটিমাত্র কলমের নয়। নাটকটি লিখিত হওয়ার পর, মনে হয়, সম্পাদনার সময় বহুজনের সযত্ন হস্তক্ষেপের ফলে এমনটি ঘটেছে, যা নাটকের মধ্যে খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়। বহু যত্নে সন্তানের যে অবস্থা হয় প্রধান সমাদ্দারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তাই চরিত্রটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, টুকরো টুকরো মনে সযত্ন প্রয়াসের ফল হিসাবে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গভীর হয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক যেন শান্ত নদীর বুকে মৃদুমন্দ বাতাসের আন্দোলনে অল্প অল্প তরঙ্গের উত্থান-পতনের মতো হয়ে চরিত্রটা অতর্কিত ভাবে পরিণতির পর্বে এসে পৌঁছেছে। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝায় সমুদ্র গর্ভে যে ভয়াল ভয়ঙ্কর উত্তালতা সৃষ্টি করে মনের ওপর গভীর ও গাঢ় দাস টানে তেমন ভাবে চরিত্রটা গড়ে ওঠেনি। অথচ নাটকের বিষয়টা ছিল ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের ঘনঘটায় পরিপূর্ণ।

অপরপক্ষে, কুঞ্জ চরিত্রটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনের উষ্ম আবর্তের ওপর দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। তার সংবহনতন্ত্রী তারুণ্যের তাজা রক্ত সুষম বন্টনের ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যথাযথ ভারসাম্য বজায় থেকেছে। সে বুঝতে পারছে মারমুখী সন্ত্রাসবাজদের সামনে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, তাই অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে প্রধানের প্রৌঢ় মনের দপ করে উদীপ্ত হয়ে ওঠাকে দমন করেছে, 'তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো ঐ বনের ভেতরই পালাই।'[১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] যদিও প্রধান এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 'আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল্, বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের; তা কুঞ্জ শোনো না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—'[১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] এই বক্তব্য কুঞ্জর পলায়নবাদিতার

দৃষ্টান্ত হতে পারে, কিন্তু কুঞ্জ সম্পর্কে এই কথাই যথেষ্ট নয়। হারু দত্ত প্রধানকে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করার সময় কুঞ্জ তীব্র প্রতিবাদ বাক্য উচ্চারণ করে তার বীরত্বের প্রমাণ রেখেছে,...........'জমি যার সে বলছে বিক্রি করব না; আর উনি শুধু বলছেন কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে।' প্রধান চুপ করতে বলায় সে দপ করে জ্বলে উঠেছে, 'কেন, কিসের জন্য। গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে, চেঁচাও,—অন্তত আর পাঁচজন মানুষ জানুক।' হারু দত্ত ছোটলোক বলে গালাগালি দেওয়ায় কুঞ্জ মাথা ঠিক রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছে, 'এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।' 'এই মুখ সামলে কথা বলো কিন্তুক।' কিন্তু হারু দত্ত যখন উত্তেজিত ভাবে প্রধানকে খচ্চর বলে গাল দিয়েছে, তখন কুঞ্জ নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি, দপ্ করে জ্বলে উঠেছে সে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—' বেগে প্রস্থান করে লাঠি হাতে প্রবেশ করেছে সে। হারু দত্তের লোকজনের সঙ্গে লড়াই করেছে সে জমি এবং মান ইজ্জৎ রাখতে। কুঞ্জ চরিত্রের এটাই প্রথম মাত্রা। কুঞ্জ ভীরু নয়, পলায়নী মনোভাবকে আশ্রয় করেনি, সাহসিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কুঞ্জ দুর্দান্ত শক্তিসম্পন্ন।

কুঞ্জ চরিত্রের দ্বিতীয় মাত্রা, কোনো ওপরওয়ালা নয়, ভাগ্য কিংবা ভগবান নয়, আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা। কুঞ্জ কৃষক জীবন মন্থন করে যে সত্য তুলে এনেছে, তা হল—'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য] কুঞ্জ এই সত্যের শীর্ষবিন্দুতে একদিনেই আরোহণ করেনি। অতি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকে অর্জন করেছে এই অভিজ্ঞতা। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস মানুষের প্রাণ নিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। অতি বাস্তব বন্যা গরিব মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে মানুষকে। অপরপক্ষে যারা নিরন্ন মানুষের মুখের খাবার আর অসহায় নারীর মান ইজ্জতের মূল্য না দিয়ে বেচাকেনার খোলা বাজার বসিয়েছে ঈশ্বর কেবলমাত্র তাদের প্রতি সদয় এটা একটা লোকঠকানো ধুর্তুমি। তাই অত্যাচারী যখন সেই কথা স্মরণ করিয়ে শোষণকে অব্যাহত রাখতে চায় তখন দৃপ্ত প্রতিবাদের অগ্নি দপ করে জ্বলে ওঠে তার চোখে মুখে। বলে, 'তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য] সুতরাং ওপরওয়ালা, ভাগ্য বা ভগবান নয়, মানুষের অত্যাচারী ভূমিকা এবং সেই মানুষের ভেতরই রয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অযূত সম্ভাবনা, নিযুত সাহসিকতা।

কুঞ্জ গার্হস্থ জীবনযাত্রার এক জীবন্ত প্রতিনিধি। প্রধানের পর সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান সে। সেই সুবাদে সে এই পরিবারের যুবরাজ। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত—এই নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের মূলধন জমি, কিন্তু অভাবের একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে সামান্য জমি এতগুলো মানুষের জীবনযাত্রাকে সরলরৈখিক পথে টেনে নিয়ে যেতে পারেনা। তাই অনিবার্যভাবে তার ঘর গৃহস্থালীতে এসে পড়ে ছোটখাট ঝগড়া-বিবাদ। রচিত হয় মতানৈক্যের রোজনামচা। 'সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে।' [১ম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য] নিজের স্ত্রীর প্রতি এধরনের মন্তব্য করতে এই চাষাড়ে যুবরাজের এতটুকু দ্বিধা হয় না বটে কিন্তু ভাই নিরঞ্জনের গঞ্জনায় যখন ভ্রাতৃবধূ বিনোদিনীর চোখে জল ঝরতে দেখে তখন মাথা ঠিক রাখতে পারে না, ফের মেরেছিস

বুঝি ?..........বলি ফের আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের? পশু বলে গালাগাল দিয়ে একখানা কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মেয়ে মানুষের গায়ে হাত.....বেরো বেরো তুই, বেরো।' কিন্তু তারপর ভাই-এর রক্ত দেখে সম্বিত ফিরে পেয়ে আত্মগ্লানিতে ভরে যায় তার মন।'খুন করে ফেললাম! খুন করে ফেললাম আমি নিরঞ্জনরে! নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!!' (১/২) কুঞ্জর যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের হাহাকারটা নাট্যমঞ্চ প্রবল প্রতিক্রিয়া সঙ্গে দর্শন করলে আমাদের মনে মর্মস্পর্শী আবেদন সৃষ্টি না করে পারেনা। সুতরাং গৃহকর্তা হিসাবে অভাবের আতিশয্যে যেমন সে নিজের সহধর্মিণীর সঙ্গে অন্যায় ঝগড়া বিবাদে মত্ত হয়, তেমনই পরিবারের অন্যদের দয়ামায়া স্নেহমমতার গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে রাখতে চায়। এই যে প্রীতিপূর্ণ বন্ধনস্পৃহা—এটি কুঞ্জ চরিত্রের তৃতীয় মাত্রা।

কুঞ্জ শুধু নিজের সংসারটাকে ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়ে আবদ্ধ নয়। প্রতিবেশী সম্পর্কেও তার অন্তরে একটা দুর্বল জায়গা আছে। কুঞ্জ বাইরে কঠিন, বাহ্যিক আচরণও খুব খানিকটা রূঢ়। কিন্তু রূঢ় কাঠিন্যের অভ্যন্তরে একটা নরম তুলতুলে জায়গা আছে, যেখানটা ঠিকমতো ঘা লাগাতে পারলে দরদর করে নিঃসৃত হবে অজস্র দয়ার নির্যাস। নিজের অভুক্ত পরিবারের জন্যে ঘটিবাটি বিক্রি করে যে ক'মুঠো চাল কিনে এনেছে তার দাবিদার পরিবারস্থ পাঁচজন ব্যক্তি। প্রধান সমাদ্দার সে কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেও ফেলে, 'শেষ সম্বল দু'খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের দুয়েক চাল নিয়ে এয়েছে কুঞ্জ; পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক'টা?' (১/৩)কুঞ্জও কতকটা প্রধানের কথার প্রতিধ্বনি করে, 'রাঙার মা ধুঁকছে কাল বিকেলবেলা থেকে, অমুকের মা ধুঁকছে কাল দুপুরবেলা থেকে, তমুকের মা ধুঁকছে আজ সকালবেলা থেকে, এই তো এখন শুনতে হবে। (১/৩) মুখে উচ্চারণ করলেও কুঞ্জর অন্তরের কথা তা নয়। তাই দয়ালের একমুঠো চালের আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেনা সে। শেষ সম্বলের থেকে কিছুটা চাল দয়ালকে দিয়ে নিজে খুব খানিকটা তৃপ্তি পায়। এই প্রতিবেশী প্রীতি কুঞ্জ চরিত্রের চতুর্থ মাত্রা।

কুঞ্জ গ্রাম্য এক কৃষক সন্তান। রাগ দ্বেষ বিবাদ বিসম্বাদের পাশাপাশি পরিবার এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি এই কৃষক সন্তানের সব কথা নয়। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে বিঘূর্ণিত হতে হতে সময়ের গতিপ্রকৃতি কোন আবর্ত রচনা করতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। গ্রাম্য জীবনে যে অনতিবিলম্বে নেমে আসবে এক হাহাকার তা তার দূরদর্শিতায় ধরা পড়ে। তাই সে অন্য সকলের মতো বিচলিত না হয়ে খুব সহজেই উচ্চারণ করে, 'বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের মতো আমাদেরও ঐ রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে হবে।'(১/৩)

কুঞ্জের এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন অদৃষ্টদ্রষ্টা সাধুসন্তর ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ঘটনার স্রোতে ভাসন্ত এক বাস্তববাদী মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। এই সত্য যে কতখানি নির্মম, নিষ্ঠুর তার পরিচয় দ্বিতীয় অঙ্কে পাওয়া যায়। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে তারা গ্রামের মাটির কোল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে শহরের পার্কে, ফুটপাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভিখারী জীবনে সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়। (দ্রষ্টব্য ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) এক গ্রাম্য অশিক্ষিত কৃষক সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সময়ের গতি প্রকৃতি জীবনের ওপর যে অনিবার্য বিপর্যয় টেনে আনতে পারে সে সম্পর্কে দুরদর্শিতার ক্ষমতা কুঞ্জ চরিত্রের পঞ্চম মাত্রা।

গ্রাম্য পটভূমিকায় কুঞ্জের ছোটখাটো একটা মর্যাদার আসন ছিল। পাড়াপড়শীরা সে আসনটা কেড়ে

নেয়নি। কুঞ্জও সে আসনের যথাযোগ্য মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আবার নিজের পরিবারস্থ সভ্যগণের প্রতি তার আন্তরিক স্নেহমমতা ভালবাসার ঘাটতি ছিল না। একের পর এক বিপর্যয় প্রধানকে উন্মাদগ্রস্ত করে তুলেছে, সংসারে জ্যেষ্ঠ সভ্য হওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে যথাযোগ্য কর্তব্যকর্মে অনেকক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, দুটি পুত্রকে হারিয়ে শোকের পৌনঃপুনিক বিলাপের শোককে গভীর হতে দেয়নি। কিন্তু কুঞ্জ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সংযত বিলাপে শোককে গভীরে নিয়ে গেছে। মতিভ্রান্ত হয়ে পুরো পরিবার—যারা তাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে, তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেনি। কেন না, পুত্রশোকটা তার কাছে তত বড় হয়ে ওঠেনি, যত বড় করে দেখেছে সে গোটা কৃষক সমাজের বিপর্যয়কে।

কিন্তু তবুও সকলকে ধরে রাখতে পারেনি সে। প্রথম হারিয়েছে নিরঞ্জনকে। সে দেশান্তরী হয়েছে, দারিদ্র ও ক্ষুধার তাড়নায় ঝালা-পালা হয়ে। পরে পুত্র মাখনকে অতর্কিত মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেছে। তারপর প্রাণের প্রিয় আমিনপুর, তারপর ভ্রাতৃবধু বিনোদিনী। কিন্তু তবুও অবিচলিতভাবে ভিখারী জীবনের হাত ধরে নিদারুণ দুঃসময়ের আঘাতকে সহ্য করবার শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে সে। বৃদ্ধ প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে টুকরো খানেক খাবার অন্বেষণ করেছে ডাস্টবিনের মলয়া ঘেঁটে। পশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে পশুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য :২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) কিন্তু তবু জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগেনি। দুর্দান্ত জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়নি। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে গভীর মমতায়। স্ত্রীর প্রতি তার সেই মমতা অজস্রধারে ঝড়ে পড়েছে। গভীর প্রেমে, 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর বাঁ হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর।' ফুটপাতের ওপর তৈরি করে ফেলে বড় প্রেমের এক বিরল অথচ সকরুণ মুহূর্ত।

এই স্নেহমমতা প্রেমপ্রীতি আর ভালবাসা কুঞ্জ চরিত্রের সবচেয়ে বড় সম্বল। ঝড়-ঝঞ্ঝা দৈব-দুর্বিপাকেও সে বিনষ্ট হতে দেয়নি এগুলিকে। রক্তাক্ত হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে; লাঞ্ছনা, অবমাননা আর নিপীড়নে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি, দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে যায়নি। আজন্ম কালের বাস্তুভিটা আমিনপুরের স্মৃতি একটুও মলিন হয়ে যায়নি। স্মৃতির টানে তাই সে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করে, 'হেঃ, কী যে আনন্দ হয় বউ আমার, সে আমি তোরে—চল্ বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না।' (৩/১) আমিনপুর-প্রীতিই তার প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে।

সর্বশেষে বলা যায় কুঞ্জ চরম আশাবাদী। বড় বড় দুর্ঘটনা তাকে নৈরাশ্যের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করেনি। সব হারিয়েছে বটে তবে হা হুতাশের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ার মানসিকতা পোষণ করেনি। বরং সর্বহারা হয়েও অন্তরের অন্তর্স্থলে জ্বালিয়ে রেখেছে আশার অনির্বাণ দীপশিখা। তাই, রাধিকা যখন বলে, 'গাঁয়ে ফিরে যাবে, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব?............সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—'(৩/১) কুঞ্জ তখন হতাশ রাধিকার সামনে হাজির করেছে একবুক আশা, 'আশা হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে।' কুঞ্জর এই আশা হতাশের প্রতি স্তোকবাক্য নয়। এক বাস্তব বোধসম্পন্ন দূরদর্শী মানুষের আত্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করে কুঞ্জ গ্রামে ফেরে এবং ফিরে পায় তার পুরো সংসার। তাই কুঞ্জ সম্পর্কে বলা যায়, সঠিক অর্থে যদিও কুঞ্জ ট্রাজিক চরিত্র নয়,

আর নবান্ন নাটকও ডোমেস্টিক নাটক নয়, তথাপি সে রাউণ্ড চরিত্রের অধিকারী মানতেই হবে।

'নবান্ন' নাটকে নিরঞ্জন চরিত্রটিও একটু গুরুত্ব দাবী করে। যদিও চরিত্রটির গতিপ্রকৃতি তেমন লক্ষণীয় নয়। সংসারের অভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে দুঃখ ভোগের দার্ঢ্য তার ছিলনা। দুঃখের আতিশয্যকে সহ্য করতে না পেরে সে পালিয়ে গিয়ে উপার্জনের স্বতন্ত্র রাস্তা ধরতে চেয়েছে এবং ধরেছে। কিন্তু পুরো গ্রামটার সঙ্গে তাদের সংসার তরণীটি তখন হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন স্বতন্ত্র জায়গায় ঝঞ্ঝার থেকে পিঠ ফিরিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সে। তথাপি দুটি কারণে চরিত্রটিকে অল্পাধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, সে গ্রামের চোরাচালানকারী হারু দত্ত এবং দুশ্চরিত্র কালোবাজারী কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেওয়ায় দুঃসাহস দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামে ফিরে গিয়ে ভাঙা সংসারকে গড়ে তুলেছে, যে সংসারের আওতায় কুঞ্জ রাধিকা ফিরে গিয়ে পুনরায় পল্লী জীবনের সুন্দর সুনিবিড় ছায়ায় আত্মস্থ এবং আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান সমাদ্দার ফিরে পেয়েছে তার বিপন্ন চৈতন্য। সে স্বস্ত অনুভব করেছে মারি মন্বন্তরের বিরুদ্ধে জোড় প্রতিরোধের সুদৃঢ় আশ্বাসে।

দয়াল চরিত্রটি পূর্বাপর পরম্পর্য সম্পন্ন ক্রমবিকাশমান চরিত্র নয়। তাৎক্ষনিক চমকসৃষ্টির এক বিশেষ প্রক্রিয়া প্রদর্শনের ইচ্ছার দ্বারা চালিত সে। গূঢ় কোন ব্যঞ্জনা কিংবা দুঃখ আর দুঃখ জয়ের কোনো বলিষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা সে পরিচালিত হয়নি। নাটকের ভূমিকালিপিতে তার যে পরিচয় জানা যায় তাতে সে প্রতিবেশী মাত্র। অভাবের সংসার ; জমির উপর নির্ভরশীল জীবন। সে আর তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান 'রাঙা'কে নিয়ে তার সংসার। বন্যা এসে তার স্ত্রী ও পুত্রকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভেঙে দেয় তার সাধের সংসার। কিন্তু তারপর গোটা গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষদের জীবনে আকাল নেমে আসে এবং আকালের দুর্দান্ত আক্রমণে ঝনঝাহত পতঙ্গের ন্যায় বিপর্যস্ত হচ্ছিল, তখন সে কোথায় ছিল তা জানা যায়নি। অথচ তাকে পুনরায় দেখা গেল এই নাটকের প্রত্যাবর্তন পর্বে। তখন সে অনেকটা উদ্দীপ্ত। গ্রাম্য মানুষদের দলপতির ভূমিকায় তখন সে দাঁড়িয়ে। কোথা থেকে এই উদ্দীপ্তির অপর্যাপ্ত শক্তি সে সঞ্চয় করল এবং গ্রাম্য জনতার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সে কেমন ভাবে অর্জন করল তার তেমন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এ নাটকে নেই। নাট্যকার শেষপর্বে তাকে দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়ে নিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ রচনা, শস্য উঠিয়ে ধর্মগোলায় তোলার পরিকল্পনা রচনা ও তাকে কার্যকর করা এবং নবান্ন উৎসবের রূপরেখা অঙ্কনের অগ্রবর্তী ব্যাক্তি হিসাবে প্রতিরোধের তেজঃদৃপ্ত বক্তব্য প্রকাশের পুরোধা হিসাবে তাকে দাঁড় করিয়ে নাট্যকার হঠাৎ তাকে গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছেন অনেকখানি। চরিত্রটা অতর্কিতভাবে অনেকখানি গুরুত্ব পাওয়ায় খাপছাড়া হয়ে গিয়েছে। বন্যার পর সে কোথায় কিভাবে ছিল জানা যায় না। সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছাড়ার পূর্বে তার ভূমিকা এতই গৌণ ছিল যে শেষ পর্যায়ে এসে তার ওইরকম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ছবি খুব খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে 'মোমেন্টাম'সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরিত্রটা যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে বলা যেতে পারে।

চোরাচালানকারী হারু দত্ত কালোবাজারী দুশ্চরিত্র কালীধন ধাড়া এই নাটকের দুটি খল চরিত্র। খল অর্থে দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্র। ইংরাজীতে যাকে বলে ভিলেন। এই নাটকে সমাদ্দার পরিবার এবং আমিনপুরের কৃষকেরা প্রগ্রেসিভ ফোর্স পজিটিভ শক্তি আর হারু দত্ত কালীধন ধাড়া নেগেটিভ ফোর্স দুষ্টচক্র। এরা মজুতদার,দালাল,

মানুষ, ও খাদ্যের বেআইনি ব্যবসাদার। ধূর্ত, মুনাফাখোর, পরশ্রমজীবী, সমাজের নোংরা লোক। নিজেদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য এরা পারে না এমন কাজ নেই। এরা দুজনেই আকাল কবলিত মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবৈধ কারবারে লিপ্ত থাকে। কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলবার দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার করে চলে।

হারু দত্ত গ্রাম থেকে ধান এবং চাল কম দামে কিনে নিয়ে কালীধনের গুদামে তুলে দিয়ে আসে। কালীধন তা মজুত করে সময় মত বেশি দামে লোক বুঝে বিক্রি করে। সেই সঙ্গে হারু দত্ত গরিব গৃহস্থ ঘরের যুবতী মেয়েও ক্রয় করে কম দামে ও বেশি পয়সায় সরবরাহ করে কালীধনের সেবাশ্রম নামক নারী ব্যবসার এক অবৈধ কেন্দ্রে। তাছাড়া হারু দত্ত অভাবের সুযোগে জোতজমিও কিনে নেয় কম পয়সার বিনিময়ে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবারকে পথে বসায় এই হারু দত্ত। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সংগ্রাম করতে করতে এই পরিবারটা যখন মুমূর্ষু, তখন সেখানে নেকড়ের থাবা বসায় সে। কুঞ্জর একটি সংলাপে এই চরিত্রটার কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে যায়, 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে।' প্রয়োজনে এই হারু দত্ত, গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষকে ভগবানের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়, 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দেখাবে বলে, তা জানি।' কিন্তু সে সবে যখন কাজ হয় না, তখন সে স্বরূপ ধারণ করে,'উঁ, সোজা শিরদাঁড়াটা তা হলে এইবার তো দেখি এট্টুখানি বেঁকিয়ে দিতে হয়; বেটা ছোটলোকের এত বড়ো আস্পর্দ্ধা!' নিজের লোকজনদের ডেকে হুকুম দেয়, ' দে তো রে আচ্ছা করেঘা দু-চার —' (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) আবার মেয়ে কেনবার সময়ে কৌশলপূর্ণ চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরে মেয়ের বাপকে। মেয়ে সংগ্রহের জন্য সে খুকির মায়ের মত মেয়ে দালাল ছড়িয়ে দেয়। তারা ফাঁকফোঁকর বুঝে তুলে আনে মেয়ের বাপকে। হারু দত্ত মারপ্যাঁচে ঘায়েল করে ফেলে তাকে । 'কিছু না, কিছু না। আমি দেখবো তোমার আপদে , তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেন! —কী বল চন্দর?' প্রথম শিকারকে সে চারিদিক থেকে ঘিরে ফ্যালে, তারপর তার ঘাড়ে কামড় বসায়, 'দু- চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তো!' তারপর হর হর করে বিষ ঢেলে দেয়, 'তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। ...... তারাই তো চালাচ্ছে এই জগৎটা। এবম্বিধ প্রকারে কাজট হাসিল করে নেয়, 'ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো ।' মেয়ে বিক্রির কোবালায় টিপসইটা দিইয়ে নেয় আটঘাট বাধবার জন্যে, 'মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোন মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নেই— কথা এই বললে ফুরিয়ে গেল ! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে।..... চেপে দ্যাও আঙ্গুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঁ।'

(২য় অঙ্ক,৪র্থ দৃশ্য)

হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত এবং জালিয়াত। নাট্যকার অতিযত্নে চরিত্রটা গড়ে তুলেছেন। নিপুনভাবে তার মুখে সংলাপ বসিয়েছেন এবং অঙ্গাভিনয়ের যথেষ্ঠ সুযোগও রেখেছেন। ফলে চরিত্রটা হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কিন্তু সেই তুলনায় কালীধন ধাড়া অতটা ফুটে উঠতে পারেনি। সাধারণত মজুতদাররা একটু মোটাবুদ্ধির হয় , বুদ্ধির চেয়ে টাকার জোরটাই তাদের বেশি। কালীধন প্রচুর টাকার মালিক। বিরাট কারবার তার। প্রচুর

চাল গুদামজাত করে রেখেছে সে। বলা বাহুল্য দেশের আপৎকালীন অবস্থায় 'ভারতরক্ষা আইন' বলে মন্বন্তরের বাজারে এই মজুতদারী একেবারে বে-আইনি, দণ্ডনীয় অপরাধের সামিল। এহেন গুদাম সংরক্ষণের এবং দেখাশোনার ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, কিন্তু কালীধন সেই সতর্কতা অবলম্বন করেনি। দ্বিতীয়ত নারী ব্যবসার কেন্দ্র সেবাশ্রমটির দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কালীধন সে প্রয়োজন বোধ করেনি। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু দুরদর্শিতার ছিল একান্ত অভাব। তার ধারণা ছিল তার নৌকার পালে যে সুসময়ের হাওয়া লেগে নৌকাটি তরতর করে সমৃদ্ধির উজানে ছুটে চলেছে এর কখনো কোনদিন ব্যত্যয় ঘটবে না এতোখানি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সে নিরঞ্জন বিনোদিণীর জালে জড়িয়ে পড়ল এবং একেবারে ভরা ডুবি হয়ে গেল। তৃতীয়ত, হারু দত্তের সঙ্গে বুদ্ধির কসরতে সে এঁটে উঠতে পারে নি। হারু দত্তের দশ ঘাটে জল খাওয়া ঘোড়েল লোক। বুদ্ধি তার পাকা, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী এবং তীক্ষ্ণ ও দ্রুতগামী। তার সঙ্গে বুদ্ধির কসরৎ করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছে কালীধন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য হারু দত্ত অনেক কথা খরচ করে, কিন্তু সেই কথাগুলোকে সে কথার কথা বলে ধরে নেয়। কালীধন কিন্তু চালাকচতুর নয়, কথার চাতুর্য তার তেমন নেই, কথাও তেমন বুদ্ধিদৃপ্ত নয়। নাট্যকার গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে এই দুটি চরিত্র গড়ে তুলেছেন।

নাট্যকারের চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য আর একটি চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজে ধরা পড়ে। চরিত্রটা খুব ছোট, স্বল্প পরিসরে আবর্তিত হয়ে টাইপ চরিত্রের 'ফরমুলাকে পালন করবার চেষ্টা করেছে। চরিত্রটার নাম রাজীব। রাজীব পূর্ববঙ্গবাসী। নাটকের প্রেক্ষাপট ও চরিত্র পরিকল্পনার আদর্শ ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলে সে। কয়েকটি তুলির টানে এই ছোট চরিত্রটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রটা প্রথম সংলাপ উচ্চারণ করে হাই তুলে তিনতুড়ি বাজিয়ে, 'রাধে গোবিন্দ বল মন।' অথচ এই গোবিন্দের জীবটি মানুষের ক্ষুধায় তীব্র ব্যঙ্গ করে, 'চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব। দুর্ভিক্ষের বাজারে মানুষ যে মানুষ নেই, অন্নের হাহাকারে পাগল হয়ে গেছে সবাই, কালীধনের গদিতে সরকারের চাকরি করতে করতে তা তার জানা হয়ে গেছে। কালীধন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ছাড়া ক্ষুধার্ত জনগণ মানুষ কিনা সে সম্পর্কে তীব্র সংশয় প্রকাশ করে সে, 'আরে কালীধন, এগুলো কী মানুষ।' তাই ক্ষুধার চাল না পেয়ে তারা যখন ক্ষিপ্ত স্বরে কথা হলে তখন সে কালীধনের হয়ে প্রবল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে, 'দে দ্যাখ —আবার চোখ ভ্যাটকায়! দেদে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি।' (২/১) ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তার শেষ সিন্ধান্ত, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব, মরার আইস্যা পরছে শহরে— কিংবা বিনোদিনীর সঙ্গে সেবাশ্রমে নিরঞ্জনকে কথা বলতে দেখে সবিস্ময়ে বলে , 'রাখহরি! সুট সুট কইর‍্যা ঘরে ঢুইকা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ.....চুপ কইরা আছস অহন, কথা সে কস্ না বড়!.....ভাবস বুইড়্যা কিছু ঠাহর পায় না, না বেটা প্রেমালাপ করনের আর জায়গা পাইলা না! (১/৫) তার ধারণা এবং বিশ্বাস প্রেম ভালবাসা কালীধনের ব্যক্তিগত এক্তিয়ার , এসবে আর কারো অধিকার নেই। তাই সে নিরঞ্জনকে শাসায়, 'সিংহর মুখে খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিছিস তাইতে! বাবু তোরে আজ কী করে দেহিসনে.... বেটা ছুটলোক আস্পর্ধা পাইলে কী আর রক্ষা আছে না!' আবার বিনোদিনী যখন ঘরের বাইরে যেতে চায় তখন তাকে গিয়ে বাধা দেয়, 'আরে এইডা কী কর ! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দরমহলে । বাইরে যাবা

ক্যান। যাও ভীতরে যাও।— কী আশ্চর্য!' (২/৫)

রাজীব বৃদ্ধ কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি সে। অত্যন্ত করিৎকর্মা। কর্তার বিক্রম প্রকাশ করতে পঞ্চমুখ সে । নিজের প্রভূত্ব খাটাতে সে খুব তৎপর। কালীধনের সেবাশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ড তার জানা। এখানে যে সমস্ত স্ত্রী লোকেরা তাদের প্রতি অন্য কারো দৃষ্টি পড়াটা সে যেমন বরদাস্ত করতে পারে না, ঠিক সেই রকম এখান থেকে কোনো স্ত্রীলোক বেরিয়ে যেতে চাইলে সে সতর্ক প্রহরীর মতো বাধা দেয়। চরিত্রটির মধ্যে খুব গভীরভাব এবং ভাবনার চিহ্ন পাওয়া যায়না। হালকা —উপরিস্তরে ভাসন্ত এই চরিত্রটা নাট্যকার অতি যত্ন সহকারে গড়ে তুলেছেন। কথাবার্তা, হালচাল, আদবকায়দার মধ্যেবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে চরিত্রটিকে খুব উপভোগ করে তুলেছেন বলতে হবে।

উপরোক্ত চরিত্রগুলো ছাড়াও 'নবান্ন' নাটকে স্ত্রী চরিত্র আছে কয়েকটি। যেমন, পঞ্চাননী, রাধিকা এবং বিনোদিনী ইত্যাদি।

পঞ্চাননী প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী। আমিনপুরের বৃদ্ধ মহিলা। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমিনপুর তথা মেদিনীপুরের একটা বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল। গান্ধী বুড়ি মাতাঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সম্ভবত এই ঐতিহ্যের পথ ধরে পঞ্চাননী চরিত্রটি নবান্ন নাটকে এসেছে। প্রধান সমাদ্দারের উপযুক্ত স্ত্রী সে। আগষ্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার মানসিকতা ঘিরে শাসক শ্রেণীর অত্যাচারে ভয়ে ভীতু আমিনপুরের মেয়েরা লজ্জা শরম খুইয়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য। এর চাইতে অপমানের কিছু আছে? পঞ্চাননীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়— বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়ে মানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? (১/১)......সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়ে মানুযের ইজ্জৎ! !' (১/১০)— উত্তরে কুঞ্জর কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক বক্তব্য না শুনতে পেয়ে পঞ্চাননী স্বয়ং একটা জনতাকে নেতৃত্ব দেয়। তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। পুলিশের মার খেয়ে পলায়নপর জনতাকে মারমুখি করে তুলে বিশেষ সাহস ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু জীবনী শক্তি তখন তার খুব কম অংশই অবশিষ্ট ছিল, তাই বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। নাটকীয় চরিত্র হিসেবে নাট্যকারের এটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি বলতে হবে।

বিনোদিণী সুসংগত, সংযত এক গ্রাম্য বধূর সু-অঙ্কিত চরিত্র। সমাদ্দার পরিবারের কনিষ্ঠ বধূ লজ্জাশীলা ধী-শক্তি সম্পন্না। স্বামী নিরঞ্জন তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও সে এই পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃখবেদানার সমান অংশীদার হয়ে এই পরিবারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থেকেছে। তাঁর একটাই বেদনা—স্বামী নিরঞ্জন সংসারের সংকটে সকলেই যখন ঝালাপালা তখন বিনোদিনীর পাশে থেকে,দুঃখ বরণের সহমর্মী হয়ে, মানসিক স্বস্তি ও আশ্বাসের স্থল হওয়ার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা না নিয়ে দেশান্তরে চলে গেছে। শত মান অভিমান অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি। তাঁর নারীসত্তার এ অবমাননা বড় বেদনাদায়ক। অতঃপর পরিবারের সকলের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে অতর্কিতভাবে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক টাউট তাকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এনে তুলে দেয় কালীধনের সেবাশ্রমে। এখানে ঘটনা চক্রে সে মিলিত হয় স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে। নিরঞ্জন রাখহরি নামে সেখানে কালীধনের কর্মচারী। নিরঞ্জনকে বিনোদিনী সেবাশ্রমের সমস্ত বিবরণ দেয় এবং কৌশলে কালীধন ধাড়া ও তার সরকার রাজীব সমস্ত বামাল

সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারপর বিনোদিনী নিরঞ্জনকে নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এবং ভেঙে পড়া ঘর ও অগোছালো সংসারকে সে পুনরায় গড়ে তোলে। বিনোদিনী একটি সুঅঙ্কিত গ্রাম্যবধূর চরিত্র।

রাধিকা নবান্ন নাটকের সবচেয়ে বড় স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী এবং সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। এই চরিত্রটির তিনটি অংশ। পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ হিসাবে সে খুব দায়িত্বশীলা; সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলবার মনোবাসনা তার অকৃত্রিম। অভাবের সংসারে ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদে যেমন জড়িয়ে পড়ে, তেমনই দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহে ভরপুর। দ্বিতীয় অংশ শহরের ফুটপাতবাসিনী। এই অংশে ক্ষুধার সঙ্গে তীব্র সংগ্রামরত সে । কিন্তু ক্ষুধার লেলিহান শিখা তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বামী ভক্তি ও স্বামীপ্রেমকে খাক করে দিতে পারেনি। বরং তা আরো গাঢ় হয়ে উঠতে দেখা গেছে। কুঞ্জর হাতে কুকুরে কামড়াবার দৃশ্যটি এই বক্তব্যকে সমর্থন করবে। কুকুরে কামড়াবার অব্যবহিত পরে রাধিকার অন্তরের অভিব্যক্তি ধাপে ধাপে গভীর থেকে গভীরতম স্তরে পৌঁছেছে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ‘একেবারে কামড়ে খেলে গো’র অনিবার্য সাধারণ গ্রাম্য নারীসুলভ প্রকাশ—‘ভারি পাজি কুকুর তো। .....দূর হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো।’বক্তব্য বিষয় অনেকটাই অমার্জিত Crude । এটি যখন অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করে, তখন ‘ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো।’ ঘর বার যখন একাকার ,তখন তার এ উপলব্ধি অন্তরে যে অসহায়তা তারই প্রকাশ উপরোক্ত অংশে। বোধ করি স্বামী কুঞ্জর যন্ত্রনাকাতর মুখ লক্ষ্য করে, তারচৈতন্যের গভীরে যে উপলব্ধি তা থেকেই বেরিয়ে আসে, ‘খুব যন্তনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?— এ যেন নতুন করে স্বামী প্রেমকে ফিরে পাওয়া, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার। তারপর ফিরে এসেছে স্বামীর হাত ধরে নিজেদের গ্রামে। তৃতীয় অংশ গ্রামপ্রীতি। গ্রামে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার অন্তরে একটা ইচ্ছা সুপ্ত ছিল। তাই কুঞ্জ যখন প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করে, রাধিকা তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করে। সেই মুহূর্তে তার অন্তরে শাশ্বত মাতৃত্বের জাগরণ ঘটে। মৃত পুত্র মাখনের জন্য তার সমস্ত অন্তর হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে সে সমস্ত কিছু ভুলে নতুন করে গড়বার আনন্দে আবার মেতে ওঠে। এই অংশের রাধিকাকে আমরা আবার প্রথম অংশের রূপে দেখে মুগ্ধ হই। রাধিকা ‘নবান্ন’ নাটকের একটি অনবদ্য নারী চরিত্র। নাট্যকার এই চরিত্রটি গভীর নিষ্ঠা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে গড়ে তুলেছেন।

৪৮.১২ ‘নবান্ন’ নাটকের সংলাপ ও গান

নাটক সংলাপ নির্ভর। সংলাপের ওপরেই নাটকের নাটকীয়তা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা, নাটকীয় বৃত্ত গঠন, চরিত্রের বিকাশ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি নির্ভর করে। সাহিত্যে অন্যান্য প্রকরণগুলিতে রচয়িতার এক নিজস্ব কলম থাকে, যে কলমে তিনি কিছু বর্ণনা, কিছু বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কাহিনী, চরিত্র, প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা, স্থান ও কালের অনেকখানি পরিচয় দিয়ে থাকেন। নাটকে কিন্তু নাট্যকারের সে সুযোগ নেই। নাট্যকার এ সমস্ত কিছুই সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। নিজে করতে গেলেও নিজেকে প্রথম চরিত্র করে তুলতে হবে,

তারপর অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে যুক্তিগ্রাহ্য পথে সংলাপ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এ কাজগুলি করে থাকেন।

সুতরাং নাটকের ,সংলাপ যেমন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই এর রচনা পদ্ধতির প্রতি রচয়িতার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়? সচেতন মনের সযত্ন প্রয়াসেও অতিরিক্ত সাবধানতা গ্রহন করতে হয়। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরগ্রাম্যভিত্তিক সংলাপ রচনা করতে না পারলে নাটক প্রার্থিত ফলদানে সক্ষম হয়না। মনের বিভিন্ন-ভাব- অনুভাব বিভাব, সঞ্চারী ভাবকে বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত স্বর সহযোগে নিক্ষেপ করতে হয়, তাহলেই নাটক থেকে উপচিত হবে যথেষ্ঠ উপভোগ্য নাট্যরস। এই সংলাপের মধ্যেই নিহিত থাকে বাচিত অভিনয়ের বহুবিধ উপকরণ, আবার এই সংলাপের মধ্যেই অনুল্লেখিতভাবে জড়িত থাকে অঙ্গাভিনয়ের নানা নির্দেশ। যেমন, ‘চলে যাও’ বললে একরকমের অঙ্গাভিনয় হবে, আবার যাও, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও’ বললে অঙ্গাভিনয়ের ধরনটা যাবে বদলে,আবার, ‘যাও, যাও চলে যাও’ বললে তার অঙ্গাভিনয়টা হবে অন্যরকম।

এই যে নাটকে দ্বিবিধ অভিনয় তা সংলাপের ওপরেই নির্ভরশীল। তাই যে নাট্যকার যত বেশি ভাল সংলাপ রচনা করতে পারেন, সেই নাট্যকারের নাটক রসিক মহলে তত বেশি সমাদৃত হবে। সেই নাট্যকার কালের দেওয়ালে হাত রাখতে পারবেন। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে , হালকা সংলাপের নাটকে সুদক্ষ অভিনেতাও, সুনাম অর্জন করতে পারেননি, কিন্তু ভাল সংলাপ সংযুক্ত নাটকে তৃতীয় স্তরের অভিনেতাও অতি সহজে দারুন অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সংলাপই নাটকের প্রাণ। তাকে আশ্রয় করেই নাটকের চরিত্রেরা চলাফেরা করে, তারা পরিস্ফুট হয়, বিকশিত হয়। তাই সংলাপ হওয়া উচিত স্বাভাবিক কথা ভাবানুগ, চরিত্রানুগ ও সংক্ষিপ্ত। এই ধরনের সংলাপ রচনার সূত্রপাত করেন মধুসূদন। তিনি একটি চিঠিতে কেশবচন্দ্রকে লিখেছিলেন, I shall endeavour to creat characters who speak as nature suggests and not mouth mere poetry. — অর্থাৎ চরিত্র স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে, কাব্যাংশ আওড়াবে না। তার পরিচয় পাওয়া গেল মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে— ‘বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ’ আর ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং ‘কৃষ্মকুমারী’ নাটকে। কৃষ্ন কুমারিতে এসেছে কথ্যরীতি। সংলাপ উচ্চারণের কাল হয়েছে দ্রুত, দ্বন্দ্বমথিত তীব্রতায় সংলাপ চরিত্রকে ব্যক্ত করেছে। সংলাপগুলির ভাষায় চরিত্রগুলির ব্যক্তি পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। মধুসূদনের প্রহসন দুটির সংলাপ ত্রুটিমুক্ত, প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষতা ঘটনাগত ও অনুভূতিগত। সংলাপ, সংস্কৃত নাটকের সংলাপরীতি অনুযায়ী বিবরণধর্মী না হয়ে বক্তব্যের বাহন হয়েছে। বগতোক্তি প্রায় বর্জিত, যা আছে তা সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ। সর্বোপরি সংলাপ হয়ে উঠেছে চরিত্রের দর্পণ। ‘একেই কি বলে সভ্যাতা’র থেকে একটি উদাহরণ তুললে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত হবে। নায়ক নবকুমারের ইয়ার কালী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, ‘কি পরিচয় দেব বলো দেখি ভাই? তোমাদের কর্তাকে কি বলব যে আমি বিএরের —মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ— সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না, শ্বশুর নয় —শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—’

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের সংলাপ প্রতীক আর রূপকধর্মী। কাব্যরসাশ্রিত প্রতীকধর্মী সংলাপ রচনার

যাদুকর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এক অসম্ভব রকমের নিজস্বতার স্বাতন্ত্র্যে তিনি উদ্ভাসিত। তাঁর সংলাপ অনেক সময় তরঙ্গায়িত বলে মনে হতে পারে। সহজ সরল শব্দগুলিকে তিনি এমনভাবে সাজান যে তার থেকে কাব্য ঝরে পড়ে। লোক প্রচলিত বাজার চলতি শব্দের ব্যবহার না থাকবার দরুন একটা মার্জিতরূপ গড়ে ওঠে। কবির মনোলোকের গভীর তলদেশ থেকে উৎসারিত হয় শব্দতরঙ্গ, সংলাপের মধ্যে আনে এক বোধসম্পন্ন অনুভববেদ্য আবেশ। শ্রীশম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের সংলাপ সম্পর্কে বলেছেন, জীবন প্রতিম বলে চিনতে পারার মতো সমস্ত বিশিষ্টতা আরোপ করেও সাধারণ প্রতীকী চেহারাটা তিনি অক্ষুন্ন রাখতে পারতেন।' প্রসঙ্গক্রমে 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অথবা 'কালের যাত্রা' প্রভৃতির সংলাপের কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের প্রসঙ্গে একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে, তিনি নাটকের সংলাপ লিখতেন কবির কলমে।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকমের বিবর্তন ঘটে গেছে। সংলাপের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে গেছে আমূল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ থেকে এই সংলাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দর্শক এবং চরিত্রের তফাৎটা ভেঙে ফেলে পারস্পররিক সাযুজ্য সন্ধানে নতুন রীতি ও কৌশল অবলম্বিত হয়েছে বাংলা নাটকের সংলাপ রচনায়। আমরা পার হয়ে এসেছি—

'গর্ব, মান, বীর-অহঙ্কার—
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,
নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে।' (গিরিশচন্দ্র)

কিংবা, 'তুমি দেখতে পাচ্ছো না দুর্যোধন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ঐ আগুনের শিখা লক লক করে আকাশ ছেয়ে ফেলল, ঐ আর্তনাদ, ঐ হাহাকার—হাঃ হাঃ হাঃ— (অপরেশচন্দ্র)

কিংবা, '—ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তার চারদিকে ধূ ধূ করে জ্বলে উঠেছে। কাল আবার ঐ সূর্য্য উঠবে। উঠুক! একদিন আসবে, সেদিন ঐ সূর্য্য আর উঠরে না। ঐ জ্যোতি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হবে যাবে। তার পাংশুরক্তবর্ণ ধূম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের ওপর এসে পড়বে। তারপর তাও পড়বে না। কৃষ্ম সূর্য্য অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই? — কে?' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

অথবা, 'সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন ভাবে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালোচুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছা করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত। (রবীন্দ্রনাথ)

এ সমস্ত সংলাপ অতিক্রম করে চল্লিশের দশক লিখছে, 'হেঃ, এ রক্তের আবার দাম! এ রক্তের জন্যে আবার মায়া! জন্তু জানোয়ারের মতো বনে জঙ্গালে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা — ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ, তুই আমারে ছেড়ে দে।— আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। অন্তর কার জলেনি, আমার না?

প্রধান। (ক্ষুব্ধ স্বরে) জ্বলেছে তো এগুলি নি কেন যখন বল্লাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অন্তর যদি —আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ। শ্রীপতি-ভুপতি ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠা! তবে তুমি শুধু বারবার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শান্তি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরি, এই তফাৎ।—

এই সংলাপ যেন প্রত্যক্ষ জীবনের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে উঠে এসে রূপ নিয়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্তে। অদ্ভুত রকমের জীবন্ত, বাস্তব, স্বাভাবিক। বাস্তবধর্মী জীবনের উষ্ণতায় ভরা অথচ মেদবর্জিত, বহুবর্ণ অননুরঞ্জিত পেলবতাহীন, অপ্রলম্বিত মৃত্তিকাশ্রয়ী মৃত্তিকাগন্ধী সংলাপ। সর্বনাশা সঙ্কটের বিরুদ্ধে প্রতিকারহীন প্রতিরোধস্পর্ধী আত্মার উত্তপ্ত গ্লানির কেন্দ্রস্থল থেকে উঠে এসেছে,— 'ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু; (হঠাৎ উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জর) ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবার, (মরিয়াভাবে) কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে (ধস্তাধস্তি)—'

কুঞ্জ। জেঠা, জেঠা, কী হচ্ছে, কী কর? জেঠা! জেঠা!! (কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান)

প্রধান। (হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে) য়্যাঃ!

কুঞ্জ। জেঠা!

প্রধান। আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর জ্বলে গেছে।

চল্লিশের দশকে 'নবান্ন' ছড়িয়ে দিচ্ছে জীবনের ঊষর ক্ষেত্রের ওপর দণ্ডায়মান কতগুলো মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহায় মুমুক্ষু আত্মার মর্মবাণী, 'আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোস নি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।'

এ সংলাপ যেন নাট্যকারের নয়, এ সংলাপ চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট চরিত্র নয়, সময়ের ঝঞ্ঝাবর্তে ব্যতিব্যস্ত কৃষিভূমিতে দণ্ডায়মান অকালগ্রস্ত, অথচ ভাগ্যবাদী চরিত্রও নয়, বরং বাস্তববোধের দ্বার বিদীর্ণ কতকগুলি জীবন্ত মানুষ। 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' সংলাপ তাই উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তঃস্থল ঠেকে 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে। এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' অত্যাচারী লুণ্ঠনস্পৃহ দানবের বিরুদ্ধে চাষাড়ে রক্ত টগবগে হুংকার ছোড়ে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—

সংলাপের শব্দগুলো লক্ষ্য করবার মতো এসব শব্দের জন্মভূমি নাট্যকারের মনোজগৎ নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্নার মধ্যে, মাঠ ঘাট পথ প্রান্তরের মধ্যে এর অস্তিত্ব। তাদের আনন্দ-উৎসব, পালপার্বণ, সুখদুঃখ, যন্ত্রণা হাহাকার, রাগদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা, ক্রোধ এবং ক্রোধোন্মত্ত অন্তরের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে রচনায় এসেছে শব্দের মণিমাণিক্য।

গ্রামের চাষী মজুরের ভাষা ও শহর কোলকাতার আটপৌরে ভাষার অস্তিত্বও দেখা যাবে 'নবান্ন' নাটকে। আবার পূর্ববাংলার উপভাষা এই নাটকে এসে গেছে রাজীবের মুখে। এ ছাড়া আরবী, ফার্সি শব্দ এসে গেছে।

মোটের ওপর এই চার রকমের ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ।

'নবান্ন' নাটকের গঠনগত একটা বিশেষত্ব— প্রায় প্রতিটা দৃশ্যে একটা করে চরম মুহূর্ত গড়ে তোলা হয়েছে দৃশ্যান্তে। সেই চরমমুহূর্ত গড়ে উঠেছে সংলাপের অদ্ভুত ঠাস বুননে—

(উন্মত্ত অবস্থায় নেপথ্য থেকে দয়াল 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দেয়)

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ........কুঞ্জ! ....কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ,কুঞ্জ, কুঞ্জ!

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তোলে আটপৌরে ঘর-কন্নার ভাষাকে দিয়ে কি অদ্ভুত ভবে ক্লাইমেক্স গড়ে তুলেছেন নাট্যকার। বন্যায় দয়ালের ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র গোটা সংসারটা ভেসে গেছে। সেই যন্ত্রণার হাহাকার বেরিয়ে এসেছে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে কুঞ্জ কুঞ্জ ডাকের মধ্যে। দর্শক অতর্কিতে ওই আর্তনাদে চমকে চমকে ওঠে। নাট্যকার প্রধান শব্দটা ব্যবহার করলেন না, কেন না, কুঞ্জ শব্দটার ভেতর অভিনেতা, আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরের ঢেউটা খেলাতে পারবেন, যে ঢেউ দর্শক মনে উত্তাপ তরঙ্গ তুলবে। আর একটি শব্দ 'সমুদ্দুর'। সমুদ্র বললে স্বরক্ষেপের কালসীমা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, 'সমুদ্দুর তারও চেয়ে অনেক বেশি হয়। অভিনেতা কণ্ঠস্বরকে অনেকখানি দর্শকমনে গভীর ছাপ ফেলবার সুযোগটা পেয়ে যান।

হারু দত্তের সরীসৃপ মন লালাসিক্ত রসনায় উচ্চারণ করে অদ্ভুত সংলাপ, 'হেঃ, হেঃ ছেলেমানুষ কিনা! ' প্রস্থানরতা বিনোদিনীর দেহের প্রতি লোলুপতা প্রকাশের পক্ষে ওইটুকু সংলাপই যথেষ্ট। কিংবা কুঞ্জকে যখন হারু দত্তের লোকজন লাঠিপেটা করছে প্রধানের সংলাপ তখন তৈরি করছে অদ্ভুত 'সিকোয়েন্স', 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' —সংলাপের ওপর অভিনয়, দর্শক মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যাওয়ার মতো। আবার তিনটি শব্দের বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে প্রেক্ষাগৃহ উত্তাল আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাখনের মৃত্যুদৃশ্যে কুঞ্জের আর্তনাদ, 'য়্যাঁঃ মাখন, মাখন—' লক্ষ্য করবার মতো শব্দগুলো মোটেই আবেগময় নয়। আবেগ উচ্ছ্বাস বর্জিত। এই ধরনের সংলাপ রচনা করে নাট্যকার তাঁর নবান্ন নাটকের বিশেষত্ব মন্ডিত করেছেন।

রাজীব পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় অদ্ভুত অমানবিক ধরনের সংলাপ উচ্চারণ করে, যাতে তার প্রতি দর্শকের ঘৃণা এবং ক্রোধ যুগপৎ বেরিয়ে আসে। 'দে দ্যাখ— আবার চোখ ভ্যাটকায়! দেচে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি। দে চে রাখহরি—' বা প্রধানের উন্মত্ততা প্রকাশের জন্যে নাট্য সংলাপ অদ্ভুত শব্দ সহযোগে গড়ে তোলেন, 'ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেল; একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখন্দ পেরিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—' আবার আবেগময় রূপকধর্মী সংলাপ রচনায় নাট্যকার সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করেন নিপুণ হাতে,—'তাই ভালো। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।'

শহুরে ভদ্র সম্প্রদায়ের ব্যক্তি নির্মলবাবু। স্বশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের অর্থগৃধ্নুতা এবং দুর্ভিক্ষের বাজারে অন্ধকার পথে কামানো অর্থে ঐশ্বর্যের দম্ভ প্রকাশের বিপক্ষে বিরুদ্ধ মানসিকতা পোষণ করে অর্থহীন মানুষদের পক্ষে সওয়াল করেন শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত সহজ সরল সংলাপে, সে পয়সা যাদের আছে তার বলতে পারে এ কথা! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার সেটা নেই কি-না?' এই দৃশ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি দুর্ভিক্ষের হাহাকার প্রকাশের উপযুক্ত সংলাপ। নাট্যকার এই শব্দ দুটির অভিনয় করিয়েছেন 'অফ ভয়েসে'। নেপথ্য থেকে মাইক্রোফোনে।

দেশী শব্দের সঙ্গে আরবি ফার্সি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নাট্যকার নাট্যসংলাপে বৈচিত্র্য এনে সংলাপকে শ্রুতিমধুর করে তুলেছেন যেমন, তেমনি ব্যক্তি পরিচয়ের বাহন হয়ে উঠেছে এ সংলাপ। '............আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়ে! সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এডারেই! এট্টু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এর! হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এর!

'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণনাটকের আসল সংলাপ। গণনাটকে গণচেতনা বৃদ্ধির একটা সচেষ্ট প্রয়াস থাকে। সেই চেষ্টাকে সফল করে তোলবার জন্য নাট্যকারকে সচেতন হতে হয়। নাটককে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া সেই সচেতনতার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষের কাছে নাটককে নিয়ে যেতে গেলে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তুলতে গেলে সংলাপকে সর্বজনবোধ্য করে তুলতে গেলে সহজ সরল শব্দ, অতি প্রচলিত সাধারণ শব্দ দিয়ে সংলাপের দেহ গঠন করতে হয়। সেদিক থেকে 'নবান্ন' নাটক যথেষ্ট সফল বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের গান :

শিল্পকলা হিসেবে নাটকের উদ্ভবের সঙ্গে গানের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কোনো দেশেই পূর্ণাঙ্গ নাটক স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেনি। তার সূচনা কোনো ধর্মীয় বা লোকোৎসবের মধ্য দিয়ে হয়েছে। এই সমস্ত উৎসবকালে গান-নির্ভর আবৃত্তির মধ্যে নাটক ও অভিনয়-কলার জন্মসূত্র জড়িত। গ্রামীণ সৌরোৎসব থেকে যেমন যাত্রার উদ্ভব ধরা হয়, তেমনি এদেশে প্রাচীন নাটগীত, আধুনিক নাট্যকলার অঙ্কুর বলে মনে করা হয়।

প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন প্রধানত যাত্রা প্রভাবিত ছিল। এই যাত্রাভিনয় ধর্মীয় বা লোকোৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। জনসাধারণের রসপিপাসু মন এর মধ্যেই পরিতৃপ্তি লাভ করত। এই ধরনের রচনায় ধর্মভাব ও সঙ্গীত বাহুল্য ছিল। এ দুটির উপস্থিতিতে নাটকীয় দ্বন্দ্বের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া যাত্রা লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে, মুক্তমঞ্চে, দৃশ্যপট ছাড়াই অভিনীত হত।

ঊনিশ শতকে বাংলা নাটক ইউরোপীয় আদর্শে গড়ে উঠলেও, বাঙালি জীবনে যাত্রার সংস্কার, সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। বিশেষত মঞ্চমুখী নাট্যকারেরা যাদের প্লে-রাইট বলে চিহ্নিত করা যায় তারা জনচিত্তজয়ের জন্য, তাদের রুচির রীতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল হতেন। গান এ ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অঙ্গ গণ্য হয়। গানের একটা তীব্র আকর্ষণ আছে, মনোরঞ্জক ভূমিকা আছে। ঊনিশ শতকের মঞ্চপ্রাণ নাট্যকারেরা অনেকেই গানের বহুল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নাট্যবোধ যেখানে প্রেরণা, জীবনের গানের ব্যবহার নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাটকীয় চরিত্র ঘটনা ও পরিবেশ বর্ণনা, সংলাপ ও অভিনয়কে অর্থবহ করবার জন্য বা ভারাক্রান্ত দর্শকমনকে আনন্দ বিরতি (Dramatic Relief). নীতি উপদেশ প্রভৃতি দেবার জন্যও গানের ব্যবহার হয়ে থাকে।

কিন্তু 'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকা নিয়ে এমন একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি মুখ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাপানী আক্রমণ, ৪২-এর আন্দোলনে উত্তাল এ দেশ, মারী-মন্বন্তর ও জলোচ্ছ্বাস, সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বভাবত নাট্যকারের শিল্পবোধ ও সংযম গানের বাহুল্যকে পরিহার করতে সচেষ্ট হয়েছে। নাটকটি সমস্যাকণ্টকাকীর্ণ বৃহত্তর জনসমাজ ও দেশের নানা ঘটনার সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলায় এতই নিবেদিত যে, প্রথম তিনটি অঙ্কের বারটি দৃশ্যে সঙ্গীতের ব্যবহারের সুযোগই ছিলনা। যুদ্ধের জন্য গ্রামীন অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের জন্য সমাদ্দার পরিবার গ্রাম জীবন থেকে মন্বন্তর কবলিত শহরে আশ্রয় নিয়ে তার সঙ্কট ও আবর্তে বিব্রত ও হৃতসর্বস্ব হয়ে পরিশেষে ঘরে ফিরেছে। এর পরই একটু স্থিত হবার অবকাশ। বিজন ভট্টাচার্য কতকটা সমাদ্দারদের এই মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে ব্যঞ্জনাময় করবার জন্য এবং বোধকরি কতকটা দর্শক চিত্র রঞ্জনের জন্য, চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যেই গান সংযোজন করেছেন।

প্রথম দৃশ্যে নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা' দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক ফকিরের গান 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এবং তৃতীয় দৃশ্যে কৃষক রমণীদের গান 'নিস্‌লো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাসলি।'

সুধী প্রধান লিখেছেন, মুদ্রিত সংস্করণের ১৫ টি দৃশ্যের পরিবর্তে মোট ১৪ দৃশ্যে নাটক অভিনীত হত। ফকিরের গানটি মূল দৃশ্যকে প্রায় সব বাদ দিয়ে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষকদের সভাশেষে এবং কুঞ্জ রাধিকার ঘরে ফেরার আগে গাওয়া হত। নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা'— কোনদিনই গাওয়া হয়নি। এমনকি শেষ দৃশ্যে কৃষক মহিলাদের গান দু'একদিন গাওয়া হলেও পরে পরিত্যক্ত হয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে, অভিনয়কালে 'আপনি বাঁচলে' গানটি ছাড়া অন্য দুটি গানের নাট্যোপযোগিতা বস্তুত স্বীকৃত হয়নি।

গণনাট্য আন্দোলন তাঁর অন্যান্য প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শের উদ্বোধনে দায়বদ্ধ। নাটকের প্রথম অঙ্কত্রয়ে ঘটনার ঘনঘটায় এ বক্তব্যটি তুলে ধরা সম্ভবপর হয়নি। চতুর্থ অঙ্কের শান্ত স্নিগ্ধ

শান্তির পরিবেশে ফকিরের গান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত চাষী ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছে। 'হিন্দু-মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান। ফকির বলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ভিন্ন আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।' বহুদর্শী ফকির আকালের, মন্বন্তরের সীমাহীন দুর্দশার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেয়েছে—'বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল' এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গাঁতায় খেটে আমন-ফসল ঘরে তোলবার পরামর্শ দিয়েছে।

এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গাঁতায় খাটার এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে ধর্মগোলায় ফসল তোলার যে সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে, তাকেই ফকির তার গানের মধ্য দিয়ে সকলের মনের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। গানটি আপাতদৃষ্টিতে উপদেশাত্মক মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে গানটির ব্যবহার এখানে নাটকের যে লক্ষ্য—ঐক্য ও সংহতি এবং সমস্ত প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করা তারই ভূমিকা। এদিক থেকে এটি অনেকটা নাট্যোপযোগী।

নিরঞ্জন ও কৃষক রমণীদের গানদুটি সুখী তৃপ্ত গৃহস্থ জীবনের স্মৃতি-বিস্মৃতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।

যুদ্ধ আন্দোলন মারী মন্বন্তরে বিধ্বস্ত গ্রাম আজ নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু পুরনো দিনগুলো স্মৃতিকে ভাবাতুর করে বইটি! কিন্তু দুঃখের দহন জ্বালার মধ্য দিয়ে তো সুখের আসন প্রতিষ্ঠা এ কথাই তো বিজ্ঞজনেরা বলেন। নিরঞ্জন শুয়ে অবকাশ যাপনের সময় গানের মধ্য দিয়ে স্মৃতিবিজড়িত অতীত স্মরণের মধ্য দিয়ে একটি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছে, দেখা যায়। গানটি কথার সীমা অতিক্রম করে সুরের মধ্য দিয়ে তার স্বজন হারানোর বেদনাভারটিকে পাঠকের অনুভূতির গভীরে পৌঁছে দেয়। এর পরই কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ যেন—হারিয়ে পাওয়ার সুগভীর আনন্দে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে।

কৃষক রমণীদের গান গ্রাম্য মেলার পরিবেশে উপস্থাপিত। মেলারব, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের স্বপ্নরঙিন জীবনের আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্কটাবসানে জনমানসের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরবার পক্ষে গানটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। মূল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেলার আনন্দ-উজ্জ্বল পরিচয় তুলে ধরবার ক্ষেত্রে গানটি যথেষ্ট আনুকূল্য করেছে।

নাটকের গান তিনটির একটি মাত্র কার্যত অভিনয়কালে গীত হলেও, কোনটিই নাটকের ভাবরসের সঙ্গে সঙ্গতিহীন তো নয়ই বরং নাটকের অভিপ্রায়ের পরিপূরক।

৪৮.১৩ সারাংশ

নাটকে কাহিনীর পর চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য বিশেষত গ্রীক নাটকে কাহিনীর প্রাধান্য ছিল, সেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্রের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের নাটকে ব্যক্তি নয়, সমষ্টির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। আর সামগ্রিক অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। 'নবান্ন' নাটকে ছোট-বড় চরিত্রের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। চরিত্রসংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাই হয়তো এর জন্য দায়ী। একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের সঙ্কট, আগস্ট আন্দোলন,

বন্যা, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর বিশাল ক্যানভাসে গ্রাম-শহরের বিপর্যস্ত চেহারা। এ সময় বিপর্যয় ঘটেছে মানুষের মূল্যবোধে, সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, দেশে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে গেলে বিস্তৃতের ক্ষেত্র ও চরিত্র সংখ্যা বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এরা জনতার ভূমিকা নেয়নি। জনতায় অনেকগুলি মুখের সমাবেশ থাকে, অথচ তাদের চরিত্র এক ও অভিন্ন। এখানে তা ঘটেনি।

গুরুত্ব অনুসারে 'নবান্ন'-এর চরিত্রগুলো হল—প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ, রাধিকা, নিরঞ্জন, বিনোদিনী, পঞ্চাননী ও দয়াল এবং হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া ও রাজীব। অন্যান্য চরিত্রগুলো নেহাৎই গৌণ— ক্ষণকালের জন্য এসে তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বটুকু পালন করেছে মাত্র।

প্রধান সমাদ্দার প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তখন থেকেই তাকে দ্বন্দ্বময়, মর্মজ্বালায় জর্জরিত দেখা যায়। সূচনাতেই যখন দেখা যায় কুঞ্জ নিরঞ্জন আর পঞ্চাননী অবস্থার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় জ্ঞাপন করে— প্রথমোক্তরা অসম শক্তি বিন্যাসের কারণে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পালিয়ে যেতে বলে, পঞ্চাননী সেখানে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। এই দুই স্বতন্ত্র মতের কারণে দ্বিধাগ্রস্ত প্রধান প্রতিরোধের কথা বলে — 'কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।..........আমি প্রাণ দেব। এর পেছনে সক্রিয় ছিল তার পুত্রশোক— শ্রীপতি ভূপতিকে পুলিশ-মিলিটারির আক্রমণে সে হারিয়েছে। এ যেন হত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ । প্রধান ক্ষোভে বলেছে 'জন্তু জানোয়ারের মত বনে জঙ্গালে পালিয়ে' বাঁচতে চায় না।

প্রধান দুটি সন্তান হারাবার পর স্ত্রী পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সে-ও পুলিশের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। ওদিকে প্রকৃতি কেড়ে নিয়েছে তার সমস্ত সম্পদ। প্রলয়ঙ্কর ঝড়, সর্বনাশা বন্যা সঙ্গো নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। প্রধানের স্বপ্নের শেষ স্মৃতিটুকুও মুছে গেল। তাকেও পথে নামতে হল। বস্তুতপক্ষে নাটকে শারীরিক ও মানসিক আঘাত তার ওপরই বেশি করে নেমেছে। একের পর কে দুর্ঘটনায় প্রধান তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য অনেকটা হারিয়ে ফেলে।

এই প্রধানকেই আবার যখন দেখি একদিকে হারু দত্ত, তার বাড়িতে এসে জমি কিনতে চায়, প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্রুদ্ধ হারু গালাগাল দেয়, কুঞ্জ প্রতিবাদ করলে হারুর লাঠিয়ালারা কুঞ্জ ও প্রধানের মাথায় আঘাত করে। অপরদিকে প্রধানের চোখের সামনেই শক্তিহীন মাখনের মৃত্যু হয়, তখন কিন্তু প্রধান কান্নায় ভেঙে না পরে বলে, 'মাখন চলে গেলি'— তখন বোঝা যায় এ বেদনার ভার বড় কঠিন, এর হাত থেকে নিস্তার নেই।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই প্রধান-ই এক সময় ছিল গ্রামের মাথা, নানা প্রতিকূলতায় পথের ভিখারি। তথাপি তার সম্বিত একেবারে হারায়নি। ফটোগ্রাফার তার বাড়ি জানতে চাইলে সে উত্তর দেয়, '.......এ-এ চিনতে পারবেন!' কঙ্কালসার দেহের ছবি তুলছে দেখে বলে, 'তা ভালো,......... কঙ্কালের ছবির ব্যবসা! '— এ থেকে তার বোধের মধ্যে যে একটা আলো-আঁধারির পরিবর্তন কাজ করছে তা বোঝা যায়। অপর

এক দৃশ্যে যখন দেখি এই প্রধান উৎসব বাড়িতে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সামান্য ভাত চেয়েও তা পাচ্ছে না, তখন ধিক্কার দিয়ে বলে, 'তোমারা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু। ....অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু!' তখন মনে হয় প্রধান সম্ভবত আবার বাস্তবে ফিরে এসেছে। আবার চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যথার কথা বলতে গিয়ে অনেক গিয়ে অনেক অসংলগ্ন কথা বলেছে, যা থেকে তাকে অনেকটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। নাটকের শেষে গ্রামে ফেরার পর মনে হয়, তার প্রায়ান্ধকার চৈতন্য, পরিচিত পরিবেশ হারিয়ে আবার ফিরে পায়। বলে, 'ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো।' দয়াল যখন বলে, 'জোর প্রতিরোধ এবার,' প্রধানও উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠে 'দয়াল'।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টত এটি উপলব্ধির বিষয় যে, প্রকৃত অর্থে 'নবান্নে' কোনো নায়ক না থাকলেও প্রধান সমাদ্দারই এ নাটকের মুখ্য চরিত্র। মূলত তার সার্বিক জীবন যন্ত্রণা (sufferings)....এ নাটকে প্রধানতম ঘটনা। সে এক সময় গ্রামে সম্পদে প্রতিষ্ঠায় মর্যাদায় শীর্ষস্থানে ছিল। ভাইপো, পাড়া প্রতিবেশী সকলেই তাকে মনত। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও সমাজ শোষণ তাকে সর্বতোভাবে রিক্ত করেছে। দুই ছেলেকে হারিয়ে, তিন মরাই ধান পুড়িয়ে, ক্ষুধা ও তৃষ্মায় দুর্বল একমাত্র বংশধর মাখনকে হারিয়ে, অভাবের তাড়নায় জমি আংশিক বিক্রি করে, সে প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছে। বাস্তু ছেড়ে শহরে গিয়ে ক্ষুধার অন্ন সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে—এর চাইতে দুবির্ষহ জীবন যন্ত্রণা আর কি হতে পারে। সমাজের সংসারের মর্যাদার আসন থেকে এই চরম বিপর্যয় ও পতন, তার মত এমন তীব্র শোক, এ নাটকের কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এদিক থেকে প্রধান সমাদ্দার এ নাটকের অবিসংবাদী মুখ্য চরিত্রের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

কুঞ্জ চরিত্রের মধ্যে তারুণ্যের তাজা রক্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছে। সে বোঝে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শাসকদের শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, অকারণ জান দিয়ে কোনো লাভ নেই। এই কুঞ্জই আবার হারু দত্তের চক্রান্তের শিকার প্রধান সমাদ্দারকে জমি বিক্রি করতে বাধা দিয়ে হারুর ক্রোধের কারণ হয়েছে।

কুঞ্জ কোনো দৈব নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস, তারা প্রাণ নিয়েছে, মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। দেখেছে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ, বন্যা মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে তাদের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে। তাই সে আর ভাগ্য—ভগবানে নয়, মানুষের নিজের ভেতর যে শক্তি রয়েছে, তার ওপর তার আস্থা সবচেয়ে বেশি।

কুঞ্জ গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার মূর্ত প্রতীক। স্ত্রী পুত্র, ভাই ও ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্যের প্রধান সম্পদ জমি,—তার অপ্রতুলতা অভাব দূর করতে পারেনা। সৃষ্টি হয় মতানৈক্য। অনিবার্য হয় ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ। এর ফলে সহধর্মিনীর সঙ্গো কদাচিৎ মতদ্বৈত হলেও পরিবারের অন্যদের জন্য স্নেহ মমতার অন্ত নেই। এই প্রীতিপূর্ণ বন্ধন স্পৃহা কুঞ্জ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কুঞ্জ নিজের সংসারের ঝড়-ঝাপটা সামলায়, শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীদের জন্যও তার হৃদয়ে দুর্বল স্থান আছে। নিজের পরিবারের জন্য ঘটি বাটি বিক্রি করে দুমুঠো চাল কিনে এনে যখন শোনে দয়ালের কুটোটির ব্যবস্থা নেই, তখন তার শেষ সম্বল থেকে খানিকটা দিয়ে তৃপ্তি বোধ করে। সে বুঝতে পারে গ্রামজীবনে একটি অনিবার্য সঙ্কট নেমে আসছে, তাকে অবিচলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর পাঁচজনের যা হবে, তারও তাই ঘটবে। সেই বাস্তব পরিস্থিতিতে গ্রামের মাটি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে তারাও শহরের ফুটপাতে নেমে এসেছে। পশুর সঙ্গে খাদ্য কাড়াকাড়ি করে খেতে হলেও ক্ষতবিক্ষত কুঞ্জ হার মানেনি, জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা হয়নি, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরও গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছে, স্ত্রীর প্রতি মমতা, অজস্র ধারায় ঝরে পড়েছে। গভীর প্রেমে 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর। তৈরি হয় প্রেমের বিরল মুহূর্ত। তারা অবশেষে আমিনপুরে ফিরে আসে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং যায়-ও।

নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হলেও দুটি কারণে তার গুরুত্ব মানতে হবে। সে পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নিতে না পারলেও গ্রামের চোরাব্যবসায়ী ও মেয়ে পাচারকারী হারু দত্ত এবং কালোবাজারী ও সেবাশ্রমের নামে নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সে স্ত্রী বিনোদিনীকে কালীধনের সেবাশ্রমে ফিরে পেয়ে গ্রামে গিয়ে ভাঙা সংসার গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কুঞ্জ রাধিকা পুনরায় সেখানে গিয়ে আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান তার বিপন্ন চৈতন্যকে ফিরে পেয়েছে।

নবান্নের দুটি খলচরিত্র হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়া। এরা মানুষেণ্ণ জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য নিয়ে কালোবাজারী মজুতদারী করে। নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এরা পারেনা এমন কোনো কাজ নেই। ধান-চালের মত নিজ গাঁয়ের মেয়ে পাচার করতেও এদের দ্বিধা হয়না। এই হারুই প্রধান সমাদ্দারকে টাকার লোভানি দিয়ে সস্তায় জমি কিনে নিতে চায়। বাধা পেলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আক্রমণ করতেও তার বাধেনা। পাচারের জন্য মেয়ে কিনতে সে খুকির মা-র মত দালাল ধরে, সেই সঙ্গে নিজেও অক্টোপাসের মত মেয়ের বাপকে ঘিরেধরে কামড় বসায়। হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত ও জালিয়াত। হেন কাজ নেই যা সে পারেনা। নাট্যকার অত্যন্ত সতর্কভাবে চরিত্রটিকে গড়েছেন বলে সে হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কালীধন সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে চিত্রিত। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, ছিল না দূরদর্শিতা। ভারতরক্ষা আইনের বিধান অমান্য করে প্রচুর চাল গুদামজাত করে রেখেছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেনি। ফলে নিরঞ্জন-বিনোদিনীর জালে জড়িয়ে পরে ভরাডুবি ঘটল। এদিক থেকে রাজীব স্বল্প পরিসরে কয়েকটি তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংলাপ উপকরণ ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তার মন্তব্য, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব বা 'দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় সব' তীব্র, তীক্ষ্ণ ও মর্মবিদারী।

নবান্নের স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে পঞ্চাননী, মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে পরিকল্পিত। প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী সে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা মর্যদাবোধ উল্লেখযোগ্য। আগস্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য শাসক শ্রেণির অত্যাচারের ভয়ে যখন সাধারণ গ্রামবাসী বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে তখন তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়—'তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? .....সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!!' পুলিশের মার খেয়ে মানুষ যখন পালাচ্ছে, পঞ্চাননী তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন—এগিয়ে যা বলছি, এগিয়ে যা। পঞ্চাননী নিজেও এভাবে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে।

বিনোদিনী সুসংগত, সংযত এক গ্রামবধূর চরিত্র। সে পরিবারের সকলের সঙ্গো দুঃখ যন্ত্রণা ভাগ করে নিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কালীধনের সেবাশ্রমে নিয়ে যায় এক টাউট। সেখানে আকস্মিকভাবে নিরঞ্জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় দুষ্কৃতিরা ধরা পড়ে। নিরঞ্জন বিনোদিনীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে, তারা আমিনপুরের বিধ্বস্ত সংসারকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

রাধিকা এ নাটকের প্রধান স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী, সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। জ্যেষ্ঠ বধূ হিসেবে সকলকে নিয়ে চলবার মানসিকতা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীলা গৃহবধূ। অভাবের সংসারে মাঝে মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তারা ফুটপাথবাসিনী, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে বিপন্ন বোধ করেছে, তখনও তার অন্তরের প্রেম শুকিয়ে যায়নি, বরং এই দুর্দিনে তার স্বামী-প্রেম আরও অনেক গভীর হয়ে উঠেছে। (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)।

তার চৈতন্যের গভীর থেকে এ প্রেম নিঃসৃত—তা তার কথা থেকে বোঝা যায়—'খুব যন্তন্না হচ্ছে, না! জল এনে দেব, জল? একটু জল খাবে?'—এভাবেই নতুন করে তারা দুজনে দুজনের প্রেমের স্বাদ নতুন করে অনুভব করেছে। পরিশেষে, এই প্রেমই তাঁদের গ্রামে ফিরে নতুন করে ঘর বাঁধবার স্বপ্নকে উজ্জীবিত করে। সে মুহূর্তে, তাঁর মৃত পুত্রের জন্য প্রাণ হাহাকার করে উঠলেও, তার সামলে নিয়ে এসে নতুন করে সব কিছু গড়বার আনন্দে মেতে ওঠে। নাটকের দর্শক/পাঠক প্রথম রাধিকাকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। রাধিকা 'নবান্ন' নাটকের একটি স্মরণীয় চরিত্র।

সংলাপ এক অর্থে নাটকের 'প্রাণ-ভোমরা'। সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, নাটকীয় দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা, নাটকের বৃত্ত গঠন, চরিত্র বিকাশ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন। আবার এই সংলাপের মধ্যেই একাধারে নিহিত থাকে বাচিক অভিনয়ের উপকরণ, অপরদিকে অঙ্গাভিনয়ের অনেক অনুল্লেখিত নির্দেশ। সংলাপে ভাষা তাই নাটকীয় চরিত্রের ভাব, ভাবনা প্রকাশোক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কালের ব্যবধানে বক্তব্য পস্থাপনা রীতিরও যুগে যুগে বিবর্তন ঘটেছে। প্রাকরবীন্দ্র, রবীন্দ্র-উত্তর, রবীন্দ্রযুগে নাটকের

ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বদলেছে। চল্লিশের দশকে গণ-নাট্যের নাটকে সংলাপ এবং ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বলা যায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এ সময় সংলাপ হয়ে উঠেছে অনেকটা প্রত্যক্ষ জীবন থেকে উৎসারিত—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের জীবন্ত ভাষা। যেমন—

প্রধান। চল তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, ... চলো পালাই।

প্রধান। পালাব, পালাতে বলছিস তুই!

কুঞ্জ। আ—া—হা—া, তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? (১/১)

এই সংলাপ স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত। এর ভাষা মেদবিহীন, বহুবর্ণরঞ্জিত, মাটিঘেঁষা। আবার—

পঞ্চাননী। আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোসনি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে (ক্ষীণকণ্ঠে) এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব....

পঞ্চাননীর এই বাচিক ও আঙ্গিক সংলাপ চল্লিশের দশকে নবান্ন নাটকের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহা সঞ্চার করে দেওয়া অগ্নিগর্ভ বাণী। এ সংলাপ নাট্যকারের সাধারণ সংলাপ নয়—প্রতিবাদী চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট বলা ভুল হবে, বরং বলা ভালো আগস্ট আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবর্তে বিপ্লবী ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা মানুষের। সেই সঙ্গে বলা যায়, দুর্যোগে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা মন্বন্তর মারীজনিত দুর্ভোগের প্রতিক্রিয়ায় ব্যতিব্যস্ত বিপন্ন মানুষ, পুলিশ প্রশাসন, চোরাকারবারীদের অত্যাচারে অসহায় গ্রামবাসী, সেই সঙ্গে যুদ্ধের আক্রমণে দিশেহারা জীবন্ত মানুষগুলির এ হল প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। আবার যখন শুনি 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' (কুঞ্জ ১/৫) অথবা 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' (কুঞ্জ ১/৫)—প্রথমটিতে বক্তার অদৃষ্টবাদ নয়, সুদৃঢ় বাস্তববোধের পরিচয় যেমন ফুটেছে, তেমনি শেষোক্ত সংলাপে যেন উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তস্থল থেকে। এসব সংলাপের শব্দগুলো নাট্যকারের বানানো কথা নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্না, মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর থেকে উঠে আসা। শহুরে বিত্তমান মানুষের ভাষা থেকে এ সংলাপ একেবারেই স্বতন্ত্র।

তাই বলা যায় 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণজীবন থেকে পাওয়া যথার্থ অর্থে গণনাট্যের সংলাপ। গণনাটকের প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় নাটকের বিষয়বস্তু ও তার বক্তব্যকে সাধারণ মানুষের কাছে

নিয়ে যাওয়া, তার সংলাপের ভাষাও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'নবান্ন' এদিক থেকে যথেষ্ট সফল।

নাটকে গানের ব্যবহার নানা কারণে হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন, যাত্রা নাটগীতের সঙ্গে বাংলা নাটকের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, নাটকের গঠনের ব্যবহার জন্মসূত্রেই এসে গেছে। তাই গানের একচ্ছত্র আধিপত্য বাংলা নাটকে বাস্তব ঘটনা নয়। কিন্তু যেহেতু প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন যাত্রা প্রভাবিত ছিল, তাই জনজীবনে, সেই সূত্রে সংগীতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় আদর্শে বাংলা নাটক রচনার আগ্রহ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটক ও বাঙালির যাত্রার সংস্কার সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। ফলে গান এক্ষেত্রে অপরিহার্য গণ্য হয়েছে। নাটক, বস্তুত জীবনাশ্রয়ী, বাস্তব জীবনের কথা বলা, তার প্রধান দায় হলেও, এই জীবনে বিনোদনের একটি ভূমিকা আছে, আছে, তাই সঙ্গীত—কণ্ঠ ও বাদ্যযুক্ত হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু সঙ্গীত যদি নাট্য বিষয়কে আচ্ছন্ন করে, তবে নাটকের মৌল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যবসায়িক থিয়েটারের নাটকে নাচ-গানের বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক। নাচগান এখানে পণ্য। দর্শক মনোরঞ্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সাফল্য তার প্রধান লক্ষ্য। গ্রিক নাটক বা সেক্সপীয়রের নাটকেও গানের ব্যবহার আছে। গান সেখানে নাট্যবোধ সঞ্চারে যেমন সহায়ক, তেমনি ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বমুখ্য নাটকে বিশেষ ভাব-রস সঞ্চারের প্রয়োজনে, কখনও কখনও গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব পালন করেছে। সেখানে গান মুখ্য বিষয় নয়—মুখ্য তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, মারী, মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এ নাটকের প্রেরণা, সেখানে মনোরঞ্জক গান প্রধান বিষয় হতে পারেনা। তাই পনের দৃশ্যের নাটকের প্রথম বারোটি দৃশ্যে গানের ব্যবহার নেই। এ নাটকে যে তিনটি গান রয়েছে—তাও নাটকের শেষে চতুর্থ অঙ্কের সমস্যাজর্জরিত মানুষ নতুন ফসল চোখের সামনে দেখে স্বস্তি ও আনন্দের আশ্বাস নিয়ে যখন শহর থেকে একে একে ঘরে ফিরছে, তখন তাদের কণ্ঠে গান উঠে এসেছে। প্রথম দৃশ্যেই ঘরে ফিরে নিরঞ্জন 'ঘরখানা জুড়েতেড়ে' নিয়ে গ্রামের সকলের সঙ্গে আলাপচারিতার পর দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে গান ধরেছে—'বড়ো জ্বালা বিষম জ্বালায় পুড়ে হব সোনা'। (৪/১) দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক পথিকের গান—'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান/হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।' ধর্ম ও সম্প্রীতির গান গণনাট্যের বক্তব্যকেই তুলে ধরেছে। তৃতীয় দৃশ্যে 'নবান্ন' উৎসবের মাতোয়ারা কৃষক রমণীর গান—'নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি।' প্রভৃতি বিষয়ানুগ ও সবিশেষ তাৎপর্যবহ।

৪৮.১৪ অনুশীলনী ৩

১। **সঠিক উত্তরে (✓) টিক চিহ্ন দিন :**
(ক) 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা — ১০/১৮/২৪/৪৫
(খ) 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য পুরুষ চরিত্র — কুঞ্জ/প্রধান/নিরঞ্জন।
(গ) 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য নারী চরিত্র — পঞ্চাননী/বিনোদনী/রাধিকা।

২। **নিচে উল্লিখিত চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন :**
রাজীব, দয়াল, মণ্ডল, নির্মলবাবু, বরকত, যুধিষ্ঠির।

৩। "তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে।" —বক্তা কে? ব্ল্যাক মার্কেট কী? 'মজুতদার' শব্দটির উৎস কী? কোনো প্রসঙ্গে বক্তা একথা বলেছেন? বক্তার সম্পর্কে আপনার অনুভব সংক্ষেপে লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের নায়ক কে যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৫। "চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত করবে না, কী রকম ধারা কথা।" —বক্তা কে? কী 'চলে এয়েছে'? বক্তার মনোভাবটি বুঝিয়ে দিন।

৬। 'নবান্ন' নাটকে প্রধান সমাদ্দার / হারু দত্তের নাট্যভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। চরিত্র ও পরিবেশ উপযোগী সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অনেকটাই সার্থক। 'নবান্ন' নাটক অবলম্বনে মন্তব্য বিচার করুন।

৮। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপের বিশিষ্টতা ও স্বাভাবিকতা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৯। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ 'অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক'—এ মন্তব্যের যাথার্থ বিচার করুন।

১০। 'নবান্ন' নাটকের সঙ্গীতসমূহের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১। "এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।"—বক্তা কে? কোথায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে? 'পোড়া মাটির দেশ' বলতে কি বুঝিয়েছেন? এ কথা বলায় বক্তার কী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

১২। "তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।" —এই সংলাপ কার? নাটকীয় তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

১৩। "ওরে বাবারে—তা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাই—কথা এই বললে, ফুরিয়ে গেল! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মতো এট্টা ইয়ে হয়ে থাকল!" —কার লেখা, কোন নাটকে, কার উক্তি? প্রসঙ্গটি উল্লেখ করুন। উক্তিটির মধ্যে বক্তার কি চরিত্র-পরিচয় মেলে বুঝিয়ে দিন।

৪৮.১৫ 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান

মঞ্চ :

এদেশে আধুনিক মঞ্চ বলতে যেটি বোঝায় তা প্রসেনিয়াম মঞ্চ। তার নির্মাণকর্তা লেবেডফ। সেখানে তিনি যে বাংলা নাটকটির অভিনয় করান তার নাম 'কাল্পনিক সংবদল'। এটি এম. জড্রেল-এর লঘু নাটক 'দি ডিগসাইস্'-এর বঙ্গানুবাদ। তার মঞ্চগঠন পদ্ধতি দেখে আমরা মঞ্চের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি। তা হল—তিনদিক ঢাকা সম্মুখ ভাগ খোলা একটি আয়তাকার ক্ষেত্রবিশিষ্ট স্থান যার ওপরটাও ঢাকা এবং মাঝখানটি উঁচু বেদির মতো—তাকে মঞ্চ বলা হয়। এই উঁচু মঞ্চটিকে অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাজান হয়। লেবেডফ অভিনয়ে চারুত্ব সম্পাদনের জন্য মঞ্চকলার অভিনবত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন। একাজে তিনি ছিলেন একাধারে স্থপতি, কারুশিল্পী, দৃশপট শিল্পী, সঙ্গীত ও অভিনয় পরিচালক। এক্ষেত্রে তাঁর স্বদেশের মঞ্চ পরিকল্পনা ও মঞ্চশিল্পী ফিয়োডার ভলকভের সম্ভাব্য অনুসরণ ছিল মনে হয়। তথাপি তাঁর দৃশ্যাঙ্কনে বাংলাদেশ ও বাঙালির প্রতিকৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল। এর পর বাংলা নাট্যমঞ্চের দৃশ্যসজ্জায় পরিবর্তন আনেন ধর্মদাস সুর। ধর্মদাস ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বরে অভিনীত 'নীলদর্পণ' নাটকের মঞ্চসজ্জার হাতেখড়ি দিয়েছিলেন. এই মঞ্চের পিছনে ছিল কাপড়ের ওপর হাতে আঁকা দৃশ্যপট। এই দৃশ্যপট বা সীনগুলো ওপর থেকে পর পর ঝোলান থাকত। দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী তোলা নামানো হত সেগুলো। তারপর এই আঁকা সীনগুলির সঙ্গে দুপাশে টরমেন্টার এঁকে তার মধ্যে একটু ডাইমেনসন আনার চেষ্টা হয়েছিল। ক্রমে ওই সব কাপড়ে আঁকা স্থিরচিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গাতি রেখে কিছু কিছু আসবাব ব্যবহার করা হত। এরপর ওই স্থির দৃশ্যপটের সঙ্গে যুক্ত করা হল ফ্ল্যাট সীন। কাঠের ফ্রেমের ওপর টান করে কাপড় লাগিয়ে তার ওপর ছবি আঁকা হত। এর সঙ্গে দুটো ফ্রেম তৈরি করা হত। দুদিক থেকে ঠেলে জুড়ে দিলে একটা দৃশ্যপট হয়ে যেত। একেই বলা হত ঠেলা সীন। আবার দৃশ্য শেষ হয়ে গেলে দুপাশে টেনে নিয়ে যাওয়া হত।

এই অবস্থাকে মেনে নিয়ে মঞ্চে এলো প্যানোরামা পদ্ধতি। কিন্তু ১৮৯৭ সালের আগে নতুন কোনো পদ্ধতি মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে দেখা গেলনা। ১৮৯৭ সালে অমর দত্ত রঙ্গমঞ্চে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে তাঁর প্রথম প্রযোজনা 'নলদময়ন্তী'। 'নলদময়ন্তী' নাটকের বিজ্ঞাপনের একটুখানি তুলে দিলে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

"নলদময়ন্তী—Splendid Lotus Scene!

একটি ক্ষুদ্র পদ্মকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরীগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।"

এই ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকে দৃশ্য সজ্জায় কাট আউটের ব্যবহার। সেট সীন, নকল আসবাবপত্রের পরিবর্তে আসল বস্তু দৃশ্যসজ্জায় এসে গেল। যেমন, আসল খাট, আয়না, চেয়াল-টেবিল ইত্যাদি।

মঞ্চ এবং মঞ্চপরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন ঘটালেন শিশির ভাদুড়ী। তিনি নাট্যমঞ্চে দুটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটালেন। (১) পাদপ্রদীপ বা ফুটলাইট তুলে দিলেন। (২) উইংস বা পার্শ্বপট নামক কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথকে রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসন দিলেন। প্রথমটি সম্পর্কে আমরা নেপথ্যবিধানের অন্যতম অঙ্গ, আলোকসম্পাতের প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এখন উইংস বা পার্শ্বপট প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

কলকাতায় ইংরেজদের নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত মঞ্চের অনুসরণে বাংলা রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট হিসেবে অঙ্কিত পশ্চাৎপট ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। প্রসেনিয়াম মঞ্চে তখন থেকেই উইংসের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উইংস মঞ্চের দুপাশে থাকত। দুটি উইংস বা পার্শ্বপটের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে শিল্পীরা মঞ্চে আসত এবং প্রস্থান করত। এই ব্যবস্থা যখন দৃশ্য সংস্থাপনায় কাট-আউট দৃশ্য সংবলিত সেট সীনের ব্যবহার চালু হল তখনও প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়ী দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট ডাইমেনসনাল বা মাত্রাবিশিষ্ট মঞ্চের প্রবর্তন করবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বপটের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলেন। তার ফল মঞ্চে শিল্পী পেলেন প্রবেশ প্রস্থানের স্বাভাবিক পথ। মঞ্চ হয়ে উঠল আরো বাস্তব এবং জীবন্ত। বাস্তব এবং জীবন্ত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, একটি ঘর দেখান হচ্ছে মঞ্চে নিশ্চয় তার দরজা থাকবে। একটা বাইরের, আর একটা ভেতরে যাওয়ার। শিল্পীরা ডাইমেনশনাল মঞ্চ পেয়ে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমনের স্বাভাবিক পথ ব্যবহার করার ফলে মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা হয়ে উঠল। এছাড়া শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে খোলা আকাশ দেখাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন, তবে অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ডাইমেনশনাল মঞ্চ তৈরি করে মঞ্চ স্থাপত্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তার পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত প্রসেনিয়াম মঞ্চকে সাধারণত ফ্লাট মঞ্চ বা সমতল মঞ্চ বলা হয়ে থাকে। এই সমতল চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মঞ্চকে একমাত্রিক মঞ্চও বলে যেতে পারে। এই একমাত্রিক বা One dimensional মঞ্চকে দ্বি-মাত্রিক (two dimensional) বা ত্রি-মাত্রিক (three dimensional) মঞ্চ করা যায়। একসঙ্গে যেখানে দুধরনের বা তিন ধরনের অভিনয় দেখাবার প্রয়োজন সেখানে এইরকম মঞ্চ একান্ত অপরিহার্য। ‘নবান্ন’ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের যে মঞ্চ পরিকল্পনার নির্দেশ নাট্যকার দিয়েছেন তা দ্বিমাত্রিক মঞ্চ বা two dimensional মঞ্চ পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়—

> শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যাচ্ছে সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সারবন্দী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বিজলি বাতির আলো চুঁইয়ে পড়ছে। অন্দরমহল থেকে সানাই-এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে—আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুন—বসুন।’ তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাঁড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক

> কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিন—অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তূপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

এই নির্দেশ থেকে two dimensional মঞ্চ স্থাপত্যের ইঙ্গিত বেরিয়ে আসে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটকে প্রথম মঞ্চ স্থাপত্যে এই ধরনের নতুনত্ব সৃজন করেছিলেন। 'সীতা' নাটকের একটি দৃশ্যে দেখাতেন, প্রাসাদ অঙ্গনে উঁচু স্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, নিম্নস্থানে জনসাধারণ, সকলের ওপরে অলিন্দে উপস্থিত অন্তঃপুরচারিণীরা, কেউ উপবিষ্ট, কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলমান এবং সকলেই অভিনয়ে রত। কেউ হাবেভাবে, কেউ ভাষায়। স্পষ্টত, ত্রিমাত্রিক মঞ্চ ব্যবস্থার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের একটি মঞ্চ পরিকল্পনা এখানে তুলে দেওয়া হল। এই নাটকটি সামগ্রিক প্রয়োগ কুশলতায় বঙ্গারঙ্গামঞ্চে অতুলন। প্রথমে যে তাঁবুর দৃশ্য দেখান হয়েছে তা প্রেক্ষাগৃহকে সচকিত করে তোলে। পুরো মঞ্চ পীঠের আয়তন জোড়া একটি কাঠের ফ্রেমে দরবার, তাঁবুর অনুকরণে ছাপানো কাপড় হুক দিয়ে ঝুলিয়ে অভ্যন্তরভাগ তৈরি করা হয়েছিল। পেছনে প্রবেশপথ এবং তার দুধারে (দর্শনানুপাত) অনুযায়ী অন্যান্য তাঁবুর অংশ তৈরি করা হয়েছিল। তাঁবুর পিছনে মোতায়েন রক্ষীবাহিনী টহল দিচ্ছে। কিংবা, দিল্লীর রাজপথ পিছনে রেখে জুম্মা মসজিদের চত্বরের দৃশ্য—যেখানে সামনে পিছনে অস্থির পদচারণা করতে করতে নাদির শাহ দিল্লী ধ্বংস করেছিলেন। 'কোতল' 'কোতল' বজ্রনিনাদ আর জনতার আর্তকোলাহলের সঙ্গো দিল্লীর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার দৃশ্য অবিস্মরণীয়। শ্রীশম্ভু মিত্র বলেছেন, 'দিগ্বিজয়ী' না দেখলে, তিনি 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্য কল্পনা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গো 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্যের মঞ্চ ব্যবস্থায় নাট্যকারের নির্দেশটুকু তুলে দেওয়া হল—

> দিনাবসানে চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্গত পল্লীর বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটা মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু-চারজন লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার এসে ঢুকল যেন আরও কারা। কী সব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামুর্তিগুলোর হাত-পা নাড়া ও কথা বলার বলিষ্ঠ ধরনে মনে হচ্ছে যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত চলছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গো উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি। আগুনের আভায় মালভূমির ওপরকার দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখের সামনে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে পৌঁছেছে : আর একজনের বয়স কম—গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠি—শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শ্রীশম্ভু মিত্র যথার্থ কথা বলেছেন :

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা' এবং 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে মঞ্চের ওপর যে স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা আরো বাস্তব আরো সহজ হয়ে এলো ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৩ সালে রঙ্গমহলে 'মহানিশা' নাটকে সতু সেন প্রথম রিভলভিং বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তৈরি করে বক্স-সেটের ব্যবহার করলেন।

এরপর মঞ্চ ব্যবস্থার রীতি আরো সহজ ও সরল হয়ে এলো ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটক প্রয়োজনায়। মঞ্চের ওপর কেবল মাত্র গোটাচারেক চট ঝুলিয়ে দিয়ে তাকেই দৃশ্যানুযায়ী একটু আধটু পরিবর্তন করে ঘর বার দুই দেখান হয়েছিল।

প্রসেনিয়াম দর্শক ও নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে অভিনয়কারী কুশীলবের মধ্যেকার একটা অস্বাভাবিক অবরোধ। সুতরাং এই অবরোধ উঠে গেলে নাটক ও দর্শক এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্তরে এসে পৌঁছতে পারবে। এই ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। তবে এই কাজে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা।

গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অত্যাচার নিপীড়ন বঞ্চনার কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং যারা তাদের দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনার কারণ তাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানান অর্থাৎ প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest গড়ে তোলবার ইচ্ছা। শহরাঞ্চলের স্থবির মঞ্চের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলে, মুক্তাঙ্গনে নাটককে নিয়ে যেতে হবে। তা করতে গেলে আয়েজানবহুল মঞ্চকে হালকা করে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত কিছুকেই সহজ সরলীকরণ করে নিতে হবে। সহজ ও সরলীকৃত হওয়ার প্রবণতা যে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে নিহিত আছে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তা বুঝেছিলেন, তাই তিনি নাট্যমঞ্চ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে গেছেন। শিশির ভাদুড়ী যে দৃষ্টিভঙ্গিটির আভাস রেখে গিয়েছিলেন, গণনাট্য সংঘের কর্মীরা সেই ইঙ্গিতটুকু অবলম্বন করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হলেন। গণনাট্যের নাট্যকর্মীরা চল্লিশের দশকে পেশাদারী নাট্যমঞ্চের বাইরে নাটককে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। তার জন্য রঙ্গমঞ্চের প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে সহজ সরল করে নেওয়ার জন্য ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা সুরু করেছিলেন।

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার রীতিতেই পরবর্তীকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চে এসেছে 'সাজেসটিভ' মঞ্চ। 'নবান্ন'র হাত ধরে সাজেসটিভ রিয়ালিজমের হাওয়া বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এসে বাঙলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিকে নাজেহাল করে তোলবার চেষ্টা চালিয়েছে। আর তার জন্যই মঞ্চ ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে শহরে, গ্রামে যত্রতত্র। এই রীতিতে শুধুমাত্র একটা কালো পর্দার সামনে গুটিকয়েক আসবাব দিয়ে কিংবা তার বদলে কাঠের বাক্স সাজিয়ে সাজেসটিভ সেটে নানা পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। তার ফলে নাটকের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, নাটক হয়ে উঠছে মানুষের জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার। একাজে অবশ্য আর একটা নেপথ্য বিধান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার নাম আলোকপাত। পরে সেই আলোকসম্পাতের বিবর্তনের চেহারাটা সুস্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মঞ্চ-আলোকসম্পাত—আবহসংগীত :

এখন মঞ্চে আলোকসম্পাত ধ্বনি এবং আবহসংগীত প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের বিশিষ্ট অঙ্গাগুলির যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। 'নবান্ন' নাটকের ক্ষেত্রেও এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন আছে। আধুনিক বিচারে এগুলিও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গো গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। নাটককে মনোজ্ঞ করে তুলতে, নাটককে রসগ্রাহী করে তুলতে গেলে এদের ভূমিকা অপরিসীম। রঙ্গামঞ্চের নেপথ্যে পশ্চাৎপটে যে আর এক ধরনের অভিনয়, অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গো সমান্তরালভাবে চললে নাট্যাভিনয় একটি নিটোল রসরূপ পায়, তার একান্ত ঘনিষ্ঠ অঙ্গা হল ঐগুলি। 'নবান্ন' নাটককে নিটোলত্ব দান করেছে মঞ্চব্যবস্থা, আলোকসম্পাতের নতুনত্ব এবং আবহসংহীতের অভিনব আয়োজন। অতএব এ সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে।

নেপথ্যবিধান ও 'নবান্ন' নাটক :

নাট্যাভিনয় বা থিয়েটারের দুটি অংশ : (১) প্রত্যক্ষ অভিনয়, (২) নেপথ্য অভিনয়। নট-নটী অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংলাপ ও অঙ্গাভঙ্গি সহযোগে অভিনয় মঞ্চে ঘটতে থাকে। আর এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাঙ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলবার জন্য নেপথ্য অভিনয়ের অপরিহার্যতা সর্বজনস্বীকৃত। এই দ্বিতীয় অভিনয় বা নেপথ্য অভিনয়কে নেপথ্যবিধান বলে। নেপথ্যবিধান অভিনয়ের সঙ্গো একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গাতিসম্পন্ন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। উভয়ে সুসঙ্গাত সহযোগিতায় নাটকে বাঞ্ছিত রস সৃষ্টি হয়। 'নবান্ন' নাটক শুধু কাহিনীগত গতানুগতিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়নি, মঞ্চ সজ্জায়, আবহসংহীতে এবং আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, যা গণনাট্য সংঘের এক লক্ষণীয় প্রচেষ্টা। পেশাদার মঞ্চ পরিকল্পনার বাইরে নাটককে গণনাট্যকে রূপান্তরিত করে যে পরিবর্তন সূচিত করেছিল, আজও সেই প্রবাহে পরবর্তী নাট্য আন্দোলন প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

আলোকসম্পাত ও 'নবান্ন' :

ভারতবর্ষ, কি ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত নাট্যাভিনয় প্রাচীনকালে করা হত তা বস্তুত হত দিনমানে। তখন মঞ্চে আলোকের উৎস ছিল সূর্য। উন্মুক্ত আকাশের তলে তখন অভিনয়পর্ব চলত, সূর্য নামক একটি আলোক উৎসের অজস্র রশ্মিপুঞ্জ রঙ্গামঞ্চে অপর্যাপ্ত আলো সরবরাহ করত। কিন্তু নাট্যাভিনয় যে দিন থেকে উন্মুক্ত আকাশ পরিত্যাগ করে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে এসে পড়ল, সেদিন থেকে স্বাভাবিক আলোক উৎস থেকে রশ্মি সরবরাহ ব্যবস্থায় বাধা পড়ল। তখন থেকেই আলোর অস্বাভাবিক প্রয়োগকৌশলে নাট্যমঞ্চ যেন কথা বলে উঠল, এক নতুনতর প্রাণবন্ত অভিব্যক্তিতে চনমন করে উঠল।

প্রথমে প্রেক্ষাগৃহ বিশিষ্ট রঙ্গামঞ্চে আলো সরবরাহ করত মোমবাতি কিংবা তেলের বাতি। এই মোমবাতি

কিংবা ল্যাম্পের আলো সামনে থেকে পড়ত মঞ্চের ওপরে। তারপরে এলো গ্যাসের আলো। গ্যাসের আলোই ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের উৎস। অর্থাৎ ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ ব্যবহার রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল গ্যাসের আলো আসবার পর থেকে। তারপর শহরে বৈদ্যুতিক আলো আসবার সঙ্গে সঙ্গে শহুরে সভ্যতায় ঘটে গেল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সেইরকম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল রঙ্গামঞ্চেও। এই আলো সব কিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই দর্শকের সামনে তুলে ধরল।

বাংলা রঙ্গামঞ্চেও এবম্বিধ পরিবর্তন এলো। গণনাট্যের 'নবান্ন' নাটকে আলোকসম্পাতের একটা দারুণ শিল্পসম্মত সুযোগ আছে। আলোর এই শিল্পসম্মত প্রয়োগ না হলে 'নবান্ন' নাটক অত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত না। ছেঁড়া চটের টুকরো দিয়ে মঞ্চসজ্জা চলে, কিন্তু আলোর প্রয়োগকৌশল আরোপিত না হলে ছেঁড়া চট চটই থেকে যায়। মঞ্চমায়া সৃষ্টি হয়না। এই নাটকের কোনো কোনো স্থানে প্রতীকধর্মী পরিবেশ সৃজনে আলো অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার ফলে 'নবান্ন' হয়ে উঠেছে বাস্তবের জীবন্ত নাট্যরূপ।

আলো কেমনভাবে নাটকে এত জীবন্ত বাস্তবের প্রতিরূপ গড়ে তোলে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সময় থেকে বাংলা নাটকের প্রয়োগরীতিতে সংযোজিত হয়েছে অভিনব এক অধ্যায়। আদিতে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের ব্যবহার হত। রঙ্গামঞ্চের সামনের দিকে প্রান্তিক অঞ্চলে একফুট উঁচু করে ফুটলাইট বসানো হত। এর ফলে তার থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিপুঞ্জ অভিনেতা অভিনেত্রীদের ওপর পড়ে সৃষ্টি করত একটা প্রস্থায়া। সেই ছায়া পশচাঋপটের ওপর পড়ে একটা কিম্ভুতকিমাত্রার পরিবেশ তৈরি করত। ফলত দর্শক মনে সামগ্রিক ইম্পেশন সৃষ্টিতে বাধা হত। তাই প্রথমে প্রয়োজন হল পশচাৎপটের এই ছায়া দূর করবার। তাই প্রসেনিয়ামের পিছনে টাঙনো দু'ফুট চওড়া ঝালর (যেটি রঙ্গাপীঠের ওপর থাকত)-এর অন্তরালে জ্বালান হত বালবের ছড়ি। এইভাবে চতুর্দিক আলোয় ঝলমল করে ওঠবার ফলে ছায়া স্পষ্ট হয়ে পশচাৎপটে পড়তে পারলনা। প্রচ্ছায়া ভুতটা রঙ্গামঞ্চ থেকে বিদায় নিল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটক প্রযোজনা কালে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ তুলে দিলেন। পাদপ্রদীপ তুলে দেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো এইরকম—দিবাভাগে সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে। সারাদিন ভূপ্রদক্ষিণ করে অপরাহ্নবেলায় পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। রাত্রে চাঁদ থেকে শুরু করে ইলেকট্রিকের আলো, গ্যাসের আলো প্রভৃতি সবই ওপর থেকে পড়ে, নয়তো আসপাশ থেকে পড়ে। আলোকরশ্মি প্রক্ষেপণের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক নিয়মে শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে আলোক ক্ষেপনের ব্যবস্থা করলেন, তাই তিনি তুলে দিলেন ফুটলাইট, আমদানী করলেন ফ্লাডলাইট, স্পটলাইট। সাধারণভাবে সমস্ত মঞ্চ আলোকিত করবার জন্য ফ্লাডলাইট। পার্শ্বলাইট থেকেও আলো সরবরাহ করা যেতে পারে। আর কোনো বিশেষ স্থান, বিশেষ

মুখ বা অবয়ব বা অভিব্যক্তিকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য তিনি ব্যবহার করলেন স্পটলাইট। স্পটলাইট হল তাই—যা নির্দিষ্ট কোনো অংশ বা স্থানকে আলোকিত করতে পারে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আলোক নিক্ষেপণ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হল ডিমার বা ধীরে ধীরে আলো বাড়াবার কমাবার যন্ত্র।

এই ব্যবস্থার গুরুত্ব এই যে হঠাৎ আলো জ্বলল এবং তীব্র আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হল বা হঠাৎ আলো নিভে গেল, এতে মঞ্চের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় এবং অভিনেতার অভিব্যক্তির ক্রমবিলীয়নাম রূপটা ঠিকভাবে ফু উঠে অভিনয়কে ব্যঞ্জনার পর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করে। ধরা যাক 'নবান্ন' নাটকের একটি দৃশ্য, যেখানে কুঞ্জর হাতে কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে। সেই রক্তাক্ত কম্পিত হাতটা নিয়ে যে যন্ত্রণাকাতর মুখে রাধিকার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর রাধিকা নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে তা দিয়ে হাতের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিচ্ছে এবং একসময় দুজনে দুজনার মুখের দিকে গভীর প্রেম ও মমতাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে আর আলোটা একটু একটু করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই অংশে পাত্রপাত্রীর মুখে কথা নেই, কিন্তু আলো এই অংশে কথা বলছে। বেদনাঘন মুহূর্তটা দর্শক মনের পরতে পরতে গেঁথে দিয়েছে। এখানে স্পটের সঙ্গে ডিমার যদি না থাকত, তাহলে আলোটা দপ করে নিভে যেত। শেষ, মুহূর্ত পর্যন্ত কুঞ্জ রাধিকার উদ্বেল হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দেখান সম্ভব হত না, যা তাদের নীরব দৃষ্টির অশ্রুক্ষরণের মধ্যে দিয়ে দর্শক মনের প্রত্যন্ত প্রদেশের নিস্তরঙ্গতায় বেদনার তরঙ্গকে উদ্বেল করে তুলছে। একাজ করেছে ডিমার যুক্ত স্পটলাইট। এতএব স্পটলাইট আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র।

এরপর আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে আরো বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সতু সেন। সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি পেশাদার রঙ্গালয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে সতু সেন বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন, নাট্যনিকেতন মঞ্চে 'ঝড়ের রাতে' নাটকে। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খুব বাস্তব রূপে তিনি ফুটিয়ে তোলেন। রঙমহলে 'স্বামী স্ত্রী' নাটকে কয়লার খনির যে দৃশ্য দেখান হয়েছিল তা দর্শকদের বিশেষ ভাবে চমৎকৃত করে। পরবর্তীকালে তাপস সেনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

আলোর এই বিস্ময়কর চাতুর্য অবশ্য ঘটেছিল বাঁধা মঞ্চগুলিতে, যা পেশাদার মঞ্চ বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু পেশাদার মঞ্চের বাইরে মঞ্চ তৈরি করে সেখানে আলোর খেলা দেখাবার কৃতিত্ব বোধহয় গণনাট্য সংঘের। এখানে 'নবান্ন' নাটকে আলো কি রকম প্রতীকধর্মী অভিনয় করেছে তার একটু পরিচয় নেওয়া যাক। দ্বিমাত্রিক মঞ্চে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অভিনয় চলেছে। বিয়ে বাড়ি, ফটকের ভেতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে যাওয়ার রাস্তা। দু'পাশে চেয়ার পাতা, সেখান দিয়ে লোকজন ভেতরে যাচ্ছে, ভেতর থেকে আসছে, একপাশে বাড়ির কর্তা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথাবার্তা চলছে। এখানে আলো খুব উজ্জ্বল। অর্থ, বৈভব, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর উৎসবের উদ্দাম আনন্দের সঙ্গে আলো এখানে যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন। ঠিক এরই একপাশে

রাস্তা, একটা ডাস্টবিন, সেখানে কুকুর আর মানুষের সহাবস্থান। উভয়ে ডাস্টবিন ঘেঁটে খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। এখানে আলো অল্প। নাট্যকার তারই নির্দেশ রেখেছেন। নাট্যকারের নির্দেশ থেকে একটা তাৎপর্য বেরিয়ে আসে, এই সব গরীব ভিখিরি মানুষগুলোর জীবনে সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, তাই আলোও নেই। নৈরাশ্য আর অসহায়তার তমিস্রায় তাদের জীবন আচ্ছন্ন। সুতরাং এখানে উজ্জ্বল আলো একান্ত অপ্রয়োজন। স্পটলাইটের স্বল্পালোকে তাদের সামাজিক অবস্থানের প্রতীকধর্মী মঞ্চরূপ গড়ে উঠেছে। এই দৃশ্যে দুই স্তরের মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্দেশে আলো এখানে প্রতীকধর্মী ভূমিকা পালন করেছে।

অবশ্য আলো ছাড়া আরো একটি বস্তু নাটকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আবহসংগীত। যেটি নেপথ্য বিধানের তৃতীয় বস্তু। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে, নাটকের পরিভাষায় আবহসংগীতের অর্থ এইভাবে করা যায় যে, নাট্যাভিনয়কালে দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে কৃত অভিনয়ের ঘটনার অনুসঙ্গী সংগীত, ইংরাজীতে যাকে background music বলে। আবহসংগীতের আভিধানিক অর্থও তাই। সংগীত নাটকের পাত্রপাত্রীর অভিনয় দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে আরো বেশি জীবন্ত, মর্মস্পর্শী করে তোলে, বা অভিনয় করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে যে সংগীত তাকে আবহসংগীত বলা হয়। 'নবান্ন' নাটক থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। বিবাহ বাড়ি, মঞ্চসজ্জা, পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জা এবং তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে বোঝবার পক্ষে কোনো অসুবিধা নেই যে দৃশ্যটা বিবাহের। তাহলেও নাট্যকার নির্দেশ দিলেন যে, এখানে সানাই-এ 'আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে'। এর কারণ এটাই বিবাহের অনুষ্ঠানে সানাই-এর একান্ত অপরিহার্য 'রাগ'। অর্থাৎ কথাটা এই দাঁড়াল যে পরিবেশ সৃষ্টি। উক্ত দৃশ্যকে বাস্তবধর্মী করে তোলবার জন্য এটি একটি স্বাভাবিক প্রয়াস।

কিন্তু প্রশ্ন, যে দৃশ্যে নাট্যকারের নির্দেশ নেই, সেখানে কি তাহলে আবহসংগীত হবে না? যেমন ধরা যাক, কুঞ্জর রক্তাক্ত হাত দেখে রাধিকা চমকে 'ওমা একেবারে কামড়ে খেলে গো' বলে সে সংলাপটা উচ্চারণ করল, এখানে ওই চরিত্রের আতঙ্কিত হওয়া, পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, অনুরাগ রঞ্জিত হৃদয়ে 'ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা।'—সংলাপ-অনুভূতি স্তরগুলিকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের কি দরকার নেই? প্রথমে 'ওয়াইলড্‌লি' চিৎকার, তারপর রাধিকা যখন দেখে কুকুর অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে তখন ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে নিয়ে বেঁধে দিতে দিতে অসহায় বোধ নিয়ে বলে, 'ওমা আমার কি হবে গো' বা গভীর মমতায় 'খুব যন্তন্না হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?' প্রভৃতি উচ্চারণ সংবেদনশীল হৃদয়ের অনুভূতিকে গভীরতম তলে পৌঁছে দেয়। এটিকে প্রকাশ করতে নিঃসন্দেহে অভিনেত্রীর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতার দরকার, এর জন্য প্রয়োজন স্বরগ্রামে—এই খেলা অতিসাধারণ অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব হবে না। এটা যেমন অভিনেত্রীর ক্ষমতার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, ঠিক তেমনই আবহসংগীত অভিনেত্রীকে অনেক বেশি সাহায্য করে দর্শক হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার জন্য। আর একটি জায়গা, প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য, প্রতিবেশী দয়াল প্রধানের বাড়ি থেকে চাল চেয়ে নিয়ে

গেছে অভুক্ত স্ত্রী রাঙার মাকে খাওয়াবার জন্য। কিন্তু গিয়ে পৌঁছানর পূর্বেই বন্যা অতর্কিতে আক্রমণ করে নিয়ে গেছে সকলকে ভাসিয়ে, বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত সর্বহারা দয়াল এর পর উন্মাদের মতো ছুটে আসছে কুঞ্জর কাছে বাইরে থেকে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দিতে দিতে।

(নেপথ্যে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক)

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ ... কুঞ্জ! ... কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ।

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (কোঁচড়ের চাল হাতে নিয়ে) এই যে কুঞ্জ, তোর, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) দয়ালদা! দয়ালদা!

দয়াল। (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল...সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

ঝড়ের শব্দ—সাঁই সং.

দৃশ্যাংশটুকুর অভিনয় পুরোটাই আবহসংগীত নির্ভর। নাট্যকারের নির্দেশ থাক বা না থাক, অভিনেতা যতই ক্ষমতাসম্পন্ন হোন, দর্শক মনে গভীর ভাবে ছাপ ফেলবার জন্য এখানে আবহসংগীতের একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক সহযোগিতার খুব দরকার। কিংবা দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে যেখানে রাধিকা কুঞ্জর হাত বেঁধে দিচ্ছে আর কাঁদছে—তারপর উভয়ে উভয়ে মুখেন্ন দিকে তাকিয়ে—এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আবহসংগীত তো এদের অব্যক্ত বক্তব্যকে, নিবিড় প্রেমের নিদারুণ বেদনাকে দর্শকের দরবারে পৌঁছে দেবে।

আবহসংগীত বলতে আমরা বুঝি এ্যাফেক্ট মিউজিক অর্থাৎ প্রভাব বিস্তারকারী সুরলহরীকে আর শব্দ সংযোজনাকেও এই অংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। 'নীলদর্পণে'র কথা ধরা যাক, যেখানে চারজন রাইয়ত হঠাৎ অফ ভয়েসে মজুমদারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সেই মুহূর্তে মনে আতঙ্ক জেগে উঠল। আবহসংগীতের প্রভাব এখানে অনস্বীকার্য। অথবা, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার দৃশ্যে—আবহসংগীত ছাড়া

এ দৃশ্যের অভিনয় চিন্তা করা যায়না। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের শেষাংশে—

হারু দত্ত। (কুঞ্জের মুখের ওপর লাঠি ঠুকে) বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যে—। (লাঠি ঠুকে) কেন, কারসঙ্গে কী কথা বলিস ঠিক থাকে না? উঁ, মনে থাকে না?

[অপমানহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশুর মত]

প্রধান। মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।

২য় ব্যক্তি। এই ওপ্। (লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে)

(কুঞ্জর কান্না আরও জোরালো হয়ে ওঠে। রুগণ মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

রাধিকা। হায় হায় হায় হায়, আমার সব গেল গো, সব গেল। ও মাখন, মাখন—

প্রধান। (বিনোদিনীর প্রতি) এট্টু, জল, জল আন। জল—

রাধিকা। ও মাখন, মাখন রে—

(আর্তকণ্ঠে মাখন গাঁইগুই শব্দ করতে থাকে)

প্রধান। মাখন, মাখন রে হে-হেঃ, —কুঞ্জ, দ্যাখ, মাখনরে একবার তুই দ্যাখ্।

(রাধিকা কেঁদে ফেটে পড়ে। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখমুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।)

কুঞ্জ। (মুখ তুলে মাখনের দিকে) য়াঁ, মাখন, মাখন...

প্রধান। মাখন চলে গেলি!

এই অংশে যেখানে সংলাপ আছে সেখানে তো বটেই, যেখানে সংলাপ নেই সেখানেও আবহসংগীত খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলে পুরো ব্যাপারটা মর্মগ্রাহী হয়ে উঠতেই পারবে না।

অতএব নাটকে আবহসংগীত একান্ত অপরিহার্য একটি নেপথ্য বিধান। এই বিশেষ নেপথ্য বিধানটি নাট্যাভিনয়ের প্রথম দিকে বিশেষভাবে অবহেলিত ছিল। এটা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়নি। তাই যত্রযত্র যেরকম সেরকম musical instrument ব্যবহার করা হত। তার যুক্তিসংগত কারণও ছিল। তখন পরিচালকরা অভিনয়ের ওপর জোর দিতেন, আর দর্শকরা অভিনয়টাই দেখতে যেতেন। তাই চরিত্রের মুখে নাট্যকাররা জুগিয়ে দিকেন অজস্র কথার বুনানী অর্থাৎ সংলাপ। অভিনেতৃবর্গ কণ্ঠস্বরের উৎক্ষেপণ—কম্পনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন স্বরগ্রামে নিয়ে গিয়ে দর্শক মনে দাগ টানবার ব্যবস্থা করতেন। তাই আবহসংগীত ব্যাপারটা তখন নেহাতই গৌণ ছিল। সম্ভবত, সেই কারণে 'নীলদর্পণে'র মত নাটকের প্রথম অভিনয়ে

চুনাগলির ফিরিঙ্গি কনসার্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। তার জন্য সমকালীন সংবাদপত্রে এই বিসদৃশ সংগীত সংযোজনার যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল। অবশ্য প্রথম দিকে থিয়েটারে ফিরিঙ্গি কনসার্টই ব্যবহার করা হত। লেবেডফ তার নাটকে বিলিতি বাজনদারদের এনেছিলেন। কিন্তু মোট কথা, তখনকার দিনে নাট্যাভিনয়ে ফিরিঙ্গি কনসার্টের নিঃসপত্ন আধিপত্যকে অস্বীকার করা যাবেনা। পরবর্তীকালে নাট্যাভিনয়ে বীর, করুণ ইত্যাদি রস বোঝানোর জন্য, ক্লাইম্যাক্স বোঝানোর জন্য ঝাঝ, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন বেহালা, ক্লারিওনেট, বিভিন্ন পর্দার আড়বাঁশী, ছোট বড় নানারকমের ঝাঝই ছিল আবহসংগীতের উপকরণ।

নাট্যাভিনয়ে সুসংহত, সুপ্রযোজিত আবহসংগীতের প্রয়োগ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তার 'সীতা' নাট্যাভিনয় থেকেই প্রথম আরম্ভ হয় নাট্যক্রিয়াকে তীব্রতর এবং অভিনয়ের রস ঘনীভূত করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের সুসংহত ব্যবহার। এই কাজ করবার জন্য তিনি তখনকার ব্রডকাস্টিং কপপোরেশনের বাংলা কর্মসূচীর অধ্যক্ষ অদ্বিতীয় ক্লারিওনেট বাদক নৃপেন মজুমদারকে ডেকে আনেন। 'স্বর্ণসীতা গড়বার প্রয়োজনে যখন ভারবাহীরা সোনার তাল বহন করছে নীরবে, তখনকার তীব্র বিরহ বেদনাসূচক আবহসংগীত আজও আমার কানে বাজছে'—একথা বলেছিলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবহসংগীত একটা আলাদা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাট্যাভিনয়ে নেপথ্য বিধানের এই অঙ্গটির অনুপস্থিতি আজ আর কল্পনা করা যায় না। বাচিক অভিনয় হোক, মুকাভিনয় হোক কিংবা অঙ্গাভিনয় হোক, আবহসংগীত সমান তালে চলতে থাকে। অভিনেতার বিভিন্ন মুডকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বিভিন্ন ভাষাহীন অভিব্যক্তির ভাষা প্রদান করে আবহসংগীত নাটকের একটা সামগ্রিক রসরূপ, শিল্পরূপ গড়ে তোলে। যা উপরিস্তরে ভাসমান থাকে, তাকে গভীর থেকে গভীর স্তরে নিয়ে গিয়ে একটা দাগ কেটে দেয়। অর্থাৎ কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে মনপ্রাণ আকুল করে তোলে। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে আজ আবহসংগীতের নিঃসপত্ন আধিপত্য।

নাট্যসাহিত্যে সাধারণ নাট্যশালায় প্রথম শতকের ন্যূাধিক শেষ দু'দশক নাট্যজগতের গৌরবজনক অধ্যায় বলে চিহ্নিত হতে পারে ঠিক, কিন্তু নেপথ্য বিধান সম্পর্কে অর্থাৎ মঞ্চ, আলো ও আবহসংহীত সম্পর্কে পথিকৃৎ হচ্ছে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত অপেশাদার গোষ্ঠী। তার মধ্যে প্রধান হল গণনাট্য সংঘ। 'নবান্ন' নাটকে 'গণনাট্য সংঘ' প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য জগতের সুসংহত মেলবন্ধন ঘটিয়ে টীমওয়ার্ক ধর্মী নাট্য পরিবেশন রীতির প্রবর্তন করে—এ সম্পর্কে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন বটে তবে কালের বিচারে তা গ্রাহ্য হবেনা। 'নবান্ন' নাটকেই প্রথম দেখা গিয়েছিল বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী অতি প্রচলিত ভাষার রথে চেপে ধ্বনি, আলোক ও মঞ্চকৌশল সমন্বিত বাস্তবানুগ পরিবেষ্টনীর মাঝে খুবই বিশ্বাসগ্রাহ্যভাবে যাত্রা শুরু করে অতি সহজেই দর্শক হৃদয় জয় করে ফেলেছিল। সেদিনই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ বুঝেছিল অভিনয় জগতে

একাধিপত্যের দাপট আর খাটবে না। তাকে টেক্কা দেবার মতো শিশু জন্মগ্রহণ করে গেছে। এখানেই গণনাট্য সংঘের আন্দোলন, এখানেই বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের বিশেষত্ব। এখানে একান্ত বাস্তবধর্মী 'নবান্ন' নাটকের নেতৃত্ব। তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যর ইতিহাস 'নবান্ন' নাটকটিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। দেখা হয় এইজন্যে যে, এই নাটকের মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছিল নাট্য আন্দোলন। জীবন ও গভীর জীবন প্রত্যয় যার বিষয়, জীবনের বাস্তবানুগ উপস্থাপনা যার লক্ষ্য। বক্তব্য মানুষের পক্ষে—খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে—শোষণ নিপীড়ন-এর বিরুদ্ধে।

৪৮.১৬ 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য

চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের পর নাটকের 'যবনিকা' পাত ঘটেছে। এটিই শেষ দৃশ্য। এ দৃশ্যের পটভূমিকা 'মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা। পরিবেশ কলহাস্যমুখর। নবান্ন উৎসব চলছে। মোরগের লড়াই, লাঠিখেলা ও কৃষাণীদের গানে মুখরিত সমগ্র অঞ্চল।' ইতোমধ্যে এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শহর থেকে ফেরা নিরঞ্জন-বিনোদিনীর নতুন করে গুছিয়ে নেয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। তৃতীয় ও শেষ দৃশ্যে অকস্মাৎ 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার 'মাথা নাড়তে' প্রবেশ করে। এমনাড়তেভাবে প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে যে দুর্যোগের ঘনঘটনার সূচনা, পরে বিস্তার, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদ, শেষ দৃশ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন এবং সেই সঙ্গে দয়ালের বক্তব্য 'মন্বন্তরের দাপট গিয়েছে, তবু মরিনি...আমরা', 'এবার আর আকাল এসে আত্মীয় পরিজন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না', 'জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ'—প্রভৃতি আপ্তবাক্য সুলভ সংলাপের অতিনাটকীয়তা ও পূর্বাপর রহিত অপ্রত্যাশিত ঘটনার আতিশয্যের জন্যই, নাটকাভিনয় দেখে, সে দিন এই দৃশ্যটি সম্পর্কে কিছু প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছিল।

শ্রীরঙ্গম মঞ্চে একাদিক্রমে সাত রাত্রি অভিনয়ের পর 'নবান্ন' নাট্যামোদী, বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল সাড়া এনে দিয়েছিল। নাটক ও প্রযোজনার অন্যতর চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তি এক নতুন দিগন্তের আভাস এনে দেয়। গণনাট্যের জয়যাত্রার শুরু এখান থেকে।

নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার দিক থেকে 'নবান্ন' যতটা অভিনন্দিত হয়েছে, সাহিত্য হিসাবে নাটকটি ততটা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এর ঘটনা পরম্পরা একটি অখণ্ড কাহিনীর ক্রমবিকশিত রূপকে তুলে ধরার চেয়ে, নাটকীয় আবেগকে একমুখী করে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি ও আবেগ বৈচিত্র্যের প্রতি বেশি মনোযোগী। সাধারণ কৃষক ও নিম্নবিত্ত কতকগুলি মানুষ ও তাদের সমাজজীবনের অবলম্বন হলেও তাকে নাট্যরসাশ্রিত করার জন্য যে প্রতিভার প্রয়োজন, সে পরিচয় নাটকটিতে পরিস্ফুট হয়নি। তাই নবান্নের কোনো

কোনো দৃশ্য পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এঁদের কেউ কেউ শেষ দৃশ্যটিকে নবান্নের দুর্বলতম অংশ বলে মনে করেন। "নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ওই অংশগুলিতে ঘটনা বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পঙ্গু।" "এই দৃশ্যে গ্রন্থাকার যেভাবে তার উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিবিহীন।" ('নবান্ন'—হিরণকুমার সান্যাল, পরিচয়, চৈত্র ১৩৫১)।

সমালোচকের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, নাটকটির প্রথমাংশে গ্রাম বাঙলার জনজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও তৎসহ নাট্য কাহিনীতে একটি গতিবেগ আনবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তা অনেকটা স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি—রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ঘটনার টানাপোড়েন, দুর্ভিক্ষ মহামারী—বন্যায় বিপন্ন মানুষের স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনার দায় নিয়ে সেদিন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাঙলা শাখার ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তে ছিল। প্রয়োজন ছিল সাধারণ মানুষকে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন এবং ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নবান্ন নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে দায় ও দায়িত্ব সম্যকভাবে পালন করেছে।

চার অঙ্কে বিন্যস্ত 'নবান্ন' নাটক বঙ্গদেশের অনাদৃত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রথম আলেখ্য। প্রথম বাংলার চাষী মজুরের 'দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সংকল্পের চমৎকার বাস্তবসম্মত চিত্র'। এর পটভূমিতে আছে তৎকালের বাংলাদেশের তিন বৎসরের ঘটনা। ১৯৪২-৪৪ সালের গ্রাম বাঙলার জনজীবনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনাকে নাট্যকার অতি স্বচ্ছন্দভাবে এ নাটকে তুলে ধরেছেন। উদ্দেশ্য গণজীবনের বিস্তৃত পরিসরটি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পোড় খাওয়া মানুষের মাধ্যমে নতুন এক বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবন দর্শনকে প্রকাশ করা, যার প্রতিপাদ্য 'সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ' চেতনা সঞ্চার করা। গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রতিপাদ্যটি তুলে ধরবার জন্য প্রাথমিকভাবে দুর্গত পল্লী ও পল্লীবাসীর সঙ্কটের স্বরূপ তুলে ধরেছেন প্রথম অঙ্কের দৃশ্য পরম্পরায়। প্রথম দৃশ্যের পটভূমি : বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ আর এখানে '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন দেশব্যাপী অগণিত মানুষের সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রক্তাক্ত সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনাকে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন—"সুদূরের পটভূমি রক্তিম। ... হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল; আর উর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি।"—এ থেকে বোঝা যায় বাঙলার রাজনৈতিক পটভূমি তখন অগ্নিগর্ভ। এ হেন পরিস্থিতিতে আমিনপুরের কৃষক প্রধান সমাদ্দার তিন গোলা ধান নষ্ট করে, নৌকা আটকে রাখে, আবার দুই ছেলেকে নিয়ে আগস্ট

আন্দোলনেও যোগ দেয়। তার স্ত্রী পঞ্চাননী পুলিশী সন্ত্রাস অত্যাচারের ভয়ে ভীত 'মেয়েমানুষের লজ্জা শরম খুইয়ে বনেজঙ্গালে গিয়ে' পহরের পর পহর বসে গ্লানির প্রতিবাদ করেও যখন কোনো সুরাহা হয় না দেখে তখন নিজেই বিদ্রোহের মশাল হাতে জনতার নেতৃত্ব দেয়, অবিচল দৃঢ়তায়; উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে যেতে। পক্ষান্তরে, কুঞ্জ মনে করে দেশের মানুষের প্রস্তুতিবিহীন সংগ্রাম আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। আর যুধিষ্ঠিরের সংলাপ নেহাৎই প্ররোচনাকারীর বক্তব্য। সব মিলিয়ে দৃশ্যটিতে বিশ্বযুদ্ধ ও আগস্ট আন্দোলনের উত্তেজনার দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বাঙলাদেশের মানুষ সেদিন যুবাবৃদ্ধ নির্বিশেষে নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তা বোঝা যায়। এ তো নেপথ্যভূমি।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দৃশ্য প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালীর বিস্তৃত বর্ণনায় সমৃদ্ধ। অভাবের তাড়নায় সমাদ্দার পরিবার বীজধানের শেষে ঘরের থালা বাসন বিক্রি করে মুখের গ্রাস সংগ্রহ করছে, তৎসত্ত্বেও সহৃদয়তা হারায়নি। প্রতিবেশী দয়ালকে সংগৃহীত সামান্য খুদকুঁড়ো থেকে মুঠোকখানেক দিতে দ্বিধা করেনা। নিরঞ্জন এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দুর্দৈব এতক্ষণ বোধ করি প্রতীক্ষা করছিল। আকস্মিক দমকা বাতাসকে সঙ্গো নিয়ে সাত-আট হাত উঁচু হয়ে আসা বান আর প্রবল ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে। প্রধানের দোচালা ভেঙে 'ঘর বার' সব একাকার হয়ে যায়। এর সঙ্গো তাল মিলিয়ে মহামড়ক উজাড় করতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম। তবু এরই মধ্যে বাঁচবার সংগ্রাম চলে, সমাদ্দার পরিবারের। এ হেন বিপর্যয়ে, সঙ্কটে হায়েনারা স্থির থাকতে পারেনা। তাদের লোভী দৃষ্টি মানুষের শেষ সম্বলটুকুতেও হাত বাড়ায়। হারু দত্ত গ্রামের মহাজন, সমাদ্দারদের অভাবের সুযোগ নিয়ে জমি কাড়তে উদ্যত হলে, কুঞ্জ বাধা দেয়। পরিণামে হারুর লাঠিয়ালের আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়-তৃতীয় অঙ্ক সমাদ্দার পরিবারের শহরবাসের ইতিকথা। ভিন্নতর পরিবেশে অনভ্যস্ত জীবনচারণে প্রতিপদে আত্মাবমানানা সহ্য করতে না পেরে প্রধান, গ্রাম বাঙলার পিতৃপুরুষ, কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে যায়। কুঞ্জ, রাধার নগরজীবনের সীমাহীন হৃদয়হীনতায় স্বগ্রামে ফিরে যাবার সংকল্প নেয়। কালীধন সেবাশ্রমে (?) বিনোদিনীর সঙ্গো নিরঞ্জনের পুনর্মিলন ও ধাড়ার সমস্ত হীন ব্যবসার পুলিশ সংবাদ দিয়ে, সচক্র ধরিয়ে দেয় এবং পরিশেষে তারা ঘরে ফেরে।

বস্তুত প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে ৪২-৪৩ সালের আমিনপুর তথা গ্রামবাঙলার যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তা যেমন ব্যাপক ও বাস্তবানুগ, তেমনি নাটকীয়। এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরার তালিকাকে ক্ষুধা মারী মন্বন্তরে পীড়াগ্রস্ত আর্ত বাঙলাদেশের ইতিহাস বলা যায়। কিন্তু ইতিহাস তো কোথাও থেমে থাকে না। আর তাই শুধু ধ্বংসের বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপনাতেই সমাজ সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধ্বংস যতই বড় হোক, প্রাণের অঙ্কুরোদগমের সেখানেই শুরু। শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের বাঁচবার

আশা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, সে তো চিরন্তন! মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও নিঃশেষে মরে না, 'নবান্ন' সেই বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে। দয়াল বলেছে—"মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, ... আমরা তো বেঁচেই আছি। কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।" কিন্তু কি সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র যা মানুষের বুকে বল, মনে শক্তি জোগায়—ভয় থেকে অভয়ে পৌঁছে দেয়? 'নবান্ন' সেই সংবাদ বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে—"জোর জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!" এভাবেই তো মানুষ অন্যায়ের বিরুধ্বে, অত্যাচারের বিরুধ্বে, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করে। এখানেই বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনচেতনার পরিচয়। 'নবান্ন' নাটকের এই উপসংহারে পৌঁছুবার জন্য মানস প্রস্তুতি ঘটেছে চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে, গাতায় খাটার প্রতিশ্রুতিতে। সংঘশক্তির এখানেই প্রতিষ্ঠা। তারপর "জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্থ ভাইদের জন্য দিয়ে" 'ধর্মগোলা' স্থাপনের সঙ্কল্পে তার প্রাণসঞ্চার। তৃতীয় দৃশ্যের প্রতিরোধ তো তারই পরিণত রূপ। দয়াল আমিনপুরে নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে যে পাথেয় সংগ্রহ করেছে, সেখানে থেকে গড়ে উঠেছে এই বলিষ্ঠ জীবনদর্শন। 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যটা তাই নাটকের প্রথমাংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি পণ্ড হয়েছে, তা বলা যায়না। নিরঞ্জন বিনোদিনী, কুঞ্জ রাধা এবং প্রধানের শেষ অঙ্কে পর্যায়ক্রমে ঘরে ফেলা একাট উপলক্ষ্য মাত্র।

পরিশেষে আর একটি কথা। নাটকের শেষ দৃশ্যটি নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও কোনো কোনো সমালোচকের মতে এ দৃশ্যটিই সব চাইতে ভালো। কেন না এই দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। তৎসত্ত্বেও দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় নাট্যকারের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। গণনাট্য সংঘ, তার অনন্য সংঘশক্তি ও অভিনয় নৈপুণ্যে এই দৃশ্যটি সম্পর্কে জনমানসে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই সামগ্রিক বিচারে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, নবান্নে আপাতঃ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও, একটি সফল নাট্যপ্রয়াস।

৪৮.১৭ সারাংশ

আধুনিক নাট্যাভিনয়ে আলো, ধ্বনি, আবহসংহীত প্রভৃতি গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলিকে নাট্যাভিনয়ে বা থিয়েটারের পরিভাষায়য় বলে নেপথ্য বিধান। থিয়েটারের দুটি অংশ—(১) প্রত্যক্ষ অভিনয়, (২) নেপথ্য অভিনয়। প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ বা বাচিক ও অঙ্গভঙ্গি সহযোগে মঞ্চে প্রত্যক্ষ অভিনয়ে। এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাগ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য নেপত্য বিধানের অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত। এতদুভয়ের সুসঙ্গত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নাটক বাঞ্ছিত রস জারণ করতে পারে। নবানের কাহিনী শুধু গতানুগতিকতা বর্জিত হয়, এর

মঞ্চসজ্জা, আবহসংগীত, আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব ছিল, যা গণনাট্য সংঘের উল্লেখযোগ্য অবদান। 'নবনাট্য' পর্বে যে আলো-ধ্বনি-আবহসংগীত বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার প্রাথমিক সূচনা 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চাভিনয়ে দেখা গিয়েছিল।

উন্মুক্ত আকাশ বা ধূসর প্রান্তরে জনতার মাঝখানে রঙ্গমঞ্চের সূচনা। গ্রীক মঞ্চ পরিকল্পনা ও তার বিবর্তনে 'কোরাস' ও 'অর্কেস্ট্রা'র বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাকে বলা হত থিয়াট্রন। এই থিয়াট্রন থেকে থিয়েটার শব্দটি এসেছে।

এদেশে লোকনাট্যের অভিনয়ের জন্য মঞ্চের প্রয়োজন হতনা। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ও ইউরোপীয় মঞ্চপ্রভাবে মঞ্চ ক্রমশ জটিলতর হয়েছে। নানা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৃৎ-কৌশল যুক্ত হয়ে আধুনিক মঞ্চভাবনা ক্রমান্বয়েই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে।

বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্য এখন যে মঞ্চকে বোঝায় তা হল প্রসেনিয়ম মঞ্চ। এর সূচনা করেছেন লেবেডফ, জড্রেলের লঘুনাটক 'দি ডিসগাইজ' এর বঙ্গানুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয় কালে। মঞ্চটির তিন পাশ ওপর দিক ঢাকা, সামনেটা খোলা, আয়তাকার, একধারে উঁচু বেদীর ওপরে, প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে সেখানে অভিনেতারা তাদের সংলাপ উচ্চারণ করেন। পেছনে দৃশ্যপট এঁকে পর পর ঝোলান থাকত। প্রয়োজনমত এর ব্যবহার করা হত। ১৮৭২-এ জাতীয় নাট্যশালা বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ধর্মদাস সুর 'নীলদর্পণ' নাটকের জন্য এধরনের একটি মঞ্চ গড়েছিলেন। পরে অমর দত্ত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটারে দৃশ্যপট ও আসবাবপত্রে আরও বাস্তবতা আনেন। কিন্তু এর আমূল পরিবর্তন ঘটান শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তিনি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট মঞ্চ পরিকল্পনা করেন, সেইসঙ্গে পার্শ্বপট ও পাদপ্রদীপ তুলে দেন। ফলে শিল্পীরা স্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথ পান। ফলত মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তব ঘেঁষা হয়ে ওঠে।

চতুষ্কোনপ্রসেনিয়ম মঞ্চকে প্রয়োজনানুযায়ী এক, দুই বা ত্রিস্তরীয় মঞ্চ করা যায়। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য মূলত দ্বিস্তরীয় মঞ্চ। "শহরের রাজপথ। পাশে ধনীর বাসভবন" প্রভৃতি মঞ্চের ডানদিকের বর্ণনা। "আর মঞ্চের বাঁদিকে এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে ডাস্টবিন..........কুঞ্জ রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট..............ইত্যাদি।" শিশিরকুমার তাঁর 'সীতা' ও 'দিগ্বিজয়ী' তে এর ব্যবহার করেছিলেন। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্য কল্পনায় শিশিরকুমারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া, তাই স্বল্পতম আয়োজনে মঞ্চ পরিকল্পনা করা হোত। তাই এ মঞ্চ বস্তুভারের পরিবর্তে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠল। আলোধ্বনি ও আবহসংগীত এ ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য প্রধানের বাড়ি থেকে দয়াল-এর চাল নিয়ে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা, বা দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাধিকা কুঞ্জকে কুকুরে কামড়ানো হাত বেঁধে দিচ্ছে ও কাঁদছে—দৃশ্যে আবহসংগীত খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। 'নবান্ন' নাটকের বাস্তবধর্মী বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবধর্মী দৃশ্য রচনা, জীবনের বাস্তবানুগ নাট্যাভিনয়ের সাফল্য বস্তুত গণনাট্য আন্দোলনের সাফল্য।

'মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর', চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য— এখানে নবান্ন উৎসবের আয়োজন হয়েছে—এটি নাটকেরও শেষ দৃশ্য। অস্তায়মান সূর্যের গোধূলি আলোয় চরাচর উদ্ভাসিত। অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে কৃষাণ-কৃষাণীরা। এদিকে ইতোমধ্যে শহর থেকে আমিনপুরে ফিরেছে নিরঞ্জন-বিনোদিনী, তাদের নতুন করে গুছিয়ে নেওয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকাও ফিরে এলো। অবশেষে শেষ দৃশ্যে 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার ফেরে। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের দুর্যোগ, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদের পর শেষ দৃশ্যেই সমাদ্দার পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন ঘটে। সর্বস্ব হারানো দয়াল সব সঙ্কটকে তুচ্ছ করে বলেছে, মন্বন্তরে মরিনি আমরা, আবার আকাল আমাদের আত্মীয় পরিজনকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তার উদ্দীপক ভাষণ, "জোর, জোর প্রতিরোধ এবার প্রধান।" দয়ালের এ ভাষণ যতই আকস্মিক ও আতিশয্যপূর্ণ হোক না কেন, এর সফল অভিনয় নাট্যামোদী মহলে নতুন দিগন্তের আভাস এনে দিয়েছিল।

নবান্নের অভিনয় সাফল্য, নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার জন্য অভিনন্দিত হয়েছে। নবান্ন জটিল নাটকীয় দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি আবেগ সৃষ্টির প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছে। নবান্ন নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি উপস্থাপনার মাধ্যমে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন ও ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার যে দায় ও দায়িত্ব গণনাট্য সংঘ গ্রহণ করেছিল, তা যথার্থভাবে পালন করেছে।

নাটকের তিনটি অঙ্ক পরম্পরায় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দোলন, ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা, মারী-মন্বন্তরের যে দৃশ্যপট রচনা করেছে, ইতিহাস সেখানে থেমে থাকেনি। তাই ধ্বংস বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপনাতেই সমাজ-সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধ্বংসের মধ্যেই থাকে প্রাণের অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা। তাই শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষ বাঁচতে চায়। নবান্নের শেষ দৃশ্য সেই বার্তাই বয়ে এনেছে। দয়ালের কথায়, "মন্বন্তরের দাপট গিয়েছে..........কই মরিনি তো আমরা"। সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে শেষ দৃশ্যে। গাঁতায় খাটা (৪/১), ধর্মগোলা স্থাপনের সঙ্কল্প শেষ দৃশ্যে প্রতিরোধ রচনার প্রতিজ্ঞা আমিনপুরের মানুষকে সঙ্কট উত্তরণ শেষে নতুন করে বাঁচার পথ দেখিয়েছে। নবান্নের শেষ দৃশ্য তাই বিশেষ তাৎপর্যবহ। নবান্নের উৎসবমুখর পরিবেশ গঠনের লোকায়ত উৎসবের আয়োজন প্রভৃতির দৃশ্য পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নাট্যকার যথার্থ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪৮.১৮ অনুশীলনী ৪

১। "সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপরডা দাঁড়ায় এই যে, এখনই, এই মুহূর্তে আমরা যদি ফসল রক্ষে করার একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারি, তা হলে মিত্যু ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না।"—কে, কোথায়, কি প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন? 'মিত্যু' থেকে 'গত্যন্তরে'র কি উপায় স্থির হয়েছিল লিখুন।

২। 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ও লক্ষ্য প্রমাণ করে নাটকটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদের নাটক। নাটকের অভিনয় গঠনরীতিতে তার আভাস আছে। —আলোচনা করুন।

৩। "নবান্ন' বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল"—সমালোচকের এই মন্তব্য সম্পর্কে আপনার অভিমত দিন।

৪। "ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরা! আমরা তো বেঁচেই আছি।"—কার লেখা, কোন নাটকের অংশ? কে এই কথা কখন বলেছে? বক্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৫। "নবান্ন'কে একই সঙ্গে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক বলা হয়।"—নাটকটিতে দুর্গতি প্রতিরোধের যে চিত্র পাওয়া যায় তা বর্ণনা করুন।

৬। 'নবান্ন' নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনায় বিশেষত মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জা ও আবহসংগীত একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। —মন্তব্যটির যাথার্থ্য নিরুপণ করুন।

৪৮.১৯ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ :

১। (ক) অভিনবত্ব নাটকের বিষয়বস্তুতে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মন্বন্তর, মারী ও মড়কে বিপর্যস্ত সর্বস্বান্ত গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবার ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্য কোলকাতা শহরের পার্কে জমায়েত হচ্ছে লঙ্গারখানায় সামান্য খাদ্যের জন্য। এ বিষয় বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম।

(খ) নাটকে কোন নায়ক চরিত্র নেই। নাটকের চরিত্রগুলির সামগ্রিক অভিনয়েই নাটকের সাফল্য নির্ভরশীল।

(গ) নাটকের সংলাপ, বাস্তবমুখী ও জীবনানুগ।

(ঘ) এ নাটকের মঞ্চ, দৃশ্য, আলো ও ধ্বনির ব্যবহারে অভিনবত্ব উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত বিষয়গুলির যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

২। প্রথম প্রকাশ 'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩-খ্রিস্টাব্দে, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৪৪-এ, প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গাম মঞ্চে, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৪।

৩। কৃষকের জীবন নিয়ে রচিত তিনটি নাটক হল—
নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র।
জমিদার দর্পণ—মীর মশাররফ্ হোসেন।
নবান্ন—বিজন ভট্টাচার্য।

৪। ৭.৩ অংশের 'দেশকাল' পর্যায়টি পাঠ করে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

৫। ৭.৩ অংশের 'নামকরণ' অংশ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ২ :

১। (ক) যুদ্ধ, দুর্যোগ, মন্বন্তরে আমিনপুর গ্রামের মানুষ যখন বিপন্ন, সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ যখন সকলকে পীড়িত করছে, তখন বন্ধু দয়ালকে সম্বোধন করে প্রধান সমাদ্দার একথা বলেছে। সে শুনেছে বিত্তবান মানুষেরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্র মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খুলে খাবার বিতরণ করছে। এই সংবাদে তার আশা শহরে গেলে প্রাণধারণের জন্য অন্তত দুমুঠো অন্ন জুটবে।

'অন্নকুট' শব্দের বাচ্যার্থ হল অন্নের পাহাড়তুল্য অন্নরাশি বা খাদ্যস্তুপ। বিশেষ তিথিতে দেবার্চনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'অন্ন' প্রসাদ হিসেবে সাধারণে বিতরণ করা হয় যে উৎসবে তা অন্নকুট নামে পরিচিত। এখানে ব্যঞ্জনার্থে শহরের লঙ্গারখানা থেকে রান্না করা খাদ্য বিতরণের আয়োজনকে 'অন্নকূট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার 'সরকার' রাজীব বলেছে। কালীধন চালের মজুতদার। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করবার জন্য চাল গোপনে গুদামজাত করে, বাজারে দাম বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় চাল সহজভাবে না পেলে বেশি দাম দিয়ে চাল কিনতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে জনৈক ভদ্রলোক চাল কিনতে এসে কোথাও না পেয়ে চাল-ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকানে হাজির হয়ে করজোড়ে একটা ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। কালীধন অন্য জায়গা থেকে পঞ্চাশ টাকা দামে সংগ্রহ করে দেবার প্রস্তাব দিলে ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় কালীধনেরই যোগ্য কর্মচারী রাজীব এই উক্তি করে।

এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে অহসায় ছাপোষা সাধারণ ক্রেতা ভদ্রলোকের প্রতি বক্তা রাজীবের তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। হীন চরিত্র কালীধনের সাহচর্যে রাজীব তার প্রভুরই মত কুরুচির পরিচয় দিয়েছে।

(গ) বক্তা প্রধান সমাদ্দার। তাঁর দুটি পুত্র শ্রীপতি ভূপতি দেশের ৪২-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হয়েছে। পুত্রহারা পিতার এই বিলাপ তাঁর অন্তর বেদনাকে প্রকাশ করেছে। কুঞ্জ প্রধানের ভ্রাতুষ্পুত্র, সেও শ্রীপতি-ভূপতির জন্য বেদনাবোধ করে বলেছে—"শ্রীপতি-ভূপতির ব্যাথা বড় কম বাজে নি এই বুকে জানলে জেঠা"—কুঞ্জ এজন্য ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরে। তাই বৃদ্ধ জেঠাকে স্বান্তনা দেয়।

(ঘ) উক্তিটি প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী পঞ্চাননীর। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল ঢেউ-এ যখন ইংরেজ সরকার বিব্রত শুধু নয়, বিপন্ন, তখন সংগ্রামীদের ওপর প্রবল বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রামের বিপ্লবীদের সন্ধানে পুলিশ সাধারণ মানুষের ওপর নানা ধরনের পীড়ন শুরু করে। পুলিশের পীড়নের ভয়ে অনেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ছেড়ে পালিয়ে আসছে দেখে পঞ্চাননী তাদের এগিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন. সংগ্রাম ছেড়ে সংকটকালে যারা পিছিয়ে আসে তারা জাতীয় জীবনে কলঙ্ক স্বরূপ সন্দেহ নেই। নাটকে পঞ্চাননী চরিত্রটি বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে রচিত। অকুতোভয় পঞ্চাননীর দেশপ্রেম, দৃঢ় চরিত্রবল, সংকটে যথার্থ নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল—এই সংলাপ থেকে তা বোঝা যায়।

২। এই এককের ৭.৯ অংশের 'নবান্ন' নাটকের গান, অংশটি এবং সারাংশের প্রাসঙ্গিক অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। 'নবান্ন' নাটকের নামকরণ ও প্রাসঙ্কি আলোচনা পড়ে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করুন।

৪। 'প্রাসঙ্কি আলোচনা' পর্যায় অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৫। গণনাট্য হিসেব 'নবান্ন'র অবদান ও গণনাট্য আন্দোলনে নবান্নের ভূমিকা অংশ পাঠ করে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ৩ :

১। (ক) ৪৫ (খ) প্রধান (গ) রাধিকা

২। পরিচয়ের জন্য চরিত্রলিপি এবং ৭.১১ অংশের উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে 'প্রাসঙ্গিক আলোচনা'র সাহায্য নিন।

৩। বক্তা দ্বিতীয় ভদ্রলোক।

ব্ল্যাক মার্কেট-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'কালোবাজার'। খোলা বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে গোপনে অতিরিক্ত মুনাফায় বেশি দাম দিয়ে বিক্রি করা। এভাবে অর্জিত হিসাব বহির্ভূত অর্থই কালো টাকার (Black Money) উৎস।

মজুতদার শব্দটি আরবী 'মৌজদ' + দার (ফরাসী প্রত্যয়) গড়ে উঠেছে।

উদ্ধৃত উক্তির মূল প্রসঙ্গ হল দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, শহরের রাজপথ সংলগ্ন ধনীর আবাস। সেখানে বিবাহোৎসব। গৃহকর্তা-বড়োকর্তার হাজার খানেক নিমন্ত্রিত। নির্মলবাবু প্রসঙ্গত বলেছেন। জিনিসপত্তর জোগাড় করতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? বড়োকর্তা জানান যদ্দিন চোরাবাজার আছে, ততদিন—কথা অসম্পূর্ণ থাকতেই দ্বিতীয় ভদ্রলোক চোরাবাজারের প্রশংসার ভঙ্গিতে বলেন, চোরাবাজার আছে বলেই কিছু আটকাচ্ছে না। তাই, তিনি প্রকাশ্যে চোরাবাজার বা ব্ল্যাকমার্কেট ও মজুতদারদের সমর্থন জানান। নির্মলবাবু অবশ্য বলেছেন পয়সা যাদের আছে, তারা একথা বলতে পারেন।

(প্রশ্নটির পরীক্ষার্থী তার নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করবেন।)

৪। ৭.১১ অংশটি পাঠ করে উত্তর তৈরি করুন। গ্রীক বা সেক্সপীয়রীয় অর্থে যাকে নাটক বলা হয়, সে অর্থে এখানে নায়ক নেই, তবে প্রধান বা কুঞ্জকে জীবনসংগ্রাম ও তা থেকে উত্তরণসূত্রে মুখ্য চরিত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

৫। বক্তা সুজন, সাধারণ গ্রামবাসীদের একজন। এঁরা কুড়ি-পঁচিশ জন প্রধান সমাদ্দার বাড়ির স্বল্প পরিসর উঠোনে বসে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত।

আলাপচারিতার মধ্যে ফকির বলেছে, বাংলা দেশের গ্রামীণ সন্তানরা বাবার দেনা ঘাড়ে জন্মায় এবং তারা শেষ জীবনে নিজের দেনা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে চলে যায়, এমনটাই চিরকালটায় ঘটছে। এর মধ্যে কোনো স্বতন্ত্র বিশেষত্ব নেই।

এই কথার উত্তরে সুজন বলেছে, এতদিন ধরে এমনটি ঘটেছে বলেই, তা মেনে নিতে হবে তা কেন? কেন এর ভালমন্দ বিচার করা হবে না? এই কথার মধ্য দিয়ে সুজনকে অনেকটা বাস্তববাদী ও সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী বলে মনে হয়।

৬। ৭.১১ চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। ভাল করে এটি পড়ে নিয়ে উত্তর দিন।

৭। ৮। ৯। — ৭.১২ অংশটি ভাল করে পড়ে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখুন।

১০। ৭.১২ ও ৭.১৩ অংশের শেষ পর্যায়ে নাটক সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরি করুন।

১১। শহরে বাসকালীন অসহায়, বিপন্ন কুঞ্জ, রাধিকাকে বলেছে। হৃদয়হীন, শহর জীবনের চেয়ে তার নিজের গ্রামে কুঞ্জ অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, এই ধারণা থেকে কথাগুলি বলেছে।

হৃদয়হীন শুষ্ক শহর জীবনে কোনোভাবেই স্বাভাবিক হতে পারছে না, তার স্বগ্রামে স্ব-ভূমিতে সে সুস্থ বোধ করবে, এই প্রত্যয় থেকে সে কথাটি বলেছে।

বক্তার এই মন্তব্য থেকে তার মাটির প্রতি চিরন্তন মমত্ব ও আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১২। এই সংলাপটি তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রধান সমাদ্দার উচ্চারণ করেছে। সংলাপটি বিশ্লেষণ করে তাৎপর্য বুঝতে হবে।

১৩। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের আমিনপুরের স্থানীয় পোদ্দার তথা চোরাচালানকারী হারু দত্তের। গ্রামের বৃদ্ধা মহিলা দুঃস্থ পরিবারের মেয়েদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে হারু দত্তের হাতে তুলে দেয় শহরে পাচার করবার জন্য।

চন্দরের অল্পবয়সী মেয়ে। তিন বছর বয়সে তার মা মারা গেলে, অনেক যত্নে সে মা-মরা মেয়েটিকে লালন করে বড় করেছে। খুকীর মা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে চন্দরের মেয়েকে হারু দত্তের হাতে তুলে দেয়। হারু দত্ত চন্দরকে দিয়ে একটি কাগজে টিপ-ঠাপ দিইয়ে নেয়।

এখানে বক্তা হারু দত্তের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল এই যে, সে শুধু মজুতদারই নয়, একজন হীন মেয়ে পাচারকারী। ধূর্ত ব্যবসায়ী এই অন্যায় কাজটি অত্যন্ত সতর্কভাবে করে। পাকাপোক্ত করবার জন্য নিরক্ষর মানুষগুলোকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমত কথা লিখিয়ে নেয়।

অনুশীলনী ৪ :

১। 'নবান্ন' নাটকে দয়াল, চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে একথা বলেছেন। প্রসঙ্গটি হল ফসল কাটা, ঝাড়া, তোলা তারপর সেই ফসল রক্ষে করার সমস্যা।

অল্প সময়ে এ কাজ সম্পন্ন করা খুবই দুরুহ। তারই একটা উপায় সকলে মিলে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। ঘরে খাদ্যাভাবের পরিণতি কি দয়াল তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে দয়াল এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে বলেছেন ফসল রক্ষে করতে না পারলে 'মিত্যু ছাড়া গত্যন্তর' থাকবে না।

'মিত্যু' থেকে গত্যন্তরে'র উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা জনে নানা কথার অবতারণা করলেও কোনো ইতিবাচক মতে পৌঁছানো যখন যাচ্ছে না, অথচ বড়োকর্তা এটা বুঝেছে "দুইচার দিনের ভেতর ফসল কাটা হল তো হল, নয় তো বিলকুল পয়মাল হবে।" অবশেষে দয়াল 'সকলে মিলে গাঁতায়' খাটার প্রস্তাব দিয়ে বলে, "অতিকম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি পাওয়া যায়, সকলে মিলে গাঁতায় খাটার পিতিজ্ঞে করে, তা হলে একদানা ফসলও জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে ফসল গোলায় তুলে ফেলা সম্ভব।" তাই ফসল যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে সব্বার আগে। আমিনপুরবাসী এভাবেই মিত্যু থেকে রেহাই পেয়েছে।

২। 'নবান্ন'-এর গঠনরীতি (৭.৮ অংশের মূলাঠ ৪) সংক্রান্ত আলোচনা পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। বক্তা মূলাপাঠ ৭(দ্রষ্টব্য ৭.১৫) অংশটি পড়ে উত্তর লিখুন।

৪। চতুর্থ অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্যে উদ্ধৃত কথাগুলি আংশিক মানসিক ভারসাম্য হারানো প্রধান সমাদ্দারের কথার উত্তরে বলেছে দয়াল মণ্ডল। অন্য সকলের মত দয়ালের ওপর দিয়েও জলোচ্ছ্বাসের দাপট গিয়েছে। তা সত্ত্বেও যখন তারা অনেকেই বেঁচে আছে, তখন এমনটি করতে হবে যাতে আকাল আর আচম্বিতে এসে কোনো স্বজনকে ছিনিয়ে নিতে না পারে। দয়ালের এই উক্তির মধ্য দিয়ে একটি আশাবাদী মানুষের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

৫। মূলপাঠ ৩ (দ্রষ্টব্য ৭.৭) অংশের শেষের দিকে এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। সেটি অনুসরণ করে উত্তর দিন।

৬। ৭.১৩ অংশের মূলপাঠ ৭ ভালো করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৪৮.২০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বিজন ভট্টাচার্য—*নবান্ন*।

২। ড. দিলীপকুমার নন্দী ও ড. নবকুমার মণ্ডল— *প্রসঙ্গ : নবান্ন*।

৩। ড. দর্শন চৌধুরী — *গণনাট্য আন্দোলন*।

৪। বহুরূপী — *'নবান্ন' স্মারক সংখ্যা ১. অক্টোবর ১৯৬৯ এবং স্মারক সংখ্যা ২, অক্টোবর ১৯৭০*।